পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন

১৯৪৭-১৯৭১

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

www.nagorikpathagar.org

পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে খুব বেশি গবেষণা হয়নি। এ বিষয়ে পথিকৃত গ্রন্থ বাংলাদেশের কালচার রচনা করেছেন আবুল মনসুর আহমদ। তারপর দীর্ঘ ৫০ বছরে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু কাজ হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা খুব বেশি হয়নি। ড. রেজোয়ান সিদ্দিকীর 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১' সে দিক থেকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক গবেষণা। এই অভিসন্দর্ভ রচনা করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৪৭-'৭১ সময়কালে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধানের জন্য তিনি প্রায় বিশ বছর ধরে দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরেছেন, পাঠাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ খুঁজে দেখেছেন' কথা বলেছেন সংশ্লিষ্ট বহু মানুষের সঙ্গে, অনুসন্ধান করেছেন হাজার হাজার পৃষ্ঠা।

এই গবেষণা-গ্রন্থে উল্লিখিত সময়ে দেশের প্রধান সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর পরিচয় ও কর্মকাণ্ড উদঘাটন করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে দেশের প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসও বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন।

পরিশেষে তিনি প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে উপসংহারে পৌছেছেন, তা হল হাজার বছরের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে নিজস্ব জাতিসত্তা। সে জাতিসত্তার বোধের কারণে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের মানুষ জাতি হিসাবে পশ্চিম বাংলার মানুষের চেয়ে স্বতন্ত্র। এবং তারা আলাদা জাতি। গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ মিলবে।

www.nagorikpathagar.org

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকীর জন্ম টাঙ্গাইল জেলার এলাসিন গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে, ১৯৫৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী। পিতা আতিকুল হোসেন সিদ্দিকী, মাতা হাওয়া সিদ্দিকী উভয়েই জন্নাতবাসী। এলাসিন তারক যোগেন্দ্র হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি. পাস করে ১৯৬৮ সালে ভর্তি হন করটিয়া সাদত কলেজে। জড়িয়ে পরেন বাম ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে। '৬৯-এর সামরিক শাসনের পর মাথায় হুলিয়া নিয়া আত্মগোপন করেন। ১৯৭০ সালে আবার ভর্তি হন ঢাকার জগন্নাথ কলেজে। এইচ.এস.সি. পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (১৯৭৬) ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই এমফিল-এ ভর্তি হন। পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৯৫ সালে। এর মধ্যে ১৯৯০-৯১ সালে হল্যান্ডের হেগ নগরীর ইন্সটিটিউট অব সোশাল স্টাডিজ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও উন্নয়ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা অর্জন করেন।

জীবনের লড়াই শুরু করেছিলেন সেই ১৯৭০ সাল থেকেই। সংবাদপত্রের সকল বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯৭২ সালে যোগ দিয়েছিলেন দৈনিক বাংলায়। কাজ করেছেন ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত। '৯৪-'৯৬ ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সচিব। ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দৈনিক দিনকালে বার্তা সম্পাদক ছিলেন। ২০০২ সালে যোগ দেন লন্ডন থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলাদেশ পত্রিকার বাংলাদেশস্থ আবাসিক সম্পাদক হিসাবে।

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী লিখে গেছেন অবিরাম। সংবাদপত্রে কলম ধরেছিলেন ১৯৭২ সালের শুরু থেকে। সে কলম কখনও থামেনি। ছোট গল্প লিখেছেন দুই শতাধিক, উপন্যাস ৯টি, প্রত্যেকটি ব্যতিক্রম লিখেছেন ফিকশন, রাসপুটিনের জীবনী, অনুবাদ, নাটক, প্রবন্ধ আর সমালোচনায় আছেন অগ্রণী, খবরের কাগজের কলামতো আছেই। টেলিভিশনের উপস্থাপক, সাংবাদিকতা ও পরিবেশ বিষয়ক প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন। ছুটে বেড়ান দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত। তার সাড়া জাগানো গবেষণা গ্রন্থের মধ্যে এই বইটি ছাড়াও আছে— কথামালার রাজনীতি (১৯৭২-'৭৯), Cultural colonization : India Bangladesh Issue, গণতান্ত্রিক পরিবেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি প্রভৃতি।

জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে লড়াই করে যাচ্ছেন ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী। সরকারী রোষে জেল খেটেছেন, হয়রানী হামলা-মামলার শিকার হয়েছেন। কিন্তু নত হতে শেখেননি রেজোয়ান সিদ্দিকী।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন

(১৯৪৭–১৯৭১)

ডক্টর রেজোয়ান সিদ্দিকী

জ্ঞান বিতরণী

www.nagorikpathagar.org

স্বত্ব
লেখক

দ্বিতীয় মুদ্রণ
জুন ২০০৬

প্রথম জ্ঞান বিতরণী সংস্করণ
মার্চ ২০০২

প্রচ্ছদ
নাসিম আহমেদ

প্রকাশক
মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১৭৩৯৬৯

অক্ষরবিন্যাস
ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি. কে. রায়লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এস, এম, প্রিন্টার্স
১৬/২০, নবরায় লেন, ঢাকা-১১০০

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য
৩৫০ টাকা US $ 10.00

PURBO BANGLAR SANGSKRITIK SONGGOTHAN
O SANGSKRITIK ANDHOLON 1947-1971
By Dr. Rezoyan Siddiqui
Published By Mohammad Shahidul Islam
Gyan Bitorani, 38/2-ka Banglabazar
Dhaka-1100, Tel : 7173969
ISBN--984-8298-03-7

www.nagorikpathagar.org

উ ৎ স র্গ

প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হক
শ্রদ্ধাস্পদেষু

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং এর গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাকে প্রথম আগ্রহান্বিত করে তোলেন আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হক। তাঁর নিরন্তর প্রেরণায় ও উৎসাহে ১৯৭৪ সাল থেকেই আমি এ বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করি। তাঁরই অব্যাহত অনুপ্রেরণায় ও তাগিদে সেই অনুসন্ধান কাজের ধারাবাহিকতায় স্নাতকোত্তর পড়াশোনা শেষে ১৯৮৫-৮৬ সালে 'পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১)' শীর্ষক পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ রচনায় হাত দেই। একটানা প্রায় দশ বছর অনুসন্ধান শেষে আমি এই অভিসন্দর্ভ ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করি এবং ১৯৯৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। সেজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। এই অনুসন্ধান কাজে প্রাণের তাগিদ যত ছিল, ডিগ্রির তাগিদ তত ছিল না। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের পরামর্শ, সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে এই কাজ আমি শেষ করতে পেরেছি। এ যদি কোন সাফল্য হয়ে থাকে, তবে তার কৃতিত্ব জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হকের। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

এই গবেষণা কাজে মূল্যবান পরামর্শ, বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও দুর্লভ দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন কবি, প্রাবন্ধিক, অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী ও নজরুল ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ।

এই গবেষণা কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন কবি মাহবুব হাসান। উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন কবি মজিদ মাহমুদ। তথ্য বিন্যাসে সহযোগিতা করেছেন মালিক আল ইমরান ও ওয়াদুদ কাফিল।

এই অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমি ন্যাশনাল আর্কাইভ, জাতীয় গ্রন্থাগার, ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও এর মাইক্রোফিল্ম বিভাগ ছাড়াও বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের

www.nagorikpathagar.org

ালয় গ্রন্থাগার, দৈনিক বাংলার

. অবজারভার গ্রন্থাগার, সিলেটের মুসলিম সাহিত্য

...রা ব্যবহার করেছি। এ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমি ঋণী।

রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে অধ্যাপনারত মিসেস কামরুননাহার খানম তার কর্মক্ষেত্র এবং সংসারের দায়-দায়িত্ব পালনের পরও আমাদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাসে আমাকে সদা-সর্বদা সাহায্য করেছেন। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কৃতজ্ঞতার নয়।

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় যারা আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে উপকৃত করেছেন, তাদের সকলের প্রতিই আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং ঋণ স্বীকার করছি।

রেজোয়ান সিদ্দিকী

জানুয়ারি ১৯৯৬

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগ ১৯৯৬ সালে যখন এই অভিসন্দর্ভটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে, তখন আমি ধারণা করেছিলাম, বইটি কলেজ বিশ্ববিদ্যায়ের পাঠ্য বা রেফারেন্স বই হিসাবেই কাজে লাগবে। কিন্তু বইটি প্রকাশের পর সংস্কৃতি বিষয়ে সচেতন সাধারণ পাঠকের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া জাগায়। সমাজে প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতি গবেষক ও বিদগ্ধ পাঠক সমাজ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে, টেলিফোন করে এবং চিঠি লিখে বইটির জন্য সাধুবাদ জানান। এ জন্য আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

বইটি প্রকাশের আগেই এতে পরিবেশিত তথ্যাদি একাধিকবার পরীক্ষা-নীরক্ষা করা হয়। ফলে এর তথ্যগত ত্রুটি সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তোলেননি। তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আগে আবারও কোন কোন বিষয় খতিয়ে দেখা হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি পাঠকের চোখে কোন ত্রুটি ধরা পড়ে, সেটা প্রকাশক বা লেখককে জানানোর অনুরোধ রইল।

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা এক-বার

প্রথম অধ্যায় ঃ সংস্কৃতি ও জাতীয় সংস্কৃতি ঃ সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন

১.	সংস্কৃতি কী	১৫
২.	জাতীয় সংস্কৃতি	২১
৩.	সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন	২২
৪.	পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় সংস্কৃতি প্রশ্নের বিতর্ক	২৩
৫.	সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব	৩১

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সাংস্কৃতিক সংগঠন

এক. তমদ্দুন মজলিস ১৯৪৭

১.	তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠা, পটভূমি ও লক্ষ্য	৩৯
২.	গঠনতন্ত্র	৪১
৩.	আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী	৪৬
৪.	আন্দোলন ও কর্মতৎপরতা	৪৯
	ক) ভাষা-আন্দোলন	৪৯
	খ) সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলন	৬০
	গ) অন্যান্য	৬৪
৫.	প্রকাশনা	৬৫
৬.	নেতৃত্ব, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	৬৬
৭.	সৈনিক, দ্যুতি	৬৬
৮.	অবলুপ্তি	৬৭
৯.	উপসংহার	৬৮

দুই. সংস্কৃতি সংসদ ১৯৫১

১.	লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পটভূমি	৭১
২.	কর্মতৎপরতা	৭৩
৩.	সংস্কৃতি সংসদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ	৭৮
৪.	কার্যনির্বাহী পরিষদ	৭৯
৫.	স্মৃতিচারণ	৮০
৬.	বিভেদ	৮১
৭.	উপসংহার	৮২

তিন. পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ১৯৫২

১.	পটভূমি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৮৪
২.	সংগঠন	৮৬
৩.	গঠনতন্ত্র	৮৮
৪.	কর্মতৎপরতা	৮৮
৫.	একুশের সংকলন	৯১
৬.	পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের বিরুদ্ধে সরকারী মনোভাব	৯৪
৭.	অবলুপ্তি	৯৬
৮.	উপসংহার	৯৬

www.nagorikpathagar.org

চার. বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ১৯৫৫
১. প্রতিষ্ঠা ও পটভূমি ৯৮
২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১০০
৩. কর্মতৎপরতা ১০০
৪. উপসংহার ১০২
পাঁচ রওনক সাহিত্য সংস্থা ১৯৫৮
১. প্রতিষ্ঠা ও পটভূমি ১০৩
২. সংস্থার কার্যক্রম ১০৪
৩. প্রকাশনা ১০৮
৪. সঙ্কট ও অবলুপ্তি ১০৯
৫. উপসংহার ১১০
ছয়. পাকিস্তান লেখক সংঘ ১৯৫৯
১. প্রতিষ্ঠা ও পটভূমি ১১২
২. করাচীতে লেখক সম্মেলন ১১২
৩. সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন ১১৩
৪. পাকিস্তান লেখক সংঘ গঠন ১১৩
৫. পাকিস্তান লেখক সংঘের ঘোষণাপত্র ১১৭
৬. পাকিস্তান লেখক সংঘের উদ্যোগে সাহিত্য সভা ও অন্যান্য কর্মতৎপরতা ১১৮
৭. নির্বাচন ১২০
৮. সাহিত্য পুরস্কার ১২১
৯. প্রকাশনা ১২২
১০. ব্যক্তিত্ব ১২২
১১. লেখক সংঘের ১৯৭০ সালের সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী ১২৩
১২. উপসংহার ১২৬
সাত. ছায়ানট ১৯৬১
১. প্রতিষ্ঠা ও পটভূমি ১৩০
২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৩১
৩. কার্যনির্বাহী কমিটি ১৩১
৪. কর্মতৎপরতা ১৩২
৫. ছায়ানটের প্রতি সরকারী মনোভাব ১৩৩
৬. ছায়ানট সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম ১৩৪
৭. উপসংহার ১৩৫
আট. পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা ১৯৬২
১. পটভূমি ১৩৭
২. কর্মতৎপরতা ১৩৮
৩. মহাকবি স্মরণোৎসব ১৩৮
৪. প্রতিক্রিয়া ১৪৬
৫. সাহিত্য সভা ১৪৭
৬. রবীন্দ্র জয়ন্তী ১৪৭
৭. নতুন কার্যকরী কমিটি ১৪৮
৮. পূর্বাঞ্চলীয় কমিটি ১৪৮
৯. উপসংহার ১৪৯

www.nagorikpathagar.org

নয়. নজরুল একাডেমী ১৯৬৪

১. নজরুল একাডেমী গঠনের পটভূমি ১৫১
২. নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠা ১৫২
৩. নজরুল একাডেমী উদ্বোধন ১৫৪
৪. নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ১৫৬
৫. গঠনতন্ত্র ১৫৭
৬. নজরুল একাডেমীর কর্মতৎপরতা ১৫৯
ক) উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৫৯
খ) হামদ ও না'ত জলসা ১৬০
গ) সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান ১৬০
ঘ) সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ১৬৩
৭. প্রকাশনা ১৬৩
৮. উপসংহার ১৬৪

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সাংস্কৃতিক সম্মেলন

এক. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা ১৯৪৮

১. পটভূমি ও উদ্দেশ্য ১৬৯
২. অভ্যর্থনা কমিটি ১৬৯
৩. প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রতিক্রিয়া ১৭০
৪. সম্মেলনের প্রথম দিন ১৭২
৫. সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ১৭৭
৬. প্রসঙ্গ কথা ১৭৮
৭. উপসংহার ১৭৯

দুই. পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, চট্টগ্রাম ১৯৫১

১. পটভূমি ১৮১
২. প্রস্তুতি ১৮১
৩. সম্মেলনের বক্তৃতামালা ১৮৩
৪. চিত্র প্রদর্শনী ১৮৮
৫. সঙ্গীতানুষ্ঠান ১৮৮
৬. সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব ১৮৮
৭. শুভেচ্ছা বাণী ১৮৯
৮. উপসংহার ১৮৯

তিন. পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, কুমিল্লা ১৯৫২

১. পটভূমি, প্রস্তুতি ১৯১
২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৯২
৩. সম্মেলনের প্রথম দিন ১৯৪
৪. সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ১৯৫
৫. সম্মেলনের তৃতীয় দিন ১৯৬
৬. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ১৯৮
৭. শোক প্রস্তাব ১৯৮
৮. উপসংহার ১৯৯

www.nagorikpathagar.org

চার. ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ঢাকা ১৯৫২

১.	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২০১
২.	প্রস্তুতি ও আয়োজন	২০১
৩.	উদ্বোধন ও সম্মেলনের বিবরণ	২০২
৪.	প্রস্তাব	২০৭
৫.	মন্তব্য	২০৭
৬.	উপসংহার	২০৮

পাঁচ. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা ১৯৫৪

১.	পটভূমি	২০৯
২.	প্রস্তুতি	২০৯
৩.	প্রথম দিনের অধিবেশন	২১২
৪.	দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন	২১৫
৫.	তৃতীয় দিনের অধিবেশন	২১৬
৬.	চতুর্থ দিনের অধিবেশন	২১৮
৭.	পঞ্চম দিনের অধিবেশন	২১৯
৮.	প্রতিক্রিয়া	২১৯
৯.	উপসংহার	২২২

ছয়. কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, টাঙ্গাইল ১৯৫৭

১.	পটভূমি	২২৬
২.	প্রস্তুতি	২২৬
৩.	প্রথম অধিবেশন	২২৯
৪.	পরবর্তী অধিবেশন	২২৯
৫.	বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার শুভেচ্ছা বার্তা	২৩১
৬.	সম্মেলনের তাৎপর্য	২২৩
৭.	প্রতিক্রিয়া	২৩৩
৮.	উপসংহার	২৩৫

সাত. 'সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান', ঢাকা ১৯৫৭

১.	পটভূমি	২৩৭
২.	প্রস্তুতি	২৩৭
৩.	সম্মেলনের প্রথম দিন	২৩৮
৪.	সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন	২৪১
৫.	সম্মেলনের তৃতীয় দিন	২৪৫
৬.	উপসংহার	২৪৬

আট. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, চট্টগ্রাম ১৯৫৮

১.	প্রস্তুতি	২৪৮
২.	পটভূমি	২৪৯
৩.	সম্মেলনের প্রথম দিন	২৪৯
৪.	সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন	২৫২
৫.	সম্মেলনের তৃতীয় দিন	২৫৯
৬.	সমাপ্তি অধিবেশন	২৬৮
৭.	সভার প্রস্তাব	২৬৮
৮.	উপসংহার	২৬৮

www.nagorikpathagar.org

নয়. ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৩
১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৭২
২. প্রস্তুতি ২৭২
৩. বিভিন্ন সংঘ ও উপসংঘ ২৭৩
৪. প্রথম দিন ২৭৪
৫. দ্বিতীয় দিন ২৭৪
৬. তৃতীয় দিন ২৭৪
৭. চতুর্থ দিন ২৭৪
৮. পঞ্চম দিন ২৭৫
৯. ষষ্ঠ দিন ২৭৫
১০. সপ্তম দিন ২৭৫
১১. অনুষ্ঠানের বিবরণ ২৭৫
১২. প্রদর্শনী ২৮০
১৩. উপসংহার ২৮১

চতুর্থ অধ্যায় ঃ সাংস্কৃতিক আন্দোলন
এক. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৪৮-১৯৫২
১. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ২৮৫
২. পূর্ব-ইতিহাস ২৮৫
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিক ঘটনাপঞ্জী:
৩. ১৯৪৭ সালের ঘটনাবলী ২৮৮
৪. গণতান্ত্রিক যুবলীগ ২৮৮
৫. পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস ২৮৮
৬. ঘটনাবলী ২৯০
৭. প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২৯৩
৮. ১৯৪৮ সালের ঘটনাপঞ্জী ২৯৪
৯. নতুন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২৯৮
১০. মার্চ ১১, ১৯৪৮ ঃ ধর্মঘট ও অন্যান্য ঘটনা ২৯৯
১১. মার্চ ১৫, ১৯৪৮ ঃ খাজা নাজিমুদ্দীনেরর সঙ্গে চুক্তি ৩০০
১২. মার্চ ১৯, ১৯৪৮ ঃ কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র ঢাকা সফর ৩০৩
১৩. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে জিন্নাহ'র সাক্ষাৎকার ৩০৪
১৪. এপ্রিল ৮, ১৯৪৮ ঃ বিধান পরিষদে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ ৩০৬
১৫. নব পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ঃ১৯৫২ ৩৯৭
১৬. একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রস্তুতি ৩১০
১৭. ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ ৩১১
১৮. বিধান পরিষদে বিতর্ক ৩১২
১৯. বিধান পরিষদ সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দীনের পদত্যাগ ৩১২
২০. নতুন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩১২
২১ শহীদ মিনার ৩১৩
২২. ৩১মে ১৯৫২ ঃ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ৩১৫
২৩. ১৯৫৩ থেকে পরবর্তী সময় ৩১৫

www.nagorikpathagar.org

২৪. বাংলা ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ৩১৬
২৫. রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন থেকে মুক্তির প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন ৩১৬
২৬. উপসংহার ৩১৭

দুই. বাংলা ভাষার সংস্কার প্রচেষ্টা ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির উদ্যোগ ১৯৪৮-১৯৬৮

১. প্রস্তাবনা ৩২২
২. রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব ৩২২
৩. আরবী হরফে বাংলা প্রবর্তনের প্রয়াস ৩২৮
৪. পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি ৩৩১
৫. বাংলা ভাষা সংস্কারে আইয়ুব খানের প্রয়াস ৩৩৪
৬. বাংলা একাডেমীর সংস্কার প্রয়াস ৩৩৬
৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ ৩৩৯
৮. উপসংহার ৩৪৩

তিন. পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র-বিতর্ক

১. পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র-বিতর্কের সূত্রপাত ৩৪৭
২. রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন ৩৪৯
৩. বেতার-টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার হ্রাসের ঘোষণা ৩৫৪
৪. পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা ৩৬৩
৫. উপসংহার ৩৬৩

পঞ্চাশ অধ্যায় ঃ উপসংহার

১. ইতিহাসচেতনা ও সংস্কৃতি ৩৭০
২. পাকিস্তান আন্দোলনের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ৩৭০
৩. পাকিস্তানকালে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি ৩৭২
৪. পূর্ব বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ৩৭৩
৫. পাকিস্তানকালে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা ৩৭৬
৬. পাকিস্তানবাদী ইসলামী ধারা ৩৭৭
৭. পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য চেতনাভিত্তিক মধ্যপন্থী মানবতাবাদী ধারা ৩৭৮
৮. বামপন্থী ধারা ৩৭৯
৯. ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মান ৩৮০
১০. বাংলাদেশের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও স্বকীয়তা ৩৮২

গ্রন্থপঞ্জি ৩৮৩-৪০০

নির্ঘন্ট ৪০১-৪১৬

www.nagorikpathagar.org

প্রস্তাবনা

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রস্তাবনা

এক.

পাকিস্তানকালের পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিষয়ে এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ঐ কালে বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও তার অন্তর্গত ক্রমবিকাশের ধারাসমূহ উদ্ঘাটন করা।

১৯৪৭—৭১ সময়কালে পূর্ব বাংলায় যেমন অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে, তেমনি অনুষ্ঠিত হয়েছে বহু গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সম্মেলনও। এগুলোর মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়েছে এদেশের সংস্কৃতিচেতনা ও সংস্কৃতি। এ সকল সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের পটভূমি, কাঠামো, কর্মতৎপরতা ইত্যাদির বিবরণ ও তথ্যাদি ক্রমশ লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছে। এসব বিষয় সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন ও আংশিক আলোচনা কোথায়ও কোথায়ও রয়েছে। কখনও স্মৃতিকথামূলক রচনায়, কখনও বা ভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনাকালে তা প্রকাশিত হয়েছে। আর সেগুলো রচিত হয়েছে কখনও সমসাময়িক কালে, কখনও বা ঘটনার অনেক পরে। এ সম্পর্কে আংশিক বিবরণ পাওয়া যায় তমদ্দুন মজলিস এবং আরও কোন কোন সংগঠনের পুস্তক-পুস্তিকায়, বদরুদ্দীন উমর প্রণীত 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' গ্রন্থে এবং আরও অনেক লেখকের অনেক গ্রন্থে, কারও কারও আত্মজীবনীতে এবং উত্তরকালের কোন কোন গবেষণাগ্রন্থে। এ দেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য নির্ভরযোগ্য বিবরণ ও তথ্যসমূহকে একত্রিত করে সেগুলোর মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যে সাংস্কৃতিক পটভূমি ও সম্ভাবনা ছিল, তার সামগ্রিক পরিচয়ও উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। কারণ তাহলে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বোঝা যাবে বর্তমান পরিস্থিতির স্বরূপ ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। বাংলাদেশের স্বকীয় সাংস্কৃতিক পরিচয় ও আত্ম-উদ্‌ঘাটনের জন্য এসব সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশের বিবরণ তুলে ধরাই এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য।

পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক সংগঠন হল ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনতিপরে ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে নব্যশিক্ষিত বাঙালী মুসলমান সমাজের কয়েকজন সাহসী প্রতিনিধি এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পশ্চাৎপদ বাঙালী মুসলমান সমাজে আধুনিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ও জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে এক দশক কালেরও অধিক সময় ধরে এই সংগঠন কাজ করে গেছে। অধ্যাপক খোন্দকার সিরাজুল হক (জ. ১৯৪১) গবেষণার মাধ্যমে রচিত 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজ চিন্তা ও সাহিত্যকর্ম'

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থে এ সংগঠনের কার্যক্রমের ধারাবাহিক বিবরণ রচনা করে এবং বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক এর মূল্যায়ন করে এই ধারার গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রযাত্রীর ভূমিকা পালন করেছেন। ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ পূর্ব বাংলায় চিন্তাধারার অগ্রগতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে গেছে। চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের কালে যখন মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা ও হিন্দু-মুসলিম বিরোধ অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে, তখন ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের উদার চিন্তাধারার বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়; কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নতুন পরিবেশে নতুন রূপে সে ধারার চিন্তাই দ্রুত বিকশিত হয় এবং মাত্র চব্বিশ বছরের ব্যবধানে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পেছনে সাংস্কৃতিক কারণ রাজনৈতিক কারণের চেয়ে নগণ্য ছিল না।

দুই.

১৯৪৭—৭১ সময়কালে এদেশে বহু সংখ্যক সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্ম হয়েছে। তবে এগুলোরও বেশীর ভাগ আবার কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোন কোনটি মাত্র দু' একটি অনুষ্ঠান করেই লুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমান গবেষণায় সেইসব সংগঠনের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যেগুলোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। তেমনিভাবে এখানে সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসাবে সেইসব সম্মেলন এবং আন্দোলনকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলো পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। ফলে ছোটখাট এবং বিচ্ছিন্ন ঘরোয়া অনুষ্ঠানাদি এখানে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

তিন.

এই অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে যৌক্তিক শৃঙ্খলার মধ্যে রূপ দেওয়ার জন্য পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃতি, সংস্কৃতির সংজ্ঞা, এ সম্পর্কিত মতভেদ, জাতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ, সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ উঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৪৭—৭১ পর্যায়ে পূর্ব বাংলার প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক সংগঠনের যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই সংগঠনগুলো হল : তমদ্দুন মজলিস (১৯৪৭), সংস্কৃতি সংসদ (১৯৫১), পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৫২), বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (১৯৫৫), রওনক সাহিত্য সংস্থা (১৯৫৮), পাকিস্তান লেখক সংঘ (১৯৫৯), ছায়ানট (১৯৬১), পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা (১৯৬২) ও নজরুল একাডেমী (১৯৬৪)। অনুসন্ধান ও বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে এই সংগঠনগুলোকেই সেকালের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সংগঠন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এসব সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মতৎপরতার

www.nagorikpathagar.org

মধ্য দিয়ে এদেশের সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতার ধারাবাহিকতার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে। সমাজের ভেতরকার দ্বন্দ্ব-বিরোধের চিত্তাকর্ষক পরিচয় পাওয়া যায় এই সংগঠনগুলোর কালক্রমিক কর্মধারা অনুসরণ করলে। এই সংগঠনগুলোর আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও কর্মধারা এক খাতে প্রবাহিত হয়নি। কোনো কোনোটি কাজ করেছে পাকিস্তানবাদী ও ইসলামী আদর্শ অবলম্বন করে, কোনো কোনোটি কাজ করেছে বাঙালী জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক আদর্শ অবলম্বন করে, আবার কোনো কোনোটি কাজ করেছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও বাঙালী চেতনা অবলম্বন করে। এই অভিসন্দর্ভে কালক্রম অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহের আদর্শ ও কর্মধারার বিবরণ দানের চেষ্টা করা হয়েছে। বিবরণের মধ্যে প্রতিটি সংগঠনের অন্তর্গত চরিত্রের পরিচয় রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যে-কয়টি সম্মেলনের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো হল : পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা (১৯৪৮), পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, চট্টগ্রাম (১৯৫১), পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, কুমিল্লা (১৯৫২), ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ঢাকা (১৯৫২), পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা (১৯৫৪), কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, টাঙ্গাইল (১৯৫৭), সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান (১৯৫৭), পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, চট্টগ্রাম (১৯৫৮), বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৩)। পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক অগ্রগতির চারিত্র্য নির্ধারণে প্রতিটি সম্মেলনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেজন্য বর্তমান গবেষণায় এই সম্মেলনগুলোর বিবরণ যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গরূপে তুলে ধরা হয়েছে। এসব সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারায়। পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিকেরা একটি সম্মেলন ডাকলে তার বিরোধীরা ডেকেছেন আর একটি সম্মেলন। বক্তব্য ও পাল্টা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সমাজ-অভ্যন্তরের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বাইরে সদর্থক বা ইতিবাচক বক্তব্যও কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কালক্রমে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতিচেতনা বিলুপ্তির দিকে গিয়েছে এবং পূর্ব বাংলার ভাষাভিত্তিক স্বতন্ত্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারাবাহিক বিবরণ। এই অধ্যায়ে খুব সংক্ষেপে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের আনুপূর্বিক বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা হয়েছে, অনেক গ্রন্থও রচিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে তাই কেবল কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাংলা ভাষার সংস্কার সাধনের ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির যে উদ্যোগ পূর্ব বাংলায় নেয়া হয়েছিল, এবং তার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ এই

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায়ে রয়েছে। এখানে পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র-বিতর্কের বিবরণ তুলে ধরে সেই আন্দোলনের স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার এবং জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে তার ভূমিকা বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে অনুসন্ধানলব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সামগ্রিকভাবে ১৯৪৭—৭১ পর্যায়ে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিচেতনার, সংস্কৃতি সম্পর্কিত উপলব্ধি ও ধারণার এবং জাতীয় সংস্কৃতির প্রবণতাসমূহের ক্রমবিকাশ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে সাজানো হয়েছে সেগুলোর উদ্ভবের কালক্রম অনুয়ায়ী। তেমনিভাবে সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলোর অনুষ্ঠানের সন-তারিখের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী। এই গবেষণাকর্মের ব্যবহার-উপযোগিতা বিবেচনা করে এটা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে এগুলোকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভক্ত করে নেওয়া যাবে।

চার.

সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোর পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। যেমন তমদ্দুন মজলিস প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে কোন রাজনৈতিক দলের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়াই। কিন্তু কিছু দিন পর খেলাফতে রব্বানী পার্টি গঠিত হলে এই সংগঠন সেই পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। হয়ত তমদ্দুন মজলিসকে সামনে রেখেই খিলাফতে রব্বানী গঠিত হয়েছিল। হতে পারে যে, তখনও খিলাফতে রব্বানী পার্টি গঠনের উদ্দেশ্য নিয়েই আগে তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সংস্কৃতি সংসদের সঙ্গে পরোক্ষ সংযোগ ছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির। কাগমারী সম্মেলন সরাসরি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান লেখক সংঘ সরকারী উদ্যোগে গঠিত ও সরকারী অর্থে পরিচালিত হয়। তবে রাজনৈতিক দলের কিংবা সরকারের আশ্রয় ছাড়া স্বল্পস্থায়ী সাংস্কৃতিক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে—যেমন রওনক সাহিত্য সংস্থা।

সাংস্কৃতিক সংগঠন ও আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলনের প্রসঙ্গ প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গেই আলোচিত হয়েছে, আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়নি। তবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে থাকলেও লেখকদের স্বাতন্ত্র্য সকল ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ন হয়নি। অনেকেই তাতে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন, অনেকে আবার রাজনীতির কারণে সে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারেননি। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, তার ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানকালেই সৃষ্টি হয়েছে। ওইকালের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিচারে অগ্রসর হলে বর্তমানের দুর্বলতা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে আরো

www.nagorikpathagar.org

স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বর্তমান অভিসন্দর্ভের অধ্যায়ে অধ্যায়ে সে বিষয়গুলো ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতাংশে তৎকালে প্রচলিত বানান ও ভাষারীতি ক্ষুণ্ন করা হয়নি। ফলে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন সম্পর্কেও গবেষক-পাঠক অবহিত হতে পারবেন বলে আশা করি।

পাঁচ.

এই গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে প্রধানত ঘটনা চলাকালীন সময়ের ও উত্তরকালের দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রপত্রিকা এবং পুস্তিকাদি অনুসন্ধান করে। কোন সংগঠনের কার্যবিবরণী প্রণয়ন করতে গিয়ে প্রথমেই অনুসন্ধান করা হয়েছে ওই সংগঠনের নিজস্ব পুস্তক-পুস্তিকা, প্রচারপত্র, বিবৃতি, ভাষণ ইত্যাদি। তারপর বিচার করা হয়েছে ওই সংগঠন সম্পর্কে অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য। কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়েও এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক বক্তব্যের মধ্যে সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য পুনরায় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হতে হয়েছে। খ্যাতিমান ও স্বল্পখ্যাত ব্যক্তিদের আত্মজীবনী ও গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত নিবন্ধাদিও গুরুত্ব অনুযায়ী এই গবেষণার উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

তবে এক্ষেত্রে মোকাবিলা করতে হয়েছে বহুবিধ সমস্যা। এসব সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের অনেকেই এখনও জীবিত আছেন। তাঁদের বহুজনের কাছ থেকেই তথ্য প্রাপ্তিতে বিশেষ সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। সংগঠনের সঙ্গে আন্তরিক সংযোগের অভাবেও এমনটি ঘটে থাকতে পারে। অনেকেই ঘটনার ধারাবাহিকতা বিস্মৃত হয়েছেন। অনেকে সঠিক তথ্য দিতেও পারেননি। কেউ কেউ নিজের অবদান সম্পর্কে বাড়িয়ে বলেছেন, যা যাচাই করতে গিয়ে অনেক সময় বিপরীত চিত্র পাওয়া গেছে। ফলে সাক্ষাৎকারের চেয়ে লিখিত তথ্যের ওপরই বেশী নির্ভর করতে হয়েছে।

ডানপন্থী ধারার সংস্কৃতি-কর্মীরা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সংরক্ষণের ব্যাপারে যতটা যত্নবান ছিলেন, বামপন্থীদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। ডানপন্থী ধারার লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীরা সম্মেলন কিংবা সংগঠনের কর্মতৎপরতার বিবরণ পত্র-পত্রিকায় বা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছেন। সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ, পঠিত প্রবন্ধ ও তার ওপর আলোচনাগুলি লিপিবদ্ধ করে তাদের নিয়ন্ত্রিত ও মতাদর্শের অনুসারী সাময়িকীগুলোর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। ফলে তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে লিখিত বিবরণ পাওয়া গেছে। তা-ছাড়া কোন কোন পত্রিকাও বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ প্রকাশ করেছে এবং নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তথ্য সংগ্রহের কাজে সেসব পত্রিকা বেশী ব্যবহার করা হয়েছে।

বামপন্থী ধারার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে লিখিত বিবরণ খুব বেশী পাওয়া যায়

www.nagorikpathagar.org

না। তার হয়ত সঙ্গত কারণও ছিল। প্রথমত, তৎকালে তাদের প্রতি সরকারী মনোভাব ছিল বিরূপ। দ্বিতীয়ত, পুলিশী নির্যাতনের ভয় এবং তৃতীয়ত, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তারা কেউ কেউ সংশ্লিষ্ট দলিল-দস্তাবেজ হাতছাড়া করতে বাধ্য হয়েছেন। কারও কারও মূল্যবান কাগজপত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়ে যায়। এদের মধ্যে এখন যারা জীবিত, তাদের অনেকেই মুখ খুলতেও রাজী হননি। কারণ দেখা গেছে, পঞ্চাশের দশকের যারা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, ষাটের দশকে এসে তাঁদের অনেকেই সরকারী সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে বিতর্কিত হয়েছেন। বিতর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঈর্ষা-বিদ্বেষও ক্রিয়াশীল ছিল এবং আছে। ফলে সম্ভাব্য বিব্রতকর অবস্থা এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন অনেকেই। সেখানে সীমিত লিখিত প্রচারপত্র/পত্র-পুস্তিকা ও পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এদের সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর (জ. ১৯৩১)লিখেছেন :

> বামপন্থী নামে পরিচিত এক ধরনের বুদ্ধিজীবীরা প্রায়ই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কথা বলেন এবং এক অথবা অন্য প্রকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন অথবা থাকার চেষ্টা করেন। যেহেতু এঁদেরও বিপুল অধিকাংশ মূলত (উপরিউক্ত) মধ্য শ্রেণীরই অংশবিশেষ এবং তাঁদের মত একই প্রবণতার অধীন, সেজন্য এই ধরনের বামপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরাও সততা ও দৃঢ় অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে অথবা তা পরিচালনার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন না। . . . দক্ষিণ অথবা বাম যে ধরনের বুর্জোয়াই তারা হোন না কেন, নানা ধরনের পুরস্কার ও প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনায় তাঁরা সদা দোদুল্যমান ও ব্যাকুলপ্রাণ। . . . মুখে তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা অনেকে বললেও অপরিহার্য তাত্ত্বিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে তাঁরা খুব সোচ্চার এবং সক্রিয়। আমাদের নামধন্য বামপন্থীদের দ্বারা যে কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিত করা সম্ভব হয় না, এটাই হল তার মূল কারণ।[১]

বদরুদ্দীন উমরের এই মূল্যায়ন একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। তবে একথাও উপলব্ধি করতে হবে যে, মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। দোদুল্যতা দেখা গেলেই কাউকে লোভী হিসাবে চিহ্নিত করলে ভুলের সম্ভাবনা থেকে যায়। আর ঈর্ষা-বিদ্বেষ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্বও আছে। ন্যায় স্বার্থকে হীন স্বার্থ থেকে পৃথক করে নিয়ে এসব বিষয় বিচার করা বাঞ্ছনীয়।

এখানে সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট' ও 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী'র কথা উল্লেখ করা যায়। বাঙালী মুসলমান সমাজে নৃত্যশিল্পকে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী' স্মরণীয় অবদান রেখেছে। এপ্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানধর্মী। নৃত্যকলা ও সঙ্গীত শিক্ষাদানই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। সে ক্ষেত্রে তারা সাফল্যের

www.nagorikpathagar.org

দাবীদার। বুলবুল ললিতকলা একাডেমী থেকে শিল্পীরা দেশের বাইরে সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হিসাবে ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কারও কোন লিখিত বিবরণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে কখন তারা কোথায় যোগদান করেছিলেন, এ তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁদের অনুষ্ঠানাদির কী প্রতিক্রিয়া বিদেশে হয়েছিল, সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

এদেশে বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সৃষ্টির ক্ষেত্রে ছায়ানটের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ সংগঠনটিও মূলত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানধর্মী। ফলে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তারা মনোযোগী হতে পারেননি। রমনার বটমূলে প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ ছায়ানট আয়োজিত বর্ষবরণ সঙ্গীতানুষ্ঠান এখনও জনপ্রিয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে এটাই ছায়ানটের প্রধান বা একমাত্র অনুষ্ঠান। যা বিশেষভাবে জনসমক্ষে এসেছে।

ছয়.

এই গবেষণায় দৈনিক আজাদ, দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার, মর্নিং নিউজ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক পয়গাম, দৈনিক ইত্তেহাদ, করাচী থেকে প্রকাশিত দৈনিক ডন, সাপ্তাহিক সৈনিক, নওবেলাল, মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত, মাহেনও, সীমান্ত প্রভৃতি পত্রিকা ব্যবহার করা হয়েছে। তার মধ্যে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা তুলনামূলকভাবে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। তার প্রধান কারণ দৈনিক আজাদ সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, অন্যান্য পত্রিকার ক্ষেত্রে তা হয়নি। পাকিস্তানকালের প্রথম দিকে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকা দুষ্প্রাপ্য। তদুপরি আজাদ নিজেদের খবর যেমন প্রকাশ করত, তেমনি নিজেদের সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণার বিরোধী প্রবন্ধ এবং খবরাদি প্রকাশ করত। আবার বিরোধী ভাবধারা সংবলিত প্রবন্ধ বা খবরের তীব্র সমালোচনাও করত। ফলে একটি ঘটনার উভয় দিকই আজাদ থেকে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা ১৯৫৪'-এ আজাদ পত্রিকা ব্যবহৃত হয়েছে সবচেয়ে বেশী। দৈনিক আজাদ থেকে গৃহীত তথ্যের প্রায় অর্ধেক ব্যবহৃত হয়েছে এই অনুচ্ছেদে। কারণ ওই সময় সংবাদ ও অবজারভার পত্রিকা বন্ধ ছিল। ইত্তেফাক, মর্নিং নিউজ বা মিল্লাতের সে সময়কার কোন কপি পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও অভিসন্দর্ভটিকে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলার লক্ষ্যে বিনা-বিচারে কিছু গ্রহণ করা হয়নি এবং যথাসম্ভব অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর সহায়তা নেয়া হয়েছে। এরপরও যেটুকু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেল, ভবিষ্যতে নতুন তথ্য প্রকাশ পেলে তা সংশোধন করার সুযোগ ঘটবে।

এ রকম গবেষণায় তথ্য প্রাপ্তির সঙ্কট সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন :

> ... ইংরেজী দৈনিক Morning News এর অফিসে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন অগ্নিসংযোগ করা হয় তখন পত্রিকাটির পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি ভস্মীভূত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়। এখন'আর তার কোন কপি বাংলাদেশে

www.nagorikpathagar.org

> পাওয়া যায় না। ... Morning News এর রিপোর্টগুলি আমি ১৯৬৯ সালের পূর্বেই কপি করে রাখার ফলে সেগুলি আমার পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের সময় দৈনিক সংবাদ এবং অধুনালুপ্ত দৈনিক মিল্লাত পত্রিকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট ও মতামত প্রকাশিত হলেও এই পত্রিকা দুটির তৎকালীন কোন কপি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয়নি।
> পুরাতন পত্রিকার কপি সংরক্ষণের প্রতি যে ঔদাসীন্য এখানে দেখা যায়, তাতে এখনো পর্যন্ত লভ্য এগুলির কপি-যে আর কিছুদিন পরে অনেকাংশ বিনষ্ট এবং অমেল হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা তাতে কোন সন্দেহ নেই।[২]

বর্তমান গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও এই অসুবিধার মোকাবিলা করতে হয়েছে।

সাত.

১৯৬৭ সালে বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার হ্রাসের বক্তব্য নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, তা জারী ছিল কয়েক মাস। কিন্তু তারপর রাজনৈতিক চেতনার তীব্রতার কারণে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কিছুদিন স্তিমিতভাব লক্ষ্য করা যায়।

জেনারেল আইয়ুব খানের (১৯০৭-১৯৭৪) 'উন্নয়ন দশকে'র আয়োজন শুরু হয় ১৯৬৮ সালে। এই আয়োজনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ শুরু করে। তারই সূত্র ধরে বহুবিধ কারণে ঘটে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান। তারপর '৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশের সাংস্কৃতিক কর্মীরাও জড়িয়ে পড়েন স্বাভাবিকভাবেই। এই পুরো সময়টাতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় গণসঙ্গীত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পোস্টার নাটক বা পথনাটকের মধ্য দিয়ে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আয়োজিত জনসভার শুরুতে বা শেষে প্রধানত গণসঙ্গীতের আয়োজন করা হত। পূর্ব বাংলার প্রায় সকল শ্রেণীর শিল্পী তাতে অংশগ্রহণ করতেন। এরও মূল লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করে তোলা। সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের চেয়ে সঙ্গীতের মাধ্যমেই সে উজ্জীবন ঘটানো অধিকতর সহজ ছিল। এই সময়ের সংস্কৃতিচর্চা সম্পর্কে কামাল লোহানী (জ. ১৯৩৭) লিখেছেন :

> '৫৮-র মার্শাল ল'র পর ৪/৫ বছর পর্যন্ত এদেশে গণসঙ্গীত গাইবার মতন কোন পরিবেশই ছিল না এবং এই সময়ে কোন প্রতিষ্ঠানকে গাইতেও দেখা যায়নি একমাত্র একুশের অনুষ্ঠান ছাড়া। . . '৬৯, '৭০ ও '৭১ সালে মানুষ নতুন গানের প্রচণ্ড শব্দে জেগে উঠেছেন। . . এ সময় দেশ ছিল আন্দোলনমুখর। আর

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক আন্দোলনের তৎপরতা যখনই প্রচণ্ড হয়েছে তখনই গণসঙ্গীত রচিত হয়েছে। সুরকার এগিয়ে এসেছেন; সুর দিতে দেরী করেননি। গাওয়াও হয়েছে দ্রুত। এই দশকে বাংলায় গণসঙ্গীত রচনা করেছেন সবচেয়ে বেশী আবুবকর সিদ্দিক (জ. ১৯৩৪)। তার অধিকাংশ গানের সুর করেছেন শেখ লুতফর রহমান ও সাধন সরকার। তার বিখ্যাত গানের মধ্যে শেখ লুতফর রহমান সুর দিয়েছেন (১) বিপ্লবের রক্তে রাঙ্গা ঝান্ডা ওড়ে আকাশে, (২) পায়রার পাখনা বারুদের বহ্নিতে জ্বলছে, (৩) মার্কিনী লাল ইয়াংকীয়া চায় কি হে রক্ত হে। এগুলো দারুণ জনপ্রিয় গান।[৩]

এ ছাড়া সিকান্দার আবু জাফরের (১৯৩২-১৯৭৬) 'জনতার সংগ্রাম চলবেই', 'কাঁদো বাংলার মানুষ আজিকে কাঁদো', হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-১৯৮৩)'মিলিত প্রাণের কলরবে' আবদুল লতিফের 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়'[৪] প্রভৃতি গান ওই সময়ে এদেশের জনজীবনকে দারুণভাবে আলোড়িত করেছে। আবদুল গাফফার চৌধুরীর (জ. ১৯৩৪)'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি', আলতাফ মাহমুদের (১৯৩৩-১৯৭১) গাওয়া 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা' প্রভৃতি গানও এই সময়ে বিশেষ প্রেরণাদায়ক ছিল।

এ সময়ে নতুন যেসব সাংস্কৃতিক সংগঠন কাজ করেছে, তারা ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনেরই অনুষঙ্গী। ১৯৭০-'৭১-এর রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় যে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, তাদের মধ্যে ছিল নজরুল একাডেমী, সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী, উন্মেষ, ক্রান্তি, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, কথাশিল্পী সম্প্রদায়, চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদ, বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ, লেখক-শিল্পী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ, লেখক-শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ, লেখক সংঘ, লেখক সংগ্রাম শিবির, শুকতারা শিল্পী গোষ্ঠী, প্রভৃতি সংগঠন।[৫]

এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারায় সর্বশেষ অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বিকালে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে। ওই দিন লেখক সংগ্রাম শিবির 'ভবিষ্যতের বাংলা' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। তাতে সভাপতিত্ব করেন ডঃ এ বি এম হাবীবুল্লাহ। প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করেন ডঃ আহমদ শরীফ (জ. ১৯২১), ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (জ. ১৯৩৬), ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার (জ. ১৯২৮), বদরুদ্দীন উমর (জ. ১৯৩১), বশীর আল হেলাল (জ. ১৯৩৬), জনাব হুমায়ূন কবির (১৯৪৫-১৯৭২), আহমদ ছফা (জ. ১৯৪৩), ফরহাদ মজহার (জ. ১৯৪৬), শাহনূর খান (১৯৪৫-১৯৯৩) ও বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (জ. ১৯৩৬)।[৬]

আট.

এই অভিসন্দর্ভে অনুসন্ধানের বিষয়টি বিরাট এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়ের বিরাটত্বের কারণে এতে প্রতিটি ঘটনার মর্মবস্তুকে ধরারই চেষ্টা করা হয়েছে। বিস্তৃত খুঁটিনাটিতে

www.nagorikpathagar.org

প্রবেশের চেষ্টা পরিহার করা হয়েছে। তবে তৎকালীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোনো কোনো বিষয়ে খুঁটিনাটিতে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হতে পারে। সে-ধারার গবেষণার বিস্তর সুযোগ রয়েছে। সামগ্রিকভাবে ঘটনা প্রবাহকে একত্রে এক সঙ্গে বিচার করার প্রয়োজনের দিকেই বর্তমান গবেষণায় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. বদরুদ্দীন উমর, *বাঙলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক* (ঢাকা, ১৯৮৫), পৃ ৮৬-৮৮

২. বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিলপত্র* (দ্বিতীয় খণ্ড), (বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, ভূমিকা) পৃ আট-নয়

৩. কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* (ঢাকা, ১৯৯3), পৃ ৫৭

৪. ঐ, পৃ ৩৩

৫. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র :* দ্বিতীয় খন্ড, (সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান, প্রকাশক তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় ১৯৮৬) পৃ ৮৮৮-৮৯২

৬. দৈনিক পাকিস্তান, ২৫ মার্চ ১৯৭১

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

সংস্কৃতি ও জাতীয় সংস্কৃতি ঃ সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সংস্কৃতি ও জাতীয় সংস্কৃতি ঃ সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতি আন্দোলন

পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিস্তারিত অনুসন্ধানে প্রবেশের আগে এই অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক চেতনা, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, তার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। কয়েকটি প্রশ্ন সামনে রেখে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি।

১. সংস্কৃতি কী

সংস্কৃতি কী—এ বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসা এখনও অর্জিত হয়নি। সংস্কৃতি, সংস্কৃতির গঠন, উপাদান, পরিবর্তন-প্রক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। বিতর্ক সত্ত্বেও যে-কোন দেশে, সমাজে, রাষ্ট্রে, জনগোষ্ঠীতে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক তৎপরতা ও কর্মকাণ্ড অব্যাহতই থাকবে, তাতে থাকবে গ্রহণ-বর্জন-আত্তীকরণের ধারা।

আভিধানিকভাবে সংস্কৃতি ইংরেজী Culture এর প্রতিশব্দ। বিশ্বের পণ্ডিতগণ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়াস পাচ্ছেন। Ruth Benedict-এর Patterns of Culture (১৯৩৪); A. L. Kroeber এবং Clyde Kluckhohn-এর Culture : A Critical Review of Concepts and Definitions (১৯৫২); Margaret Mead-সম্পাদিত Cultural Patterns and Technical Change (১৯৫৩); Ralph Linton-এর The Tree of Culture (১৯৫৫); M. K. Opler সম্পাদিত Culture and Mental Health (১৯৫৯); T. S. Eliot-এর Notes Towards a Definition of Culture (১৯৪৮); বদরুদ্দীন উমর প্রণীত *সংস্কৃতির সঙ্কট* (১৯৬৭) ও *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা* (১৯৬৯); মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬) প্রণীত *সংস্কৃতি কথা* (১৩৬৫ বাং) রায়হান শরীফ (জ.১৯৩৭) প্রণীত *আমাদের কৃষ্টি প্রসঙ্গে* (১৯৬১), রফিউদ্দীন প্রণীত *সংস্কৃতি* (১৯৬৮), ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০—১৯৭৭) প্রণীত *সাংস্কৃতিকী* প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে *বাংলা বিশ্বকোষ*-এ 'সংস্কৃতি'র যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ :

> মানব জাতির প্রথম বিকাশের সময় হইতেই সংস্কৃতি মানব সমাজ ও মানবেতর প্রাণীদের সমাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। মানব

www.nagorikpathagar.org

সমাজের আচার ব্যবহার ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহ্যে পরিণত হইয়া পরবর্তী মানব সমাজে সংক্রমিত হয়। সংস্কৃতির এই সংক্রমণের প্রধান বাহন ভাষা। তবে বহু আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গী ভাষা ব্যতীত অন্যান্য উপায়েও সংক্রমিত হয়। বস্তুগত সংস্কৃতি বলিতে যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ ও শিল্পকলা জাতীয় কৃষ্টি বুঝায়। প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। বিভিন্ন পরিমাণে কোন না কোন প্রধান স্বার্থের সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট সংস্কৃতির সংমিশ্রণের যে প্রবণতা থাকে, তাহার দ্বারা সেই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয়। তাই সংস্কৃতিকে "শিকার" বা "খাদ্য সংগ্রহ" প্রভৃতি ধারণার দ্বারা প্রকাশ করা যায়, কিংবা "সমবায়ধর্মী" "আক্রমণাত্মক" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষায়িত করা চলে। সাংস্কৃতিক সংগঠনের জটিলতার পরিমাণ দ্বারা সংস্কৃতির উচ্চ ও নীচ মানের এবং সভ্য ও আদিম সমাজের পার্থক্য নির্ণীত হয়। মূলতঃ প্রত্যেক মানবীয় সমাজ বা দল বিভক্তির একটা নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে, কিন্তু জটিল সমাজে উপসংস্কৃতিও (Subculture) থাকিতে পারে। উপসংস্কৃতির উদ্ভব হয় জাতীয় মূল, ধর্ম বা সামাজিক মর্যাদা হইতে। ইহার বিপরীতভাবে কতিপয় বিভিন্ন সমাজ একটি সাধারণ সংস্কৃতি অবলম্বন করিতে পারে। এই সাধারণ অবলম্বনের কাজ শান্তিপূর্ণ উপায়ে অথবা বাধ্যতামূলক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক হইতে সম্পন্ন হইতে পারে।[১]

এই সংজ্ঞা থেকেও সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিতর্কের অবসান ঘটে না। মতপার্থক্য শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়। সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ব্রিটিশ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার বলেছেন: 'সংস্কৃতি হল মানুষের নিজের সৃষ্ট সব কিছু; অতিজৈব পরিবেশ বা সুপার এনভিরনমেন্ট'।[২] তেমনিভাবে এ প্রসঙ্গে অন্য পণ্ডিতগণের মতও উদ্ধৃত করা যায়।'

রাশিয়ান চিন্তাবিদ টি. ভি. ডি. রবার্টের মতে, সংস্কৃতি হল অনুমানগত ও ফলিত সব চিন্তাধারা ও জ্ঞানের সমষ্টি।

গ্রাহাম ওয়ালেসের মতে সংস্কৃতি হল, 'মানুষের ক্রমবর্ধমান সৃষ্টির সমষ্টি'। জন লুই গিলিন এবং জন ফিলিপ গিলিন সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার বলে গণ্য করেছেন। সাংস্কৃতিক বস্তু হল মানুষের সংস্কৃতির ফল।

সামনারের মতে, লোকজীবনধারা, শুভ-অশুভ বোধ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমষ্টি হল সংস্কৃতি।

স্যার ই. বি. টাইলারের মতে, 'জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইন-কানুন, অনুশীলন ও অভ্যাস এবং অন্যান্য সব সম্ভাবনা যা মানুষ সমাজের সদস্য হিসাবে আহরণ করে তা-ই সংস্কৃতি।[৩]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৭-১৮৯৪) Culture বা সংস্কৃতির একটি স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে গুরুর সংলাপে তিনি লিখেছেন:

www.nagorikpathagar.org

অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে প্রশ্ন উদিত হইত—'এ জীবন লইয়া কি করিব?' 'লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুঁজিয়াছি . উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন দেশী-বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে আমি এ তত্ত্ব [অর্থাৎ অনুশীলন তত্ত্ব—আজ আমরা যাকে বলি সংস্কৃতি] কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন দিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এতদিনে পাইয়াছি। তুমি এক দিনে ইহার কি বুঝিবে?[৪]

তিনি লিখেছেন, "উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মানুষের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলোর অনুশীলন তাই; এ জন্য ইংরেজীতে উভয়ের নাম CULTURE। এই জন্য কথিত হইয়াছে যে, The substance of religion is culture— " মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম।"[৫]

এই অনুশীলন তত্ত্বের সারমর্ম বঙ্কিমের নিজের ভাষায় নিম্নরূপ :

১. মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি [instinct, impulse, faculty] নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফূরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।
২. তাহাই [অর্থাৎ মনুষ্যত্বই] মনুষ্যের ধর্ম্ম।
৩. সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।
৪. তাহাই সুখ।[৬]

সংস্কৃতি কথাটিকে Culture অর্থে বাংলা ভাষায় চালু করেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪৩) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায়, ১৯২০-এর দশকে। তার আগে Culture অর্থে কিছুকালের জন্য কৃষ্টি শব্দটি বাংলা ভাষায় চালু হয়েছিল। . . . বাংলা ভাষায় Culture অর্থে কৃষ্টি শব্দটির ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। কারণ, 'তিনি জেনেছিলেন যে, কৃষি শব্দের সম্পর্ক আছে কৃষি কর্ষণ প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে। তাই কৃষ্টিকে তার কাছে চাষবাস ও চাষাভূষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় বলে মনে হত। এই শব্দের মধ্যে কোনো উচ্চ ভাবের কথা তিনি ভাবতে পারতেন না।'[৭]

সংস্কৃতি বা Culture-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) লিখেছেন :

ইংরাজী সাহিত্যে কালচার শব্দটা প্রথম আমদানি করেন ফ্রান্সিস বেকন ষোল শতকের শেষ দিকে। উহাকে ডিফাইন করার চেষ্টা করেন সর্বপ্রথম ম্যাথু আর্নল্ড ইংলন্ডে এবং ওয়াল্ডু ইমার্সন আমেরিকায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

কালচার শব্দের যে অর্থে তাঁরা উহার সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন শব্দটা বেশীদিন সে অর্থে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। বিশ শতকের মাঝামাঝি রবার্ট এয়রা পার্ক ও টেইলার প্রভৃতি মার্কিন পণ্ডিত এবং টার্নার ও লাস্কি প্রভৃতি ইংরাজ পণ্ডিতগণের লেখায় কালচার শব্দটা অনেক ব্যাপক ও গভীর অর্থে ব্যবহৃত হইতে শুরু করে। এর ফলে শব্দটা নতুন তাৎপর্য গ্রহণ করে। কিন্তু তাতে সমস্যা মিটে নাই। বরঞ্চ শব্দটা ব্যাপকতর ও গভীরতর মানে গ্রহণ করার ফলে এই দিককার জটিলতাও ব্যাপক গভীর হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমা সাহিত্যে 'কালচার' শব্দটা আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে শুরু করিয়াছে। সেখানে 'পলিটিক্যাল কালচার', 'এথিক্যাল কালচার', 'এস্থেটিক কালচার' 'রিলিজিয়াস কালচার' ইত্যাদি কথার প্রচলন হইয়াছে। এসব কথা কিন্তু 'এগ্রিকালচার', 'হর্টিকালচার' বা 'ব্লাড কালচার' ইত্যাদি টার্মের মত অকৃষ্টিক কোন বিশেষ বিষয় বা বস্তু-জ্ঞাপক নয়। বরঞ্চ মানুষের মন ও মস্তিষ্ক বিকাশের বিশেষ স্তর-বোধক। তার মানে কোনও সমাজ বা জাতির মনে কোনও এক ব্যাপারে একটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যবহার-বিধি মোটামুটি সার্বজনীন চরিত্র, ক্যারেক্টার, আচরণ বা আখলাকের রূপ ধারণ করিলেই সেটাকে ঐ ব্যাপারে ঐ মানবগোষ্ঠীর কালচার বলা হইয়া থাকে। এ অবস্থায় আজিকার পরিবেশে কালচার ও সিভিলিযেশনের সীমা-সরহদ্দ ঠিক রাখা এখন খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তবু কালচার ও সিভিলিযেশন যে এক নয়, সেটা আমাদের বুঝিতে হইবে। সভ্য জগতের মণীষীরাও সে চেষ্টা করিতেছেন। কারণ এটা যুগের দাবি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারের দ্বারা দুনিয়াটা যতই ছোট হইতেছে, কালচারেল অটনমির প্রয়োজনীয়তা ততই তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। ফলে কালচার ও সিভিলিযেশনের সীমা নির্ধারণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ সীমা নির্ধারণ ডেফিনিশন দ্বারা সম্ভব নয়। বিশ্লেষণ দ্বারাই তা করিতে হইবে।[৮]

সংস্কৃতি সম্পর্কে গোপাল হালদার তার *'সংস্কৃতির রূপান্তর'* গ্রন্থে লিখেছেন :

সংস্কৃতির অর্থ কী, এই প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে জাগা উচিত—মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য জীবের সংস্কৃতি বলিয়া কিছু নাই। তাহার অর্থ—মানুষ হিসাবে মানুষের আসল পরিচয়ই তাহার সংস্কৃতি। এই 'কৃতি' বা কাজের বলেই মানুষ মানুষ হইয়াছে। প্রকৃতির নিয়মও বুঝিয়া উঠিতেছে, বাধা ছাড়াইয়া যাইতেছে।

প্রাণী মাত্রেরই জীবনের মূল প্রেরণা বাঁচিয়া থাকা। মানুষ এই প্রেরণায় চাহে আপনার পরিবেশের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিয়া টিকিয়া থাকিতে। অর্থাৎ মানুষ চায়, বাঁচিবার উপায়, যতটা পারে প্রকৃতির নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে।

www.nagorikpathagar.org

ইহারই নাম জীবিকা চেষ্টা। মানুষের সভ্যতা বা সংস্কৃতির মূল প্রেরণা তাই প্রকৃতির অন্ধ দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ জীবিকা আয়ত্ত করা, তাহা সহজসাধ্য করা। সংস্কৃতির মূলের কথা এই জীবিকা-প্রয়াস, শ্রমশক্তি; আর সংস্কৃতির মোট অর্থ বিশ্ব প্রকৃতির সংযোগে মানব-প্রবৃত্তির এই স্বরাজ-সাধনা।[৯]

সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন :

এ নিয়ে অনেক সূক্ষ্ম তর্ক সম্ভব হলেও এর স্বরূপ উপলব্ধির সহজ উপায় সংস্কৃতির অভিব্যক্তি বলতে আমরা যা-কিছু বুঝি সেগুলির প্রতি লক্ষ্যপাত করা। যেমন, আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সঙ্গীত-নৃত্য, সাহিত্য-নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি। এগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথমত এগুলি নিত্যকার জীবন যাপনের সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়ত জীবন উপভোগের ব্যবস্থা এবং উপকরণের সাথে জড়িত। কোন জাতির অথবা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি বলতে এ জন্যে তার সামগ্রিক আর্থিক জীবন থেকে শুরু করে ললিতকলা এবং শিষ্টাচার পর্যন্ত সব কিছুই বোঝায়। অর্থাৎ সেই দেশ এবং জাতির অন্তর্গত মানুষের জীবনযাপন ও জীবন উপভোগের যাবতীয় পদ্ধতি এবং আয়োজনই এর অন্তর্গত। কোন একটি লোকের সংস্কৃতি কী, একথা বোঝার জন্য তাই প্রয়োজন তার আর্থিক জীবন, ভাষা, শিক্ষা, রুচি ইত্যাদি সব কিছুরই সাথে ওয়াকিফহাল হওয়া।[১০]

ডঃ আহমদ শরীফ (জ. ১৯২১) একটি বাক্যে সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে 'পরিশীলিত ও পরিশ্রুত জীবন-চেতনাই সংস্কৃতি।'[১১] সংস্কৃতির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ডঃ আহমদ শরীফ লিখেছেন :

সংস্কৃতির উৎসও অনেক। কেননা জীবনচেতনা ও জীবনের প্রয়োজন ঋজুও নয়, এককও নয়। এ জন্যে ধর্মীয় বিধিনিষেধ, নৈতিক বোধ, আর্থিক অবস্থা, শৈল্পিক মান, রাজনীতির প্রজ্ঞা, সামাজিক প্রয়োজন, মানবিক অভিজ্ঞতা, ভৌগোলিক সংস্থান, দার্শনিক চেতনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রভৃতি অনেক কিছু সমন্বয়ে গড়ে উঠে এক একটি সংস্কৃতি।[১২]

শেষ কথা হিসাবে তিনি লিখেছেন :

সৌজন্যই সংস্কৃতির পরিচয়। মনুষ্যত্বই সংস্কৃতির উৎস ও প্রসূণ, বীজ ও ফল। কেননা মনুষ্যত্বই মানুষের সৌন্দর্য-অন্বেষা, কল্যাণ বুদ্ধি ও মানবপ্রীতি জাগায়। আর কে অস্বীকার করবে যে সৌন্দর্যপ্রিয়তা, কল্যাণকামিতা ও মানবপ্রীতিই সংস্কৃতিবানতার শেষ লক্ষ্য?[১৩]

ইংরেজী Culture এর প্রতিশব্দ সংস্কৃতি বা কৃষ্টি এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

www.nagorikpathagar.org

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় (১৮৫৯—১৯৫৬) বিতর্ক করেছেন তিরিশ ও চল্লিশের দশকে।[১৪] শেষ পর্যন্ত নীহাররঞ্জন রায় Culture -কে দেখতে চেয়েছেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি বলেছেন :

> কালচার কথার অন্য আর একটি প্রসারিততর ও গভীরতর অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে, এবং তা হচ্ছে বীজের উন্নতি সাধন করা, সংস্কার সাধন করা, তার শক্তিবৃদ্ধি করা। সে জন্যই কালচার কথার জন্য আভিধানিক অর্থ হচ্ছে To improve কর্ষণ, কৃষিকর্মেরও অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বীজের সংস্কার সাধন, তার গুণগত পরিবর্তন ঘটানো। বুদ্ধিমান চাষীরা বারবার যা করে এসেছেন। এ পরিবর্তন কৃষ্টিকর্ম বা চাষ ছাড়া সম্ভব নয়।
>
> এই গুণগত পরিবর্তনই সংস্কৃতি, অর্থাৎ চাষের যে অন্যতম উদ্দেশ্য সংস্কার, সেই সংস্কার ক্রিয়ার ফল হচ্ছে সংস্কৃতি, যেমন কৃষির ফল হচ্ছে কৃষ্টি।[১৫]

এ সম্পর্কে আবুল ফজল (১৯০৩—১৯৮৩) লিখেছেন, 'বলা বাহুল্য, ধর্ম-কর্মও এক রকমের সংস্কৃতি চর্চা। এতেও মন আর চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়। তবে এর জন্য চাই আন্তরিকতা। আর চাই সত্যিকার ধর্মভাব আর ধর্ম চেতনাকে নিজের মনের অঙ্গ করে নেয়া। ... সাংস্কৃতিক জীবন মানে সুন্দর ও শোভন জীবন—যার মন-মানসের পুরোপুরি বিকাশ ঘটেছে, একমাত্র সেই হতে পারে এমন জীবনের অধিকারী।[১৬]

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬) লিখেছেন :

> ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নত জীবন সম্বন্ধে চেতনা-সৌন্দর্য আনন্দ ও প্রেম সম্পর্কে অবহিতি। সাধারণ লোকেরা ধর্মের মারফতই তা পেয়ে থাকে। তাই তাদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা আর কালচার থেকে বঞ্চিত করা এক কথা।[১৭]

বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সময় থেকে শতাধিক বৎসর যাবৎ সংস্কৃতির ধারণাটি বিকশিত হয়ে চলছে। এ অবস্থায় সংস্কৃতির সংজ্ঞা অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কোন ব্যক্তির বা জনসমষ্টির পরিশীলিত জীবনচেতনাই সংস্কৃতি। আর এক একটি সমাজে নিজস্ব স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে তাদের ভাষা, নৈতিক বোধ, ধর্মীয় সাজুয্য, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষার মান, ভৌগোলিক অবস্থান, মানবিকতা, প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং দার্শনিক চেতনার ওপর ভিত্তি করে। কখনও এই বিষয়গুলির কোনটি প্রধান হয়ে ওঠে, আবার কখনও কোন নির্দিষ্ট সমাজের সংস্কৃতি গঠনে সেই বিষয়টিই গৌণ হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

২. জাতীয় সংস্কৃতি

সংস্কৃতির সংজ্ঞা বিষয়ক উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। আমরা এমনিতেও হামেশা জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করি। নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয় অন্যের সামনে তুলে ধরারও প্রয়াস পাই। অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে যেমন ভিন্ন ভিন্ন জাতির অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনি সেসব জাতির রয়েছে নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতিও।

জাতীয় সংস্কৃতি আবার কোন এক উপাদানে গড়ে ওঠে না। তা ধর্মেও যেমন নয়, ভাষায়ও তেমনি নয়। ডঃ আহমদ শরীফের মতে :

> ধর্মমতের অভিন্নতা দেশকালনিরপেক্ষ সংস্কৃতির জন্ম দেয় না। যদি তা-ই হত, তাহলে গোটা দুনিয়ায় কয়েকটা ধর্মীয় সংস্কৃতিই থাকত। কেবল ভাষাই যদি সংস্কৃতির ভিত্তি হত, তা হলে পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতি থাকত। সংস্কৃতি যদি আঞ্চলিক সীমা-নির্ভর হত, তাহলে ভৌগোলিক সংস্কৃতিই হত সংস্কৃতির উৎস। সংস্কৃতি যদি রাষ্ট্রিক সংস্থাজাত হত, তাহলে রাষ্ট্র ভাষা গড়ার সঙ্গে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটত। যদি বিদ্যাই অভিন্ন সংস্কৃতির জনক হত, তাহলে পাশ্চাত্যবিদ্যা এত দিনে সারা বিশ্বের শিক্ষিত সমাজে একটি একক সংস্কৃতি গড়ে তুলত।
>
> অতএব দেশ, কাল, ভাষা, ধর্ম, রাষ্ট্র, কোনটাই এককভাবে সংস্কৃতির জনক নয়, পরিচায়ক নয়, নিয়ামকও নয়। সব কিছুর দানে প্রভাবে ও মিশ্রণে সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব। কাজেই সংস্কৃতি কখনও অবিমিশ্র হতে পারে না। সৃজনে-গ্রহণে, বরণে-বর্জনে সংস্কৃতি চিরকাল ঋদ্ধ ও দেশকালের উপযোগী হয়েছে।[১৮]

ডঃ শরীফও এখানে 'দেশ' বিষয়টি উপেক্ষা করেননি। কার্যত জাতি গঠনের উপাদানের সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতিও গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সাধারণ মনোভাব, রীতিনীতি, স্বার্থবোধ ও রাজনৈতিক চেতনা বিশিষ্ট জনসমষ্টিকেই এক সময় জাতি হিসাবে অভিহিত করা হত। 'বর্তমানে বংশ ও ভাষার একত্ব নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন হইলেও ধর্মমতের একত্ব ভিন্ন জাতি গঠন তেমন দেখা যায় না। ভৌগোলিক একত্ব বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া গণ্য; একত্র বসবাস ভিন্ন সাধারণ স্বার্থবোধ গড়িয়া উঠে না। কিন্তু দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও পোলদের মধ্যে, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া থাকা সত্ত্বেও ইহুদীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সজীব ছিল। কোনও জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের প্রেরণা ও প্রচেষ্টা উহার জাতীয়তাবোধের চরম প্রকাশ। আধুনিককালে রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনসমষ্টিকেই সাধারণত জাতি বলা হয়।'[১৯]

একথাও আবার সত্য যে, কোন জাতিই এককভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে না, আবার কোন রাষ্ট্রও একটিমাত্র জাতিসত্তার প্রতিভূ সচরাচর হয় না। এ জন্যে

www.nagorikpathagar.org

অধিকাংশ রাষ্ট্রে কোন না কোন সংখ্যালঘু জাতি থাকে। বেশীর ভাগ সময় তাদের সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রের সংস্কৃতিকেই আমরা জাতীয় সংস্কৃতি বলে অভিহিত করতে পারি।

৩. সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পরিশীলিত জীবনচেতনাই সংস্কৃতি। এই পরিশীলিত জীবনচেতনার বিকাশ সাধনের দায়িত্ব সমাজে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান জনসমষ্টির। এ দায়িত্ব বিরাট। এই সংস্কৃতিবান জনসমষ্টি যখন আরও বেশী সংখ্যক মানুষকে সংস্কৃতিপ্রবণ করে তোলার লক্ষ্যে একতাবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলেন, তখন সেই সংগঠনকে আমরা 'সাংস্কৃতিক সংগঠন' হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। সাংস্কৃতিক আন্দোলন হল জনসাধারণের চিন্তাধারা, রুচি, পছন্দ-অপছন্দ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিবর্তনের আন্দোলন।

কিন্তু কারা সেই সংস্কৃতিবান মানুষ? এই প্রশ্ন উপেক্ষণীয় নয়। সমাজের একদল মানুষ যাকে সংস্কৃতিবান বলে অভিহিত করেন, অপর দল তাকে গোঁড়া কিংবা চরমপন্থী বলে আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হন না। এ ক্ষেত্রে এক এক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক আদর্শও এক এক রকম। কেউ আন্তরিকভাবে ধর্মে বিশ্বাসী, কেউ বাহ্যিকভাবে নাস্তিক। এই দল ওই দলে রেষারেষির ফলে সমাজের ভেতরে কখনও কখনও নিদারুণ অস্থিরতারও জন্ম হয়। কালচারড্ মানুষ কে, সে সম্পর্কে মোতাহের হোসেন চৌধুরী লিখেছেন, 'শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়, উপায়। উদ্দেশ্য নিজের ভেতরে একটা ঈশ্বর বা আল্লাহ সৃষ্টি করা। যে তা করতে পেরেছে, সেই কালচার্ড অভিধা পেতে পারে, অপরে নয়।'[২০] তিনি লিখেছেন :

> কালচার্ড লোকেরা সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন অন্যায় আর নিষ্ঠুরতাকে; অন্যায় নিষ্ঠুরতাকে তো বটেই ন্যায়-নিষ্ঠুরতাকেও। মানুষকে ন্যায়সঙ্গত শাস্তি দিতেও তাদের বুক কাঁপে। নিষ্ঠুর হয়ো না—এই তাদের ভেতরের দেবতার হুকুম আর সে হুকুম তারা তামিল না করে পারে না। কেননা, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই একটা ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন ও স্বধর্ম্ম সৃষ্টি করা কালচারের উদ্দেশ্য। যেখানে তা নেই, সেখানে আর যাই থাক, কালচার নেই। কালচার একটা ব্যক্তিগত ধর্ম্ম। ব্যক্তির ভেতরের আমিকে সুন্দর করে তোলাই তার কাজ।[২১]

কিন্তু সঙ্কট আছে অন্যত্র। এই গুণে গুণান্বিত জনসমষ্টি জোগাড় করে তার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কারণ, "এক মাথা যখন অন্য মাথার বিচার করবে, তখনই মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি

www.nagorikpathagar.org

লাগবে। একই পণ্যের দুই ব্যবসায়ী যেমন নিজের পণ্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত থাকেন, মস্তিষ্কের কীর্তির ক্ষেত্রেও তেমনি প্রতিযোগীর সেই হীন আত্মশ্রেষ্ঠতা প্রকাশের ব্যস্ততা সর্বক্ষেত্রে প্রকট হয়ে ওঠে। মাথা থাকা সত্ত্বেও মাথা নিয়ে যাঁদের মাথাব্যথা নেই, সেই সব সাধারণ লোক মস্তিষ্ক-প্রধানদের অন্তরের দৈন্য দেখে শিউরে উঠবেন।"[২২]

তা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭—১৯৭১) বহু সংখ্যক মত-পথের ভিন্নতা নিয়ে, আলাদা আলাদা আদর্শ-উদ্দেশ্যে নিয়ে, সরকারী মদতে, সরকারী বিরোধিতায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্ম হয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠানের নেতা-কর্মীরা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে স্ব স্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়াস পেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বিনয় ঘোষের কথাও সত্য যে, 'সামাজিক সংঘাতের তীব্রতার মধ্যেই সভাসমিতির বিকাশ হয়। এটা আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও তা-ই দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে, এ যুগের সভা-সমিতি বা ক্লাব-সোসাইটি বলতে যা বোঝায়, তার বিকাশ হয়নি।'[২৩] পূর্ব বাংলা যতদিন পাকিস্তানের অন্তর্গত ছিল, ততদিন তো সামাজিক সংঘাত এখানে ছিলই, স্বাধীনতার পরও তার অবসান ঘটেনি।

এখানে সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলতে আমরা সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও সম্মেলন-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাকে বোঝাতে চেয়েছি। সাংস্কৃতিক আন্দোলন সমাজে চিন্তাধারা পরিবর্তনের আন্দোলন। আর রাজনৈতিক আন্দোলন হল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করার প্রত্যক্ষ আন্দোলন।

সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মতৎপরতা ও আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গে ১৯৪৭—৭১ কালপর্বে যে পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছিল, বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য তা লিপিবদ্ধ করা ও মূল্যায়ন করা।

৪. পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় সংস্কৃতি প্রশ্নে বিতর্ক

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বাংলাদেশ অঞ্চলে এক ধরনের সামাজিক অভিন্নতা ছিল। এখানকার মানুষের জীবন-জীবিকার পদ্ধতিও ছিল অভিন্ন। সে সময় থেকেই এদেশের মাটির পোষণে, প্রকৃতির লালনে এবং মানুষের ঐতিহ্যধারায় আমাদের দেহমন পুষ্ট হয়েছে। 'আমরা আর্য নই, আরবী ইরানী কিংবা তুর্কীস্তানীও আমরা নই। আমরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বংশধর'।[২৪] "এদেশে আগে যাদের 'আদি-অস্ট্রেলীয়' বলা হত, এখন তাদের বলা হয় 'ভেড্ডিড'। ... অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীদের সঙ্গে চেহারার মিল পাওয়া গেছে বলেই এক সময় এখানকার আদিবাসীদের বলা হত 'আদি-অস্ট্রেলীয়।' বাঙালীর জনপ্রকৃতিতে এ পর্যন্ত যেসব উপাদান পাওয়া গেছে, তাতে বলা যায়—ভেড্ডিড উপাদানই বাংলার জনগঠনের মূল ও প্রধান উপাদান। পরে কালক্রমে নানা অবস্থায় তাতে কমবেশী

www.nagorikpathagar.org

মাত্রায় পশ্চিমের ইন্দো-আর্য ও পাক-পামিরীয় উপাদান এবং পূর্বে মোঙ্গোলীয় পাইরোইয়ান ও মালয়-ইন্দোনেশীয় উপাদান এসে মিশেছে। এই বিচিত্র মেলামেশার ফলে কালক্রমে বাঙালীর একটা নিজস্ব গড়ন দাঁড়িয়ে গেছে।"[২৫]

এই গড়নের মানুষেরা বাংলাদেশ অঞ্চলে হাজার হাজার বছর ধরে বসবাস করে আচার-আচরণে, খাদ্য-অভ্যাসে, জীবিকা-নির্ধারণে এবং জীবনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে অভিন্ন আচরণের মাধ্যমে নিজেদের এক স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় গড়ে তুলেছে।

হাজার বছর আগেও এই ভূখণ্ড বিভক্ত ছিল ছোট ছোট রাজ্যে, জনপদে। অনেকগুলো ছিল জনপদ রাজ্য। তাদের মধ্যে কতকগুলোর নাম ও অস্তিত্ব পাওয়া যায়, আবার কতকগুলো সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সেকালে ছিল এই ভূখন্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বতন্ত্র আঞ্চলিক সত্তা। মানুষের চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা-অভিজ্ঞতা-আনুগত্য আবর্তিত হত নিজ নিজ অঞ্চলকে, বড় জোর রাজাকে কেন্দ্র করে। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে আজকের সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল কখনও একচ্ছত্র শাসনে ছিল না।[২৬]

এদেশে মুসলমান বণিক ও সুফী সাধকদের আগমনের পর পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন সাধিত হতে শুরু করে। শ্রেণী বিভক্ত এই সমাজে, সামন্ত সমাজ ব্যবস্থায়, সকল বাঙালীর জীবনমান এক ছিল না। বাংলা ভাষাভিত্তিক যে 'বাঙালী জাতি'র সৃষ্টি তাদের অর্থনৈতিক জীবন মানে পার্থক্য ছিল। পার্থক্য ছিল বলেই তাদের জীবনচেতনাও ছিল ভিন্ন, ভাষার একত্ব থাকলেও তাদের সাংস্কৃতিক মানেও ছিল দুস্তর ব্যবধান। তবে সাধারণ কৃষি-নির্ভর গরিষ্ঠ সাধারণ বাঙালীর জীবনচেতনা ছিল প্রায় একই রকম।

এ ছাড়াও ধর্মীয় সাজুয্য বরাবরই সমাজ এবং জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

তুর্কী বিজয়ের আগে থেকেই বাংলায় মুসলমান আরব বণিক ও সুফী সাধকরা আসতে শুরু করেন, অষ্টম শতকের দিকে। তখন তারা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে দু' তিন মাস অবস্থান করেন। তাদের সঙ্গে আগত সুফী সাধকরা সনাতন ধর্মের অত্যাচার, নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার জনগণকে ইসলামের সাম্যবাদী মন্ত্র শুনিয়ে মুগ্ধ করেন এবং সকল মানুষ যে এক কাতারে দাঁড়াবার অধিকারী সেকথা প্রচার করতে শুরু করেন। তা থেকে সাধারণ মানুষ অবলম্বন হিসাবেই ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই জনসমষ্টিই এক সময় অত্যাচার থেকে নিবৃত্তি লাভের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

> বাঙ্গালা দেশে যে মতের মোহম্মদীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তা খাঁটি শরিয়তী অর্থাৎ কোরান অনুসারী ইসলাম নহে। শরিয়তী মত, অন্য কোন ধর্মের সঙ্গে সহযোগ করতে প্রস্তুত নহে; বাঙ্গালা দেশে ইসলাম সূফী মতই বেশী প্রসার লাভ করে। সূফী মতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর কোনও

www.nagorikpathagar.org

> বিরোধ হয় নাই। সূফী মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালায় প্রচলিত যোগ মার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল; মধ্যযুগে তুর্কী বিজয়ের পর হইতে যে ইসলাম বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, তাহা নিজেকে বাঙ্গালীর পক্ষে সহজগ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিল।[২৭]

আহমদ শরীফসহ অন্যান্য গবেষকও এই মতের সমর্থক।

বাংলার সংস্কৃতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা এবং সংস্কৃতিগতভাবে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আলোচনায় হুমায়ূন কবিরের (১৯০৬-১৯৬৯) বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তিনি লিখেছেন : 'পশ্চিম বাঙলায় শালবন আর কাঁকড়ের পথ—দিগন্তে প্রান্তর দৃষ্টিসীমার বাইরে মিলিয়ে আসে। শীর্ণ জলধারার গভীর রেখা কাটে দীর্ঘ সংখ্যাহীন স্রোতস্বিনী। বাতাসে তীব্রতার আভাস, তপ্ত রৌদ্রে কাঠিন্য, দিনের তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট দীপ্তির পর অকস্মাৎ সন্ধ্যার মায়াবী অন্ধকারে সমস্ত মিলিয়ে যায়। রাত্রিদিনের অনন্ত অন্তরাল মনের দিগন্তে নতুন জগতের ইঙ্গিত নিয়ে আসে, তপ্ত রৌদ্রালোকে মূর্চ্ছাহত ধরণী অন্তরকে উদাস করে তোলে। পশ্চিম বাঙলার প্রকৃতি তাই বাঙালীর কবিমানসকে যে রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস। অনির্ব্বচনীয়ের আস্বাদে অন্তর সেখানে উম্মুখ ও প্রত্যাশী, জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণ। ... বাঙলার পূর্ব্বাঞ্চলের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। পূর্ব্ববঙ্গের নিসর্গ হৃদয়কে ভাবুক করেছে বটে, কিন্তু উদাসী করেনি। দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের অভাব সেখানেও নাই, কিন্তু সে প্রান্তরে রয়েছে অহোরাত্র জীবনের চঞ্চল লীলা। পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোতধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস। প্রকৃতির বিপুল শক্তি নিয়তই উদ্যত হয়ে রয়েছে, কখন আঘাত করবে তার ঠিকানা নেই। কূলে কূলে জল ভরে উঠে, সোনার ধানে পৃথিবী ঐশ্বর্য্যময়ী, আর সেই জীবন ও মরণের অনন্ত দোলার মধ্যে সংগ্রামশীল মানুষ। প্রকৃতির সে ঔদার্য্য, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সেই সংহত শক্তি ভোলবার অবসর কই? চরের মানুষ নদীর সাথে লড়াই করে, জলের ঐশ্বর্য্যকে লুটে জীবনের উপাদান আনে। তাই লোকাতীতের মহত্ত্ব হৃদয়কে সেখানেও স্পর্শ করে, কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার পরিসমাপ্তি; প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণের সেখানে অবকাশ কই?'[২৮]

হুমায়ূন কবির লিখেছেন :

> বাঙলার পূর্ব্বাঞ্চলেই এ বিপ্লবী মনোবৃত্তি কেন বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল, তাও সহজেই বোঝা যায়। প্রকৃতির শক্তির উদ্যত আঘাতের সম্মুখে সংগ্রামশীল মন, নদীপ্রবাহের ভাঙাগড়ায় গৃহসৃষ্টির ব্যর্থতাবোধ, এবং মঙ্গোলীয় রক্তের অহিংস্রতা মিলে পূর্ববঙ্গকে বৌদ্ধমানসের উপযোগী ক্ষেত্র করে রেখেছিল। বাঙলায় আর্য্যপ্রভাবের শক্তি এমনিতেই ক্ষীণ, পূর্ববঙ্গে সে প্রভাব ক্ষীণতর। বরঞ্চ পশ্চিমবঙ্গে স্থিরতা অনেক বেশী, রাজশক্তির প্রভাবও সেখান অধিকতর

www.nagorikpathagar.org

কার্য্যকরী। তাই বৌদ্ধযুগের অবসানে যেদিন হিন্দু অভ্যুত্থানে বৌদ্ধমানসকে ধ্বংস করবার চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠে, প্রাক্তন মজ্জাগত জাতিবিচারের পূর্ব্বস্মৃতির মধ্যে পশ্চিম বাংলায় তা অনেক পরিমাণে সম্ভব হয়েছিল। বল্লালী কৌলিণ্য প্রথার উদ্ভব সেখানে, সব চেয়ে বেশী সাফল্যও বোধহয় সেইখানে। কিন্তু ভঙ্গুর, বিপ্লবী পরিবর্তনশীল পূর্ব্ববঙ্গে জাতিবিচারের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সে পরিমাণে সার্থক হয়নি। সেই জন্যেই পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সমশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেও বিবাহে ব্যবহারে সেদিন পর্যন্ত নানাবিধ বাধার কথা শোনা যায়। হিন্দু অভ্যুত্থানের বিজয়ের দিকে, কৌলিণ্য ও জাতিবিচারের প্রাবল্যের মধ্যেও পূর্ব্বদেশে বৌদ্ধ মনোবৃত্তির অহিংস্রতা ও সাম্য প্রচ্ছন্ন হয়ে বেঁচে ছিল। মোসলেম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আত্মপ্রকাশ করে পূর্ব্ববঙ্গের ধর্মীয় রূপ বদলে দেয়।[২৯]

পূর্ব বাংলার মানুষের মানস-বিশ্লেষণে হুমায়ূন কবির লিখেছেন : 'পূর্ব বাঙালায় যে কেন এভাবে সাংসারিক অনাধ্যাত্মিক কাব্য আত্মপ্রকাশ করল তার কারণ বোঝা কঠিন নয়। পশ্চিম বাঙলার প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য ও মহিমা সত্ত্বেও সেখানে তা প্রবল হয়ে উঠেনি, কারণ নিসর্গের সঙ্গে সংগ্রামশীল মানুষ মুহূর্ত্তের জন্যও নিজের সত্তা ভুলে থাকতে পারেনি। বৌদ্ধবিপ্লবে যে সাম্যবাদ পূর্ব বাঙলার মজ্জাগত, মোস্‌লেম বিজয়ে তা আরো প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করল, এবং সেই সঙ্গে জেগে উঠল নতুন আত্মপ্রত্যয়, নতুন ব্যক্তিত্ববোধ এবং স্বাধিকারের জ্ঞান। আরাকাণের রাজসভায় তাই বাঙলার সামাজিক কবিতার পত্তন, এবং পরবর্ত্তী যুগে ময়মনসিংহ ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামের গীতিকার মধ্য দিয়ে তা সমাজ সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তার ফলে যে আমরা কেবলমাত্র কাব্যরচনায় নতুন ধারার পরিচয় পাই তা নয়,— পুরানো রীতির জীর্ণ খাদেও তার প্রভাবে নতুন ঢঙের জোয়ার নেমেছিল। ... 'পূর্ব্ব বাঙলার নদীর ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ স্বাভাবিক— তার প্রকাশ বারে বারে নতুন নতুন বিদ্রোহের সূচনা করেছে — তাই পূর্ব্ব বাঙলায় নেমেছে বৌদ্ধবিপ্লবের বিপুল প্লাবন। হিন্দু অভ্যুত্থানের যুগেও শক্তি ও তন্ত্রের বিচিত্র ছদ্মবেশে সে বিদ্রোহের রূপান্তর সহজেই ধরা পড়ে। মোস্‌লেম বিজয়ের দিনে সে প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ আবার প্রকট হয়ে কিভাবে বাঙলার সমাজ ও জনসংগঠন বদলিয়ে দিয়েছিল, সেকথা আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করেছি, কিন্তু কাব্যসৃষ্টির উপরেও তার প্রভাব বড় কম নয়। ... মুস্‌লিম সংস্কৃতির প্রসারেও সন্ন্যাস-বিরোধী মনোবৃত্তি প্রথমে কাব্যরূপ পায়নি, কারণ পশ্চিম বাঙলার মানসসংগঠন সংসারবিমুখ ও ত্যাগধর্মী। তাদের সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ফলে পশ্চিম বাঙলার দিগন্ত-প্রসারী প্রান্তরের মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার জন্ম,— মানুষের প্রেমকে অবিনশ্বর অসীমে টেনে নিয়ে তার সমাপ্তি। রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদেও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব লঙ্ঘনের একই আদর্শ, সমাজধর্মের প্রেরণায় মানুষের ব্যক্তিধর্মের দাবী সেখানে গৌণ। ...পশ্চিম বাঙলা থেকে মুস্‌লিম প্রভাব এসে যেদিন পূর্ব বাঙলায় পৌছল, সেদিন কিন্তু সাহিত্যধর্মের বিপ্লব

www.nagorikpathagar.org

আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। পূর্ব বাঙলার ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিদ্রোহধর্মী মন সহজেই ইসলামের সংসারমুখী সন্ন্যাসবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করে নিল। তার ফলে একদিকে মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে গেল, অন্যদিকে ইসলাম যারা গ্রহণ করল না, তাদেরও চিত্তবৃত্তিকে ইসলামের বিপ্লবী আহবান নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করল। পশ্চিম বাঙলার হিন্দুমানসে ইসলামের সংঘাতে জেগেছিল বৈষ্ণব গীতিকা, পূর্ব্ব বাঙলার হিন্দু মানসে সে সংঘাতে জাগল মনসামঙ্গল। বৈষ্ণব কাব্যের অভিযান মানবধর্মকে অতিক্রম করে অতিমানবের ক্ষেত্রে, মনসামঙ্গলের সাধনা লোকাতীতকে সমাজ জীবনের সহজ সম্বন্ধের মধ্যে প্রকাশ। ... মনসামঙ্গল কাব্যগুলির সামাজিক তাৎপর্য আজও সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়েনি। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে ধর্মপ্রেরণায়ই তাদের জন্ম, কিন্তু বৈষ্ণব কাব্যের সঙ্গে তাদের পার্থক্য বিচার করলে কোন সন্দেহ থাকে না যে লৌকিক কাহিনী হিসাবেই তাদের সার্থকতা। পূর্ব বাঙলার নদ-নদীবহুল নিসর্গ, বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির প্রাধান্য অথবা বেহুলার অভিযান,— এ সমস্ত প্রসঙ্গের আধিভৌতিক তাৎপর্য্য কেবলমাত্র কষ্টকল্পনা, কিন্তু নদীমাতৃক বাণিজ্যনির্ভর সমৃদ্ধ নরনারীর হিংসা ও প্রেম, তেজ ও সাহস এবং বিপুল অধ্যবসায়ের কাহিনী হিসাবে তাদের মূল্য অপরিমেয়। বরিশালে মনসামঙ্গলের প্রথম কবি বিজয় গুপ্তের জন্ম তাই আকস্মিক নয়। ধর্মকে উপলক্ষ্য করে সামাজিক সম্বন্ধের এ কাব্য প্রকাশ পূর্ব্ব বাঙলাতেই প্রথম সম্ভব হয়েছিল।'[৩০]

সেভাবেই পূর্ব বাংলায় ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং বাংলা ভাষাভাষী জনপদের প্রায় ৭০ ভাগ মুসলমান। এ সম্পর্কে আর. ডব্লিউ. উইকিস লিখেছেন :

> The Bengal People Compose with the world's largest Muslim ethnic group after the Arabs. More than 67 per cent of Bengali speaking people are Muslim.[৩১]

বর্তমান কালে বাঙালী জাতিসত্তার অনুসন্ধানকালে প্রায়শই এই সত্য বিস্মৃত থাকে। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধর্ম জাতিসত্তার গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং ধর্মবিশ্বাস মানুষের জীবনাচরণে পরিবর্তনও আনে। এই যুক্তি খন্ডন করার জন্য বদরুদ্দীন উমর প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের উদাহরণ টেনে বলেছেন যে, এই দুই গ্রুপের পার্থক্য ক্রমশই কমে আসছে। এ কথাও সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ ইউরোপের গ্রামে গ্রামে এখনও পর্যন্ত ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের জন্য আলাদা আলাদা গীর্জা রয়েছে এবং একই পাড়ায় সন্তানদের পড়াশোনার জন্য পাশাপাশি আলাদা আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। উপরন্তু ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টের তুলনা হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে হতে পারে না, সে তুলনা হতে পারে মুসলমানের শিয়া-সুন্নী সম্প্রদায়ের সঙ্গে।

তবে গরিষ্ঠ সংখ্যায় বাঙালী মুসলমান হওয়ায় এক শ্রেণীর মুসলমান পণ্ডিত যেভাবে দুঃখ পেয়েছেন, হিন্দু পণ্ডিতগণ ততটা পাননি। পাননি বলেই, তারা বাঙালী হওয়ার চেয়ে

www.nagorikpathagar.org

ভারতীয় হওয়ার ওপরই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী। যেমন নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩—১৯৮১) লিখেছেন :

> বাঙ্গালী জাতির বা বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধে কিছু কথা বলিতে হইলে, ভারতবর্ষকে বাদ দেওয়া চলে না। ভারত হইতেছে সাধারণ, বাঙ্গালা হইতেছে বিশেষ। যাহা লইয়া বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব, তাহার বেশীরভাগই ভারতবর্ষের অন্য জাতির মধ্যেও মিলে; ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকদের সঙ্গে সেইসব বিষয়ে বাঙ্গালীদের সমতা আছে। বিশেষের ওপর ঝোঁক দিয়া সাধারণকে ভুলিলে ভারতের সমস্ত প্রদেশ-সুলভ একটা সাধারণ ভারতীয়ত্ব আছে, বাঙ্গালাও তাহার অংশীদার।[৩২]

এ ক্ষেত্রে বাঙলা যদি ভারত হয়, ভারত যদি এশিয়া হয়, এশিয়া যদি বিশ্ব হয়, তাহলে বিশ্বে এক অভিন্ন সংস্কৃতিরই জন্ম হত।সংস্কৃতি নিয়ে এত আলোচনার বোধহয় কোন প্রয়োজন হত না। বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সমাজবিন্যাসের দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে :

> Although in certain period, the two areas were administratively united, their differences have remained. The riverine eastern part of Bengal (Bangladesh) with its Muslim majority and the relatively dry western part (West Bengal) with its predominantly Hindu Population.[৩৩]

বাংলার পূর্বাঞ্চলে মুসলমানরা বসতি গেড়েছে বেশী এবং বরাবরই তারা সংখ্যায় বেশী ছিল; হিন্দুরা পশ্চিমে। তা সত্ত্বেও বাংলা ভাষাভাষীদের শতকরা প্রায় ৭০ জনই মুসলমান। পূর্ব-বাংলার মানুষের জীবন-সংস্কৃতিতে স্বতন্ত্র ধারা যে বহাল রয়েছে, তারও কারণ তারা প্রধানত মুসলমান। আর মুসলমান জনসাধারণের সংস্কৃতি যে স্বতন্ত্র এ সত্য উপেক্ষা করা যাবে না।

ঔপনিবেশিক শাসন আমলে এই ধর্মীয় পার্থক্য আরও প্রকট রূপ লাভ করে। ব্রিটিশ আমলেও বাঙালী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও 'বাংলার জমিদার, পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত; আর কৃষক, জোতদার ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে চাকরিজীবী শ্রেণীর এক নগণ্য সংখ্যা ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই হিন্দু সংস্কৃতি বলতে যেমন উঁচু শ্রেণীর বাঙালীর সংস্কৃতি বোঝায়, তেমনি মুসলিম সংস্কৃতি বলতে প্রধানত বাংলার কৃষক, শ্রমিক, সর্বহারা শ্রেণী ও জোতদার শ্রেণীর সংস্কৃতি বোঝায়। বাংলাদেশের দুটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়, হিন্দু ও মুসলমান বহুদিন পাশাপাশি বাস করেও একটি অপরটিকে গ্রাস করতে পারেনি। ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে বাংলার শাসকবৃন্দ মুসলমান ধর্মাবলম্বী হওয়ায় শাসকগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাথে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক কারণে শাসিত শ্রেণীর সংস্কৃতি তথা চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

তাই বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমান এক অভিন্ন সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে এক জাতি সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। ফলে একে অপরের থেকে শুধু দূরে সরে যায়, তাই নয়, একে অপরের প্রতি বৈরীমনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে।"[৩৪]

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন, তার সবটুকু ফল ভোগ করেন হিন্দু বিত্তশালী সম্প্রদায়। তাদের প্রায় সবাই প্রজা হিসাবে পান মুসলমানদের। ফলে জমিদারী নির্যাতনের সবটাই ভোগ করতে হয় প্রধানত বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদের। এই নির্যাতনের ফলে নির্যাতিত মুসলমান সমাজের ভেতরে এক ধরনের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমাজে যেমন একটা আধা-পুঁজিবাদী আধা-সামন্তবাদী শ্রেণীর সৃষ্টি করে, তেমনি এই শ্রেণীর ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট একটি 'সামন্ত-বুর্জোআ' সংস্কৃতির জন্ম হয় বাংলায়। সেটা 'বাবু কালচার' বা 'ভদ্রলোকের সংস্কৃতি', হিন্দু সম্প্রদায়ের উঁচু শ্রেণীর ধ্যানধারণার প্রতীক। রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬—১৮৮৬), বিবেকানন্দ (১৮৬৩—১৯০২), সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ নববাবুর সংস্কৃতি ধারাতেই আত্মপ্রকাশ করেন। অপরপক্ষে বঞ্চিত কৃষক শ্রেণীর সংস্কৃতিই হল মূলত বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কারকদের আন্দোলনগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রথমোক্ত সংস্কারকগণ ছিলেন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। মুসলমান সংস্কারকগণ সবাই এসেছিলেন আর্থিক দিক দিয়ে নিম্ন শ্রেণী থেকে। যেমন হাজী শরিয়তউল্লাহ (১৭৭৯—১৮৪০), দুদু মিয়া (১৮১৯—১৮৬০), তীতুমীর (১৮৭২—১৮৩১), প্রমুখ।[৩৫]

এই প্রেক্ষাপটেই বাঙালী মুসলমান নেতারা সাধারণভাবে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন, এবং স্বতন্ত্র প্রাদেশিক কাঠামোর ভেতরে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের স্বপ্ন দেখেন, যা হিন্দু অভিজাত শ্রেণী থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে যোগসাজসে হিন্দু অভিজাত শ্রেণী সংখ্যায় গরিষ্ঠ বাঙ্গালী মুসলমানের সেই আকাঙ্ক্ষা পর্যুদস্ত করে দেয়। এতে বাঙালী মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য-চেতনা আরও প্রচণ্ড রূপ লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬ সালে এই অঞ্চলের মুসলমানগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯০৫ সালে কেউ রাজনৈতিকভাবে দ্বিজাতিতত্ত্ব আবিষ্কার করেননি।

ভারতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের যে প্রচারণা ছিল, তার পেছনেও ক্রিয়াশীল ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থই। কারণ সংখ্যায় লঘিষ্ঠ হয়েও পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজকে শোষণের দুরভিসন্ধি ছিল হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর। কিন্তু তা টেকেনি। শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাগ হয় ভারতীয় হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর নেতৃত্বেই।

www.nagorikpathagar.org

তারাও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থানের ফলে বাংলাভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়াননি। কারণ তাদেরও ভয় ছিল, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে গোটা বাংলা অভিন্ন থাকলে পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানই বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে এবং এতে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। এই মনোভাব শেষ পর্যন্ত জারি ছিল বলেই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পশ্চিম বাংলার মানুষেরা পুনরায় অখন্ড বাংলার কাঠামোর ভেতরে আসার আন্দোলন করেননি, বরং ভারতীয় কাঠামোর ভেতরে প্রদেশ হিসাবে প্রদত্ত স্বায়ত্তশাসন নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছেন।

এই পরিস্থিতি সামনে রেখেই পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় আলোচনা করা দরকার।

পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি যেমন ধর্ম ছাড়া অন্য কোন বিবেচনায় পাকিস্তানের অঙ্গীভূত ছিল না, তেমনি তা হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন সংস্কৃতি থেকেও পৃথক ছিল। এদিকে 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের নেতৃত্বেও যে হিন্দুরা ছিলেন তারাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই।'[৩৬] সমাজের ভেতরকার এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতেই পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজে এবং পশ্চিম বাংলার হিন্দু সমাজে "দুইটা প্যারালাল কালচার গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতীয় কালচার গড়িয়া উঠে নাই। বাংলা ভাগের মধ্যে এই দুইটা কালচার নিজ নিজ আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইয়াছে।"[৩৭]

এই স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে অধ্যাপক আবুল ফজলের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে এ উপমহাদেশে মুসলমানরা একটি শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়মাত্র ছিল। তার বিবেচনায় মুসলমানরা যে পাকিস্তান দাবী করে, তা ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নয়, বা ইসলামী সংস্কৃতির জন্যও নয়, প্রধানত এ দাবী ছিল সে যুগের 'ভারতীয় মুসলমানদের নিরাপত্তা যা সাধারণভাবে মুসলিম স্বার্থ নামে অভিহিত হতো—তা সংরক্ষণের জন্যই—যা মোটামুটি ধর্মনিরপেক্ষ আর পরিধি যার বহু ব্যাপক।'[৩৮] আবুল ফজল উল্লেখ করেন যে,

> 'আধুনিক রাষ্ট্রে ধর্মের তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলেও আমার মনে হয় না। সে ভূমিকা এখন নিয়েছে রাজনীতি আর অর্থনীতির যোগফল। রাজনীতি-প্রাজ্ঞ কায়েদে আজম এ সত্য বুঝতে পেরেছিলেন—তাই তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি কখনও ইসলাম বিপন্ন এ ধুয়া তোলেননি। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় প্রধানতম শ্লোগান ছিল ভারতীয় মুসলমানরা বিপন্ন; বিপন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মানুষ হিসাবে, ধর্মীয় সত্তার দিক থেকে নয়। কায়েদ নিজেও ছিলেন প্রথম নম্বরের গণতন্ত্রমনা আর সার্থক পার্লামেন্টারিয়ান, কাজেই তার বুঝতে এতটুকু দেরী লাগেনি যে, স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো গণতান্ত্রিক না হয়ে যায় না। সে গণতন্ত্রে ভারতীয় মুসলমানেরা এক অসহায়

www.nagorikpathagar.org

সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে, আর তা থাকবে হয়ে চিরকাল।[৩৯]

আবুল ফজল (১৯০৩—১৯৮৩) লিখেছেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ভিত উভয় দিক থেকেই মুসলমানদের কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল। সে সময় 'যখনই কোন একজন মুসলমানকে কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হতো, দেখা গেছে তখনই আপত্তি আর প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেছে (হিন্দু সমাজে)। উপযুক্ত ও সর্বতোভাবে যোগ্য মুসলমানকে ভাইস-চ্যান্সেলর, কিংবা কর্পোরেশনের মেয়র এমনকি অধ্যাপক অধ্যক্ষের পদ দেওয়া হলেও সাম্প্রদায়িকতার তুমুল তুফান বয়ে যেতে দেখেছি আমরা।'[৪০] শাহেদ সোহরাওয়ার্দীকে (১৮৯০—১৯৬৫) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ললিতকলার অধ্যাপক নিয়োগের বিরোধিতা করেছিল হিন্দুরা। তেমনি স্যার আবদুর রহিম (১৮৬৭—১৯৫২), মন্ত্রিসভা গঠনের আহবান পেলে তাকে সহযোগিতা করতে রাজী হয়নি কোন হিন্দু। আবুল ফজলের বিবেচনায় অবিভক্ত ভারতীয় কাঠামোর ভেতরে থাকলে বাংলার মুসলমানদের দুর্দশা আরও বাড়ত।[৪১]

পরবর্তীকালেও দেখা গেছে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোন ঢেউ ভারতের পশ্চিম বাংলায় সঞ্চারিত হয়নি। এমন কি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও নয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তো হিন্দিকে জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে বাংলা ভাষার চর্চা করতে বলেছেন।[৪২] অথচ পূর্ব বঙ্গে মানুষ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উর্দুর পাশে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তাই পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিকে বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি বলে অভিহিত করলে দোষের কিছু হয় না।

৫. সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

"সভা-সমিতি ও ক্লাব-সোসাইটি-অ্যাসোসিয়েশন হল এ যুগের মানুষের সামাজিক জীবনের অঙ্গ। শুধু অন্যতম নয় অপরিহার্য সহচর। আদিম মানব সমাজেও ক্লাব-সোসাইটি ও অ্যাসোসিয়েশন ছিল। কোথায়ও বয়সভেদে, কোথায়ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে, এমনকি কোথায়ও কোথায়ও স্টেটাস বা মর্যাদা ভেদেও সেগুলি গড়ে উঠত এবং তার একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক কর্তব্যও ছিল। সমাজের সমগ্র গড়নের সঙ্গে তার বিরোধও ছিল কোথায়ও কোথায়ও 'ব্যক্তি', 'পরিবার', ও 'ক্লাব' প্রত্যেকটি ইউনিটের সঙ্গে বিরোধ।"[৪৩]

সভ্য সমাজের সভা-সমিতির বৈশিষ্ট্য হল, তার গোষ্ঠীগত ও শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য। এই জাতীয় সভা-সমিতির উৎপত্তি হয়েছে আধুনিক যুগে এবং ক্রমেই তার প্রভাব এত বেড়েছে ও বাড়ছে যে তার ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ধারা পর্যন্ত বদলে যাচ্ছে।[৪৪]

পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন ধরনের সমিতি বা সংগঠনের ইতিহাসও প্রায় দেড় শ' বছরের।

www.nagorikpathagar.org

নানা কারণে নানা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে এসব সমিতি বা সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৮৩৮ সালে ঢাকায় প্রথম যে সমিতি স্থাপিত হয়, তার নাম ছিল 'তিমিরনাশক সভা'।[৪৫] এরপর থেকে বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে নানা ধরনের সংগঠনের জন্ম হয়। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে স্থাপিত মোট ৩৭৪টি সভা-সমিতির খোঁজ পাওয়া যায়। এর মধ্যে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী ছিল মুসলমানদের সমিতি বা আঞ্জুমানগুলি।[৪৬] আর এসব সংগঠনের মুখ্য লক্ষ্য ছিল, আত্মোন্নয়ন, নৈতিক উন্নয়ন, সমাজসেবা, শিক্ষা, সাহিত্যচর্চা, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ প্রভৃতি। এ ছাড়া কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত সভা-সমিতিরও খোঁজ পাওয়া যায়।[৪৭]

পাকিস্তান শাসনামলে সভা-সমিতি-সংগঠন গড়ে তোলার এই ধারা পূর্ববঙ্গে আরও লক্ষ্যমুখী ও উদ্দেশ্যপ্রবণ হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে আরও বিচিত্রমুখী।[৪৮]

এখানে আলোচ্য বিষয় সাংস্কৃতিক সংগঠন। সমাজচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে গঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কখনও রাজনীতিবিচ্ছিন্ন নয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ বহু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ফলে তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মনোভঙ্গীও একই সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানে প্রতিফলিত হয়েছে।

জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ তথা পরিশীলিত জীবনবোধ সৃষ্টির জন্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলে এখনও একক কোন ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেউ কেউ পূর্ব বাংলার তথা বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে দেখেন বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি হিসাবে; কেউ বা জাতীয় সংস্কৃতিকে বিবেচনা করেন 'বাঙালী সংস্কৃতি' হিসাবে। এ দু'য়ের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকাঠামোও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাংলা ঐতিহাসিক কারণেই দুই রাষ্ট্রের অধীন হওয়ায় (পূর্ব বাংলা পাকিস্তানে এবং পশ্চিম বাংলা ভারতে) অভিন্ন সংস্কৃতির ক্ষীণ স্রোতধারা ব্যাহত হয়েছে। ভারতের বাঙালী হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা 'বাঙালী সংস্কৃতি'কে 'ভারতীয় সংস্কৃতির' স্রোতধারায় যেমন বইয়ে দিতে চেয়েছেন; অপরদিকে পাকিস্তানের বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিকে ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট করে স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। স্বতন্ত্র স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র রূপে পূর্ব বাংলা বাংলাদেশ রাষ্ট্র হওয়ায় সেই স্বাতন্ত্র্যের কথা আজ আরও বেশী করে উচ্চারিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এদেশের সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন, অপর পক্ষ (তারাও প্রধানত বাঙালী মুসলমান) ধর্মনিরপেক্ষভাবে সংস্কৃতি নির্মাণের ওপর জোর দিয়েছেন। উভয় ক্ষেত্রেই সংস্কৃতি কর্মীরা বা বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন সংগঠনের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

এখনও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করার জন্য তাই সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি। জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ে যতই বিতর্ক করি না কেন, এ কথা

www.nagorikpathagar.org

ঐতিহাসিক সত্য যে, পূর্ব বাংলার মানুষ উনিশ শতকের গোড়া থেকেই তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছে। তারা বঙ্গভঙ্গ রদ করার প্রতিবাদে পথে নেমেছেন, ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভোট দিয়েছেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

একথা সত্য, পূর্ব বাংলার মানুষ বরাবরই তুলনামূলকভাবে শিক্ষাবঞ্চিত এবং দরিদ্র। নানা জিগিরে বিভিন্ন সময় তাদের দিয়ে নানা রকম ফায়দা হাসিল করে নিয়েছে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোক। কিন্তু ক্রমান্বয়ে দেশে জনসচেতনতা বেড়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সুনির্দিষ্ট রূপদান ও তাকে ঋদ্ধ করে তোলার দায়িত্ব শিক্ষিত ও সৎ জনশ্রেণীর। সে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার প্রয়াস ছিল, তার প্রধান ভিত্তি ছিল স্বাধীন সার্বভৌম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও ইসলাম ধর্ম। সেই চেতনা অনেক দিন জারীও ছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানে স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। তাতে মধ্যপন্থী ও বামপন্থী ধারার বুদ্ধিজীবীরা অংশ নেন। সে সময় ক্ষীণ ধারায় অখণ্ড বাংলার বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেতনাও প্রবাহিত ছিল।

এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখেই পূর্ব বাংলায় ১৯৪৭—৭১ পর্বে যেসব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল, সেগুলোর প্রধান প্রধান সংগঠনের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া এসব সংগঠনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন শিল্পী-সাহিত্যিক। সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে সেও কম বড় অবদান নয়। একই সঙ্গে এদেশে যেসব সাংস্কৃতিক আন্দোলন হয়েছিল তার প্রধান প্রধান সম্মেলন ও ধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ১৯৪৭—৭১ পর্বে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক প্রবণতার উন্মোচন ঘটবে বলে আশা করি।

তথ্যনির্দেশ

১. *বাংলা বিশ্বকোষ*, চতুর্থ খন্ড, (ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রমোশন/নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭৬) পৃ ৫২২

২. উদ্ধৃত, বুলবন ওসমান, *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি তত্ত্ব*, (মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৭৭) পৃ ১২-১৩

৩. উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত

৪. *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খন্ড, (শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৩৮০) পৃ ৬২২

www.nagorikpathagar.org

৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৫৯১

৬. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *'অপসংস্কৃতি ও সংস্কৃতি'* (প্রবন্ধ), উদ্ধৃত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রবন্ধাবলী ২'-এ সঙ্কলিত, জুলাই ১৯৮৯) পৃ ১০

৭. আবুল কাসেম ফজলুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ ৩-৪

৮. আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার* (আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৭৬) পৃ ৪-৫

৯. *গোপাল হালদার*, *সংস্কৃতির রূপান্তর* (মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪) পৃ ৩১

১০. বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সঙ্কট* (মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৪)পৃ ২৭-২৮

১১. আহমদ শরীফ, *স্বদেশ অন্বেষা* (খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৩৭৭ বাং) পৃ ১

১২. পূর্বোক্ত, পৃ ১

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৫

১৪. উদ্ধৃত, নীহাররঞ্জন রায়, *কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি* (জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৯) পৃ ১-১৩

১৫. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ ১৭

১৬. আবুল ফজল, *সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (মুক্তধারা, ১৯৭৪) পৃ ৩২-৩৩

১৭. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতি কথা* (দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০) পৃ ১

১৮. আহমদ শরীফ, *স্বদেশ অন্বেষা* (খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৩৭৭ বাং) পৃ ৩

১৯. *বাংলা বিশ্বকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড (ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস/মুক্তধারা, ১৯৭৫) পৃ ৫১০

২০. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতি-কথা* (বাংলা একাডেমী, ১৯৭০) পৃ ১

২১. পূর্বোক্ত, পৃ ১-২

২২. বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎ সমাজ* (প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৮৭) পৃ ১২৭

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৭২

২৪. আহমদ শরীফ, *স্বদেশ অন্বেষা*, (ঢাকা) পৃ ২০

২৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব) দ্রষ্টব্য

২৬. সুকান্ত একাডেমী, ঢাকা সম্পাদিত *ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি*, ডঃ আহমদ শরীফের আলোচনা, পৃ ২৭-২৮

২৭. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারত-সংস্কৃতি* (মিত্র ও ঘোষ ১৩৭০ বাং) পৃ ১০২-১০৩

২৮. হুমায়ূন কবির, *বাংলার কাব্য* (খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭৩) পৃ ১০-১১

২৯. হুমায়ূন কবির, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩-১৪

৩০. হুমায়ূন কবির, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫-৩৬

৩১. R. W. Weekis, *Muslim Peoples*, (London, 1976) P. 89.

www.nagorikpathagar.org

৩২. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত। পৃ ৮৮

৩৩. The Third World Guide, 1991-92. Bangladesh Chapter.

৩৪. তাজুল ইসলাম হাশমী, *ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি : ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ* (প্রবন্ধ) (সংকলিত ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, সুকান্ত একাডেমী) পৃ ৫৬–৫৭

৩৫. পূর্বোক্ত

৩৬. আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকা ১৯৬৯) পৃ ১

৩৭. আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার* (আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৭৬) পৃ ২৪

৩৮. আবুল ফজল, *সমকালীন চিন্তা* (পাকিস্তানী জাতীয়তার বুনিয়াদ, ঢাকা ১৯৭০) পৃ ১৫৩

৩৯. পূর্বোক্ত

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৪

৪১. পূর্বোক্ত

৪২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারত-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ ৮৮

৪৩. Rovert H. Lowie : *Premitive Society* (London 1949). অধ্যায় ১০–১১, (উদ্ধৃত : বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎসমাজ) পৃ ৫৬

৪৪. *Encyclopaedia of Social Sciences* (1959) Vol. 6. অধ্যায় ৩। উদ্ধৃত ঃ পূর্বোক্ত।

৪৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* দ্বিতীয় খন্ড, (কলকাতা, ১৩৪০ বাং) পৃ ৯০

৪৬. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সভা-সমিতি* (ডানা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৪) পৃ ৯৩

৪৭. পূর্বোক্ত

৪৮. পূর্বোক্ত

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংস্কৃতিক সংগঠন

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

এক. তমদ্দুন মজলিস ১৯৪৭

১. তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠা, পটভূমি ও লক্ষ্য

পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর।

এই উপমহাদেশের শিক্ষিত মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পাকিস্তান আন্দোলন (১৯৪০—৪৭) সমর্থন করেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে বৃটেনের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটলি ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণের কথা ঘোষণা করার সময় থেকেই, অথবা পাকিস্তান আন্দোলনের সাফল্যের শুরু থেকেই, এটা অনেকের কাছে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে, ক্ষমতায় গেলেও মুসলিম লীগের হাতে জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের কোন পরিকল্পনা নেই। তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোক্তারা এই সাংস্কৃতিক শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যেই এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।[১]

বাংলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আবুল কাসেম (১৯২০—১৯৯২) প্রথমে এই সাংস্কৃতিক শূন্যতা পূরণের জন্য সাংগঠনিক উদ্যোগ নেন এবং এর একটা পরিপক্ব রূপ দান করেন। তিনি তাঁর আশেপাশের অনেকের সাথেই এ ব্যাপারে আলোচনা করেন এবং উৎসাহজনক সাড়া পান। তাঁর উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকার সিদ্দিকবাজারস্থ 'লিলি কটেজে' সংস্কৃতিমনা অধ্যাপক, সাহিত্যসেবী ও বুদ্ধিজীবীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় উপস্থিত ছিলেন আবুল কাসেম, নূরুল হক ভূঁইয়া, শামসুল হক, আজিজ আহমদ, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবু জাফর শামসুদ্দীন (জ. ১৯১১), মোজাফফর আহমদ চৌধুরী (১৯২৩—১৯৭৮) প্রমুখ রাজনীতি ও সংস্কৃতিসচেতন ব্যক্তি। কর্মক্ষেত্রে এদের মত-পথ স্বতন্ত্র ছিল। সভায় এই রকম বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সমাবেশ ঘটায় কোন ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভবপর হয়নি। ঐ সভার লক্ষ্য ছিল : একটি জাতীয় আন্দোলন শুরু করা। মোহাম্মদ তোয়াহাসহ কেউ কেউ চাইলেন একটি সাম্যবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে। অপরদিকে নূরুল হক ভূঁইয়া, আবুল কাসেম, এ কে এম আহসান প্রমুখ চাইলেন "ইসলামী আদর্শ অনুসারী প্রগতিশীল" একটি আন্দোলন। দৃষ্টিভঙ্গিগত এই পার্থক্যের জন্য ঐ আলোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, যদিও ঐ আলোচনা অনুষ্ঠানে তুমুল কোনো বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়নি। অধ্যক্ষ আবুল কাসেম (তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক), অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া, এ কে এম

www.nagorikpathagar.org

আহসান ঐ সভা থেকে বের হয়ে এসে ভাবলেন যে, দেশের আশা-আকাঙক্ষার প্রতিফলন ঘটানো যায় "এমন একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা যায় কিনা, যার নামের মধ্যে পাকিস্তানী গন্ধ আছে।" এর ক'দিন পরেই আবুল কাসেমের ১৯নং আজিমপুরের (ঢাকা) বাসায় ঐ উদ্দেশ্যে আর একটি বৈঠক বসে। এই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। আবুল কাসেম তমদ্দুন মজলিসের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। এই উদ্যোগ আবুল কাসেমের ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফলে সফল হয়। ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়।[২]

তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানা যায়, দেশের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঠিক প্রতিফলন ঘটানোর ইচ্ছা নিয়ে তমদ্দুন মজলিস কাজ শুরু করে। তাদের প্রাথমিক দাবী ছিল রাষ্ট্রভাষার দাবী। তারা বাংলা ভাষাকে পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা ঘোষণার দাবী প্রথম উত্থাপন করেন এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তোলেন। বাংলাভাষার সঠিক মর্যাদা দান ছিল তাদের লক্ষ্য। অথচ তাদের প্রতিষ্ঠানের নামে 'তমদ্দুন মজলিস' কেন রাখা হল—এই প্রশ্নের জবাবে অধ্যক্ষ আবুল কাসেম বলেন, 'তমদ্দুন' এবং 'মজলিস' এই দুটি শব্দের সাথে পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা পরিচিত। এর অর্থ তারা সহজেই বুঝতে পারবে। কিন্তু 'সংস্কৃতি' শব্দটির সাথে তারা পরিচিত নয়। তাই দেশের জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য এই 'তমদ্দুন মজলিস' (নাগরিক বৈঠক) নামটি তাঁরা তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট করেন। অধ্যাপক আবুল কাসেম ঐ সময়ে তৎকালীন ছাত্রনেতা সানাউল্লাহ্ নূরীর (জ. ১৯২৭) সাথে 'তমদ্দুন মজলিস' বিষয়ে আলোচনা করেন। সেখানেও আবুল কাসেম একইভাবে এই নামটি ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, আরবী 'মদ্‌ন্' (নগর) শব্দটি থেকে 'তমদ্দুন' শব্দটি নেয়া হয়েছে।[৩]

তমদ্দুন মজলিস গঠনের পেছনে কেবল সাংস্কৃতিক প্রেরণাই কাজ করেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশের সর্বক্ষেত্রে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। এই অবস্থায় শিক্ষিত সমাজের সচেতন অংশের মন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন সমস্যা দ্বারা আলোড়িত হয়। সেই অবস্থায় অধ্যাপক আবুল কাসেম তমদ্দুন মসলিস গঠনের উদ্যোগ নেন বলে মজলিসের অন্য সদস্যরা জানান। তিনি বুঝতে পারেন যে, মুসলিম লীগ নেতারা তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হবেন। মজলিস-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতির স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন এবং এ বিষয়ে তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে দেখেন যে তাঁরা সে-সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা পোষণ করেন না। এমন কি ইসলাম সম্পর্কে মুসলিম লীগ নেতাদের সুস্পষ্ট কোন ধারণা আছে বলে আবুল কাসেম মনে করতে

www.nagorikpathagar.org

পারেননি। তিনি একা তখন খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে দেখা করেন। কিন্তু নাজিমুদ্দীনও তার প্রশ্নের কোন সঠিক জবাব দিতে পারেননি। খাজা নাজিমুদ্দীন তাকে জাকির হোসেনের কাছে পাঠান। জাকির হোসেন বলেন, বই লিখুন। কিন্তু পরে আর তাঁদের কোন উৎসাহ ও সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। এতে আবুল কাসেম দেশের নেতাদের সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি ভাবেন যে, সাংস্কৃতিক উপায়ে অর্থাৎ দেশের ভেতরে বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা প্রভৃতি সমসার সমাধান সন্ধান করতে হবে। আর তারই ফল এই 'তমদ্দুন মজলিস'।[৪]

তমদ্দুন মজলিস গঠন সম্পর্কে তৎকালীন ছাত্রনেতা (জগন্নাথ কলেজ) সানাউল্লাহ নূরীর সঙ্গে আবুল কাসেমের আলাপ হয় ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে। সানাউল্লাহ নূরীর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে অধ্যাপক কাসেম মজলিসের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেন। লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপ :

১. বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

২. সাংস্কৃতিক সচেতনা বৃদ্ধি করা। যেহেতু এদেশের জনসাধারণের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী মুসলমান, তাই এদেশে ইসলামী সংস্কৃতি চালু করতে হবে।

৩. সাহিত্যকে অশ্লীলতামুক্ত ও গণমুখী রূপদান করতে হবে।

৪. জনসাধারণকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে হবে।

৫. নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার দূর করতে হবে।

৬. আদর্শবাদী যুবসমাজ সৃষ্টি করতে হবে। তা না হলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৭. পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।[৫]

২. গঠনতন্ত্র

তমদ্দুন মজলিসের প্রথম গঠনতন্ত্র মজলিসের কাজ শুরু হবার সাথে সাথেই ঘোষিত হয়নি। ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর মজলিস আত্মপ্রকাশ করলেও তার প্রথম গঠনতন্ত্র রচিত হয় ১৯৪৯ সালের ২৭ মার্চ। গঠনতন্ত্র বিষয়ে তৎকালীন ছাত্রনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলামের সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের কক্ষে আলোচনা হয়।[৬]

১৯৪৯ সালের ২২ জুলাই তমদ্দুন মজলিসের প্রথম গঠনতন্ত্র মজলিসের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'সৈনিক'-এ প্রকাশিত হয়। মজলিসের সর্বমোট তিনটি গঠনতন্ত্র রচিত হয়। কিন্তু প্রথম দিককার গঠনতন্ত্র ও পরবর্তীকালের গঠনতন্ত্রের রূপ ক্রমশ বদলে যায়।

www.nagorikpathagar.org

<u>**প্রথম গঠনতন্ত্র**</u> *(১৯৪৯ সালের ২২ জুলাই সংখ্যা সৈনিক থেকে উদ্ধৃত)*

তমদ্দুন মজলিসের গঠনতন্ত্র

১। নাম

এই প্রতিষ্ঠানের নাম হবে 'তমদ্দুন মজলিস'। আপাততঃ এর কাজ পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২। উদ্দেশ্য

(ক) কুসংস্কার, গতানুগতিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দূর করে ব্যাপক তামদ্দুনিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সুস্থ ও সুন্দর তমদ্দুন গড়ে তোলায় সহায়তা।

(খ) সংগঠন ও গঠনমূলক কাজের ভেতর দিয়ে নিখুঁত চরিত্র গঠন করে গণজীবনের উন্নয়নে সহায়তা করা।

(গ) আলোচনা ও প্রচারের ভেতর দিয়ে যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গসুন্দর ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদের দিকে মানব সমাজকে এগিয়ে নেওয়ায় সহায়তা।

(ঘ) মানবীয় মূল্যবোধের ওপর সাহিত্য ও শিল্পের মারফত নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা।

৩। কর্মসূচী

(ক) মজলিসের উদ্দেশ্যের পরিপোষক গবেষণামূলক ও অন্যান্য গ্রন্থাদি প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা।

(খ) মজলিসের তরফ থেকে সাহিত্য পত্রিকা ও মতবাদপ্রধান সংবাদপত্র প্রকাশ।

(গ) পাঠাগার, পাঠচক্র ও বিতর্কসভার প্রতিষ্ঠা; পাকিস্তানে লাইব্রেরী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ।

(ঘ) প্রয়োজনবোধে মজলিসের তরফ থেকে পুস্তিকা, প্রচার পত্রিকা ও ইশতেহার প্রকাশ।

(ঙ) একটি আদর্শ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা।

(চ) বিভিন্ন মতবাদ, সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানদানের জন্য কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে ক্লাসের বন্দোবস্ত করা।

(ছ) সাহিত্যিকদের পুস্তকাদি প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা।

(জ) দুঃস্থ কর্মী সাহিত্যিক ও ছাত্রদের সাহায্য করা।

(ঝ) দেশের কবি, গায়ক ও শিল্পীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও সংস্কৃতি আন্দোলনে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করা।

(ঞ) শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমবায়িক জীবন-চেতনা ও গণসংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে কবি, শিল্পী,সাহিত্যিক, গায়ক, ও কর্মীদের নিয়ে বৎসরে অন্তত একবার কিছুদিনের জন্য তাঁবু জীবন যাপনের ব্যবস্থা।

(ট) দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ব্যাপক অভিযান চালানো এবং মজলিসের পরিচালনায় নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন।

www.nagorikpathagar.org

(ঠ) বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মজলিসের তরফ থেকে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ ও অর্থকরী সাহায্যদানের ব্যবস্থা।

(ড) স্বাস্থ্যচর্চার জন্য ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা।

(ঢ) পল্লী উন্নয়নের জন্য পল্লীবাসীদের সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য করা।

(ণ) কতকগুলি নির্দিষ্ট দিবস উদযাপন।

গঠনতন্ত্রে তমদ্দুন মজলিসের ৬টি বিভাগ রাখার কথা ঘোষণা করা হয়। এই বিভাগগুলো হল :

এক। সাহিত্য বিভাগ। এর কাজ হল কিছুদিন অন্তর অন্তর সাহিত্য আলোচনার অনুষ্ঠান, মৌলিক সাহিত্যগ্রন্থাদি প্রকাশ, প্রাচীন সাহিত্য সংগ্রহ, গবেষণামূলক সাহিত্য সৃষ্টি ও দিবস উদযাপন ইত্যাদি।

দুই। লাইব্রেরী বিভাগ। এর কাজ পাঠাগার পরিচালনা ও পাকিস্তানে লাইব্রেরী আন্দোলন।

তিন। প্রচার বিভাগ। এই বিভাগের দায়িত্ব হল মতবাদ প্রধান পত্রিকা প্রকাশ, দেয়াল পত্রিকা বের করা, শিল্প ও চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

চার। রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ। এর কাজ পাঠচক্র পরিচালনা, বিতর্ক সভার আয়োজন, বক্তৃতা শিক্ষাদান ও দেশের বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা সভার আয়োজন করা।

পাঁচ। লোককলা বিভাগ।

ছয়। জনহিতৈষী বিভাগ।

গঠনতন্ত্রে মজলিসের শাখা অফিস গঠন সম্পর্কেও বলা আছে। তাতে শাখা মজলিস গঠনের জন্য ১১ জনের একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়। মজলিসের সাধারণ সভ্যদের ভোটে পরিচালনা কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও দফতর সম্পাদক নির্বাচিত হবেন। এছাড়া মফস্বলে তমদ্দুন মজলিসের মহিলা শাখা খোলার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ আছে।

প্রথম গঠনতন্ত্রে মজলিসের সদস্য হওয়ার যোগ্যতার জন্য ছয় দফা শর্তের উল্লেখ রয়েছে। শর্তগুলি নিম্নরূপ :

১। ব্যক্তিগত এবং পদসংক্রান্ত সমস্ত দলাদলি তারা ত্যাগ করবেন, এবং পরস্পর আন্তরিক ভ্রাতৃভাব পোষণ করবেন।

২। স্বার্থপরতা এবং পদলোভ থেকে নিশ্চিতভাবে মুক্ত থাকবেন।

৩। কোন রকম প্রতিক্রিয়াশীলতাকে প্রশ্রয় দেবেন না।

৪। সপ্তাহে বা দিনে নির্দিষ্ট সময়ে মজলিসের কার্যে আত্মনিয়োগ করবেন।

www.nagorikpathagar.org

৫। মজলিসের উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা, আইনকানুন ও শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলবেন।

৬। বৎসরে প্রাথমিক সদস্য চার আনা, শাখা কমিটির সদস্য আট আনা ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ১ টাকা করে চাঁদা দেবেন। মজলিসের সকল সদস্য সম্বন্ধেই এই নীতি প্রযোজ্য। নীতিগুলোকে যারা পরিপূর্ণভাবে মেনে চলবেন, একমাত্র তাঁদেরই মজলিসের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হওয়ার অধিকার থাকবে।

তমদ্দুন মজলিসের প্রথম গঠনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে ধর্ম সম্পর্কে কোন উগ্র মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়নি। কেবল উদ্দেশ্য এই শিরোনামে বলা আছে যে, "আলোচনা ও প্রচারের ভিতর দিয়ে যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গসুন্দর ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদের দিকে মানব সমাজকে এগিয়ে নেওয়ায়" সহায়তা করতে হবে।

দ্বিতীয় গঠনতন্ত্র

তমদ্দুন মজলিসের সংশোধিত দ্বিতীয় গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয় আরও পরে, ১৯৬০ সালের দিকে। কিন্তু অনুসন্ধান করে এর কোন কপি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। মজলিসের সদস্যরা জানান, দ্বিতীয় গঠনতন্ত্রে ধর্ম সম্পর্কে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে সমাজজীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি আলোচনা করে ইসলামকে আদর্শ ধর্ম বলে বিবেচনা করা হয়, এবং একমাত্র ইসলামী পথেই যে দেশের মুক্তি আসতে পারে সে–কথা উল্লেখ করা হয়। ফলে 'উদ্দেশ্য' এই কলামে দ্বিতীয় গঠনতন্ত্রে 'ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদ কথাটার বদলে 'ইসলামী সমাজতন্ত্রবাদ' এই বাক্যাংশটি ব্যবহৃত হয়। মজলিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকের মতে এটা মজলিসের যে লক্ষ্যের কথা এতদিন প্রকাশ করা হয়নি সেই মূল লক্ষ্যের দিকে অগ্রসরতার প্রমাণ।[৭]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৪৭ সালের সমাজ পরিবেশ ও ১৯৬০ সালের সমাজ পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের মনোভাবে ১৯৬০ সালের দিকে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। চীন ও রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে এ–সময় আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট কৌতূহল দেখা দেয় এবং যুবসমাজ চীন ও রাশিয়ার প্রবর্তিত সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। আর ছাত্র–যুবকদের মধ্যে ধর্মের প্রতি একটা অনীহ ভাব এবং সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীও দেখা দিতে আরম্ভ করে। এর কিছুদিন পরেই ১৯৬৩ সালের দিকে পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের ও রাশিয়ার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই পরিবেশে তমদ্দুন মজলিসের গঠনতন্ত্রের ইসলামমুখী পরিবর্তন লক্ষ্যযোগ্য।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় গঠনতন্ত্র

মজলিসের তৃতীয় গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালের দিকে। অধ্যাপক আবদুল গফুরের (জ. ১৯২৯) কাছ থেকে প্রাপ্ত তৃতীয় গঠনতন্ত্রে প্রকাশের কোন সন-তারিখের উল্লেখ নেই। ১৯৬৫ সালের সমাজ পরিবেশ '৬০ সালের সমাজ পরিবেশ থেকে আরও অনেকখানি বদলে যায়। নাগরিক জীবনের জটিলতা ও সামাজিক অসন্তোষ তখন আরও বৃদ্ধি পায়। রাশিয়া ও চীনে প্রবর্তিত মতবাদের দিকে স্বাভাবিকভাবেই তরুণ সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ও মানুষের কৌতূহল অনেক বেড়ে যায়। এই পরিবেশে প্রকাশিত হয় তমদ্দুন মজলিসের তৃতীয় সংশোধিত গঠনতন্ত্র। এ সময় মজলিসের আগের ঐক্য, শৃংখলা, সহনশীলতা ও কর্মতৎপরতা ইত্যাদি অব্যাহত ছিল না এবং সব কিছুতেই একটা শৈথিল্য দেখা দেয়। তৃতীয় সংশোধিত গঠনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় বলা হয় :

- আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম হবে "পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস।" তমদ্দুন মজলিস পাকিস্তানের তৌহিদী জনতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।
- পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস বিশ্বাস করে : একমাত্র ইসলামী (অর্থাৎ শান্তি) আদর্শের ভিত্তিতেই আজকের সমস্যাজর্জরিত এবং নিপীড়িত বিশ্ব-মানুষের সত্যিকার মুক্তি সম্ভব।
- পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস আজকের মানবতাবিরোধী তথা বিকৃত ও জনবিরোধী সংস্কৃতি এবং কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দূর করে ব্যাপক তামদ্দুনিক আন্দোলনের মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর তমদ্দুন গড়ে তুলবে।

এবং

- পাকিস্তানের গণজীবনে মনোবিপ্লব সাধন করে ইসলামী আদর্শের দিকে মানুষকে এগিয়ে দেওয়াই মজলিসের আশু উদ্দেশ্য।
- পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসে স্বার্থপর মোনাফেক বা নাস্তিকের কোনো স্থান নেই। আদর্শবাদী নিঃস্বার্থ সাংস্কৃতিক কর্মীরাই মজলিসের ধারক, বাহক এবং পরিচালক।[৮]

এ ছাড়া তৃতীয় গঠনতন্ত্রের 'সাধারণ কর্মসূচী' অধ্যায়েও প্রথম গঠনতন্ত্র থেকে পরিবর্তন চোখে পড়ে। এখানে বলা আছে :

> আলোচনা ও প্রচারের ভেতর দিয়ে যুক্তির মাধ্যমে ইসলামী আদর্শের দিকে মানব সমাজকে এগিয়ে দেয়া এবং ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূর করা। এবং সাহিত্য, পত্রিকা, আলোচনা ও সভা-সমিতি মারফত ইসলামের সত্যিকার রূপ জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং বিভিন্ন অপূর্ণাঙ্গ ও ক্ষতিকর আদর্শ এবং মতবাদ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সজাগ করে দেয়া।[৯]

www.nagorikpathagar.org

আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও মজলিসের এই গঠনতন্ত্রের আরও কতিপয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। আত্মসমালোচনার ক্লাস প্রবর্তন তার মধ্যে একটি। নিয়মিত নির্দিষ্ট বিরতির পর এই আত্মসমালোচনার ক্লাস বসত। এতে প্রত্যেক সদস্য সুশৃঙ্খলভাবে একে অপরের বিভিন্ন ব্যক্তিগত দোষত্রুটিও ধরিয়ে দিতেন। প্রথম প্রথম তরুণ উৎসাহী মজলিস কর্মীরা সোৎসাহে এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, মজলিসের প্রবীণ সদস্য ও কর্মকর্তাদের অনেকেই নতুনদের এই আলোচনা–সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না। এ কারণে মজলিসে নতুন কর্মীদের আগমনের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।[১০]

৩. আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী

তমদ্দুন মজলিসের আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী সম্পর্কে বলতে গেলে, প্রায় সবটাই প্রকাশিত হয়েছে মজলিস কর্তৃক প্রকাশিত 'একমাত্র পথ' নামক একটি পুস্তিকায়। পুস্তিকাটি প্রণয়ন করেছিলেন মজলিসের আহ্বায়ক আবুল কাসেম ও মজলিস কর্মী শাহেদ আলী (জ. ১৯২৫) ঐ পুস্তিকার মোট ৩টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি হচ্ছে :

১। আদর্শের সন্ধানে মানুষ।

২। আমাদের আদর্শের সমস্যা।

৩। আদর্শ রূপায়ণে।

'আদর্শের সন্ধানে মানুষ' প্রবন্ধে লেখকদ্বয় বলেন যে, মানুষ যখন দারুণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন তার জন্য দরকার হয় আদর্শের। তার এই আদর্শ হবে এমন, যা মানুষকে দিতে পারে সর্বাঙ্গীন মুক্তি। আধুনিক সমাজজীবনের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি তারা গুরুত্ব দেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের মতে অর্থনৈতিক সমস্যাই মানুষের জীবনের শেষ কথা নয়। তাঁরা বলেন :

> একথা সত্য যে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের যুগে কম্যুনিজম আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির আশ্বাস দিতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পুঁজিবাদ পৃথিবীর সম্পদ গুটিকতক পুঁজিপতির হাতে সঞ্চিত রাখতে চায়। আর কম্যুনিজম সেই সম্পদকেই সর্বহারাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে চায়। দুইয়েরই চরম ও পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনোপার্জন, অন্তহীন অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা—এর বাইরে কোন মহৎ উদ্দেশ্য কারও নেই। কিন্তু প্রচুর খেতে পরতে পেলেই মানুষ সুখী হয়, তার সকল দুঃখের অবসান হয়, সে চরম স্বাধীনতা ভোগ করে, মানুষ সত্যিকার মানুষ হয়–একথা স্বীকার করলে মানুষের মনুষ্যত্বকেই অস্বীকার করতে হয়।[১১]

তাঁরা বলেন যে, কম্যুনিজম ব্যক্তির বিকাশকে অস্বীকার করেছে। সেখানে বহুমুখী ভাবধারা আজ নিপিষ্ট। কিন্তু তবু তাদের পক্ষে সেই সামাজিক অসাম্য দূর করা সম্ভব

www.nagorikpathagar.org

হয়নি। মার্কসবাদ প্রসঙ্গে ঐ প্রবন্ধে তারা বলেন, নাস্তিকতাকে কেন্দ্র করে যে মার্কসবাদ তথা কম্যুনিজম দর্শন প্রসার লাভ করেছে, বাস্তবক্ষেত্রে তাও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। মার্কসবাদের জন্ম মার্কসের বিক্ষুব্ধ মস্তিষ্কে; তাঁরই কঠোর একচক্ষু চিন্তার ফল হচ্ছে এই মতবাদ—এজন্য মানব-হৃদয়ে এর কোন সহজ আবেদন নেই—এ শুধু মানুষের মনকেই বিক্ষুব্ধ করে।[১২]

একই প্রবন্ধে তাঁরা বলেন যে, কম্যুনিজমও নবুয়তের মতো অন্ধভক্তি সৃষ্টি করেছে। ফলে তার পক্ষে মানব-সমাজকে পুঁজিবাদ ও উপনিবেশবাদ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হলেও আদর্শ হিসাবে তা নিখুঁত নয়।[১৩]

কিন্তু তারা চান একটি নিখুঁত আদর্শ। যে আদর্শ মানব-সমাজকে সমাধান দিতে পারে যাবতীয় সমস্যার। আশ্বাস দিতে পারে সব ধরনের অত্যাচার-অনাচার থেকে মুক্ত হওয়ার। এখানে তাঁরা আলোচনা করেন পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের কথা। প্রাবন্ধিকগণ সব ধর্মেরই সঙ্কীর্ণতার কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা নতুন বিবর্তিত আদর্শ উদ্ভাবন করেন, যা গোটা মানব সমাজকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ধারণ করবে। তাঁরা বলেন, হযরত মোহাম্মদ (সঃ) প্রবর্তিত ধর্মকে বলা হয়, মুসলমান ধর্ম। তা একপেশে। তাই তারা এই ধর্মের কালিক প্রয়োজনানুযায়ী বিবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। 'একমাত্র পথ' পুস্তিকায় তাঁরা বলেন, ঐ বিবর্তিত আদর্শের নাম হবে ইসলাম। মজলিস এই নতুন আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হবে।[১৪]

'আমাদের আদর্শের সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে তারা বলেন : আমাদের উদ্দেশ্যে হচ্ছে সুবিধে সহকারে ধর্মের বিশ্লেষণ করে সত্যে উপনীত হওয়া।[১৫]

তারা 'মুসলমান ধর্মে'র বদলে 'ইসলাম ধর্মে'র নতুন সংজ্ঞা দান করেন। তাঁদের সংজ্ঞা অনুযায়ী :

- ০ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকৃত ধর্মের বাহ্য আচারনিরপেক্ষ মৌলিক ঐক্যসূত্রই ইসলাম।
- ০ এর বাহ্যিক রূপ ও প্রয়োগ-পদ্ধতি যুগে যুগে ও দেশে দেশে পরিবর্তনশীল এবং পরিবর্ধনশীল। এজন্য বিজ্ঞানই এর প্রধান অবলম্বন এবং ইহা প্রগতিশীল। অসাম্য, অন্যায়, অত্যাচার ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে সত্যিকার মানুষ সৃষ্টি ক'রে, মানব-সমাজে প্রকৃত শান্তি আনয়নই এর লক্ষ্য।
- ০ অতএব অসাম্য, অন্যায়, অত্যাচার, হিংসা, বিদ্বেষ ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে খাঁটি মানুষ সৃষ্টির ভেতর দিয়ে মানব-সমাজে প্রকৃত শান্তি আনয়নের জন্য যে ধর্ম বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে, বিজ্ঞানকে অবলম্বন করতঃ প্রয়োগ পদ্ধতিতে পরিবর্তিত ও প্রগতিশীল রূপ গ্রহণ করেছে; তা-ই ইসলাম। অন্য কথায় যে মানব ধর্ম আদি পুরুষ আদম হতে শুরু, নিরবচ্ছিন্নভাবে মানব সমাজে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবিক, আধ্যাত্মিক—অর্থাৎ মানুষের

www.nagorikpathagar.org

সামগ্রিক সমস্যাসমূহের প্রগতিশীল সমাধান দিয়ে মানব সভ্যতাকে সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা ও পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা-ই ইসলাম।[১৬]

দেশের সামগ্রিক সমস্যার বিশ্লেষণে 'একমাত্র পথ' পুস্তিকায় তাঁরা বলেন, "মানব সমাজের বর্তমান বড়ো সমস্যা—মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্যের (Equillibrium) একান্ত অভাব। ফলে যুদ্ধ, বিপ্লব, হানাহানি ও অশান্তি লেগেই আছে।"[১৭] সমাজের ও রাষ্ট্রের এই ভারসাম্যের অভাবগুলিকে তাঁরা মোটামুটি ছয়ভাগে বিভক্ত করে দেখানোর চেষ্টা করেন। ভাগ ছ'টি হচ্ছে :

ক. জাতিতে জাতিতে ভারসাম্যের অভাব। (আন্তর্জাতিক সমস্যা)

খ. বর্ণে বর্ণে ভারসাম্যের অভাব। (সামাজিক সমস্যা)

গ. ধর্মে ধর্মে ভারসাম্যের অভাব। (সাম্প্রদায়িক সমস্যা)

ঘ. শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভারসাম্যের অভাব। (অর্থনৈতিক সমস্যা)

ঙ. আদর্শে আদর্শে ভারসাম্যের অভাব (আদর্শিক সমস্যা)

চ. অন্যান্য।

মোটামুটি এসব সমস্যাকেই তাঁরা 'প্রকৃত ইসলামের' আদর্শ দ্বারা সমাধানের কথা উল্লেখ করেন। প্রবন্ধকারগণ বলেন, তাঁদের আদর্শ হচ্ছে এসব সমস্যার সমাধানের জন্য ইসলামকে ব্যবহার করা।[১৮]

তাঁদের মতে, 'এই আদর্শের রূপদানের জন্য দরকার একদল সুশিক্ষিত, খোলাফায়ে রাশেদীনের মত বলিষ্ঠ চরিত্রের কর্মীবাহিনী। তাঁরাই রূপায়িত করতে পারেন এই আদর্শের'।[১৯] তাঁদের লক্ষ্য ছিল ঐ ধরনের একটি কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আদর্শ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে তারা সাহিত্যের একটি সংজ্ঞা দান করেন। তা হল : "আমরা সাহিত্যে সমন্বয়ী, শিল্প আর জীবনে—আর্ট শুধু আর্টের জন্য, অথবা আর্ট হবে শুধু শ্রেণীসংগ্রাম তথা আর্থিক সমস্যার রূপ দেবার জন্য—এ দুটোর কোনোটারই আমরা ভক্ত নই। আমাদের সংজ্ঞায় : সৌন্দর্য কল্পনা আর সমাজ ও ব্যক্তিমানসের শিল্পময় রসঘন প্রকাশই সাহিত্য।"[২০] অবশ্য তাঁদের রচিত সাহিত্যে এই আদর্শ পুরোপুরি অনুসৃত হয়নি।

'একমাত্র পথ' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় নবেম্বর, ১৯৪৯-এ। কিন্তু সে-সময় মসলিসের সদস্যদের কাছে এই আদর্শ বা পুস্তিকাটি প্রচারের ব্যবস্থা বড় একটা করা হয়নি। কারণ, এখানে ধর্ম-বিষয়ে যে বক্তব্য আছে, তা সকলে গ্রহণ করতে পারবেন বলে হয়তো তারা মনে করেননি। তমদ্দুন মজলিসে বিভিন্ন ধরনের কর্মীর সমাবেশ ঘটে। ঐ পুস্তিকাটিই ছিল তাদের আদর্শ। কিন্তু তমদ্দুন মজলিসের প্রথম গঠনতন্ত্রেও এ সম্পর্কে কোন কথা বলা নেই। যদিও প্রথম গঠনতন্ত্র রচিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালেই, 'একমাত্র পথ' প্রকাশের মাত্র কয়েক মাস আগে।

www.nagorikpathagar.org

৪ . আন্দোলন ও কর্মতৎপরতা

১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হলেও মজলিসের কর্মতৎপরতার ব্যাপক প্রচার ও মজলিস সম্পর্কিত খবরাখবর প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি। ১৯৪৮ সালের ১৪ নবেম্বর মজলিসের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। তখন থেকে মজলিস তার বিভিন্ন কর্মতৎপরতার সংবাদ ছাপার সুযোগ পায়।

তমদ্দুন মজলিসের কর্মতৎপরতাকে দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করলে সুবিধা হবে। প্রথম ভাগ হচ্ছে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত। দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে ১৯৫৪ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। এই দ্বিতীয় ভাগে তমদ্দুন মজলিস মোটামুটিভাবে রক্ষণশীলতাকে আশ্রয় করে দু'চারটা বৈঠক-সভা করা ছাড়া তেমন কোন বড় কাজে অংশ নিতে পারেনি এবং তার তৎপরতা হ্রাস পেতে পেতে তখন প্রায় নীরবতার পর্যায়ে চলে এসেছিল।

কিন্তু ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পরিসরেই তমদ্দুন মজলিস তার আয়ুষ্কালের উজ্জ্বল সময় অতিবাহিত করে। ১৯৫৪ সালে খেলাফতে রব্বানী পার্টির মধ্যে বড় রকমের ভাঙন লক্ষ্য করা যায়। সানাউল্লাহ নূরীর কাছ থেকে এ সম্পর্কে জানা যায় যে, তৎকালে রাজনীতিতে মজলিসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সরাসরি যোগদান অনেক মজলিস কর্মীই সমর্থন করেননি। '৫৪ সালের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ থেকেই মজলিসের মূল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভাটা পড়তে থাকে

১৯৪৭-'৫৪ পরিসরে তমদ্দুন মজলিসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে, ভাষা আন্দোলনে তাদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ।

ক) ভাষা-আন্দোলন

তমদ্দুন মজলিসের বিভিন্ন কাজের মধ্যে ভাষা আন্দোলনই ছিল সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তমদ্দুন মজলিসই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনের পথিকৃৎ। এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে বদরুদ্দীন উমর তার 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া মজলিস প্রকাশিত 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস' পুস্তিকায়ও তার পরিচয় আছে।

পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমাপ্তিকালে দেশের শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের মনে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। 'নতুন দেশে' মোটামুটি শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও ভাষাবিষয়ক বিতর্কে যাবার কোন প্রবণতা দেখা যায়নি। তখনকার দিনে পূর্ব বাংলার মানুষেরাও যেন মেনেই নিয়েছিলেন যে, 'নতুন রাষ্ট্র' পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। আর সেই সময় তমদ্দুন মজলিস কর্মীরাই প্রথম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক চিন্তায় বাংলা ভাষার দাবী উত্থাপন করেন তারাই প্রথম চিন্তা করেন যে, সঙ্গীত, সাহিত্য

www.nagorikpathagar.org

ও অন্যান্য সম্পদে সমৃদ্ধ পূর্ব বাংলার ৫ কোটি লোকের মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হবে।[২১]

সে-সময় "১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় গণতান্ত্রিক যুবলীগের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে নিম্নলিখিত ভাষাবিষয়ক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়: পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।"[২২]

এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর। আর তমদ্দুন মজলিস ভাষার দাবী নিয়েই তাদের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করে। ভাষা বিষয়ক উদ্যোগ তমদ্দুনই প্রথমে গ্রহণ করে।

১৯৪৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা-না উর্দু ?" এই নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭—১৯৮১), কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮—১৯৮৯)ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আবুল কাসেম, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে পৃথক পৃথক তিনটি প্রবন্ধ লেখেন।

ঐ পুস্তিকাতে ভাষা বিষয়ে একটি প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হয়। প্রস্তাব রচনা করেন মজলিসের আহবায়ক অধ্যাপক আবুল কাসেম। প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ:

১। বাংলা ভাষাই হবে:
  (ক) পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন।
  (খ) পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা।
  (গ) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দু'টি—উর্দু এবং বাংলা।

৩। (ক) বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাবিভাগের প্রথম ভাষা। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা একশ' জনই শিক্ষা করবেন।
  (খ) উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা। যারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকুরী ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হবেন, তাঁরাই শুধু ও ভাষা শিক্ষা করবেন। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫ হতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে।
  (গ) ইংরেজী হবে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা।

www.nagorikpathagar.org

পাকিস্তানের কর্মচারী হিসেবে যাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকুরী করবেন বা যাঁরা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন, তারাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাদের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে হাজার-করা ১ জনের চেয়ে কখনো বেশী হবে না। ঠিক এই নীতি হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে ওখানে স্থানীয় ভাষা বা উর্দু প্রথম ভাষা, বাংলা ভাষা দ্বিতীয় ভাষা, আর ইংরেজী তৃতীয় ভাষার স্থান অধিকার করবে।

৪। শাসনকার্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাততঃ কয়েক বৎসরের জন্য ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকার্য চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।[২৩]

এই পুস্তিকায় অধ্যাপক আবুল কাসেম বলেন যে, ইংরেজরা এদেশে তাদের ভাষা জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিলো। ঠিক সেভাবে উর্দু বাঙালীদের ওপর চাপিয়ে দিলে তা ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই অনুসারী হবে। তিনি বলেন, "লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কাজেই প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের স্ব স্ব প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, তা নির্ধারণ করার স্বাধীনতা দিতে হবে।"

পুস্তিকায় কাজী মোতাহার হোসেন তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, বাঙালী মুসলমানরা বাঙ্গাল বলেই নানা শ্রেণীর মানুষের শোষণের পাত্রে পরিণত হয়। তিনি বলেন, "যখন দেখি উর্দু ভাষার একটা অশ্লীল প্রেমের গান শুনেও বাঙালী সাধারণ ভদ্রলোক আল্লাহর মহিমা বর্ণিত হচ্ছে মনে করে ভাব-মাতোয়ারা; অথবা বাংলা ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতও হারাম বলে নিন্দিত, তখনই বুঝি এইসব অবোধ ভক্তি বা অবোধ নিন্দার প্রকৃত মূল্য কিছুই নাই।" তিনি বাংলা ভাষার হিন্দুয়ানীর যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, "মুসলমান বিদ্বজন পুঁথিসাহিত্যের স্থলবর্তী বাংলা সুসাহিত্য সৃষ্টি করে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় সাধন করবেন, ও তবেই মাতৃভাষা সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ হবে এবং ইসলামী ভাবধারা যথার্থভাবে জনসাধারণের প্রাণের সামগ্রী হয়ে তাদের দৈন্য এবং হীনতাবোধ দূর করবে। উর্দুর দুয়ারে ধরণা দিয়ে আমাদের কোনো কালেই লাভ হবে না।"

সেই কাল-পরিবেশে কাজী মোতাহার হোসেনের এই প্রবন্ধ বেশ জোরালো ও বলিষ্ঠ ছিল। তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন : 'ইংরেজের স্থান যেন বৈদেশিক বা অন্য কোন প্রদেশীয় লোকে দখল করে না বসে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা নিতান্তই প্রয়োজন। কুচক্রী লোকেরা যাতে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে ভাষার বাধা সৃষ্টি করে নানা অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মানসিক বিকাশে বাধা না জমাতে পারে, সে বিষয়ে নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণকে সজাগ থাকতে হবে।'

www.nagorikpathagar.org

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর, 'বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, "উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার অর্থ হবে পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের রাতারাতি 'অশিক্ষিত বানানো' এবং 'রাষ্ট্রীয়' চাকরি–বাকরিতে তাদের সুযোগ–সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা।" তবু "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা–না উর্দু?" শীর্ষক এই পুস্তিকাটির বেশী প্রচার সম্ভবপর হয়নি। তমদ্দুন মজলিসের কর্মীরা প্রথম অবস্থায় এই পুস্তিকার মর্মকথা তাঁদের বন্ধুদের মধ্যে প্রচার করার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ তাঁদের কথা বুঝলেন, কেউ কেউ বুঝলেন না। সবচেয়ে অসুবিধা হল, যাঁরা এর মর্মকথা সমর্থন করলেন, তারাও সরকারী নির্যাতন বা হস্তক্ষেপের ভয়ে এগিয়ে আসতে সাহস করলেন না।[২৪]

ঐ সময় অধ্যাপক আবুল কাসেম তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমেই বিভিন্ন স্থানে ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি সাহিত্য বৈঠকের আয়োজন করেন। তারা ছাত্রদের রুমে রুমে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ–আলোচনা করেন। দু'এক জায়গায় তারা এই আলোচনায় সার্থক হন, আর সর্বত্রই ব্যর্থ হন।[২৫]

এ ব্যর্থতা সত্ত্বেও মজলিস কর্মীরা ঐ দাবীকে আন্দোলনে রূপ দেবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। তারা সরকারী-বেসরকারী অফিসে, দেশের কবি–সাহিত্যিকদের সাথে আলোচনা করে ও অলিতে–গলিতে ঘুরে সাধারণ লোকদের কাছ থেকে সই সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এর উদ্দেশ্য ছিল: বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্টীয় ভাষা করার দাবীতে সরকারের কাছে একটি মেমোরেণ্ডাম পেশ করা। কয়েক সপ্তাহের চেষ্টায় তাঁরা ঐ মেমোরেণ্ডামের জন্য কয়েক হাজার সই সংগ্রহ করতে সমর্থ হন এবং সরকারের কাছে তা পেশ করেন। ঐ দরখাস্তে যারা সই করেছেন তাদের মধ্যে পুলিশের আইজি, ডিআইজিও ছিলেন। এছাড়া কয়েকজন মন্ত্রীও গোপনে তাঁদের এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দান করেন। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে মজলিস কর্মীরা একটি সভা করার সুযোগ পান। সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার (১৯০৬–১৯৬৬)। আর ভাষা বিষয়ে বক্তৃতা করেন কবি জসীমউদ্দীন (১৯০১–১৯৭৬), কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক আবুল কাসেম প্রমুখ।[২৬]

সে সময় ভাষা আন্দোলনের প্রশ্নে সঙ্গত কারণেই যাদের সমর্থন পাবার কথা ছিল, তারা কেউই উদ্যোগী হয়ে অথবা অনুরুদ্ধ হয়ে তা করেননি। মুসলিম লীগ এই দাবীকে মোটেই আমল দেয়নি। কংগ্রেস কর্মীরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবে আঁৎকে ওঠে। আর কম্যুনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী ছাত্র ফেডারেশন জানিয়ে দেয় যে, এই আন্দোলন সমর্থন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড মোজাফফর আহমদ ভাষার দাবী সম্বলিত স্মারকলিপিতে সই করতেও অস্বীকৃতি জানান।[২৭]

এ সময় ছাত্র লীগের মধ্যে ২টি উপদলের সৃষ্টি হয়। শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্ব অঙ্গীকার করে শামসুল হক, আজিজ আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০–১৯৭৫),

www.nagorikpathagar.org

নঈমুদ্দীন আহমদ প্রমুখ বেরিয়ে এসে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করেন। এই উপদল ভাষা আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সমর্থন জানায়।[২৮]

১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সর্বশেষ বৈঠক বসে। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, উর্দুকে পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা করা হবে না। তখন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সরকারী বাসভবন বর্ধমান হাউসে বহু সংখ্যক ছাত্র এবং কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত হয়ে অবিলম্বে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে চালু করার দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁ তাদের দাবী পূরণের আশ্বাস দিলে তারা বর্ধমান হাউস ত্যাগ করে চলে যান।[২৯]

ঐ দিনই তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে আবুল কাসেম এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীন মওলানা আকরম খাঁর (১৮৬৮—১৯৬৯) সাথে ভাষার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার পর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আবুল কাসেম বলেন, 'মওলানা আকরম খান আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের এ আশ্বাস দেন যে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষাকে চালানোর চেষ্টা করলে পূর্ব পাকিস্তান বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং তিনি নিজে সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবেন।'[৩০]

ইতিপূর্বে করাচীতে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ শেষে পূর্ব বাংলা সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার ও আবদুল হামিদ ৫ ডিসেম্বর ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দেন। সেখানে তারা বলেন যে, শিক্ষা সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ৬ ডিসেম্বরের মর্নিং নিউজে প্রকাশিত হয় যে উর্দু পাকিস্তানের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা (মতামত বিনিময়ের ভাষা) হিসাবে গৃহীত হয়েছে, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়নি। পাকিস্তানের সংবিধান সভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

শিক্ষা সম্মেলনের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর বেলা ২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও তমদ্দুন মজলিসের আহ্বায়ক অধ্যাপক আবুল কাসেম। রাষ্ট্রভাষার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই হচ্ছে সর্বপ্রথম ছাত্রসভা। এই সভায় বক্তৃতা করেন মুনীর চৌধুরী (১৯২৪-১৯৭১) আবদুর রহমান, কল্যাণ দাশগুপ্ত, এ কে এম আহসান, এস আহমদ এবং আরও অনেকে। বক্তারা ভাষা সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তারা বাংলা ভাষাকে সাংস্কৃতিক দাসত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন। তারা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের বাঙালিত্ব খর্ব করার এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার

www.nagorikpathagar.org

আহ্বান জানান। এক ঘন্টাকাল ধরে এই সভা চলে। সভাশেষে ছাত্ররা মিছিল সহকারে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে সেক্রেটারিয়েটে যায় এবং সেখানে কৃষিমন্ত্রী মুহম্মদ আফজাল ছাত্রদের সামনে ভাষার দাবী সমর্থন করে বক্তৃতা করেন। এরপর ছাত্ররা নূরুল আমিনের (১৮৯৩—১৯৭৪) বাসভবনে যায়। সেখান থেকে খাজা নাজিমুদ্দীন (১৮৯৪—১৯৬৪) ও হামিদুল হক চৌধুরীর বাসভবনে। অতঃপর তাঁরা মর্নিং নিউজ পত্রিকা অফিসে গিয়ে তাদেরকে ভাষার দাবী সমর্থন করার আহ্বান জানায়।[৩১]

এভাবে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা স্লোগান-মিছিলের ফলে মানুষের মনে ভাষার ব্যাপারটি সম্পর্কে ঔৎসুক্য জাগে এবং জনসাধারণ ক্রমশ এ ব্যাপারে সচেতন হতে থাকেন। এদিকে ভাষা আন্দোলনের উদ্বোধক তমদ্দুন মজলিস তাদের কাজ পুরোদমে চালিয়ে যেতে থাকে।

অক্টোবর মাসে ফজলুল হক হলের সাহিত্য সভার পর তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগেই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন তৎকালীন কলাভবনের গেটের পাশে রশিদ বিল্ডিং নামে একটি বাড়ি ছিল। ঐ রশিদ বিল্ডিং-এর একটি কামরায় তমদ্দুন মজলিসের অফিস ছিল। সেখানে তমদ্দুন মজলিস ও শাসসুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম ছাত্র লীগের অল্প কয়েকজন কর্মীর উপস্থিতিতে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম প্রধান কর্মী অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।[৩২]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর মনিঅর্ডার ফর্ম, ডাক টিকিট এবং মুদ্রায় শুধুমাত্র উর্দু এবং ইংরেজীর ব্যবহার দেখা যায় এবং এসব থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেয়া হয়। এতে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত জনসাধারণের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। তখন পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান (১৯০৫—১৯৬৬) উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা, আরবী হরফে বাংলা লেখা ইত্যাদির প্রস্তাব করে বক্তৃতা-বিবৃতি ও সভা-সমিতির মাধ্যমে বিতর্কের অবতারণা করেন। বস্তুত ঐ পর্যায়ে তিনি ছিলেন পাকিস্তান সরকারের বাংলা-বিরোধী নীতির অন্যতম প্রধান মুখপাত্র। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হবার পর পরই তিনি ঢাকায় আসেন। অধ্যাপক আবুল কাসেম সংগ্রাম পরিষদের আরও কয়েকজন সদস্যসহ ১৯৪৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারী মওলা সাহেবের (ফজলুল হক) নাজিরাবাজারের বাসায় গিয়ে তার সাথে দেখা করেন। আলোচনায় পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেয়া, ডাকটিকিট, মুদ্রা, মনিঅর্ডার ফর্ম ইত্যাদিতে বাংলা ভাষার স্থান না পাওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পরিশেষে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান বলেন যে, ঐসব জায়গায়, বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারটি ইচ্ছাকৃত নয়, নিতান্তই ভুলবশতঃ তা ঘটেছে। তিনি পরবর্তীতে ঐ ভুল সংশোধনের আশ্বাস দেন।[৩৩]

ফজলুর রহমানের সাথে এই আলোচনার পর ফেব্রুয়ারী মাসেই আবুল কাসেম বাংলা

www.nagorikpathagar.org

ভাষার দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপিতে সই সংগ্রহ শুরু করেন, এবং কয়েক হাজার স্বাক্ষরসহ তা সরকারের কাছে প্রেরণ করেন।[৩৪]

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহূত হয়। এই অধিবেশনে যোগদান করার জন্য পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে নূরুল আমিন, হাবিবুল্লাহ বাহার, গিয়াসুদ্দীন পাঠান প্রমুখ করাচী যাবার জন্য মনোনীত হন। তারা রওয়ানা হবার আগে অধ্যাপক আবুল কাসেম, তমদ্দুন মজলিসে রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটি ও মুসলিম ছাত্রলীগের এক প্রতিনিধিদল তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকালে তারা পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাকটিকিট, মনিঅর্ডার ফর্ম ইত্যাদিতে বাংলা ভাষা বাদ দেয়ার প্রতি গণপরিষদের উপরিউল্লিখিত প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সদস্যবৃন্দ প্রতিনিধি দলকে এ সম্পর্কে ভুল সংশোধনের আশ্বাস দেন।[৩৫]

তমদ্দুন মজলিসের ভাষা বিষয়ক আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য রেল শ্রমিক লীগ ও কেন্দ্রীয় কর্মচারী সমিতির সঙ্গে অধ্যাপক আবুল কাসেম যোগাযোগ করেন। এরা সবাই মিলে ২২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সভা করেন এবং সভা শেষে একটি মিছিল বের করা হয়। পরে গুন্ডা এসেছে— এই সংবাদে সেক্রেটারিয়েট থেকে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পরদিন ২৩ মার্চ আবার মিছিল হয়। পুলিশ মিছিলটিকে সেক্রেটারিয়েটের কাছে বাধা দেয়। কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে, লাঠি চার্জ করে ও শত শত লোককে গ্রেফতার করে। অনেককে জেলে পুরা হয়। আবার কাউকে কাউকে বাসে চড়িয়ে তেজগাঁ ও নারায়ণগঞ্জে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়।[৩৬]

প্রতিদিন আন্দোলন আরও তীব্রভাবে দানা বেঁধে ওঠে। ইতিমধ্যে খবর আসে যে, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬—১৯৪৮) ঢাকা আসছেন। আরো শোনা যায় যে, তিনি খাজা নাজিমুদ্দীনকে সব গণ্ডগোল মিটমাট করে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। এই সময়ে 'গভর্নমেন্ট দাবী মেনে নিতে রাজী' - এই মর্মে আলোচনা করার জন্য খাজা নাজিমুদ্দীন অধ্যাপক আবুল কাসেমের কাছে একটি চিঠি দেন। তিনি ঐ চিঠি সংগ্রাম পরিষদের কাছে পেশ করেন। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদ প্রথমে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পরে দাবী মেনে নেবার প্রতিশ্রুতি পাবার পর সংগ্রাম পরিষদ আলোচনায় বসতে সম্মত হয়। খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে সংগ্রাম পরিষদের দুইটি বৈঠক হয়। সংগ্রাম পরিষদ নিচের শর্তগুলি খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে পেশ করে :

১। অবিলম্বে বাংলাকে পূর্ব বঙ্গের সরকারী ভাষা, আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

২। কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্ট যাহাতে বাংলাকে স্বীকার করিয়া নেন, সেজন্য পূর্ব বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব পাস করিয়া কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের নিকট তাহা

www.nagorikpathagar.org

পাঠাইতে হইবে।

৩। ভাষা আন্দোলনের সময় যাহারা বন্দী হইয়াছেন তাহাদের বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হইবে।

৪। ভাষা আন্দোলনের সময় ইত্তেহাদ, অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইয়াছে, তাহা উঠাইয়া লইতে হইবে।

৫। ভাষা আন্দোলনে জড়িত ছিল বলিয়া কোন সরকারী কর্মচারীকে কোন রকম শাস্তি দেওয়া চলিবে না।

৬। প্রেস নোট বাহির করিয়া সরকার ঘোষণা করিবেন যে, ভাষা আন্দোলন কোন মতেই রাষ্ট্রের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত হয় নাই।

৭। ভাষা আন্দোলন দমাইবার জন্য সরকার যে কার্যক্রম লইয়াছে, তজ্জন্য প্রকাশ্যভাবে নাজিমুদ্দীন সাহেবকে ক্ষমা চাহিতে হইবে।

বাদ-প্রতিবাদের পর খাজা নাজিমুদ্দীন মাত্র ৩টি দাবী মেনে নিতে রাজী হন। ২, ৪, ৫ ও ৭ নং দাবী মেনে নিতে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ২নং দাবী সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'তা কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের এখতিয়ারের বিষয়।' ৪নং দাবী সম্পর্কে তার বক্তব্য ছিল, 'কয়েকটি পত্রিকা বন্ধ করা হয়েছে, পাকিস্তানের বিরোধিতা করছিল বলে, ভাষা আন্দোলনের জন্য নয়।' ৫নং দাবী সম্পর্কে তার মত ছিল, 'এ দাবী মানলে সরকারী কাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।' আর ৭নং দাবী সম্পর্কে তিনি বলেন, 'প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করা তার পক্ষে অবমাননাকর। কিন্তু পরিষদে দুঃখ প্রকাশ করতে তিনি রাজী আছেন।' সবগুলি দাবী মেনে না নিলে সংগ্রাম পরিষদ চুক্তিতে আসবে না বলে জানালে আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়।[৩৭]

এর কিছুদিন পর খাজা নাজিমুদ্দীন পুনরায় সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলোচনার জন্য অধ্যাপক আবুল কাসেমকে চিঠি দেন। এবারের আলোচনায়ও অনেকক্ষণ ধরে বিতর্ক চলে। অবশেষে খাজা নাজিমুদ্দীন সংগ্রাম পরিষদের দাবী মেনে নেন। চুক্তির ৮ নম্বর দফা খাজা নাজিমুদ্দীন নিজ হাতে লেখেন। সর্বসম্মত চুক্তিটি ছিল নিম্নরূপ :

১। ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হইবে।

২। পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩। ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্য যে দিন নির্ধারিত হইয়াছে, সেইদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয়

www.nagorikpathagar.org

সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪। এপ্রিল মাসের ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে, প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজী উঠিয়া যাইবার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষা রূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দান করা হইবে।

৫। আন্দোলনে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬। সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭। ২৯শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে, সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮। সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশ্‌মনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।[৩৮]

চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে আবুল কাসেম, কমরুদ্দিন আহমদ (১৯১২—১৯৮২) প্রমুখ জেলখানায় উপস্থিত হয়ে ভাষা আন্দোলনের বন্দীদেরকে চুক্তিপত্রটি দেখান। শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ চুক্তির শর্তগুলি দেখার পর তাদের অনুমোদন জ্ঞাপন করেন। পরে তাঁরা 'বর্ধমান হাউস'-এ ফিরে আসেন এবং সরকার পক্ষে খাজা নাজিমুদ্দীন ও সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কমরুদ্দিন আহমদ চুক্তিতে সই করেন।[৩৯]

১৯ মার্চ, ১৯৪৮ বিকালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তেজগাঁ বিমান বন্দরে পৌছেন। হাজার হাজার লোক তাঁকে সংবর্ধনা দানের জন্য প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু ভাষা আন্দোলন বিষয়ে পুলিশী নির্যাতনের ফলে ছাত্রদের মধ্যে তার এই সফরে উৎসাহ কম দেখা যায়। ২১ মার্চ বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে তিনি রেসকোর্স মঞ্চে উপস্থিত হয়ে (মানপত্রাদি পাঠ শেষে) বক্তৃতা শুরু করেন। বক্তৃতায় তিনি ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন। তিনি ভাষা আন্দোলনকারীদের 'বিদেশী এজেন্ট' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, বিদেশী অর্থসাহায্যপুষ্ট এক শ্রেণীর লোক এটা করাচ্ছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যুক্তি দিয়ে বলেন :

> আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদেরকে জানাতে চাই যে, আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে কোন রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হবে—এ কথার মধ্যে কোন সত্যতা নেই। আপনারা, এই প্রদেশের অধিবাসীরাই, চূড়ান্তভাবে স্থির করবেন, আপনাদের প্রদেশের ভাষা কী হবে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু একথা আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া দরকার যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এবং অন্য কোন ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, তাহলে বুঝতে হবে, সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু। একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোন জাতিই এক সূত্রেগ্রথিত হয়ে কার্যনির্বাহ করতে পারে না। অন্য দেশের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অতএব, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।[৪০]

২৪ মার্চ (১৯৪৮) বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সম্মানে এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সময়ের অভাবের জন্য তিনি সেখানে মৌখিক বক্তৃতা দেন। তিনি ভাষা আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে তার দৃষ্টিতে রাষ্ট্রশত্রুদের গালাগাল ও সতর্ক করেন। পরে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে ঐ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন যে, এদেশের লোক প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে কোন্ ভাষা বেছে নেবেন, তা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা যথাসময়ে স্থির করবেন। কিন্তু—

রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগের ভাষা হিসাবে একটি ভাষা থাকবে। এবং সে ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়। কাজেই স্বাভাবিকভাবে রাষ্টভাষা হবে উর্দু, যা এই উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে, যা পাকিস্তানের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সকলেই বোঝে এবং সর্বোপরি যার মধ্যে অন্য যে কোন প্রাদেশিক ভাষা থেকে ইসলামী সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বেশী বাস্তব রূপ লাভ করেছে এবং যে ভাষা অন্যান্য ইসলামী দেশগুলিতে ব্যবহৃত ভাষার সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি।[৪১]

জিন্নাহর বক্তৃতার এই পর্যায়ে হলের মধ্যকার বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র 'না, না' বলে চীৎকার করতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মতিন, এ কে এম আহসান প্রমুখ। ছাত্রদের মধ্যে আগে থেকেই এর প্রস্তুতি ছিল।

২৪ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের এক প্রতিনিধিদলকে চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের বাসভবনে সাক্ষাৎ দান করেন। ঐ সাক্ষাতের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন শামসুল হক, কমরুদ্দিন আহমদ, আবুল কাসেম, তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫—১৯৭৫), মোহাম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, নঈমুদ্দীন আহমদ, শামসুল আলম ও নজরুল ইসলাম। আলোচনার শুরুতেই জিন্নাহ পরিষদকে বলেন যে, নাজিমুদ্দীনের সাথে তাদের যে চুক্তি হয়েছে, তিনি সেটা মানেন না। কারণ, তিনি বলেন, নাজিমুদ্দীনের কাছ থেকে জোর করে ঐ চুক্তিতে সই নেয়া হয়। এ সময় মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, প্রমুখের সাথে মিঃ জিন্নাহর তুমুল বিতণ্ডা হয়।[৪২]

এই সাক্ষাৎকারের সময় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, বাংলাভাষার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শব্দ

www.nagorikpathagar.org

আরবী-ফারসী ভাষা থেকে নেয়া এবং সুলতান হুসেন শাহ্ বাংলাভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁরা এই ভাষায় কয়েকজন মুসলমান কবির অবদানের কথা উল্লেখ করেন।[৪৩]

জিন্নাহর ভাষা বিষয়ে এইসব অগণতান্ত্রিক অযৌক্তিক উক্তির পরও তার জন-সমর্থনে কোন বিরাট পরিবর্তন হয়নি বলেই মনে হয়। ফলে ভাষা আন্দোলন তখন ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। এ অবস্থায় ভাষা আন্দোলনের উদোক্তাদের মধ্যে একটা হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা ত্যাগের পর রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে আন্দোলনের পর্যালোচনাকালে ছাত্রলীগ এবং তমদ্দুন মজলিসের সদস্যরা স্ব স্ব সংগঠনের কৃতিত্বের ওপর জোর দেবার চেষ্টা করেন। তমদ্দুন মজলিস আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে বিশেষত তা যখন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মার্চের প্রথম দিক থেকে আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করলে তাতে তমদ্দুন মজলিসের গুরুত্ব এবং তাদের নেতৃত্বের প্রভাব কমে আসে। এর পরবর্তী পর্যায়ে গণতান্ত্রিক যুবলীগের কর্মীবৃন্দ, মুসলিম ছাত্রলীগ, এবং সাধারণ ছাত্র সমাজই আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আন্দোলনের সময় তমদ্দুন মজলিসের শামসুল আলম ও মুসলিম ছাত্রলীগের নঈমুদ্দীন আহমদ যৌথভাবে রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদের আহ্বায়কের কাজ করেন। এই দুইজনের মধ্যে শামসুল আলমের কাছেই পরিষদের খাতাপত্র ও অন্যান্য রেকর্ড থাকত। কর্ম পরিষদের একই বৈঠকে শামসুল আলম আহ্বায়কের পদ থেকে ইস্তফা দেন। কারণ, তাঁর মতে, আন্দোলন এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, যাতে করে সত্যিকার কিছু করার জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন কর্ম পরিষদ। পুরাতন কর্ম পরিষদ, তাঁর মতে, সেদিক থেকে ছিল সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।[৪৪]

ভাষা আন্দোলনে এই ছিল তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা। তা ছাড়া মফস্বলেও তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি স্থানেও তমদ্দুন মজলিস সভা-সমিতি করে।

এ সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর তাঁর "পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি" গ্রন্থে লিখেছেন:

> ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলা ভাষার দাবীতে প্রথম সংগ্রাম পরিষদ তাদের উদ্যোগেই গঠিত হয়। আন্দোলনের সাংগঠনিক দিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখার ফলে ভাষা আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক আলোচনা ক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তীর্ণ করার ব্যাপারে তাদের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

তমদ্দুন মজলিসের এই ভূমিকার জন্য বাংলা ভাষা আন্দোলনের বিরোধী সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রগুলিতে সে সময় তাদের বিরূপ সমালোচনা করা হয়। এই পত্র-

www.nagorikpathagar.org

পত্রিকাগুলির মধ্যে 'মর্নিং নিউজ', 'পাসবান', সিলেটের 'আসাম হেরাল্ড', 'যুগভেরী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৪৫]

ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা সম্বন্ধে অধ্যাপক কাজী এ কামরুজ্জামান লিখেছেন :

> লক্ষ্য করেছি কাসেম সাহেব ও তমদ্দুন মজলিসের প্রচেষ্টায় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন; দেখেছি মহান কায়দে আযম থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক ও ছাত্রসমাজের দ্বারে দ্বারে তমদ্দুন মজলিস ও কাসেম সাহেবকে ধরনা দিতে; দেখেছি বলতে : 'আমাদের ন্যায্য দাবী মেনে নিন, কোটি কোটি লোকের মাতৃভাষাকে অগ্রাহ্য করবেন না। সভায়, সমিতিতে, কথায়–বার্তায়, গল্পে–প্রবন্ধে সবদিক থেকে সেদিন আমাদের অন্তরের দাবীর যে চাক্ষুস রূপ ক্রমান্বয়ে ফুটে উঠেছিলো তার পেছনে সেদিনের প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন কাসেম সাহেব ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত তমদ্দুন মজলিস।[৪৬]

ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানে মজলিসের কর্মীরা গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু ভাষা আন্দোলন যখন পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়, তখন আর তমদ্দুন মজলিসের অতিরিক্ত কিছু করার ছিল না।[৪৭]

খ) সাহিত্য–সংস্কৃতি আন্দোলন

তমদ্দুন মজলিসের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'সৈনিক' প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালের ১৪ নবেম্বর। এই পত্রিকার মাধ্যমেই তমদ্দুন মজলিসের কার্যাবলীর বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯৪৮ সালে যখন সদ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন কেবল দলীয় রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত, তখন তমদ্দুন মজলিস নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী দূরদর্শী সাংস্কৃতিক উদ্যোগের চিন্তায় ও কর্মে আত্মনিয়োগ করে। তারা প্রথম যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উদ্বোধন করেন, তা হচ্ছে ভাষা আন্দোলন। একই সাথে তমদ্দুন মজলিস দেশের বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয়ে আলোচনা ও সভা–সমিতির আয়োজন করতে থাকে।

তমদ্দুন মজলিসের সাপ্তাহিক মুখপাত্র সৈনিকের ১ম সংখ্যায়ই মজলিসের সাহিত্য–সভার একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেন মজলিসের তৎকালীন সাহিত্য সম্পাদক সানাউল্লাহ্ নূরী। বক্তব্য ছিলো ঃ

> "এখন থেকে প্রতি শুক্রবারের বেলা পাঁচটা থেকে নিয়মিতভাবে সৈনিক অফিসে তমদ্দুন মজলিসের সাপ্তাহিক সাহিত্য–সভা বসবে। আমরা এসব সাহিত্য–সভায় আজকের সাহিত্যের বিভিন্ন দিক এবং সমাজ রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আসছে শুক্রবারের আলোচ্য বিষয় – 'জাতি গঠনে সংবাপত্রের

www.nagorikpathagar.org

স্থান'। আশা করি এ বিষয়ে উৎসাহী ও উৎসুক কর্মী ও সাহিত্যিকরা অংশগ্রহণ করবেন।"

৪ মার্চ, ১৯৪৯–এ সৈনিক অফিসে তমদ্দুন মজলিসের একটি সাহিত্য–সভা আনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রফেসর ফেরদাউস খান এমএসসি "বাংলা লিপি সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫–১৯৬৯) পড়েন "বাংলা শিখিবার সহজ উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রবন্ধে 'বাংলাদেশের জমাট নিরক্ষরতা দূর করার জন্য' ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'সোজা বাংলা'র এক অদ্ভুত প্রস্তাব পেশ করেন। তাতে কোন অনাবশ্যক অক্ষর না রাখার প্রস্তাব করা হয়। অনাবশ্যক অক্ষরগুলোর মধ্যে স্বরবর্ণ আছে : ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও। তাছাড়া ব্যঞ্জন বর্ণও সংক্ষিপ্ত করার কথা বলা হয়। এতে মোট ব্যঞ্জন বর্ণ দাঁড়ায় ৩১টিতে।

ক খ গ ঘ।	চ ছ জ ঝ।	ট ঠ ড ঢ।
ত থ দ ধ।	প ফ ব ভ।	ড় ঢ় ন ম।
য় র ল।	শ হ য স।	

এই বর্ণহ্রাস পদ্ধতিতে "দেখিয়া তাহার লোভ হইল" বাক্যাংশটি দাঁড়াতো : "দখীয়া তাহার লীভ হঈল"।

পরে তমদ্দুন মজলিস লিপির সংস্কার সাধন করে এ ধরনের লিপিমালা ও লেখন পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মজলিসের অধ্যাপক আবুল কাসেম লিপি সংস্কারের এই চেষ্টায় অন্যান্য মজলিস কর্মীদের কাছ থেকে কোনরূপ সহযোগিতা পাননি।

দশম সংখ্যা (১ম বর্ষ) সৈনিকে মজলিসের রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞান শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা সভার খবর ছাপা হয়। ঐ আলোচনা সভায় "অতি আধুনিক কুসংস্কার" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধটি পাঠ করেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (১৯২০—১৯৭১)। প্রবন্ধটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন :

> বিচারের অভাব, Fear of Freedom এবং কনভার্টেড হয়ে যাওয়ার ভয় থেকেই কুসংস্কারের জন্ম। মুক্তবুদ্ধির চর্চা ছেড়ে আমরা যখন প্রচলিত বিশ্বাস ও মতবাদ দ্বারাই পরিচালিত হই, তখনই আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের পরিচয় দেই। কিন্তু বিচার করে যদি একটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তেও আসা যায়, তাও কুসংস্কার নয়। বিচারের অভাব যেখানে, সেখানেই কুসংস্কার। মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ভয় পায়। ভগবান যে আছেন, তা কেউ যুক্তিবিচার করে দেখতে চায় না, কারণ শেষে যদি নাস্তিকতায় বিশ্বাসী হয়ে যেতে হয়। অতি আধুনিক কুসংস্কারগুলির উৎস মূলত এই অন্ধ বিশ্বাসেই। Technology মানুষের সমাজ জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে–এ বিশ্বাস আজকের মানুষের বিশেষ একটা অংশের মনে শিকড় গেড়ে বসেছে। কিন্তু এ বিশ্বাসের পিছনে

www.nagorikpathagar.org

> একটা একচোখা ব্যাখ্যা ছাড়া সত্যিকার কোন বিচার নাই। একচোখা যুক্তিবাদের জন্যই আধুনিক সমাজ জীবনে সম্ভব হয়েছে কতকগুলো আতিশয্যমূলক মতবাদের। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই আতিশয্যের একদিকে আছে এনাটিজম, অন্যদিকে আছে State God-এর ধারণা। অপর পক্ষে অর্থনীতিই মানুষের জীবনের সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ-বিধাতা। রাশিয়ার এই নিয়ন্ত্রণবাদও যেমন একটা আতিশয্য, তেমনি রাশিয়ার সব কিছু মন্দ, তাও একটা আতিশয্য। মতবাদের ক্ষেত্রে এইসব একপেশেমি প্রচার বুদ্ধিবৃত্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার একটা কৌশল মাত্র। জীবন যখন নতুনত্ববোধ হারিয়ে ফেলে, তখনই সেখানে জন্ম নেয় গোঁড়ামি। আর এই গোঁড়ামি সংস্কারের সূতিকাগার।

সে-সময় সৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শাহেদ আলী (জ. ১৯২৫)। ঐ অনুষ্ঠানে জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার প্রবন্ধের আলোচনা কালে শাহেদ আলী বলেন : '...মুক্তবুদ্ধিই হলো কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অস্ত্র। কম্যুনিস্টরা মনে করে, তাঁদের মতবাদই সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক। কিন্তু আধুনিকতার সঙ্গে বিজ্ঞানের সত্যিকার কোন সম্বন্ধ নেই। .. তাঁরা মানুষকে দেখেন শুধু একটা জড় পিণ্ড রূপে। আর এই জড় জীবনে যা প্রয়োজন তাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে তাঁদের সমস্ত মতবাদ ও সমাজব্যবস্থা। কিন্তু মানুষ শুধু কতকগুলি জড়কণার সমষ্টি মাত্র নয়। তার মধ্যে জড়াতীত একটা মহাশক্তির ক্রিয়াও রয়েছে। ইসলাম এই মহাশক্তিটাকে স্বীকার করে নিয়ে মানুষকে দেখেছে সেই মহাশক্তির উত্তরাধিকারীরূপে। ইসলামের এই পরিপূর্ণ মানুষটির জন্যই তার কোরানের আত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। ... মুক্তবুদ্ধির চর্চার অভাবেই মানুষ হয়ে উঠে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ডেকে আনে জীবনে অকল্যাণ, অসত্য। কোরান জেহাদ ঘোষণা করেছে এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। বুদ্ধির মুক্তির দিয়েছে শাণিত নির্দেশ। কুসংস্কারমুক্ত মন নিয়ে হাজির হলে এই কোরানেই পাওয়া যাবে আজকের এই পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান, কম্যুনিজমে নয়।'

একই আলোচনা সভায় তমদ্দুন মজলিসের আহ্বায়ক অধ্যাপক আবুল কাসেমও বক্তব্য রাখেন। 'অতি আধুনিক কুসংস্কার' সম্বন্ধে তিনি বলেন :

> অতি আধুনিক কুসংস্কারের উৎসমূল খুঁজতে হবে অতি আধুনিক মতবাদগুলিতে। বস্তুত অতি আধুনিক মতবাদগুলিতেই রয়েছে অতি আধুনিক কুসংস্কারের বীজ। পাশ্চাত্য জড়বাদ, হেগেলের ডায়লেকটিকস এবং মার্কসের জড় দ্বন্দ্ববাদ এগুলিই হল অতি আধুনিক মতবাদ।"[৪৮]

১৯৪৯ সালের ২৬ ও ২৭ মার্চ তমদ্দুন মজলিসের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। ঢাকার মজলিস কর্মীরা ছাড়াও চাটগাঁ, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর প্রভৃতি এলাকা থেকে ঐ সম্মেলনে প্রতিনিধিরা যোগদান করে। সেখানে সম্পাদকের যে রিপোর্ট পাঠ করা হয়, তাতে দাবী করা হয়ঃ "ঢাকার শিল্প-সাহিত্য প্রধানতঃ তমদ্দুন মজলিসই জিইয়ে

www.nagorikpathagar.org

রেখেছে।" নিষ্কলুষ মন নিয়ে যখনই কোন প্রতিষ্ঠান প্রগতিশীল আন্দোলনে এগিয়ে এসেছে, মজলিস তাকেই অভিনন্দন জানিয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

এই অধিবেশনে মজলিস-কর্মী শাহেদ আলী বলেন :

> একমাত্র ইসলামকেই বিশ্বজনীন ধর্ম বা মতবাদ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু সে ইসলাম পুরাতন কস্তাবন্দী ইসলাম নয়। কারণ ইসলাম গতিশীল (Dynamic)— মূল লক্ষ্যকে ঠিক রেখে বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন উপযোগী প্রয়োগ-পদ্ধতি বদলানোই ইহার প্রকৃতি। (সৈনিক, ১ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা)

এ ছাড়া তমদ্দুন মজলিস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহিত্যিকের জন্ম-মৃত্যু দিবস পালনের ব্যবস্থা করে। ১৯৪৯ সালের ১৭ জুন সংখ্যা সৈনিকের একটি সংবাদে জানা যায়, মজলিস ফজলুল হক হলে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) জন্ম-জয়ন্তীর আয়োজন করে। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)। সভায় কবি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে ৩টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় :

১। এই সভা প্রস্তাব করছে যে অসুস্থ কবি নজরুলের সাহায্যের জন্য পাকিস্তান সরকার যেনো অবিলম্বে ৩০০/- টাকা মাসিক ভাতা মঞ্জুর করেন।

২। এই সভা অসুস্থ কবির চিকিৎসার জন্য ও তার সমগ্র পরিবারের ব্যয়ভার বহন ও সমস্ত বই প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য পাকিস্তান সরকারের কাছে দাবী করছে।

৩। এই সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির বিভিন্ন গ্রন্থ বিভিন্ন ক্লাসে পাঠ্য করার অনুরোধ জানাচ্ছে।

সাহিত্য সম্পর্কে তমদ্দুন মজলিসের ধারণার ওপর 'আদর্শ, উদ্দেশ্যে, কর্মসূচী', অনুচ্ছেদে আলোকপাত করা হয়েছে। সাহিত্যকে আসলে তাঁরা তাদের মতবাদ প্রচারের বাহক হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তাঁরা যেহেতু সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি সব কিছুরই ইসলামী সমাধান দেয়ার চেষ্টা করতেন, তাই তাদের সাহিত্য সেই লক্ষ্যে নিয়োজিত ছিল।

'সৈনিক' পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর তরুণদের মধ্যে অনেকেই উৎসাহী হন এবং সৈনিক অফিসে যাতায়াত শুরু করেন। এবং তাঁরা মজলিসের সাথেও সংশ্লিষ্ট হন।

এসময় দেশের বিভিন্ন এলাকায় তমদ্দুন মজলিসের শাখা গঠিত হয়। সৈনিকে তার বিবরণ ছাপা হয়েছে। তাছাড়া মজলিস এসময় নানা স্থানে সভা-সমিতিরও আয়োজন করে। ঢাকায়ও তাঁরা বিভিন্ন সভা-সমিতি ও সৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সাহায্যে তাদের সাহিত্য-উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এ সময়ে তাদের সাহিত্য চিন্তা কীভাবে ধর্মকেন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

'আজকের সাহিত্যিকদের কর্তব্য' এই শিরোনামে অধ্যাপক আবু রুশদ (জ. ১৯১৯) আজাদী দিবস সংখ্যা সৈনিকে একটি নীতি-নির্ধারণী প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বলেন :

> ...সাম্প্রতিকের ধূয়া আমরা আর নাই বা তুললাম। কারণ, যা কিছু সাম্প্রতিক, তাই আধুনিক নয়। আপনারা নিজেরাও হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, এই এ্যাটম বোমার যুগেও এমন অনেক কিছু ঘটে, যা মধ্যযুগের লোককেও হয়তো লজ্জার কালিমা পরিয়ে দিতো।...
>
> সব সময় অবশ্য সাবধান থাকতে হবে, যেনো আমার দেখাটা কুয়াশাচ্ছন্ন মনের দেখা না হয়। যা ক্ষণিক এবং ক্ষণভঙ্গুর তাকে যেনো আমরা সমগ্রতার সৌন্দর্য না দিই। আধুনিক উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্যের প্রধান ব্যর্থতা, আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, এইখানে। মন্বন্তর এবং দাঙ্গা নিয়ে, আপনারা জানেন, অনেক লেখা ব্যাঙের ছাতার মতো জাগে। তবে সেসব লেখার সাহিত্যিক মূল্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যাঙের ছাতার মত বেশী নয়। এমন হয় কেন? এর উত্তর দেয়া সহজ। আমাদের লেখক সমাজে বলতে গেলে এমন কেউ নেই, যার মন্বন্তর এবং দাঙ্গার প্রত্যক্ষ ও নিবিড় আবেগোষ্ণ অভিজ্ঞতা আছে। বাইর থেকে মন্বন্তরের জ্বালা বা দাঙ্গার বিভীষিকা বুঝবার চেষ্টা করা সৌখিন বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই মন্বন্তরের দুই একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে মহাকাব্যের মর্যাদা দিয়ে আমরা একাধারে নিজেকে ও পাঠককে প্রতারিত করি।
>
> আমার বলার দাঙ্গা বা মন্বন্তর নিয়ে সাহিত্য রচিত না হলেই যে প্রগতির সর্বনাশ হল, যাঁরা বলেন, তাঁরা সাহিত্যিকদের ষ্টালিনী শাসনের নির্মমচক্রে ফেলে দিতে চান। প্রগতির চাকাকে যারা ধরা-বাঁধা নিয়মের প্যাঁচে আটকে রাখতে চান, উদ্দেশ্য তাদের মহৎ হলেও তারা, দুঃখের সঙ্গে আমাকে একথা বলতেই হবে, প্রগতির মর্ম ঠিক বোঝেননি।[৪৯]

সাহিত্য বিষয়ক লেখা ছাড়াও মজলিস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহিত্য-বৈঠকের আয়োজন করে। সেখানে সাহিত্যিকদের উৎসাহ দেবার চেষ্টা করা হয়।

<u>গ) অন্যান্য</u>

তমদ্দুন মজলিস কর্মীদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মীদের জন্য তাঁবু জীবনের আয়োজন করে। এতে কর্মীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা ও স্বাবলম্বী হবার মানসিকতা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

সমাজ সেবায়ও তমদ্দুন মজলিস অংশ গ্রহণ করে। ১৯৫০ সালের প্রথমার্ধে দেশে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, তমদ্দুন মজলিস ও তাদের মুখপত্র 'সৈনিক' পত্রিকা তখন

www.nagorikpathagar.org

এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে কর্মসূচী গ্রহণ করে ও দাঙ্গার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।

ঢাকা শহরে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে কয়েকটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রও চালু করা হয়।

৫. প্রকাশনা

১৯৪৮ থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম প্রধান অবদান হল তার প্রকাশনা। অধ্যাপক আবুল কাসেম ও অন্যরা তমদ্দুন মজলিসের মতাদর্শ বিষয়ক রচনা ছাড়াও বহু বিজ্ঞান-গ্রন্থ অনুবাদ করে তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে প্রকাশ করেন। বাংলা প্রচলনের ঐ যুগে তার প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য। তমদ্দুন মজলিস আনুমানিক পাঁচ শ'য়েরও অধিক সংখ্যক পুস্তক প্রকাশ করেছে।

৬. নেতৃত্ব, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

১৯৪৮ সালে তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হলেও ৭/৮ বছরের কর্মতৎপরতায় তার নেতৃত্বে বিরাট কোন পরিবর্তন হয়নি। এই সবটা সময়ই মজলিসের নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। কখনও কখন অবশ্য নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বরাবর তিনিই মজলিসের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

মজলিসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা কম নয়। তাঁরা এর নিয়ন্তা ছিলেন না, কিন্তু খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। এদের মধ্যে ছিলেন শাহেদ আলী, অধ্যাপক আবদুল গফুর, হাসান ইকবাল, সানাউল্লাহ নূরী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া, আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-৯১), বদরুদ্দীন উমর, এনামুল হক, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (জ. ১৯০৬), আজিজুর রহমান, এ কে এম আহসান প্রমুখ। এরা তমদ্দুন মজলিসের আয়ুষ্কালের সবটাতে অথবা আংশিক সময়ে জড়িত ছিলেন। এরা সবাই সমাজে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত।

তমদ্দুন মজলিসের সাপ্তাহিক সৈনিক ও মাসিক দ্যুতি পত্রিকার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাদের মধ্যেও অনেকে তমদ্দুন মজলিসের নীতি আদর্শের সমর্থক ও কর্মী ছিলেন। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (জ. ১৯৩৬), মোস্তফা কামাল, আনোয়ারউদ্দিন, ফেরদৌসী বেগম, মাহফুজুল হক, তালুকদার মনিরুজ্জামান প্রমুখ ছিলেন এমনি কর্মী। শিক্ষিত যুব সমাজে ও ছাত্র সমাজে মজলিসের বেশ কিছু কর্মী ছিলেন। তবে ছাত্র ও যুব-সমাজে মজলিস জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। 'পাকিস্তান ছাত্র শক্তি' নামক সংগঠনে মজলিসের ছাত্র-কর্মীরা কাজ করতেন। ছাত্র শক্তি কিছু দিনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাবশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। ছাত্র শক্তির ওপর 'খিলাফতে রব্বানী' নামক

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক দলের এবং ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বেঙ্গল মুসলিম লীগের এক-কালের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের প্রভাব ছিল।

৭. সৈনিক, দ্যুতি

তমদ্দুন মজলিস বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে। তমদ্দুন মজলিস তার সাপ্তাহিক মুখপত্র সৈনিক প্রকাশ করে ১৯৪৮ সালের ১৪ নবেম্বর। প্রথম সংখ্যায় এর সম্পাদক হিসাবে শাহেদ আলী ও এনামুল হকের নাম ছাপা হয়। তারপর '৫৭ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। তা ছাড়া প্রকাশক হিসাবেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ছাপা হয়। বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত সৈনিকের যে কপি পাওয়া গেছে, তার সর্বশেষ সংখ্যার তারিখ ১৭ই অক্টোবর, ১৯৫৭। তারপরও কয়েক সংখ্যা সৈনিক প্রকাশতি হয়েছে। কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। আবার ১৯৭০ সালেও কয়েক সংখ্যা সৈনিক প্রকাশিত হয়; তারও কোন কপি সংশ্লিষ্ট কারও কাছে পাওয়া যায়নি।

১৯৪৮ সালের প্রকাশ-লগ্ন থেকেই সৈনিক তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধিতার নীতি নিয়ে কাজ শুরু করে। এই পত্রিকা বিভিন্ন সময়ে সরকারের গণবিরোধী সিদ্ধান্ত ও নীতি-নিয়মের কঠোর সমালোচনা করে। এবং এক পর্যায়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সৈনিক পত্রিকাতে সরকার-বিরোধী কিছু না ছাপার নির্দেশ দেয়। তৎকালীন 'আজাদ' মুসলিম লীগের কাগজ ছিল। আজাদে সৈনিকের বিরুদ্ধে নানা কথা লেখা হয়। যখন দেশে মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য কোন দল ছিল না, তখন সৈনিক পত্রিকা বিরোধী মতের মুখপত্রের ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া সৈনিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হত। যেমন স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, নজরুল দিবস সংখ্যা, কায়দে আযম সংখ্যা, উমর দিবস সংখ্যা, দুর্নীতি বিরোধী সংখ্যা প্রভৃতি। সর্বোপরি ভাষা আন্দোলনে সৈনিক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। সৈনিকে মজলিসের নিজস্ব লোকেরাই বেশী লিখতেন। মজলিসের নীতি আদর্শ অনুযায়ী লেখাই সৈনিকে স্থান পেত। ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সৈনিকের ভূমিকা খুবই বলিষ্ঠ ছিল।

দ্যুতি

দ্যুতি ছিল সাহিত্য পত্রিকা। '৫২-থেকে '৫৪ সাল পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেনঃ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। কিন্তু 'দ্যুতি' কোন সাহিত্য আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেনি। দ্যুতির প্রথম সম্পাদক ছিলেন ওবায়েদ আসকার অর্থাৎ আসকার ইবনে শাইখ (জ. ১৯২৫) পরে সহযোগিতায় ছিলেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও চৌধুরী লুৎফর রহমান।

www.nagorikpathagar.org

৮. অবলুপ্তি

১৯৫৪ সালের পরই তমদ্দুন মজলিসের আন্দোলনে ভাটা পড়ে। '৫৪ সালে মজলিস কর্মীরা খিলাফতে রব্বানী পার্টির নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তখন খিলাফতে রব্বানী পার্টির নেতা ছিলেন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ আবুল হাশিম। কিন্তু এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে মজলিস কর্মীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। তমদ্দুন মজলিসের মূল উদ্দেশ্যের তা ক্ষতি করবে বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। কিন্তু মজলিসের প্রধান কর্মকর্তা অধ্যাপক আবুল কাসেম নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে অনমনীয় থাকলে মজলিস আবুল হাশিমের নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশ নেয়। আর রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ার জন্য মূল সাংস্কৃতিক আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়তে থাকে এবং এক সময় তমদ্দুন মজলিস কেবল কাগুজে সংগঠনে পরিণত হয়।

তমদ্দুন মজলিসের আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং সৈনিক পত্রিকার এককালীন সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল গফুর ১৯৭৪ সালে এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেন, "না, তমদ্দুন মজলিস তো এখনও আছে।"

১৯৫৪ সালের পর থেকেই মজলিস ক্রমশ ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে থাকে। ফলে মজলিসে আগত তরুণ কর্মীরা তমদ্দুন মজলিস সম্পর্কে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। ১৯৬০ সালের পর মজলিস পুরোপুরি একটি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, এবং এ সময় মজলিসের রক্ষণশীল রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। ফলে তরুণ কর্মীদের আগমনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। মজলিসে তখন দরকার ছিল নতুন কর্মী। কিন্তু তা পাওয়া যায়নি। এতে মজলিসের কর্মতৎপরতা আর অগ্রসর হতে পারেনি।[৫০]

মজলিসে সে সময় প্রায় নিয়মিত আত্মসমালোচনার ক্লাস বসত। মজলিস কর্মীরা একে অপরের বিভিন্ন ধরনের দোষ ধরিয়ে দিতেন ও তা নিয়ে আলোচনা হত। কিন্তু শেষের দিকে অধ্যাপক আবুল কাসেম এসব সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না। ফলে ঐ আত্মসমালোচনার ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়। এই সভাগুলোর পদ্ধতি বেশ গণতান্ত্রিক ছিল। তাতে নতুন কর্মীর অন্তর্ভুক্তি সম্ভব ছিল। কিন্তু অধ্যাপক আবুল কাসেম ক্রমশ সমালোচনা—অসহিষ্ণু হয়ে পড়ায় নবীনদের আসা যেমন বন্ধ হতে থাকে, তেমনি প্রবীণরাও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়তে থাকেন।[৫১]

'লিপি-সংস্কার' নিয়েও তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবুল কাসেমের সঙ্গে মজলিসের অন্যান্য কর্মীর বিরোধ হয়। অধ্যাপক আবুল কাসেম বাংলা বর্ণমালাকে সংক্ষিপ্তকরণ এবং এ-কার ই-কার-এর অদ্ভুত ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। (যেমন ঃ 'বাড়িতে' শব্দটিকে তিনি লেখার প্রস্তাব করেন 'বাড়তি' এভাবে 'লবিতি'।) এসব প্রস্তাব নিয়েও অন্যান্য মজলিস কর্মীর সঙ্গে তার মতভেদ বাড়ে। অপরদিকে মার্কসীয় দর্শনের প্রভাবে এবং রুশ-চীন সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্থাপনের ফলে পূর্ব

www.nagorikpathagar.org

বাংলার শিক্ষিত তরুণদের ও ছাত্রদের মধ্যে নতুন বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত হয় এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার ও স্বাধীনতার চেতনা প্রখর হয়ে উঠে। নতুন আদর্শ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন দল শক্তিশালী হয়ে উঠে। মজলিসের প্রতি তখন সকলের আগ্রহ নিঃশেষ হয়ে যায়।

এসব কারণে ১৯৬৫ সালের দিকে তমদ্দুন মজলিস একবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে থাকেন আবুল কাসেম, অপর দিকে তমদ্দুন মজলিসের অন্য কর্মীরা।[৫২] তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠার পেছনে অধ্যাপক আবুল কাসেমের দান যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি এই প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তির পেছনেও তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না বলে মজলিসের কর্মীদের অনেকে উল্লেখ করেন।

তমদ্দুন মজলিসের এইসব অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা ছাড়াও মজলিসের আন্দোলনে ভাটা পড়ার পেছনে সমাজ-পরিবেশগত কারণও ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যুগ বদলের সাথে সাথে মানুষের মন থেকে কম্যুনিস্টভীতি ক্রমশ অপসারিত হচ্ছিল, নতুন মতাদর্শগত আন্দোলন তৈরী হচ্ছিল, সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি তরুণ সমাজ আকৃষ্ট হচ্ছিল। ফলে মজলিসের 'ইসলামের ডাক' ও 'একমাত্র পথ' আর আগের মত আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। এ কারণেও মজলিস শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৯. উপসংহার

১৯৪৭ সালে দেশের সাংস্কৃতিক শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে গঠিত তমদ্দুন মজলিস অবশ্যই সচেতন ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু ধর্ম-ভিত্তিক রক্ষণশীল মতাদর্শ যদি ক্রমশ এর ভেতর এতটা তীব্রভাবে প্রবেশ না করত, যদি কালিক প্রয়োজন অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি গণতান্ত্রিক ও গতিশীল ভূমিকা নিতে প্যারত, তবে আজও পর্যন্ত দেশের সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটান মজলিসের পক্ষে হয়ত সম্ভব হত। তবু, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনে মজলিসের ভূমিকার কথা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

(এই লেখার যে-সব ক্ষেত্রে তথ্য-নির্দেশের ক্রমিক নম্বর প্যারার শেষে সন্নিবেশিত, সে-সব ক্ষেত্রে পুরো প্যারার তথ্যই একই সূত্র থেকে প্রাপ্ত। সাক্ষাৎকারগুলো '৭৪-'৭৫ সালে কয়েক দফায় গ্রহণ করা হয়।

১. অধ্যাপক আবুল কাসেম, সানাউল্লাহ নূরী, অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া, অধ্যাপক আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার

২. অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া, আবুল কাসেম, আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার

www.nagorikpathagar.org

৩. আবুল কাসেম, সানাউল্লাহ্ নূরী, সাক্ষাৎকার, ১৩ জুলাই, ১৯৭৫

৪. আবুল কাসেম, সাক্ষাৎকার, (এ সম্পর্কে মজলিসের আর সবাই একমত যে অধ্যাপক আবুল কাসেমের একক প্রচেষ্টায়ই প্রাথমিকভাবে তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়)

৫. সানাউল্লাহ নূরী, পূর্বোক্ত

৬. আবদুল গফুর, পূর্বোক্ত

৭. পূর্বোক্ত

৮. *পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস ঃ গঠনতন্ত্র* (পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী কর্তৃক ৩১/২ আজিমপুর রোড, ঢাকা হইতে প্রকাশিত এবং মোঃ মোবারক আলি কর্তৃক প্যারামাউন্ট প্রেস, ঢাকা হইতে মুদ্রিত)

৯. পূর্বোক্ত

১০. সানাউল্লাহ নূরী, পূর্বোক্ত

১১. অধ্যাপক আবুল কাসেম ও শাহেদ আলী, *একমাত্র পথ* [প্রকাশ করেছেন, অধ্যাপক আবুল কাসেম, (তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে)। ১ম সংস্করণ–নবেম্বর ১৯৪৯। মুদ্রণে–শ্রী মনোরঞ্জন দাস। মুসলিম প্রিন্টিং ওয়ার্কস; ৮/২ নং ওয়াইজঘাট, ঢাকা] পৃষ্ঠা ৪

১২. পূর্বোক্ত, পৃ ৫–৬

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৭

১৪. পূর্বোক্ত, *'আদর্শের সন্ধানে মানুষ'* প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ ১৮–১৯

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ ২১

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ ২০–৪৬

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ ৪৯ এবং সানাউল্লাহ নূরী, সাক্ষাৎকার

২০. পূর্বোক্ত, পরিশিষ্ট

২১. আবুল কাসেম, সানাউল্লাহ নূরী, আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার

২২. বদরুদ্দীন উমর, *'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'* (খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা ১৯৬৯) উদ্ধৃত পৃ ১২

২৩. *'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা–না উর্দু'?* (প্রকাশক অধ্যাপক এম, এ, কাসেম এম, এস–সি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তমদ্দুন অফিস, রমনা, ঢাকা। প্রিন্টার এ, এইচ, সৈয়দ, বলিয়াদী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩৭নং বংশাল রোড, ঢাকা। ১ম সংস্করণ— সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ইং) পৃ এক –দুই

www.nagorikpathagar.org

২৪ মোহাম্মদ আবুল কাসেম, প্রিন্সিপাল, বাংলা কলেজ, ঢাকা, '*ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস।*' পৃ ৩। (৩য় সংস্করণ, মার্চ, ১৯৬৯। প্রকাশক, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে মোহাম্মদ নূরুন্নবি, মজলিস অফিস; ৩১/২ আজিমপুর রোড; ঢাকা-৯। ছাপায় : ফকির আফতাব উদ্দিন আহমদ, আমাদের বিগ্যান প্রেস, ৩১/২ আজিমপুর রোড, ঢাকা-৯)

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ ১৩-১৫

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ ১৫-১৬

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ ১৭

২৮. পূর্বোক্ত

২৯. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (১৯৭০) পৃ ১৯

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ ১৯-২০

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ ২১-২২, এবং প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, সাক্ষাৎকার

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ ৪২

৩৩. পূর্বোক্ত

৩৪. *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস,* পৃ ১৭

৩৫. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ ৪৬

৩৬. *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস,* পৃ ২৩

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ ২৩-২৪

৩৮. বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ ৮১

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ ৮২

৪০. পূর্বোক্ত, উদ্ধৃত, পৃ ১০৬

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ ১০৮-১১০

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ ১১২

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ ১১৩-১১৫

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ ১২৫-১২৬

৪৫. সানাউল্লাহ নূরী, আবুল কাসেম, নূরুল হক ভূঁইয়া, সাক্ষাৎকার

৪৬. *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস,* পৃ ৩৭

৪৭. আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার

৪৮. *সাপ্তাহিক সৈনিক,* ১ বর্ষ, দশম সংখ্যা (৪-৩-১৯৪৯)

৪৯. সাপ্তাহিক সৈনিক, ১ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা

৫০. সানাউল্লাহ নূরী, আবদুল গফুর, নূরুল হক ভূঁইয়া, সাক্ষাৎকার

৫১. সানাউল্লাহ নূরী, সাক্ষাৎকার

৫২. আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার

www.nagorikpathagar.org

দুই. সংস্কৃতি সংসদ ১৯৫১

১. লক্ষ্য. উদ্দেশ্য ও পটভূমি

সংস্কৃতি সংসদের প্রতিষ্ঠা ১৯৫১ সালে।[১] এ সম্পর্কে ওবায়দুর হক সরকার লিখেছেন, "১৯৫১ সালের মার্চ মাসে মুসলিম হলের ৩৮ নং কক্ষে মরহুম আনওয়ারুল আজীম, মরহুম কবি হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২—১৯৮৩), কবি এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ্ খান (সেন্টু) (জ. ১৯৩৪) ও আমি—এই চারজন মিলে সংস্কৃতি সংসদের সূচনা করলাম। পরে এর নাম হল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ'।"[২] তাছাড়া "এ সংসদ গঠনে অনুপ্রেরণা যোগান অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও খান সারওয়ার মোর্শেদ।"[৩]

কার্যত সংস্কৃতি সংসদ প্রায় প্রথম থেকেই ছিল নিষিদ্ধ কম্যুনিস্ট পার্টির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংগঠন। সংস্কৃতি সংসদের আদর্শও ছিল সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও রুশ-বিপ্লব প্রভাবিত। কবি হাসান হাফিজুর রহমান ও ওবায়দুল্লাহ্ খান তখন কম্যুনিস্ট পার্টির আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। প্রত্যক্ষ কোন ঘোষণা না দিয়েও সেই অনুপ্রেরণায়ই সংস্কৃতি সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।[৪] তাছাড়া দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে লেখা বিজন ভট্টাচার্যের যে জবানবন্দী নাটক নিয়ে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫১ সালে সংস্কৃতি সংসদের যাত্রা শুরু, সেটি ওই সময়ে কলকাতার কম্যুনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন গণনাট্য সংঘও মঞ্চস্থ করেছিল।[৫]

ডঃ আনিসুজ্জামান (জ. ১৯৩৭) লিখেছেন, 'গোড়া থেকেই সংস্কৃতি সংসদ ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারবিরোধী অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংগঠন।[৬]

এর আদর্শ উদ্দেশ্য সম্পর্কে ফারুক আলমগীর ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত তার সংকলনে লেখেন :

> জার্মানীর বিরুদ্ধে পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষ যুদ্ধ ঘোষণা করলেও বিথোভেন-এর সঙ্গীত যুগ যুগে জগতের বিচিত্র কর্মসভার নর-নারীর হৃদয়কে আপ্লুত করেছিল। মানবতার শত্রু মার্কিন সরকারের বর্বর ভিয়েতনাম নীতি জগতের কারো অজানা নয়—ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এই কিছুকাল আগে পর্যন্তও আলজিরিয়ার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে রুদ্ধ করতে চেয়েছিল অমানুষিক নির্যাতনের মাধ্যমে—শত জমিলার নির্যাতন কাহিনী শুনে সেদিন জগতের মানুষ ক্ষোভে,

www.nagorikpathagar.org

দুঃখে ঘৃণায় প্রতিবাদের উদ্যত ঝড় তুলেছিল। তথাপি ফরাসী শিল্প ও সাহিত্যের মহৎ অবদানের কথা কেউ বিস্মৃত হয়নি আর অদ্যপি জাঁ পল সার্ত্রে, পল রোবসন আমাদের সংগ্রামী কাফেলার ঈপ্সিত সহযাত্রী। একই কারণে আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার জনগণের মুক্তি সংগ্রাম রাজনৈতিক দিক থেকে যেমন বিচ্ছিন্ন ঘটনা-নয়, তেমনি সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এর প্রেরণার পটভূমি। সহস্র যোজন দূরে মেকং বদ্বীপে একজন অশীতিপর বৃদ্ধের যে যুদ্ধ ঘোষণা সে তো তার বাঁচবার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম আর সেই সংগ্রামের পশ্চাতে রয়েছে সে দেশের বিশেষ আলো, হাওয়া আর প্রকৃতিগত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। এখানে পরোক্ষে স্বগতোক্তি করতে পারি যে প্রচারধর্মী সংস্কৃতিতে আমরা যেমন অবিশ্বাসী; তেমনি তথাকথিত বিশুদ্ধ মনন-পরিচর্যায় আমরা আস্থাবান নই।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের আক্রমণকে কেন্দ্র করে দেশে যে জাতীয়তাবোধের উদগম হয়েছে আমরা সেই জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী। এ' জাতীয়তাবোধ কোন ফ্যাসিস্ট, বর্ণ বা সম্প্রদায়গত জাতীয়তাবোধ নহে, বরং গণ-চেতনা ও গণ-সংহতিমূলক জাতীয়তাবোধ। সততা নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাই কোন মহল রবীন্দ্রনাথকে এ দেশের সংস্কৃতি-জীবন থেকে নির্বাসন দিতে পারবে না। কেননা কাব্যগাঁথা পূর্ব পাকিস্তানেরই নদী-তরঙ্গের কল্লোলে প্রবাহিত, বাতাসে মর্মরিত, শ্যামল মাঠের শস্যে হিল্লোলিত। কালের প্রবহমানতার অনিবার্য কারণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল আর বিতর্কিত বিষয় নয়। উভয়েই এখন আবহমান, সর্বজনীন, লোকায়ত। রবীন্দ্রনাথের আজীবন সাধনার বিমুগ্ধ ফলশ্রুতি, সোনার তরীর ফসল আমাদেরই প্রার্থিত ঐশ্বর্য। আর "নজরুল সেই শ্রেণীরই একজন কবি যিনি সমাজ পরিবর্তনের সপক্ষে কলমকে হাতিয়ারের পর্যায়ে এনেছেন।" অতএব শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ নজরুলের অন্যরূপ মূল্যায়নে বৃহত্তর গণ-স্বার্থ বিরোধী কর্মই সাধিত হবে।

সংস্কৃতি সংসদ চিরকাল উপরোক্ত ক্ষুদ্রস্বার্থ-বিরোধী সংস্কৃতির ধারক এবং এখানেই সংস্কৃতি সংসদ সাংস্কৃতিক রণক্ষেত্রের অক্লান্ত সৈনিক। বুদ্ধির মুক্তি তথা প্রথাপীড়িত সংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয়ের মুক্তি সাধনাই পূর্ব বাংলা সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের শরণি নির্দেশ করবে। কেননা নতুন সমাজ প্যাটার্ণ আর প্রগতি আন্দোলন; উদার এবং উন্নততর সংস্কৃতির বর্তমান সাপেক্ষ—এ আদর্শবাদ থেকেই চৌদ্দ বছর পূর্বে জন্ম নিয়েছিলো সংস্কৃতি সংসদ। বিভাগোত্তর কালে পূর্ব বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন, ঐতিহ্যময়, প্রগতিবাদী এবং সচেতন গণআন্দোলন-ভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।

www.nagorikpathagar.org

> এ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তবতা, স্বচ্ছলতা, এবং অপ্রাদেশিকতা পূর্বাহ্নেই প্রমাণিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত ঢাকায় জাতীয় সংহতি সম্মেলনে বিশেষজ্ঞেরা একবার একমত হয়েছিলেন যে পূর্ববাংলার স্বতন্ত্র ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বীকৃতিতেই সমগ্র দেশের বৃহত্তর মঙ্গল শর্তায়িত। এটা যেমন অত্যন্ত আনন্দের কথা। ভিন্ন মতাবলম্বীদের নিকট এ বোধ যত শীঘ্র জাগ্রত হবে দেশের তত কল্যাণ, সংস্কৃতির সংজ্ঞা আজকের দিনে আর ব্যাসকূঠ নয়। দেশকাল সন্ততি ভেদে যা যথার্থ তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। বিতর্কবহুল পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি-সংকটের প্রসংগও তেমনি অচিরকাল স্থায়ী। সংস্কৃতির ধারা তত্ত্বে পরিণতি প্রাপ্ত হয় না। এর বিপুল প্রাণভাঙ্গা মানুষের বিচিত্র কর্মসভায় পরিব্যাপ্ত; জীবন্ত আয় প্রাসংগিকভাবেই অনস্বীকার্য যে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির উৎস তার নরনারীর বিচিত্র জীবন প্রবাহের মধ্যেই বিধৃত। তার্কিকের কূটজালে আর সংস্কৃতি বিলাসীর উন্নাসিকতায় শুধু ব্যর্থতারই আস্ফালন। বহিঃপ্রকৃতিকে পরিবর্তিত করার সংগে সংগে বৃহত্তর আপামর জীবনের আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনও বিবর্তিত হচ্ছে নিরন্তর। যে সংস্কৃতি সাধনার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য, সংগীত, চিত্রশিল্প এবং সমাজতত্ত্ব ও বিজ্ঞান আলোচনা পূর্ব বাংলার অধিবাসী সকলেরই তা গর্বের বস্তু; হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য।
>
> সংস্কৃতি সংসদের অনতিদীর্ঘ ইতিহাস এ সাধনারই কাহিনী। আশ্চর্য্য নয় পূর্ব বাংলার তরুণ বুদ্ধিবাদী, কবি যশপ্রার্থী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী, যশস্বী সাংবাদিক ও গবেষক-এঁদের প্রায় অধিকাংশই কোন কোন ভাবে এ প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত ছিলেন এবং আছেন।[৭]

সংস্কৃতি সংসদ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য কমই পাওয়া যায়। ফারুক আলমগীরের এই উক্তি থেকে এই সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়।

২. কর্মতৎপরতা

প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে সংস্কৃতি সংসদের কর্মকাণ্ড প্রধানত নাটক মঞ্চায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[৮] আর সংগঠনটির প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটকের মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে ১৯৫১ সালেরই ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাহবুব আলী ইন্সটিটিউটে।[৯] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদের ঐ নাটকেই প্রথমবারের মতো নারী চরিত্রে ছাত্রদের বদলে ছাত্রীরা অভিনয় করে।

সেই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে ওবায়দুল হক সরকার লিখেছেন ঃ

> বিজন ভট্টাচার্যের "জবানবন্দী" নাট্যানুষ্ঠান এদেশের নাট্যধারায় বিপ্লবের সূচনা করে। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রথম মঞ্চে একত্রে অভিনয়ের দুঃসাহস

www.nagorikpathagar.org

প্রদর্শন করেন। দুঃসাহস এ কারণে যে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে মুসলমান ছেলেদের পক্ষেই নাটক করা সহজসাধ্য ছিল না। মেয়েদের ত কথাই নেই। ১৯৪৭-এ দেশে স্বাধীন হলো কিন্তু দেশের মেয়েরা স্বাধীনতা পেলো না, তাছাড়া তাদের ঘরে বন্দী করে রাখা হতো। তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারতো না। রেডিওতে মুসলমান মহিলা শিল্পী গান গাইতে সাহস পেতো না। প্রযোজক ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে মহিলা শিল্পীর বাড়ীতে ধরনা দিতেন। "আমার চাকরি বাঁচান। প্রোগ্রামটা করে দিন" বলে কোন মতে শিল্পীকে নিয়ে আসতেন। পর্দা ঘেরা ঘোড়ার গাড়ী রেডিও ষ্টেশনের (নাজিমউদ্দিন রোড) ভিতরে এসে থামতো। বড় পর্দা পুষিদার মধ্যেও শিল্পীকে কথা শুনতে হত। সেই পর্দা ভেদ করে প্রকাশ্য মঞ্চে পর-পুরুষের সাথে অভিনয়—এ যে কত বড় বিপ্লব আজ তা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। আজ নাটক নন্দিত, তখন নাটক ছিল নিন্দিত, আজ নাটক করলে সম্মান ও সম্মানী লাভ হয়, তখন জুটতো সম্মার্জনী।

জনাব সরকার লিখেছেন :"নাটকে তিনটি মহিলা চরিত্র। ঠিক হলো, আর ছেলে দিয়ে মেয়ের পাঠ করানো নয়। ছাত্রদের এই নাটকে ছাত্রীরা অভিনয় করবে। কিন্তু কোন ছাত্রী রাজী হয় না। শেষে নুরুন্নেহার নামে এক ছাত্রী রাজী হলেন; কিন্তু বাকী দুটি চরিত্রে ছাত্রী আর পাওয়া গেল না। অগত্যা দুই শিক্ষিকা মিসেস রোকেয়া কবীর ও মিসেস লায়লা সামাদ রাজী হলেন। শিক্ষার সাথে জড়িত অতএব, ছাত্রদের নাটকে চলে! মহিলা শিল্পী সমস্যার সমাধান হলো। কিন্তু রিহার্সালের জায়গা আর পাওয়া যায় না। যেখানেই যাই সেখানেই "সোমত্ত বয়েসের ছেলেমেয়েদের এই বেলেল্লাপনা চলবে না" শুনতে হয়। নাটক যেন নেহায়েত অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ। অবশেষে নীলক্ষেতে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর বাসায় রিহার্সালের সুযোগ পেলাম। মুনীর চৌধুরী তখন জেলে। মিসেস লিলি চৌধুরী সব ব্যবস্থা করে দিলেন। শুধু রিহার্সালের ব্যবস্থা করে দেয়া নয়; মিস নুরুন্নেহারকে তাঁর বাসায় এনে রাখলেন। তিনি থাকতেন চামেলী হাউসে (রোকেয়া হল)। তখন তালিকাভুক্ত অভিভাবক ব্যতীত ছাত্রীদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। প্রতিদিন রিহার্সালে উপস্থিতি তাই সম্ভব ছিল না। লিলি আপা তাকে তাঁর বাসায় নিয়ে এসে রিহার্সালের সুযোগ করে দিলেন। লিলি আপার সাহায্য-সহযোগিতা না পেলে হয়তো আমরা নাটকই মঞ্চস্থ করতে পারতাম না। রিহার্সালের সুযোগ পেলাম। কিন্তু নাটক মঞ্চস্থের ছাড়পত্র সংগ্রহ আরেক সমস্যা। তখন কম্যুনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ। কলকাতার গণনাট্য সংঘকে মনে করা হতো কম্যুনিষ্ট। সুতরাং সেই গণনাট্য সংঘের নাটক ঢাকায় মঞ্চস্থ করা অসম্ভব ব্যাপার। এ ব্যাপারে পরিচালক হাবিবুল হক সাহায্য করলেন। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী (তখন তাই বলা হতো) নুরুল আমীনের তিনি ছিলেন শ্যালক ও প্রাইভেট সেক্রেটারী। তার এক টেলিফোনে ছাড়পত্র এসে গেল। নাটক মঞ্চস্থ হবে অধুনালুপ্ত মাহবুব আলী ইন্সটিটিউটে। কড়া পুলিশ

www.nagorikpathagar.org

প্রহরাধীনে নাটক মঞ্চস্থ হলো। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন। তিনি নাটক দেখে দুই লক্ষ টাকা খুলনা রিলিফে দেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন। আমরাও বহু স্বেচ্ছাসেবক পেয়েছি।

'নারী চরিত্রে ছাত্রীদের দিয়ে অভিনয় করার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংস্কৃতি সংসদের ওপর ক্ষেপে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঢাকার পত্রপত্রিকায় ওই নাটকের ভূঁয়সী প্রশংসা করায় কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হননি।"[১২]

জবানবন্দী নাটক সম্পর্কে পাকিস্তান অবজারবার পত্রিকায় প্রকাশিত 'নিউ ট্রেন্ডস অ্যান্ড নিউ ফেসেস' শিরোনামে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয় :

> মাস কয়েক আগে ডক্টরস ক্লাব যখন শরৎচন্দ্রের "বিভাগ" এবং এর পরেই রূপশ্রী "দুই পুরুষ" মঞ্চস্থ করলো তখন আমরা অনুভব করলাম ঢাকার মঞ্চ যাত্রা শুরু করেছে। আর এখন বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী" এবং শওকত ওসমানের "কাঁকর মণি" মঞ্চস্থ হতে দেখে ঢাকা মঞ্চের সম্ভাবনা ও শক্তি সম্পর্কে আমাদের প্রত্যয়ের সঞ্চার হয়েছে।
>
> জনাব ওবায়দুল হক সরকার পরাণ মণ্ডলের ভূমিকায় আমাদের প্রথম শ্রেণীর অভিনয় উপহার দিয়েছেন। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষে কলকাতার রাজপথে অনাহারে মৃত্যুবরণ করা একটি চাষীকে প্রাণবন্ত করে ফুটিয়ে তোলা বেশ কষ্টকর। তাছাড়া আরও অনেক বাধাবিঘ্ন ছিল। এতদসত্ত্বেও সরকার সারাক্ষণ সফল অভিনয় করে এবং বেশ কয়েক জনের প্রথম শ্রেণী অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর এই সাফল্য অবশ্য তার দলের (টীমওয়ার্ক) ওপর নির্ভর করেছিল, এবং পুরো দলই কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত হয়েছিল। মিসেস রোকেয়া কবীর বেন্দার মার চরিত্রে এবং মিস নূরুন্নেহার বেন্দার স্ত্রীর ভূমিকায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। বেন্দার ভূমিকায় কামার আমহদ, পর্দা চরিত্র কাজী মুকিত, ভিলেন চরিত্রে ওবায়দুল্লাহ এবং হাসি চরিত্রে মিসেস লায়লা সামাদ ভাল অভিনয় করেন। সবাই সুনাম করার কারণ টীমওয়ার্কের সাফল্য।[১৩]

দৈনিক সংবাদ-এর রিপোর্টে বলা হয় : মহিলা ও পুরুষের মিলিত নাট্যাভিনয় গত দুই তিন মাসের মধ্যে ঢাকায় আরও দুইটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞ ও ঝানু শিল্পী সমন্বয়ে গঠিত বহু বিঘোষিত 'রূপশ্রী'র পক্ষে যা সম্ভব হয়নি, বিশ্ববিদ্যালয়েব মঞ্চ-অনভিজ্ঞ তরুণদের দ্বারা তাই সম্ভব হয়েছে জবানবন্দীতে। সংবাদ-এ আশা প্রকাশ করা হয় যে, ভবিষ্যতে হল ও ইউনিভার্সিটির নাটকাভিনয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ সমভাবে অংশগ্রহণ করবেন।[১৪]

১৯৫২ সালে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সংস্কৃতি সংসদ এই নাটকটিই পুনরায় মঞ্চস্থ করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে।[১৫] এরপর সংস্কৃতি সংসদ ১৯৫৩ সালে

www.nagorikpathagar.org

মঞ্চস্থ করে তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক', ১৯৫৪ সালে মেঘনাদবধের প্রথম সর্গ এবং বনফুলের 'কবয়', ১৯৫৬ সালে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', ১৯৫৮ সালে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', ১৯৭০ সালে রবীন্দ্রনাথের 'রক্ত করবী'।[১৬]

নাটকের এই ধারার পাশাপাশি পরবর্তীকালে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও গণসঙ্গীতের অনুষ্ঠানও সংস্কৃতি সংসদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৭]

সংস্কৃতি সংসদ সম্পর্কে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (জ. ১৯৩৮) লিখেছেন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ অনার্সের ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে পড়তে এলে সংস্কৃতি সংসদের নাম না জেনে উপায় ছিল না। সংস্কৃতি সংসদের আভিজাত্য ছিল অসাধারণ আর রূপ ছিল আকর্ষণীয় মুখের মত। এর যেকোন আলোচনা অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ডাকতে হত না, তাঁরা নিজেরাই ভিড় করতেন। ক্লাসকক্ষ দর্শকে ভরে যেত। আর বার্ষিক অনুষ্ঠানের সময় জায়গা পাওয়া যেত না অনুষ্ঠান দেখার। সে জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হত বাংলা একাডেমীর খোলা মাঠে আর টিএসটিসর বড় লনে।[১৮]

তাছাড়া পোস্টার কিংবা দেয়াল পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেও সংস্কৃতি সংসদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের সুরুচি ও নতুনত্বের জন্য তারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। '৫৮-'৫৯ সালে সংস্কৃতি সংসদ প্রচারিত পোস্টার সম্পর্কে বুলবুল খান মাহবুব লিখেছেন, "গতানুগতিক পোস্টার দেখে অভ্যস্ত আমার চোখে মধুর ক্যান্টিনের সদ্য লাগানো সুদৃশ্য রঙিন কাগজে সুন্দর হাতের খেলায় চমৎকার সব কথা, আর অভিনন্দন বাণী দিয়ে নতুনদের বরণ করে নেয়া বহুরঙ পোস্টারগুলো একটা নতুন জগৎকে যেন উন্মোচিত করে দিল।"[১৯] আর নাজিমউদ্দীন রোডের শেষ মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ভবনের 'সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে উল্টো দিকে তাকালে চোখে পড়ত বহু বর্ণে আঁকা চোখ মেলে দেখার মত 'পোস্টার আর সুঅলঙ্কৃত দেয়াল পত্রিকা'।[২০] তার নীচে বড় করে লেখা থাকত সংস্কৃতি সংসদ। এছাড়া সংস্কৃতি সংসদের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ফারুক আলমগীরের প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন :

> ১৯৫৪ সনে সাহিত্য সম্মেলনে 'মেঘনাদ বধ' ও 'কবয়' মঞ্চস্থ করে সংস্কৃতি সংসদ ঢাকায় বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। 'কবয়ে'র অভিনয় দর্শনে মোহিত মনোজ বসু বলেছিলেন, "কোলকাতায় গেলে বলাইকে (বনফুল) বলবো তোমার নাটকের এত ভাল অভিনয় আর কোথাও দেখিনি।"
>
> ১৯৫৫ সনে বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠান ছাড়াও রবীন্দ্র, নজরুল এবং সুকান্ত স্মৃতি তর্পণ করা হয়। একুশে ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলার শোক এবং বিজয়ের দিন। বুকের পবিত্র রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করে সেদিন এদেশের বীর জনতা ও ছাত্রগণ মায়ের বুকের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছির। একুশের পটভূমিকায় রচিত 'কবর' নাটকের অভিনয়, বাংলা ভাষার আলোচনা এবং স্বদেশী সঙ্গীতের আসর;

www.nagorikpathagar.org

১৯৫৬ সনে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমের কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯৫৭ সনে ঢাকা হল মিলনায়তনে সংস্কৃতি সংসদ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করে। নিয়মিত সাহিত্য সভা, আলোচনা ব্যতিরেকেও পূর্ববর্তী বছরের মতো রবীন্দ্র নজরুল এবং সুকান্ত বার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

পরবর্তী বছর ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবনে আলোড়নকারী ঘটনা ছিল। সংস্কৃতি সংসদ ২৬শে ফেবরুয়ারী দশ দিবসব্যাপী নাটক, কাব্যনাটক, সঙ্গীত, সাহিত্যালোচনা এবং আলোকচিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করে। ঢাকার সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি মাত্রেই এতে প্রীত হন। অন্যতম ফলশ্রুতি ছিল বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংস্কৃতি সংসদকে স্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং আর্থিক সাহায্য প্রদান।

১৯৫৯ সনে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাগত জানিয়ে এক সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান করি। পরবর্তী বছর অত্যন্ত দুঃখজনক। সামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সংস্কৃতি সংসদের বসন্তোৎসবকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৬১ সনে ঢাকা কলেজের মিলানায়তনে সংস্কৃতি-সংসদ আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠান বছরের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিকর্ম বলে সুজন অভিমত প্রকাশ করেন।

১৯৬২ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক জীবনে যে তীব্র আলোড়নকারী সাড়া পড়ে সংস্কৃতি সংসদ তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে তাকে সুসংহত রূপায়ন দান করে। সামরিক শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জনগণমনে উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, সংস্কৃতি সংসদ তার নেতৃত্বে অগ্রবর্তী হয়। সে বছর দুই দিন ব্যাপী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আয়োজিত ৩রা অগ্রহায়ণের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের আসর ও ৪ঠা অগ্রহায়ণের প্রেমের গানের আসর ও শ্যামা নৃত্যনাট্য সুধীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসালাভে সমর্থ হয়। ছাত্রবন্ধুদের প্রবল ভিড় ও উৎসুক দৃষ্টে আমরা পুনর্বার শ্যামা মঞ্চস্থকরণের সিদ্ধান্ত করি। কিন্তু পরবর্তীকালে আর্থিক সংকটের দরুন তা সম্ভব হয়নি বলে আমাদের শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম রজনীতে দেশাত্মবোধক গানের আসরের সমাপ্তিতে কুমিল্লার নৃত্যশিল্পী সুকান্তের 'রাণার' এর সঙ্গে নৃত্যসংযোগ এতই হৃদয়গ্রাহী হয় যে দর্শকগণ যুগপৎ উত্তেজিত ও পুলকিত হয়ে ওঠেন।

১৯৬৩ সালে সংস্কৃতি সংসদ বাংলা একাডেমীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের আয়োজন করে। প্রদেশের বিভিন্ন ছাত্রবন্ধুরা এ অনুষ্ঠান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং উক্ত অনুষ্ঠানের শেষে দিনাজপুর থেকে আগত ছাত্রবন্ধুদের "একটি বিদ্রোহী অনুভূতির জন্যে" নামক দৃশ্যনাট্যের মূক অভিনয় এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে বিভিন্ন মহল থেকে এর পুনরাভিনয়ের জন্য আবেদন এসেছিল।

www.nagorikpathagar.org

১৯৬৪ সনে অর্থাৎ পরবর্তী বছরও আমরা অন্যান্য বারের মতোন আবারো বাংলা একাডেমীর বটতলায় গণসঙ্গীতের আসর করি। ১৯৬২ সালের দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনের নিমিত্ত সে বছর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিবসে আমরা বহু কষ্ট স্বীকার করেও 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করণের ব্যবস্থা করলেও শেষ মুহূর্তে কোন অশুভ চক্রান্তের ষড়যন্ত্র আমাদের পূর্বসূচী বাতিল করতে হয়। সে বছরের শেষের দিকে লেনিন পুরস্কার বিজয়ী পাক-ভারতের শ্রেষ্ঠ জীবিত উর্দু কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ঢাকায় আগমন করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র সংস্কৃতি সংসদই তাঁর সম্মানার্থে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে।

নতুন কার্যকরী সংসদ নির্বাচিত হলে ১৯৬৫ সনে সর্বপ্রথম সংস্কৃতি সংসদ রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী উদযাপন করে। এ' বছর নবীন আবাহন উৎসবে সংস্কৃতি সংসদ যুদ্ধকালীন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশাত্মবোধক গানের আসর এবং সাম্রাজ্যবাদ ও নব-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে গণজাগরণমূলক নাট্য মঞ্চস্থকরণের পরিকল্পনা নিয়েছে। সংস্কৃতি সংসদ প্রসঙ্গে সংসদের বর্তমান কার্যক্রম আলোচনা করতে গিয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে এখানে সংস্কৃতি সংসদের অতীত কার্যাবলীর বিবরণ দেয়া হলো। আমরা এখনো এগিয়ে চলেছি সম্মুখপানে। আমরা আশাবাদী কর্ম এবং মনোবলে উদ্বুদ্ধ। সাধনায় বিরতি আমাদের নাই; ভবিষ্যতে আরো অনেক নতুন কিছু করার উৎসাহে উৎসাহিত। মুক্তবুদ্ধি এবং সংস্কৃতিবান ও প্রগতিশীল ছেলেমেয়েদের তাই আহবান জানাচ্ছি, আমাদের শরণীতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা নতুন পদার্পণ করেছেন তাদের বরণ করার সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলি তোমাদের কর্মপ্রবাহ আর প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ব-বাংলার সংস্কৃতি ও জনজীবন আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক; জীবন হয়ে উঠুক আরো উজ্জ্বল; সার্থকতম। এদেশের জল আর মাটি আমাদের চোখে সোনা হয়ে প্রতিভাত হোক।[২১]

১৯৬৬ সালে সংস্কৃতি সংসদ 'জ্বলছে আগুন ক্ষেতে খামারে' শীর্ষক একটি নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে।[২২]

৩. সংস্কৃতি সংসদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ

সংস্কৃতি সংসদের সঙ্গে সে সময়ের বহু প্রগতিশীল ব্যক্তি জড়িত হন। এর মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি অঙ্গনে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। এদের সম্পর্কে আনিসুজ্জামান লিখেছেন : "সংস্কৃতি সংসদের প্রথম সভাপতি ছিলেন ডঃ খান সরওয়ার মুরশিদ। তিনি তখন ছিলেন ইংরেজী বিভাগের তরুণ অধ্যাপক। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম।(জ. ১৯২৭)

এর সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও অন্য যারা জড়িত ছিলেন তারা হলেন : শহীদ গিয়াসউদ্দীন আহমদ, শহীদ রফিকুল ইসলাম ও শহীদ আ ন ম গোলাম মোস্তফা

www.nagorikpathagar.org

(১৯৪২—১৯৭১); মুজিবুর রহমান খান, রফিকুল ইসলাম (জ. ১৯৩৪), সনজীদা খাতুন (জ. ১৯৩৩), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (জ. ১৯৩৬), মমতাজউদ্দীন আহমদ (জ. ১৯৩৫), মকসুদউস সালেহীন, বজলুল করিম, শহীদ খান, জিয়া হায়দার (জ. ১৯৩৬), জহিরুল হক, আবদুল্লাহ আল মামুন (জ. ১৯৪৩), রামেন্দু মজুমদার, ফারুক আলমগীর, রশীদ হায়দার (জ. ১৯৪১), আসাদ চৌধুরী (জ. ১৯৪৩), মুসা আহমদ, আতাউর রহমান (জ. ১৯২৫), ফরিদা বারী মালিক (পরে খান), কামরুন্নাহার লাইলী (১৯৩৭—১৯৮৪), জহরত আরা খানম, ফাহমিদা খাতুন, মালেকা বেগম (জ. ১৯৪৪), ফেরদৌসী মজুমদার, সুলতানা রেবু প্রমুখ।[২৩]

৪. কার্যনির্বাহী পরিষদ

সংস্কৃতি সংসদের কার্যকরী পরিষদের বিস্তারিত তথ্য কারও কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। সভাপতিও সাধারণ সম্পাদকের নিম্নোক্ত পরিচয় পাওয়া যায়।[২৪]

সাল	*সভাপতি*	*সাধারণ সম্পাদক*
১৯৫১-৫২	খান সারওয়ার মুরশিদ	মুস্তাফা নূরউল ইসলাম
১৯৫২-৫৩	মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	আলাউদ্দীন আল আজাদ
১৯৫৩-৫৪	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	রফিকুল ইসলাম
১৯৫৪-৫৫	হাসান হাফিজুর রহমান	আবদুস সাত্তার
১৯৫৫-৫৬	সাখাওয়াত হোসেন	জহির রায়হান
১৯৫৬-৫৭	মোমিনুল হক	খন্দকার আসাদুজ্জামান
১৯৫৭-৫৮	এনাম আহমদ চৌধুরী	এনায়েতউল্লাহ খান
১৯৫৮-৫৯	জহির রায়হান	মোহাম্মদ হোসেন
১৯৫৯-৬০	এনামুল হক	কাজী জাফর আহমদ
	(১৯৬২ সাল পর্যন্ত এঁরাই কাজ চালিয়ে যান)	
১৯৬২-৬৩	রফিকুল হক	সাইফউদ্দীন আহমদ মানিক
	(১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এঁরাই কাজ চালিয়ে যান)	
১৯৬৫-৬৬	আখলাকুর রহমান	মুহম্মদ মুহাদ্দিস

এছাড়া সংস্কৃতি সংসদের ১৯৬৫ সালের কার্যকরী পরিষদের উল্লেখ আছে ফারুক আলমগীর সম্পাদিত সংকলনে। তাতে ছিলেন[২৫] :

সভাপতি— আখলাকুর রহমান

সহ-সভাপতি— ফারুক আলমগীর, সৈয়দ আশরাফুজ্জামান, জিনাত ইসলাম, নরেন বিশ্বাস, আবুল হাসেম, বদিউজ্জামান চৌধুরী, মামুন আল, নিলুফার আহমদ

www.nagorikpathagar.org

সাধারণ সম্পাদক—	মুহম্মদ মুহাদ্দিস
সহ-সম্পাদক—	নার্গিস আবেদ, জাহাঙ্গীর জব্বার, আমজাদ হোসেন।
সাংগঠনিক সম্পাদক—	হায়াত হোসেন
প্রমোদ সম্পাদিকা—	আবেদা বেগম
	সহযোগী আমিনুল ইসলাম জাহাঙ্গীর
প্রচার সম্পাদক—	নূরুল আহসান
সাহিত্য সম্পাদক—	মাহবুবউল্লাহ
	সহযোগী হাসনা হেনা (বকুল)
নাট্য সম্পাদক—	আবদুস সাত্তার
	সহযোগী আখতার জাহান বেগম
দফতর সম্পাদক—	মুজিবর রহমান চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ—	আবদুল হামিদ

৫. স্মৃতিচারণ

ফারুক আলমগীরের সংকলনে এর নেতৃবৃন্দ যে স্মৃতিচারণ করেছেন, তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল। সংস্কৃতি সংসদের প্রাক্তন সভাপতি জহির রায়হান লিখেছেন :

'সংস্কৃতি সংসদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে শ্বাসনালীর মত। সকালে, দুপুরে, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সাহিত্য সভা, আলোচনা সভা, বিচিত্রানুষ্ঠান, কবি সম্মেলন, বসন্ত উৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে এই বিদ্যামন্দিরে এক নতুন সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছিল এই সংসদ।'[২৬]

প্রাক্তন সভাপতি এনামুল হক বলেছেন :

> একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে প্রদেশ-ভিত্তিক কোন প্রতিষ্ঠান না হয়েও পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ। স্বাধীনতা উত্তরকালে পূর্ব বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খানিকটা বন্ধ্যাত্ব আর খানিকটা নৈরাশ্যের মধ্যে নির্ভয়ে এক সুস্থ ও সহজ জীবনমুখী মূল্যবোধকে শুধু সযত্নে বাঁচিয়ে রাখাই নয় নানা প্রতিকূল পরিবেশে তার সম্প্রসারণে এ সংগঠনের প্রচেষ্টা অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণার উৎস।
>
> ভাবতে ভালো লাগে যে বহু দিনের ব্যবধান হলেও সংস্কৃতি সংসদ-এর সঙ্গে এক সময়ের সক্রিয় আত্মীয়তাবোধ মনে এখনও এক নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করে। অভিযাত্রিক জীবনের বিবর্তনের সঙ্গে তার অপরিহার্য সাথী হিসাবে সংস্কৃতি-

www.nagorikpathagar.org

> চেতনারও বিবর্তন হয়। এক ঐতিহ্যের অনুসরণে জন্ম নেয় নতুন ঐতিহ্য। সৃষ্টিশীল ঐতিহ্যের প্রবহমান ধারায় বিশ্বাসী সংস্কৃতি সংসদ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলুক এই কামনা করি।[২৭]

প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কাজী জাফর আহমদ বলেছেন, 'মানুষের পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পালা বদল চলে। সামন্তযুগ কিংবা পুঁজিবাদের বিকাশমান কালে যে রূপ ও সংজ্ঞা ছিল, এখন নেই। জীবন প্রবাহের সাথে মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রাম যেমন আরো তীব্র হয়েছে তেমনি সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। আজ আফ্রিকায় এবং এশিয়ায় যে নতুন সংস্কৃতির উজ্জীবন চলছে তা অবশ্যই জনতার সপক্ষে পরিচালিত হবে। কেননা এ দুটি মহাদেশের মানুষ মাত্রেই রুচি, রুটি ও অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করছে। তাদের সংস্কৃতিকে তাদের সংগ্রামের পরিপন্থী হলে চলবে না। পূর্ব পাকিস্তানেও সংস্কৃতির বিবর্তিত রূপ জনজীবনকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলুক; সংস্কৃতি-সংসদের কাছে এইটুকু আমাদের আশা।'[২৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লিখেছেন :

> দেশ বিপন্ন হলে দেশের সংস্কৃতিও স্বাভাবিকভাবেই বিপন্ন হয়। তাই স্পেনের যুদ্ধে মাতৃভূমি রক্ষার্থে কবি-সাহিত্যিকেরা অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। নাৎসী ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক কামান চালিয়েছিলেন ফরাসী সাহিত্যিকরা। পাকিস্তানের উপর ভারতের সাম্প্রতিক কাপুরুষোচিত অতর্কিত হামলার সময় পাকিস্তানের বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের কবি সাহিত্যিকরাও প্রশংসনীয় মসী যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থায় আমাদের ছাত্র সমাজের কর্তব্য দেশ রক্ষার সামরিক ও বেসামরিক শিক্ষায় অবিলম্বে নিজেদের শিক্ষিত করে তোলা। কেবলমাত্র এই প্রয়োজনের দ্বারাই আমাদের ছাত্রসমাজ দেশের সংস্কৃতির যথার্থ সেবা করতে পারেন। সংস্কৃতি সংসদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। আশা করি দেশের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির বর্তমান সংকটকালে সদস্যবৃন্দ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবেন।[২৯]

৬. বিভেদ

সংস্কৃতি সংসদের সুনির্দিষ্ট কোন গঠনতন্ত্র ছিল কি না, তা স্পষ্ট জানা যায়নি। তবে এর নেতৃত্ব নিয়ে যে বিভেদ ছিল, তা অনেকের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

ওবায়দুল হক সরকার লিখেছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের সদস্য বজলুল করীম পরবর্তীকালে ড্রামা সার্কেল প্রতিষ্ঠা করেন।'[৩০] আনিসুজ্জামান লিখেছেন, "পরে আমরা ছাত্র থাকতেই শিল্প ও সাহিত্য পরিষদ নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান গড়ে

৬—

www.nagorikpathagar.org

উঠেছিল। এর উদ্যোক্তা ছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুরী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, হাসনাত আবদুল হাই, মোস্তাফা জামান আব্বাসী। অল্পকালের মধ্যে এদের সংগঠনও বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে।'[৩১] আসাদ চৌধুরী লিখেছেন, "মস্কোপন্থী পিকিংপন্থীর ঝগড়ার বাতাস এখানেও লেগেছিল।"[৩২]

কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৬৫ সালে বিভক্ত হয়ে যায়। তখন সংস্কৃতি সংসদও বিভক্ত হয়। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সংস্কৃতি সংসদ ছাত্র ইউনিয়নের সহযোগী সংগঠন হিসাবেই কাজ করে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট রাজনীতির বিভেদের প্রভাবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন বিভক্ত হয়ে গেলে বিভক্ত সংস্কৃতি সংসদ আগের মতো সক্রিয় থাকেনি।

৭. উপসংহার

সংস্কৃতি সংসদ যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সংগঠন ছিল, তা সত্ত্বেও গোটা পূর্ব বাংলার সংস্কারমুক্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পাকিস্তান আমলে সংস্কৃতি সংসদ পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। ১৯৫০-এর ও '৬০-এর দশকের প্রথমে সংস্কৃতি সংসদের ভূমিকা যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, পরে তা বহুলাংশে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

তথ্যনির্দেশ

১. ডঃ সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশে নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা* (বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮) পৃ ১৮৮

২. ওবায়দুল হক সরকার, *নাট্য আন্দোলনের স্মরণীয় দিন* (দৈনিক ইনকিলাব, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯২)

৩. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশ আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পর্যায়* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা। ডিসেম্বর, ১৯৭৬) পৃ ১৯৩

৪. আবুল কাসেম ফজলুল হক, সাক্ষাৎকার, ২০-৯-৯৩

৫. ওবায়দুল হক সরকার, পূর্বোক্ত

৬. আনিসুজ্জামান, *সংস্কৃতি সংসদের কথা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ সম্মেলন '৮৯ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, সম্পাদক, হামিদ কায়সার অপু)

৭. ফারুক আলমগীর, *সংস্কৃতি সংসদ* (হেমন্ত, ১৩৭২) পৃ ৬-৭

৮. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩) পৃ ২৭

www.nagorikpathagar.org

৯. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত

১০. ওবায়দুল হক সরকার, পূর্বোক্ত

১১. পূর্বোক্ত

১২. পূর্বোক্ত

১৩ The Pakistan Observer. Sept. 9, 1951.

১৪. দৈনিক সংবাদ, ২৪ ভাদ্র, ১৩৫৮

১৫. ওবায়দুল হক সরকার, পূর্বোক্ত

১৬. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত

১৭. সাঈদ–উর রহমান, পূর্বোক্ত

১৮. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *স্মৃতিময় সেই দিনগুলি* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ সম্মেলন '৮৯ স্মরণিকা)

১৯. বুলবুল খান মাহবুব, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুময় সেই দিনগুলি* (মাসিক অনুসরণ : সম্পাদক, শাহ আহমদ রেজা, এপ্রিল, ১৯৯৩) পৃ ৩৭

২০. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। পূর্বোক্ত

২১. ফারুক আলমগীর, পূর্বোক্ত সংকলন, পৃ ১০–১২

২২. রাহিজা খানম, নৃত্যশিল্প, ঢাকা, ১৯৭৯ পৃঃ ১২৭

২৩. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত

২৪. ফারুক আলমগীর (সম্পাদক) *সংস্কৃতি সংসদ* (হেমন্ত ১৩৭২) পৃ ২৪ এবং আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত

২৫. ফারুক আলমগীর, পূর্বোক্ত পৃ ২৩

২৬. ফারুক আলমগীর, পূর্বোক্ত পৃ ২০

২৭. পূর্বোক্ত

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ ১৯

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬

৩০. ওবায়দুল হক সরকার, পূর্বোক্ত

৩১. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত

৩২. আসাদ চৌধুরী, *সংস্কৃতির বিকাশ ধারা* (রক্তাক্ত বাংলা, কলকাতা, ১৯৭১) পৃ ৩০৪

www.nagorikpathagar.org

তিন. পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ১৯৫২

১. পটভূমি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর পাকিস্তানী শাসকরা প্রগতিশীল যে কোন আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। প্রগতিশীল, বামপন্থী বা সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন লোকদের বিরুদ্ধে শাসক গোষ্ঠী প্রথম থেকেই রুষ্ট ছিল। সে কারণে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে প্রগতিশীল লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকদের কার্যক্রমে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তখন পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিকেরা সংগঠিত হন। তাঁরা পূর্বতন অখণ্ড বাংলার সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[১]

এর বিপরীতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীরা সাম্যবাদী ধারা ও মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক ধারায় সাহিত্য রচনার জন্য সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেন। সে সম্পর্কে হাসান হাফিজুর রহমান লিখেছেন :

> ১৯৫২ সাল। ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। তখন সাহিত্যের জন্যে প্রবল উন্মাদনা। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু তরুণ সাহিত্যিক মাটি ফুড়ে ওঠার জন্য তছনছ হচ্ছি। পরস্পরের আগুন দিয়ে পরস্পরকে ছুঁই, কিন্তু সে আলো ছড়িয়ে দেয়ার পথ আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কারণ আমাদের পায়ের তলায় কোন ঠাঁই ছিল না। আমরা ধূমকেতুর মতো তেজে প্রখর, কিন্তু নিরবলম্ব। ঠাঁই ছিল না, তাই আমরা সংগঠিতও ছিলাম না। অসংগঠিত আমরা প্রবল উত্তেজনায় অস্থির, পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে ভাসছিলাম শুধু। আমরা বিকিরীত হচ্ছি, কিন্তু সংহত নই বলে শক্তি ও তাৎপর্যকে অপরের অনুভবে তীব্র করে তুলতে পারছিলাম না। সেই সময় 'প্রগতি লেখক সংঘ' ভেঙে গেছে। তরুণ সাহিত্যিকদের নতুন চেতনা নতুন বক্তব্যের সংগঠিত মাধ্যমের খোঁজে আমরা ছটফট করছি।
>
> সময়টা ৫২ সাল, ভাষা আন্দোলনের তুমুল মুহূর্ত। সেই সময়ে আমি হঠাৎ করে সওগাত প্রকাশনালয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি। সওগাত মানেই সাওগাত সম্পাদক নাসিরউদ্দীন সাহেব। নাসিরউদ্দীন সাহেব এবং সওগাতের প্রগতিশীল ভূমিকা আমাদের অজানা ছিল না। আমরা জানতাম, পাকিস্তান হওয়ার আগে

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত প্রায় দুই যুগ ধরে নাসিরউদ্দীন সাহেব মুক্তবুদ্ধির আলোক ছড়িয়ে দিতে কি কঠিন সংগ্রাম করেছেন। কুসংস্কার এবং অন্ধতার বিরুদ্ধে তিনি কি প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে ধীরে ধীরে নবচেতনার সচ্ছল পথ কাটাচ্ছিলেন। নাসিরউদ্দীন সাহেবের সংস্পর্শে আসা মাত্রই আমরা যেন পথের দিশা খুঁজে পেলাম। সওগাতে আমার বসার জায়গা মিললো, সেই সুযোগে তরুণ সাহিত্য-কর্মীদের ভিড় জমে উঠতে লাগলো সওগাতকে কেন্দ্র করে। আমরা কতিপয় ক্ষুধার্ত সাহিত্যিক নাসিরউদ্দীন সাহেবের আতিথেয়তার উপর অনবরতই হামলা করতে শুরু করলাম। সওগাতে তরুণদের যাতায়াত নিয়মিত হয়ে উঠলো। ভিড়ও বাড়তে লাগলো। খাদ্যের লোভে আমরা সমবেত হয়েছিলাম, না সমধর্মিতার আকর্ষণে একটা প্লাটফর্মের চারপাশে আমরা সংঘবদ্ধ হওয়ার অন্তর্নিহিত তাড়নায় একত্র হচ্ছিলাম, তার চুলচেরা বিশ্লেষণের আজ কোন প্রয়োজন নেই। নাসিরউদ্দীন সাহেবকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা সওগাতের প্ল্যাটফর্মে একত্র হয়েছিলাম, এটাই বড় কথা। নাসিরউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমাদের এই যোগাযোগ প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের এক স্বর্ণপ্রসূ ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দিল। আমরা 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গড়ে তুললাম সেই ১৯৫২ সালেই। প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের প্রথম সংগঠন নাসিরউদ্দীন (১৮৮৯—১৯৯৩) সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত হলো। কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব সভাপতি। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন (১৯১৪—১৯৭৬), বেগম সুফিয়া কামাল (জ. ১৯১১), অজিত কুমার গুহ (১৯১৪—১৯৬৯), কামরুল হাসান (১৯২২-১৯৮৯), মুনীর চৌধুরী (১৯২৪-১৯৭১), আবদুল গণি হাজারী, শামসুর রাহমান (জ. ১৯২৯), আলাউদ্দিন আল আজাদ (জ. ১৯৩২), ফয়েজ আহমেদ (জ. ১৯২৯), মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ফজলে লোহানী (-১৯৮৫), আনিস চৌধুরী, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ (জ. ১৯৩৩), আতোয়ার রহমান (জ. ১৯২৭), আবদুল গাফফার চৌধুরী (জ. ১৯৩১), আনিসুজ্জামান, খালেদ চৌধুরী, লায়লা সামাদ (জ. ১৯৩৪), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (জ. ১৯৩৪) প্রমুখ এই সংগঠনের সদস্য হিসেবে সক্রিয় হয়ে উঠলেন।

সেই সময়ে সাহিত্যসভার প্রতিটিতেই প্রায় দু'শো আড়াইশো লোক জমায়েত হতেন। নাসিরউদ্দীন সাহেবের অবারিত আতিথ্য, প্রত্যেক সভাতেই চা-মিষ্টির ব্যবস্থা থাকতো। অনেক প্রবীণ সাহিত্যিকও উৎসাহের সঙ্গে এই সভায় যোগ দিতেন। তরুণদের নতুন চেতনার সঙ্গে তাঁদের পরিণত মনোভাবের

www.nagorikpathagar.org

গভীর যোগাযোগ ঘটেছে। যা অগ্রসর চিন্তার অনুকূল, তারই একটি স্থায়ী আসন পাকাপোক্তভাবে দ্রুত গড়ে উঠতে লাগলো। প্রতিক্রিয়ার কাছে এদেশের সাহিত্য যে আত্মসমর্পণ করেনি বা পরাজিত হয়নি, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ভূমিকাই তার জন্য সর্বতো কৃতিত্বের দাবীদার, এ এক ঐতিহাসিক সত্য। নাসির উদ্দীন সাহেবের কাছে তাই এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস অশেষ ঋণী, মুক্ত কণ্ঠে তা এখন বলা যায়।

শুধু সংগঠনের জন্য আশ্রয় দেয়াই নয়, প্রগতিশীল সাহিত্যের মুখপত্র হিসেবে ঢাকা থেকে সওগাতের পুনঃপ্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও আরেক অসীম উপকার নাসিরউদ্দীন সাহেব আমাদের করেছিলেন। পাকিস্তানের আগেও যেমন, তেমনি পাকিস্তানের পরেও, সওগাত-ই এই দেশের প্রথম প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। এই সত্যের পুরো তাৎপর্য বোঝা এখন হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা যারা তখন মাটির উপর শক্ত পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম, নিজেদের ধ্যানধারণা চারপাশে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম, তাদের কাছে এই সত্য আজও অমলিন। একথা ভাবলে আজও আমাদের মাথা নত হয়ে আসে নাসিরউদ্দীন সাহেবের প্রতি।[২]

ফয়েজ আহমদ লিখেছেন, প্রগতি লেখকদের সংঘের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবার পর স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট শূন্যতার মধ্যে অল্পদিনের জন্য 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এবং পরে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হিসাবেই 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ-এর জন্ম।'[৩] পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ছিল মুক্ত সাহিত্য সংগঠন। এই প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল র‍্যাংকিন স্ট্রিটের ইঞ্জিনিয়ার দাসবাবুর বাড়িতে।[৪]

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠনের ক্ষেত্রে হাসান হাফিজুর রহমানের দান ছিল অসামান্য। তিনি তাঁর সাংগঠনিক শক্তির বলে ও কর্মোদ্দীপনার মাধ্যমেই প্রগতিশীল লেখকদের সওগাত অফিসে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের পৃষ্ঠপোষকতায় সমবেত করতে পেরেছিলেন। একথা সাহিত্য সংসদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন।[৫]

তবে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ঠিক কবে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়েছিল, তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ডঃ সাঈদ-উর রহমান (জ. ১৯৪৪) কোন সূত্র উল্লেখ না করে লিখেছেন, '১৯৫২ সালের শেষ দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ।'[৬]

২. সংগঠন

১৯৫২ সালে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠনের পর থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এর কার্যক্রম চালু ছিল। এই সময়কাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল, নতুন ও আধুনিক সাহিত্যিকদের মুখ্য সংগঠন ছিল পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ।[৭]

www.nagorikpathagar.org

ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন বরাবরই এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫২ সালের নির্বাহী কমিটিতে সহ-সভাপতি ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, বেগম সুফিয়া কামাল ও আবদুল গণি হাজারী (১৯২৫-১৯৭৬), সম্পাদক ছিলেন ফয়েজ আহমদ। এ প্রসঙ্গে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম লিখেছেন, "প্রগতিশীল এবং মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ তখনকার দিনের অনেক লেখক শিল্পীই ছিলেন পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সাথে। তাঁদের অনেকেই লেখা পড়েছেন, আলোচনায় অংশ নিয়েছেন সংসদের বৈঠকগুলোতে। সবার নাম এমুহূর্তে মনে আনতে পারছি না। তবে সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯২৩—১৯৭৮), শামসুর রাহমান, ফজলে লোহানী, আনিস চৌধুরী, আলাউদ্দীন আল আজাদ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬—১৯৭১), কামরুল হাসান, আমিনুল ইসলাম, মুর্তাজা বশীর, আতোয়ার রহমান, খান সারোয়ার মুর্শেদ, শহীদ সাবের, খালেদ চৌধুরী, রোকনুজ্জামান খান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, অজিত গুহ, সৈয়দ শামসুল হক (জ. ১৯৩৫), আনিসুজ্জামান—এঁরা ঘনিষ্ঠ ছিলেন।"[৮]

১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন আতোয়ার রহমান। ১৯৫৮ সালের শেষে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের শেষ সম্পাদক ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-৮৩)।[৯]

১৯৫৪-৫৭ সালের জন্য পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের নির্বাহী কমিটি ছিল নিম্নরূপ :[১০]

সভাপতি	:	ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন
সহ-সভাপতি	:	বেগম সুফিয়া কামাল, আবদুল গণি হাজারী, অজিত গুহ, শওকত ওসমান
সাধারণ সম্পাদক	:	আতোয়ার রহমান
অফিস সম্পাদক	:	আনিসুজ্জামান
সাহিত্য সম্পাদক	:	হাসান হাফিজুর রহমান
অনুষ্ঠান সম্পাদক	:	বোরহান উদ্দীন খান (জাহাঙ্গীর)
কোষাধ্যক্ষ	:	সরদার জয়েনউদ্দীন
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	আবদুল্লাহ আল-মূতী শরফুদ্দীন
সদস্য	:	ফয়েজ আহমদ, আলউদ্দীন আল আজাদ, লায়লা সামাদ, লুৎফুল হায়দার চৌধুরী, হামেদ শফিউল ইসলাম, আ স ম আবদুল ওয়াহেদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম।

১৯৫৭ সালের ১৮ মে আতোয়ার রহমান ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে এক মাসের

www.nagorikpathagar.org

জন্য সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি নেন। ওই এক মাস আলাউদ্দীন আল আজাদ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

৩. গঠনতন্ত্র

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র ছিল বলে জানা যায়। তবে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করে এর কোন কপি পাওয়া যায়নি।[১১]

৪. কর্মতৎপরতা

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কর্মতৎপরতা প্রধানত আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাক্ষিক সাহিত্য সভা ছাড়াও কখনও কখনও এর বিশেষ সভা বসত। তবে কোন কোন সময় এর শ্রোতা সংখ্যা দেড় শ' পর্যন্ত হত। এ সম্পর্কে ফয়েজ আহমদ লিখেছেন: সাহিত্য সংসদের পক্ষ থেকে নিয়মিত পাক্ষিক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হত। আমাদের প্রায় সব ক'টি এ জাতীয় সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সওগাত পত্রিকার পটুয়াটুলিস্থ অফিসে। সওগাত পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় নাসিরউদ্দীন আমাদের এই সমস্ত সভার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন। সে সময়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে সংসদের অগ্রগতি যে ব্যাহত হত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাক্ষিক সাহিত্য সভায় কবি সাহিত্যকদের পূর্ব-নির্ধারিত রচনা আলোচনা-সমালোচনা করতেন বিশিষ্ট সমালোচক-সাহিত্যিকগণ। এই সমস্ত সাহিত্য-সভা এমনই গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় ছিল যে, কোন কোন সময় দীর্ঘ তিন চার ঘন্টা চলার পরও শেষ হতো না। বৈঠকগুলোর প্রধান আকর্ষণ কবিতা গল্প বা প্রবন্ধ পাঠ নয়, আলোচনা। গঠনমূলক তীব্র ও কঠোর সমালোচনায় অনেক সময় অনেক সাহিত্যিককে বিব্রতবোধও যে করতে হয়নি তা নয়।[১২]

প্রধানত সাহিত্য বৈঠকের বাইরে তেমন কোন বড় ধরনের কার্যক্রম ছিল না। তবে ১৯৫৪ সালের ২৩ থেকে ২৬ এপ্রিল ঢাকায় যে সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ।[১৩]

১৫-০৪-১৯৫৪ তারিখে সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ পালিত হয়। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে লায়লা সামাদ লিখেছেন :

> নববর্ষ পালনের উদ্যোগ নিয়েছিল হাসান [হাসান হাফিজুর রহমান] এবং আরও কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক। সেদিন সকালে সংসদের বার্ষিক অধিবেশন হয় ও সংসদের নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করা হয়। সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠান ও নৃত্যনাট্য 'শকুন্তলা' মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করা হয়। এই নৃত্যনাট্যটির পরিকল্পনা পরিচালনা ব্যবস্থাপনা এমনকি মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যসজ্জার সব কিছুর দায়িত্ব ছিল আমার ওপর।...

www.nagorikpathagar.org

হাসানের ধারাবিবরণী নৃত্যনাট্যটিকে এমন রূপ দিয়েছিল, যা নিয়ে সাড়া পড়ে গিয়েছিল চার দিকে। স্থানীয় পত্রিকায় সে নাটক সম্পর্কে এমনই মন্তব্য করা হয়েছিল। ১৬এপ্রিল '৫৪ সালে মিল্লাত পত্রিকায় লেখা হয়েছিল 'নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া রাজধানীর নাগরিকগণ' এবারকার নববর্ষ পালনে যতগুলি উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ কর্তৃক আয়োজিত এবং স্থানীয় মাহবুব আলী রেলওয়ে ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত নৃত্যনাট্য নতুনত্ব ও অভিনবত্বের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

ইত্তেফাক লেখে, 'এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি পূর্ব বঙ্গের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নূতন উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছে। দর্শকগণ বিমোহিত চিত্তে শেষ পর্যন্ত উহা উপভোগ করেন।'[১৪]

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায় এর দীর্ঘদিনের সাধারণ সম্পাদক আতোয়ার রহমানের অপ্রকাশিত ডাইরী থেকে। এসব তারিখের কাছাকাছি দৈনিক আজাদ পত্রিকার শহর ও শহরতলী কলামে এর সমর্থন মেলে।

১০-০৫-১৯৫৪ তারিখে সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে ফজলুল হক হল মিলনায়তনের রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ।

২৭-০৫-১৯৫৪ তারিখে সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে ফজলুল হক হল মিলনায়তনে নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়।

০৫-১১-১৯৫৪ তারিখে সাহিত্য সংসদের প্রথম মাসিক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয় ফজলুল হক হল মিলনায়তনে। সভাপতি ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন (পরবর্তীকালে শামসুদ্দীন আবুল কালাম)। এতে রম্য রচনা পাঠ করেন নূরুল মোমেন। কবিতা পড়েন মোহাম্মদ মামুন, আল মাহমুদ। এই অনুষ্ঠানে বার্নার্ড শ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়েন ভবেশ মুখার্জী। গল্প পড়েন সৈয়দ শামসুল হক। আবৃত্তি করেন হোসনে আরা। অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন আনোয়ার উদ্দীন আর সেতার বাজিয়েছিলেন মতিলাল দে।

১৪-১১-১৯৫৪ তারিখে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর (১৮৯৬—১৯৫৪) মৃত্যুতে সাহিত্য সংসদ শোকসভার আয়োজন করে। এই দিনের অনুষ্ঠানটির স্থান ছিল সওগাত কার্যালয়। এতে সভাপতি ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। আলোচনা করেন আতোয়ার রহমান, কবি আবদুল কাদির (১৯০৬—১৯৮৪), বেগম সুফিয়া কামাল, মঈনউদ্দীন, আজহারউদ্দীন। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর রচনা থেকে পড়ে শোনান আল মাহমুদ (জ. ১৯৩৬) ও আবদুল গাফফার চৌধুরী। প্রবন্ধ পড়েন মিজানুর রহমান, আবদুল হক। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিলেন ২৯ জন।

২৯-১১-১৯৫৪ তারিখে সাহিত্য সংসদের পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতি ছিলেন বাহাউদ্দীন চৌধুরী। কবিতা পড়েন আল মাহমুদ। গল্প পড়েন মাহমুদ শাহ

www.nagorikpathagar.org

কোরেশী (জ.১৯৩৬)। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ২৭ জন।

০৩-১২-১৯৫৪ তারিখে সংসদ হেমিংওয়ের ওপরে বিশেষ অনুষ্ঠান করে। এতে সভাপতিত্ব করেন কাজী মোতাহার হোসেন। প্রবন্ধ পড়েন আতোয়ার রহমান। আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি।

১৪-০১-১৯৫৫ তারিখে সওগাত অফিসে সংসদের সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন সৈয়দ মুস্তফা আলী। প্রবন্ধ পড়েন বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। কবিতা পড়েন শামসুর রাহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ। রম্য রচনা পড়েন আবু জাফর শামসুদ্দীন। আলোচনায় অংশ নেন আতোয়ার রহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আলাউদ্দীন আল আজাদ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল গণি হাজারী, আজিজুল হাকিম, সিরাজুল হক। এতে উপস্থিত ছিলেন ২৭ জন।

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে মাঝে মাঝে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। সংসদ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা শ্রবণ করত।

০৭-০১-১৯৫৫ তারিখে সংসদ সদস্যরা ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর স্মৃতিকথা শ্রবণ করেন। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। তিনি আবেগময় ভাষায় বক্তৃতা করে অনুষ্ঠানকে মোহিত করে তোলেন।

২১-০১-১৯৫৫ তারিখে সংসদ ফজলুল হক শেলবর্ষীর স্মৃতিকথা শ্রবণ করেন। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর রহমান খাঁ। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৫৫।

১৫-০৭-১৯৫৫ তারিখে সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে মওলানা আকরম খাঁর স্মৃতিকথা শ্রবণ করা হয়, মওলানার বাড়ীতেই। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ২৮।

এছাড়া সংসদের উদ্যোগে গোলাম মোস্তফার বাড়ীতে তাঁর স্মৃতিকথা শ্রবণ করা হয়। এবং ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর স্মৃতিকথাও শ্রবণ করা হয়।

২৮-০১-১৯৫৫ তারিখে পাক্ষিক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আ ন ম বজলুর রশীদ। কবিতা পাঠ করেন লতিফা রশী· আল মাহমুদ। প্রবন্ধ পাঠ করেন আনিসুজ্জামান। গল্প পড়েন মিরজা আবদুল হাই। আলোচনা করেন শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল হক, আতোয়ার রহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আহমদ শরীফ। অনুষ্ঠানে সভাপতি তাঁর সম্পূর্ণ বক্তৃতা কবিতাকারে উপস্থাপন করেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ৪২ জন।

০১-০৪-১৯৫৫ তারিখে সংসদের পাক্ষিক সভা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ মুস্তফা আলী। অনুষ্ঠানে কবিতা পড়েন আবুল ফজল সাহাবুদ্দীন (ফজল শাহাবুদ্দীন), লুৎফুল হায়দার চৌধুরী। গল্প পড়েন আলাউদ্দীন আল আজাদ। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৪০।

www.nagorikpathagar.org

১৫-০৪-১৯৫৫ তারিখে সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ পালিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল, গান পরিবেশন করেন লতিফা রশীদ। নববর্ষের এই অনুষ্ঠানটি হয় ঢাকা হল মিলনায়তনে। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩০০'র উর্ধ্বে।

২২-০৪-১৯৫৫ তারিখে সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে ইকবাল স্মৃতি সভার আয়োজন করা হয়। ইকবাল স্মৃতি সভার অনুষ্ঠানটি ঢাকা বার লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংসদের পক্ষ থেকে অংশ গ্রহণ করেন হানিফ হক ও নেয়ামুল বশীর। সাহিত্য সংসদের এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তাহলো বড় ধরনের অনুষ্ঠানগুলি অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে করা হতো।

০৯-০৫-১৯৫৫ তারিখে সাহিত্য সংসদ অন্যান্য সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্তভাবে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। অনুষ্ঠানটি ঢাকা হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

০৮-০৬-১৯৫৫ তারিখে সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন (শামসুদ্দীন আবুল কালাম) (জ. ১৯২৬)। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল হাজারেরও বেশী। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় কার্জন হলে। এতে গান গেয়েছিলেন সোহরাবউদ্দীন, বেদারুদ্দীন আহমদ ও আরো অনেকে। এতে শহীদ কাদরী বিরচিত একটি ছায়া নাটক পরিবেশন করা হয়।

৩০-০৩-১৯৫৬ তারিখে সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে বাংলা একাডেমী ভবনে 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা' সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন। আলোচনা করেন ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা (১৯০০—১৯৭৮), অধ্যক্ষ আবদুর রহমান খাঁ, জনাব মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮—১৯৭৪), জনাব কিউ এন জুলফিকার আলী ও জনাব আবদুল হক ফরিদী।

৫. একুশের সংকলন

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ কর্মীরা ১৯৫৩ সালের মার্চে প্রকাশ করেন 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নামে একটি মূল্যবান সংকলন। কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ভাষা আন্দোলনের স্মারক এই সংকলনটি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে মাইলফলক হিসাবে উল্লিখিত হয়ে থাকবে।

একুশের এই সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে। সে সময় এর দাম ছিল "দু'টাকা আট আনা"। প্রকাশ করেছিলেন "পুঁথিপত্র প্রকাশনীর পক্ষ থেকে মোহাম্মদ সুলতান"। প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন আমিনুল ইসলাম, রেখাঙ্কন করেছিলেন মূর্তজা বশীর ও অন্যান্য। পাইওনিয়ার প্রেসের পক্ষ থেকে ছেপেছিলেন এম এ মুকিত। ব্লক তৈরি

www.nagorikpathagar.org

করেছিলেন "এইচম্যান কোম্পানী, বাদামতলী ঢাকা"। সংকলনটির উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল

যে অমর দেশবাসীর মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছেন
একুশের শহীদেরা
যে অমর দেশবাসীর মধ্যে অটুট হয়ে রয়েছে
একুশের প্রতিজ্ঞা,
তাঁদের উদ্দেশ্যে

সংকলনে "একুশের প্রবন্ধ গল্প কবিতা গান নকসা ইতিহাস" স্থান লাভ করেছে। সংকলনের ভূমিকায় লেখা ছিল :

"একুশে ফেব্রুয়ারী"

একটি মহৎ দিন হঠাৎ কখনো জাতির জীবনে আসে যুগান্তের সম্ভাবনা নিয়ে। পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারী এমনি এক যুগান্তকারী দিন। শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে নয়, একুশে ফেব্রুয়ারী সারা দুনিয়ার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। দুনিয়ার মানুষ হত-চকিত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনতার দুর্জয় প্রতিরোধের শক্তিতে, শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছে ভাষার দাবীতে পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণদের এই বিশ্ব ঐতিহাসিক আত্মত্যাগে। জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে, জনতার গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য দুনিয়া জোড়া মানুষের যুগ যুগ ব্যাপী যে সংগ্রাম, একুশে ফেব্রুয়ারী তাকে এক নতুন চেতনার উন্নীত করেছে। মেকি আজাদীর রঙিন ছটা আর উজ্জ্বল নতুন দিনের সোনালী স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, জাতির জীবনে সমগ্র দেশের বুকে নেমে এসেছে নিরন্ধ্র অন্ধকারের কালো বিভীষিকা। সামন্তবাদ সাম্রাজ্যবাদের দোসর প্রতিক্রিয়ার দানবীয় নিষ্পেষণে দেশের অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু, শিক্ষার অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীনতা বিপর্যস্ত, গণতন্ত্র নির্বাসিত। আর এই নিঃসীম অন্ধকারের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে জনতার জীবন গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন।

এমনি দুর্দিনে এক ঝলক আশীর্বাদের মতই এল একুশে ফেব্রুয়ারী। দিনে দিনে যে বিপুল বিক্ষোভ পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে জমে ছিল মানুষের মনে মনে, শহীদের পবিত্র রক্তের স্পর্শে যেনো কোন মন্ত্রগুণে তার বাঁধ গেলো ভেঙে—উচ্ছল জোয়ারের কলধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশজুড়ে।

শহীদের আত্মদান সমগ্র আন্দোলনকে এমন এক পবিত্র মহিমায় মণ্ডিত করলো যে, দেশের আপামর সাধারণ মানুষ প্রতিক্রিয়ার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এই আন্দোলনে সামিল হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করল না। প্রথম দিকে ছাত্র এবং শহরের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে ভাষা ও সংস্কৃতির এই আন্দোলনের

www.nagorikpathagar.org

সূত্রপাত হলেও, একুশে ফেব্রুয়ারী তাকে ছড়িয়ে দিলো দেশের আনাচে-কানাচে; গ্রাম-গ্রামান্তরের সুদূরতম প্রান্তে। শহীদের রক্ত ডাক দিল দেশজোড়া কিষাণের শক্তিকে, মধ্যবিত্তের শক্তিকে—দেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষকে। আর এই বিপুল জমায়াতের সামনে পড়ে সাময়িকভাবে হলেও পিছু হঠতে বাধ্য হল প্রতিক্রিয়ার শক্তি।

একুশে ফেব্রুয়ারীর পেছনে দেশজোড়া এই বিপুল জমায়েত সম্ভব হয়েছিল, কেননা এ তো শুধু ভাষা আর সংস্কৃতির প্রশ্নই ছিল না। এর সাথে জড়িয়ে ছিল আমাদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন ও বিভিন্ন ভাষাভাষী জনতার আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী, বাঙালীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রশ্নও। জাতিগত ও আঞ্চলিক অত্যাচার ও শোষণের চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় এই ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়াতে পূর্ব পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর দেশপ্রেমিক মানুষ তাই কোন আত্মত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

একুশে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানে শুধু গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই জোয়ার সৃষ্টি করেনি, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এনেছে দিগন্ত বিসারী প্লাবন। প্রতিক্রিয়ার নির্মম হিংসা ও লোভের আগুন থেকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচাবার জন্য দেশ জুড়ে জনতার যে দুর্জয় ঐক্য গড়ে উঠেছে পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি এই দরদ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নতুন গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক বিকাশের বিপুল সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে— আপামর মানুষের মনে আমাদের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিকে নতুন সম্ভাবনার পথে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে।

প্রতিক্রিয়ার শক্তি জনতার বিপুল ঐক্যের সামনে সাময়িকভাবে পিছু হঠলেও আজ আবার নতুন করে তার বিভেদ এবং ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী জনতার মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, জাতিসমূহের গণতান্ত্রিক অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার, স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার হরণ করে, অত্যাচার শোষণ এবং কায়েমী স্বার্থের অধিকারকে পাকাপাকি করার আয়োজন করছে।

একুশে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের জনতাকে পথ দেখিয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারী দেখিয়েছে, জনতার সকল শ্রেণীর প্রগতিশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হলে প্রতিক্রিয়ার সমস্ত ষড়যন্ত্রকে পরাজিত করা সম্ভব।

একুশে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রথম ব্যাপক পশ্চাদপদানুসরণের সূচনা করেছে। সূচনা করেছে জনতার ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়াভিযান এবং সুদূরপ্রসারী সাংস্কৃতিক নব জাগরণের।

www.nagorikpathagar.org

একুশে ফেব্রুয়ারী তাই পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি অশেষ গৌরবমণ্ডিত ক্রান্তিকালের দিন।

একুশে ফেব্রুয়াবীকে সালাম!

পূর্ব পাকিস্তানের নবজাগ্রত জনতার বিজয়াভিযানকে সালাম!

সংকলনে প্রবন্ধ লেখেন আলী আশরাফ (সকল ভাষার সমান মর্যাদা)। এতে কবিতা সংকলিত হয় শামসুর রাহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল গণি হাজারী, ফজলে লোহানী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আনিস চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, জামালুদ্দিন, আতাউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক ও হাসান হাফিজুর রহমানের। ছোটগল্প লেখেন : শওকত ওসমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম, আজিজ সিকদার, আতোয়ার রহমান। একুশের নকশা লেখেন মূর্তজা বশীর (একটি বেওয়ারিশ ডায়েরীর কয়েকটি পাতা) ও সালেহ আহমদ। উল্লেখ্য, শামসুর রাহমানের কবিতাটি ১৯৫১ সালে প্রথম ঢাকা কলেজ বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর একুশের সেই বিখ্যাত গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' স্থান পায় এই সংকলনে। আর ছিল কবিরউদ্দীন আহমদ সংকলিত ৫২'র একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাপঞ্জী (একুশের ইতিহাস)।[১৫]

সংকলনটি আজও আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত।

৬. পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের বিরুদ্ধে সরকারী মনোভাব

পাকিস্তান সরকার বরাবরই পাকিস্তান সাহিত্য সংসদকে কম্যুনিস্টদের সংগঠন মনে করে সন্দেহের চোখে দেখেছে। কখনও কখনও নানা ধরনের হামলাও হয়েছে এর কর্মীদের বিরুদ্ধে। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮—১৯৯৪)লিখেছেন[১৬] :

"১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি সময়। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ তখন শক্তিশালী সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আর সওগাত ছিল উক্ত সাহিত্য সংসদের মুখপত্র। কিন্তু উর্দুপন্থী প্রগতি-বিরোধীরা এই তরুণ লেখক গোষ্ঠীর উত্থান এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাদের অগ্রযাত্রা সহ্য করতে পারলেন না। তরুণ দলের গোঁড়ামীমুক্ত জীবনবাদী কবিসাহিত্যিকরা উর্দুর দ্বারা বাংলা ভাষাকে বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র উন্মোচন করে দিলেন। তাঁদের মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত লেখনী উর্দুপন্থীদের কায়েমী স্বার্থের দুর্গে আঘাত হানলো।

'সাহিত্য সংসদের বিরুদ্ধাচারী দলের কে বা কা'রা স্বরাষ্ট্র বিভাগে এই মর্মে অভিযোগ করে যে, সওগাত অফিসে একদল লেখক একটি সংঘ স্থাপন করেছে এবং এই সংঘ থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র-বিরোধী কার্য-কলাপ পরিচালনা করা হয় এবং সওগাত প্রেসে তাদের প্রচারপত্র ইত্যাদি ছাপা হয়।"

www.nagorikpathagar.org

হঠাৎ একদিন রাত তিনটার সময় একদল পুলিশ সওগাত অফিসে প্রবেশ করে তারা তাঁকে সেখানে নিয়ে আসার জন্য দারোয়ানকে হুকুম দেয়। প্রেস থেকে রওশন আলী তাঁর বাড়ীতে টেলিফোন করে জানায় যে, পুলিশের অনেক লোক সওগাত অফিসে ঢুকেছে এবং তারা তাঁকে চায়। তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন এবং ভাবলেন তাঁকে হয়তো কোন কেসে ফেলেছে এবং ধরে নিয়ে যেতে পারে। স্ত্রীকে বললেন- অতিরিক্ত কিছু কাপড় দিতে, সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা কাঁদাকাঁটি করতে লাগলো। তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তিনি কোন প্রকার অপরাধ করেননি। 'আমাকে হয়রানী করা ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না'—এই বলে পাটুয়াটুলীস্থ সওগাত অফিসে তিনি চলে এলেন।

এসে দেখলেন সেখানে অনেক পুলিশ এবং একটা থমথমে ভাব। জিজ্ঞেস করলেন, তারা কেন এসেছেন এবং এত রাতে তাঁকে কেন ডেকেছেন?

পুলিশ অফিসার বললেন, এত রাতে বিরক্ত করার জন্য তারা খুবই দুঃখিত। কিন্তু তারা অভিযোগ দেখালেন।

সওগাত অফিস রাষ্ট্রদ্রোহীদের ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রস্থল। বিপ্লবী লেখকদের প্রচার-পত্র ইত্যাদি সওগাত প্রেসে ছাপা হয়। সেখানে এসব কাজের সন্ধান পেলে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

নাসিরুদ্দিন বললেন-সওগাত দেশের সর্বপুরাতন ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রিকা। তিনি এর সম্পাদক এবং বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক এবং সর্বস্তরের লেখকগণ এই পত্রিকার সংগে সংযুক্ত।

তিনি তাড়াতাড়ি সওগাতের অনেকগুলি কপি এনে পুলিশ অফিসারের সামনে রেখে বললেন, আপনারা এক এক পাতা করে দেখুন সওগাতে কোন রাষ্ট্র বিরোধী লেখা প্রকাশিত হয়েছে কি-না। তিনি বললেন, তিনি কেবল পত্রিকা সম্পাদকই নন রাষ্ট্র ও সমাজেরও একজন সেবক। পুলিশ অফিসার বললেন- তাঁর কথা সত্য হলেও প্রেসে বর্ণিত কোন প্রচারপত্র ছাপা হয়েছে কিনা, দেখা প্রয়োজন।

অনুসন্ধানে দেখা গেল, রাষ্ট্র বা সমাজবিরোধী কিছুই এখানে ছাপা হয়নি। বরং রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক বিষয়সমূহ ছাপা হয়েছে। যে সব কাগজপত্র ছাপা হয়েছে তার ফাইল এবং কম্পোজ করা ফর্মা ইত্যাদিও তাদেরকে তিনি দেখালেন।

তিনি পুলিশ অফিসারকে জানালেন যে, সওগাতের লেখকগণ এখানে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ও আলোচনাই করে থাকেন, যা জাতি গঠনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কাজ।

পুলিশ অফিসার লিখলেন-'সওগাত সাহিত্যক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদান রেখেছে এবং এর লেখক গোষ্ঠী দেশভক্ত, সমাজ ও সাহিত্যের উন্নতিকামী।'

তাঁর সামনেই রিপোর্ট লেখা হলো এবং অভিযোগ যে মিথ্যা তা বলা হল। তারা তাঁকে বললেন- কিছু মনে করবেন না। কর্তব্যের খাতিরে আপনাকে বিরক্ত করেছি। একজন

www.nagorikpathagar.org

মহান ব্যক্তি ও একটি মহৎ সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এরূপ মিথ্যা অভিযোগ করা অন্যায় কাজ। ব্যাপরটা যে মিথ্যা ও শত্রুতামূলক তা বোঝা গেল।

৭. অবলুপ্তি

সাহিত্য সংসদ কর্মীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। অনেকে আবার এর পাশাপাশি অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গেও জড়িত হয়ে পড়েন। '১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারীর পর এই প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটে।'[১৭] সামরিক শাসনামলে লেখক-বুদ্ধিজীবীরা ব্যাপকভাবে যোগদান করেন 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' ও 'পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা'য়। সে সব ঘটনার বিবরণ এই অধ্যায়েই পরে দেওয়া হয়েছে।

৮. উপসংহার

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কার্যক্রম স্থায়ী হয়েছিল ৬ বছর। কিন্তু এই স্বল্পকালেই প্রগতিশীল সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে এই সংগঠনের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানবাদী শুধুমাত্র ইসলামপন্থী সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার জোয়ারের মুখে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। সে জন্য এই সংগঠনটির অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

১. আবদুল গণি হাজারী, *'সাহিত্যে বিপন্নবাদ'* মাসিক সওগাত, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

২. উদ্ধৃত, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *'হাসানের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়* (হাসান হাফিজুর রহমান স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদক খালেদ খালেদুর রহমান, জুন ১৯৮৩) পৃ ২০-২২

৩. ফয়েজ আহমদ, *রাজনৈতিক ব্যক্তি হাসান* (পূর্বোক্ত স্মারক গ্রন্থ) পৃ ৩৯৬

৪ ফয়েজ আহমদ, *সত্যবাবু মারা গেছেন* (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, জুন ১৯৮৪) পৃ ১৭

৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য পূর্বোক্ত স্মারক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

৬. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন* (ঢাকা, ১৯৮৩) পৃ ২০

৭. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশ আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পর্যায়* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর, ১৯৭৬) পৃ ১৯২

৮. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *স্বজন-কথা*, পূর্বোক্ত স্মারক গ্রন্থ, পৃ ১৯০

৯. রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত

১০. আতোয়ার রহমানের ডাইরী থেকে, (সাক্ষাৎকার, ৮-৫-১৯৯৩)

১১. গঠনতন্ত্র সংগ্রহের জন্য জনাব আতোয়ার রহমান নিজে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন বলে জানান। (৮-৫-১৯৯৩)

www.nagorikpathagar.org

১২. ফয়েজ আহমদ, *মধ্যরাতের অশ্বারোহী* (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা। সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৮২) পৃ ৩২

১৩. সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে

১৪. লায়লা সামাদ, *হাসান হাফিজুর রহমান* (পূর্বোক্ত স্মারক গ্রন্থ) পৃ ১১৯

১৫. হাসান হাফিজুর রহমান, (সম্পাদক) *একুশের সংকলন*, ঢাকা, মার্চ, ১৯৫৩

১৬ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* (সওগাত প্রেস, ঢাকা) পৃ ১৩২২-১৩২৩

১৭. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশ আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পর্যায়* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৭৬) পৃ ১৯২

www.nagorikpathagar.org

চার. বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ১৯৫৫

১. প্রতিষ্ঠা ও পটভূমি

উপমহাদেশের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর (১৯১৯–১৯৫৪) স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে ললিতকলা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৯৫৫ সালের ১৭ মে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় বুলবুল ললিতকলা একাডেমী।[১] এদেশের সংস্কৃতিচর্চার এক ক্রান্তিলগ্নে বুলবুল চৌধুরী আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকলাকে সাংস্কৃতিক সৌকর্যে অভিষিক্ত করেছিলেন। অন্যদিকে উদয়শঙ্কর নৃত্যকলাকে দিয়েছিলেন লোকপ্রিয়তা। এই দুই ধারার সেতুবন্ধ হিসাবে নৃত্যচর্চায় বুলবুল চৌধুরীর অবদান অনস্বীকার্য। রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে নৃত্যশিল্পকে জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি ললিতকলার এই ধারাটি উজ্জীবিত করেন।'[২]

বুলবুল চৌধুরীর নৃত্যচর্চা সম্পর্কে আবুল ফজল (১৯০৩–১৯৮৩) লিখেছেন : নৃত্যের ক্ষেত্রে বুলবুল মুসলিম ঐতিহ্য, আবহাওয়া ও পরিবেশ সৃষ্টি করে নৃত্যকে একটি জাতীয় শিল্পের রূপ ও মর্যাদা দিয়েছিলেন। মুসলিম ইতিহাস, পুরাকাহিনী ও কাব্য থেকে উপকরণ নিয়ে তিনি বিভিন্ন ও অভিনব নৃত্যরূপ গড়ে তুলেছিলেন এবং এইভাবে মুসলমান সমাজে ও দেশে অবহেলিত নৃত্যশিল্পকে তিনি মুসলিম দর্শকদেরও প্রাণের ও মানসতৃপ্তির রসবস্তু করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। আবুল ফজলের মতে এটাই বুলবুলের শ্রেষ্ঠ অবদান। এই ক্ষেত্রে তার অসাধারণ সাফল্য শিল্পজিজ্ঞাসু মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর মতে, বুলবুল শুধু অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না — ছিলেন একক ও অদ্বিতীয়। ইরানের পান্থশালা, হাফিজের স্বপ্ন, রুস্তম–সোহরাব, চাঁদ সুলতানার নৃত্যরূপ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বুলবুলের নৃত্য প্রতিভার মৌলিকতা ও তাঁর বাস্তব রূপায়ন দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেননি।[৩]

বুলবুল চৌধুরী সম্পর্কে রাহিজা খানম লিখেছেন : '১৯৩৪ সালে মানিকগঞ্জ হাইস্কুলের একটি বিচিত্রানুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পী হিসেবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ।

'বৈশাখের বাংলাদেশ। একফোঁটা ফটিক জলের আশায় মাটি, প্রাণী, গাছপালা উন্মুখ। তৃষ্ণার্ত চাতকের সকরুণ উদাস সুরে ফটিকজলের জন্য সকরুণ মিনতি। তারপর বৃষ্টি নামে। আকাশে উদ্দাম মেঘের দাপাদাপি। বৃষ্টির অঝোর ধারায় তপ্ত মাটি, প্রাণী, গাছপালা সজীব হয়ে ওঠে। মনের আনন্দে পাখা ঝাপটে মেঘ শান্ত আকাশের নীচে উড়ে বেড়ায়

www.nagorikpathagar.org

উৎফুল্ল চাতক। এ কাহিনীর ভিত্তিতে 'চাতক নৃত্য' পরিবেশন করে শিল্পী বুলবুল দেহের ছন্দে, পায়ের গমকে নিজের অনুভবকে সংক্রমিত করেছিলেন দর্শকের চিত্তে। নিতান্ত খেয়ালের বশে যিনি নৃত্যশিল্পী হিসেবে মানিকগঞ্জে প্রথম মঞ্চে আসেন, বছর চার পাঁচেকের মধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নতুন ধারার একজন শিল্পী হিসেবে। এর কারণ, 'শিল্পের জন্য শিল্প'—প্রচলিত এই শিল্পদৃষ্টি থেকে নিজেকে মুক্ত করে তিনি নৃত্যকে জীবনঘনিষ্ঠ করার উদ্যোগ নেন। সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি প্রয়োজনীয় আঙ্গিক ও ভাব কল্পনা গ্রহণ করে আঙ্গিক, মুদ্রা ও তাল-লয়ের কঠিন নাগপাশ মুক্ত সাধারণ মানুষের ভঙ্গি ও ইঙ্গিতময়তাকে শিল্পরূপ দান করেন এবং মানুষের প্রাণসত্তাকে নৃত্যরূপে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করেন পরিচিত সহজ সাবলীল অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে। বিষয়বস্তুর যথার্থ পরিবেশন ক্ষমতার গুণে বুলবুল চৌধুরীর নৃত্যও হয়ে ওঠে জনপ্রিয়। তাঁর মন্বন্তর, আনারকলি, মালকোষ, চাঁদসুলতানা, জাগৃতির আহ্বান, উন্মেষ, হাফিজের স্বপ্ন, ইরানের পান্থশালা, জীবন নৃত্য, প্রেরণা, আবাহন, চাঁদনীরাত, হারেম, নর্তকী, জেলে, নবান্ন, তরবারী নৃত্য, সাপুড়ে, ভবঘুরের দল প্রভৃতি নৃত্য ও নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে দেশের সুপ্ত আত্মার বিকাশ ঘটেছে। তার মন্বন্তর বা আমরা যেন ভুলে না যাই—সুখী শান্তিপূর্ণ শান্ত গ্রামজীবনে সরল নির্মল মানুষের ওপর যুদ্ধের সুযোগে ঘুষখোর আমলা, লোভী মহাজন, ঠিকাদার, মজুতদার, কালোবাজারীর অত্যাচার ও নিগ্রহের কাহিনী। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ প্রক্রিয়ার সাথে একাত্ম হয়ে থাকা দেশীয় মহাজন, কালোবাজারী ও আমলা শাসনের ফলে বিপর্যস্ত জনজীবন এবং তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের স্বাক্ষর হচ্ছে বুলবুল চৌধুরীর নৃত্যনাট্য মন্বন্তর।[৪]

এ কারণেই উপমহাদেশে বিশেষ করে পূর্ব-বাংলায় সকল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নেতা-কর্মীদের কাছে এক নামে পরিচিত ছিলেন বুলবুল চৌধুরী, সকলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও ছিল। আর সে জন্য ১৯৫৫ সালে যখন বুলবুল চৌধুরী স্মরণে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাহমুদ নূরুল হুদার উদ্যোগে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার নির্বাহী কমিটিতে ছিলেন দেশের প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা। নবগঠিত বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদে ছিলেন:[৫]

চেয়ারম্যান	:	শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক
প্রধান পৃষ্ঠপোষক	:	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
সভানেত্রী	:	বেগম রানা লিয়াকত আলী
নির্বাহী সভাপতি	:	বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম
সম্পাদক	:	মাহমুদ নূরুল হুদা

এছাড়া আরও যাঁরা এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, তাদের মধ্যে ছিলেন : শামসুননাহার মাহমুদ (১৯০৬—১৯৬৪), বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ

www.nagorikpathagar.org

হোসেন, বেগম আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, মোহাম্মদ মোদাব্বের (১৯০৮—১৯৮৪), এম মোহাইমেন, এম মহসিন, বেগম বদরুন্নেসা আহমদ, বেগম সেলিনা বাহার চৌধুরী, শিল্পী কামরুল হাসান, শ্রীমতী বাসন্তী গুহঠাকুরতা, সৈয়দ আজিজুল হক, ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীম, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, আনিসুজ্জামান, জি এ মাদানী, শ্রী অজিত স্যানাল, ওস্তাদ খাদেম হোসেন খান এবং বর্তমান অধ্যক্ষ বেদারউদ্দীন আহমেদ।[৬]

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দেশের বহু আকাঙ্ক্ষিত ললিতকলা চর্চার পাদপীঠ হিসাবে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী কন্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্যকলা, নাট্যকলা, চারু ও কারুশিল্পে শিক্ষাদান ও শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতে গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালের ১৭ মে জাতীয় শিল্পী বুলবুল চৌধুরী ১ম মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলার গৌরবমণ্ডিত জাতীয় সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুযায়ী নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তুলে ধরা ও কালক্রমে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাচ্যের ললিতকলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করাই এই একাডেমীর লক্ষ্য বলে উল্লেখ করা হয়।[৭]

৩. কর্মতৎপরতা

বুলবুল ললিকলা একাডেমী প্রধানত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ শুরু করলেও পাকিস্তানী সংস্কৃতির ভাবধারা প্রচারে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল পাঠায়। তাতে পূর্ব বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি তুলে ধরার বিষয়টিই প্রাধান্য পায়।

বিভিন্ন সময়ে সরকারী অনুমোদনক্রমে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী এককভাবে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল নিয়ে ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, সোভিয়েট রাশিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চীন, নেপাল, বলিভিয়া, ওমান প্রভৃতি দেশে অনুষ্ঠান করে প্রচুর সুনাম অর্জন করে।[৮] বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অনতিপরে প্রতিষ্ঠিত শিল্পকলা একাডেমী বিদেশে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল পাঠানোর দায়িত্ব পালন করছে।

তাছাড়া একাডেমী পাকিস্তান কালেও নিয়মিতভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় একুশে ফেব্রুয়ারী, স্বাধীনতা দিবস, রবীন্দ্র-নজরুল, বুলবুল চৌধুরী, আব্বাস উদ্দীন, জয়নুল আবেদীন প্রমুখ প্রয়াত শিল্পীবৃন্দের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী পালন, বর্ষবরণ, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।[৯]

বুলবুল ললিতকলা একাডেমী এদেশের সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে এবং ললিত কলার বিভিন্ন শাখায় শিল্পী তৈরি করে সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গনে একাডেমী যে সাড়া জাগিয়েছিল, সে কথা অনস্বীকার্য। একাডেমী

www.nagorikpathagar.org

'ললিতকলার বিভিন্ন মাধ্যম—কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্যকলা, নাটক, চিত্রকলা ও ভাস্কর্যশিল্পে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে।' শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে পদ্ধতিগত শিক্ষাদান ছাড়াও একাডেমীতে রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা বিভাগ। একাডেমীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সার্টিফিকেটধারী ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে এই প্রযোজনা বিভাগ গঠিত হয়। উচ্চমানের অনুষ্ঠানাদি করা এর দায়িত্ব।[১০]

প্রশিক্ষণ একাডেমী হলেও বুলবুল ললিতকলা একাডেমী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছে। যেমন রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী (১৯৬১) অনুষ্ঠানে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী অংশ নেয় এবং সেই আয়োজনকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সহায়তা করে। সংবাদপত্র সূত্রে দেখা যায়ঃ

> উক্ত অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে অদ্য রবিবার (৩ বৈশাখ, ১৩৬৮) হইতে একযোগে বুলবুল (ললিতকলা) একাডেমীতে ও ১১৩ নং সেগুন বাগানে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদান ও প্রয়োজনীয় মহড়া আরম্ভ হইবে। একাডেমীতে সপ্তাহে তিন দিন শুক্র, মঙ্গল, রবিবার এবং সেগুনবাগানে দুই দিন শুক্র ও রবিবার নিয়মিত বিকাল পাঁচটায় মহড়া অনুষ্ঠিত হইবে।[১১]

শিল্পীরা এর যে-কোন একটিতে যোগদান করে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবে বলে একাডেমীর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

বিভিন্ন সময়ে বুলবুল ললিকলা একাডেমী যেসব নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেছে, তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :

	রচয়িতা	নৃত্যনাট্য	প্রথম মঞ্চায়ন
১.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চণ্ডালিকা	১৯৫৮
২.	"	প্রকৃতির লীলা	১৯৫৮
৩.	কবি জসীম উদদীন	নকসী কাঁথার মাঠ	১৯৫৯
৪.	কাজী নজরুল ইসলাম	সিন্ধু	১৯৬১
৫.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্যামল মাটির ধরাতল	১৯৬৪
৬.	"	মায়ার খেলা	১৯৬৪
৭.	"	চিত্রাঙ্গদা	১৯৬৬
৮.	ডঃ এনামুল হক	হাজার তারের বীণা	১৯৬৭
৯.	ডঃ রফিকুল ইসলাম	বাদল বরিষণে	১৯৬৭
১০.	ডঃ এনামুল হক	রাজপথ জনপথ	১৯৬৯
১১.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্যামা	১৯৭০

এছাড়াও, একাডেমী বিভিন্ন বিষয় ও গানের ওপর ওপর অর্ধশতাধিক খণ্ডনৃত্যনাট্য পরিবেশন করে।[১২]

www.nagorikpathagar.org

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত একাডেমী সক্রিয়ভাবেই তাদের কাজ চালিয়ে যায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৪. উপসংহার

বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর সবচেয়ে বড় অবদান সংস্কারমুক্ত সংস্কৃতি চর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া। নৃত্যকলার ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের সংস্কার ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারেও এই প্রতিষ্ঠানের অবদান স্মরণীয়। তবে প্রধানত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালনা করেছে বলে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান ততটা দৃশ্যমান নয়। কিন্তু সঙ্গীত, নৃত্য ও যন্ত্রশিল্পী তৈরি করে এই প্রতিষ্ঠান দেশের মৌলিক সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করেছে। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও এই প্রতিষ্ঠান কখনও জড়িত হয়নি।

তথ্যনির্দেশ

১. শাহিদা আখতার, *বুলবুল চৌধুরী* (বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯০) পৃ ৫২
২. ঐ, পৃ ৪৩
৩. আবুল ফজল, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা* (ঢাকা, ১৯৬০) পৃ ১১৭
৪. রাহিজা খানম, *নৃত্যশিল্প* (ঢাকা, ১৯৭৯), পৃ ১২৪-১২৫
৫. শাহিদা আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ ৫২
৬. *বুলবুল ললিতকলা একাডেমী তিন যুগ পূর্তি ও সমাবর্তন* (স্মরণিকা), ১৯৯১
৭. বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (বাফা) প্রকাশিত ফোল্ডার (প্রকাশের তারিখ নেই, সংগ্রহ ১৯৯৩)
৮. পূর্বোক্ত স্মরণিকা দ্রষ্টব্য
৯. ঐ
১০. শাহিদা আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ ৫২
১১. দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ বৈশাখ ১৩৬৮
১২. পূর্বোক্ত স্মরণিকা দ্রষ্টব্য

www.nagorikpathagar.org

পাঁচ. রওনক সাহিত্য সংস্থা ১৯৫৮

১. প্রতিষ্ঠা ও পটভূমি

জেনারেল আইয়ূব খানের সামরিক শাসনের পর ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে রওনক সাহিত্য সংস্থার গোড়াপত্তন ঘটে।[১] এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 'পাকিস্তানের জাতীয় ভিত্তিতে তমদ্দুন গঠনে সহায়তা করার জন্য সকল প্রকার সাহিত্যিক ও তামদ্দুনিক প্রচেষ্টা চালানো।'[২] রওনক সাহিত্য সংস্থা গঠন সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) লিখেছেন :

> একদিন 'পারস্য প্রতিভা'র খ্যাতনামা লেখক জনাব বরকতউল্লাহ'র সাথে দেখা হলে তিনি বললেন 'দেশের সাহিত্যিক আবহাওয়াটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। আমরা যারা পুরানো দলের লেখক আছি, তাদের সাথে তরুণ উদীয়মান সাহিত্যিকদের মেলামেশার কোন ব্যবস্থা না থাকায় কেউ কাউকে আমরা আর চিনি না। এটা নিশ্চয়ই ভাল কথা নয়। সাহিত্যিকদের মেলামেশার একটা কমন প্লাটফর্মের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর একটা ব্যবস্থা করুন না।'[৩]

আবুল কালাম শামসুদ্দীন এই প্রস্তাবে আন্তরিকভাবে সায় দিয়ে জানান যে, তিনিও এ বিষয়ে অনেক সময় চিন্তাভাবনা করেছেন। বরকতউল্লাহর (১৮৯৮-১৯৭৪) প্রস্তাবের জবাবে তিনি বলেন, "কলকাতায় আমাদের রেনেসাঁ সোসাইটি ছিল, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি ছিল—কিন্তু এখানে গত এক দশকেরও বেশী সময়ের মধ্যে তেমন কোন কেন্দ্রীয় সাহিত্য সংস্থা গড়ে উঠতে পারল না। ঢাকায় এসে প্রথম দিকে রেনেসাঁ সোসাইটি, পাকিস্তান মজলিশ, সাহিত্য সংসদ গড়ে তুলবার চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু সেসব চেষ্টা সফল হতে পারে নাই। কারণ এখানে (পূর্ব বাংলায়) সাহিত্যিক মহলে কেমন যেনো একটা অবাঞ্ছিত মনোভাব গড়ে উঠেছে। যার ফলে একটা কেন্দ্রীয় সাহিত্য সংস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এখানে দলীয় ভাবটা সাহিত্যিক মহলে এত প্রবল যে, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সাফল্যলাভের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না।"[৪] আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন :

> বরকতউল্লাহ সাহেব বললেন : "তাই যদি হয়ে থাকে, তবে সর্বদলীয় সাহিত্য সংস্থা না-ই বা হল। চলুন, আমরা আমাদের পরিচিত মহলের একটা সাহিত্য সংস্থা খাড়া করি, যাতে আমরা মাসে অন্তত একবার মিলিত হয়েও স্বস্তির

www.nagorikpathagar.org

নিঃশ্বাস ফেলতে পারব। এখন একেবারে হাঁফিয়ে পড়েছি।"[৫]

আবুল কালাম শামসুদ্দীন তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, 'একই প্রস্তাব তাঁর কাছে দিয়েছিলেন মতীনউদ্দীন আহমদ। তিনি বলেছিলেন, "সাহিত্যিক আবহাওয়ায় মানুষ আমরা। সে আবহাওয়ার অভাবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলাম যে! একটা ব্যবস্থা করুন শামসুদ্দীন সাহেব।"[৬]

শেষ পর্যন্ত এ ধরনের একটি সংগঠন গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। মুজীবুর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪), শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), আকবরউদ্দীন (১৮৯৫—১৯৭৮) প্রমুখের পরামর্শক্রমে তাঁদের অনুরোধে সংস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন নিজে। তার বাড়ীতে বৈঠকে বসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি প্রায় পঞ্চাশটি আমন্ত্রণপত্র পোস্ট করেন।[৭] জবাবে নির্দিষ্ট তারিখে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণ আবুল কালাম শাসসুদ্দীনের বাসভবনে সমবেত হন: (১) প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), (২) মোহম্মদ বরকতউল্লাহ, (৩) মতীনউদ্দীন আহমদ, (৪) মুজীবুর রহমান খাঁ, (৫) আকবর উদ্দীন (১৮৯৬-১৯৭৮), (৬) সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, (৭) খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন,(১৯০১-৮৯) (৮) এম নাসির আলী (৯) মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, (১০) কবি আজিজুর রহমান (১৯০৪-৭৮), (১১) কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), (১২) কবি বেনজির আহমদ (১৯০১-৮০), (১৩) আশরাফউজ্জামান খান (জ.১৯১১), (১৪) কবি তালিম হোসেন (জ. ১৯১৮), (১৫) মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, (১৭) আবদুর রহমান, (১৮) আবদুল মান্নান, (১৯) শামসুল হুদা চৌধুরী, (২০) ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন। এছাড়া আবুল কালাম শামসুদ্দীন তো ছিলেনই।[৮]

এঁদের মধ্যে ঘন্টাখানেক বৈঠকের পর ঠিক হয়, একটা সাহিত্য সংস্থা অবশ্যই গঠন করা দরকার এবং প্রতিমাসেই তার বৈঠক হওয়া প্রয়োজন। এই মাসিক বৈঠক কোথায় বসবে, সে প্রসঙ্গে ঠিক হল, প্রতিমাসে এক একজন সদস্যের বাড়ীতেই এ বৈঠক বসবে এবং তিনি যথারীতি চা-নাশতার আয়োজন করবেন। এরপর উপস্থিত সাহিত্যিকদের নিয়ে রওনক নামে সাহিত্য সংস্থা গঠিত হল।[৯] পারস্য প্রতিভা'র লেখক মননশীল প্রবন্ধকার মুহম্মদ বরকতউল্লাহ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। সম্পাদক ছিলেন সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন।[১০]

২. সংস্থার কার্যক্রম

রওনক সাহিত্য সংস্থার ঘোষিত কোন গঠনতন্ত্র ছিল না। তবে তাদের কার্যক্রমে পাকিস্তানের তাহজীব তমদ্দুনকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভুরি ভোজনেরও ব্যবস্থা। 'রওনক' প্রায় আড়াই বছর ধরে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখলেও সদস্য সংখ্যা ওই ২১ জনেই সীমিত ছিল। রওনক সাহিত্য সংস্থার

www.nagorikpathagar.org

কার্যক্রম সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন :

> এরপর নবীন উৎসাহে মাসে মাসে সদস্যদের বাড়ীতে একুশ সদস্য বিশিষ্ট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে চলল। প্রতি বৈঠকেই মূল্যবান প্রবন্ধাদি পঠিত হত এবং তা নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা হত। এসব বৈঠকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিভিন্ন দৈনিকে বিশেষ করে দৈনিক 'আজাদে' প্রকাশিত হত। বৈঠক শেষে সদস্যদের মিষ্টিমুখ করার যে ব্যবস্থা ছিল, তার বিস্ময়কর ক্রমোন্নতি হতে লাগল। সম্ভবত তৃতীয় মাসিক বৈঠক বসেছিল গোলাম মোস্তফার বাড়ীতে। তিনি সদস্যদের জন্য একেবারে পোলাও-কোর্মা-দইয়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন। আর যায় কোথায়? এরপর এ নিয়ে যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। প্রতি সদস্যই রওনকের সাহিত্যসভা উপলক্ষ্যে পোলাও-কোর্মা-বিরিয়ানীর ব্যবস্থায় মেতে উঠলেন। ক্রমে ক্রমে এমন হল যে কমপক্ষে এক শ' টাকার নীচে একুশ সদস্যের এ বৈঠক ডাকা মুশকিল হয়ে পড়ল। তবু সদস্যরা দু'রাউন্ড অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর ধরে এভাবেই বৈঠক চালালেন। তৃতীয় রাউন্ড থেকে তাদের এ উৎসাহে যেনো কিছুটা ভাঁটা পড়ল বলে মনে হল। তৃতীয় রাউন্ড থেকেই বৈঠক অনিয়মিত হয়ে পড়তে লাগল। নিজেদের বাড়ীতে বৈঠকের অনুষ্ঠানে সদস্যদের মধ্যে একটা গড়িমসি ভাব দেখা দিল। যা হোক তিন বৎসর বাদে ধীরে ধীরে এই সংস্থার অস্তিত্ব অনুভবযোগ্য থাকতে পারল না।[১১]

যদিও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, রওনকের বৈঠক ভোজনের আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই বৈঠকে নির্ধারিত বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনার জন্য সবাই প্রস্তুতি নিয়ে আসতেন এবং তার আলোচনা সমালোচনাও যথেষ্ট হতে। রওনক বৈঠকে পঠিত প্রবন্ধ মাহেনও বা অন্য যে-কোন পত্রিকায় প্রকাশের স্বাধীনতা সংশ্লিষ্ট সদস্যদের ছিল।

রওনকের বৈঠক সম্পর্কে প্রধানত দৈনিক আজাদ পত্রিকায়ই খবর প্রকাশিত হত।

রওনকের তৃতীয় সভা হয় কবি গোলাম মোস্তফার বাসায়। তাতে তিনি নিজে 'পাক-বাংলা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনার ধারায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অতীতে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলা ভাষায় হিন্দু ভাবধারা সংবলিত সংস্কৃত শব্দের অনাবশ্যক বাহুল্য ঘটেছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রগত আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেগুলো বর্জন করা আবশ্যক।

ওই সভা সম্পর্কে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয় :

> পাকিস্তানে রাষ্ট্রগত আদর্শ সম্পর্কে বর্তমানে প্রচারিত পাক-বাংলা ভাষার সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে গত পরশু রবিবার কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের শান্তিনগরস্থ বাসভবন মোস্তফা মঞ্জিল-এ 'রওনক'-

www.nagorikpathagar.org

এর বিশেষ সাহিত্য সভার অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব সৈয়দ আলী নূর। সভার সূচনায় 'পাক-বাংলার ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে কবি গোলাম মোস্তফা সাহেব পাক-বাংলা ভাষায় অধিকতর আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দ গ্রহণের ওপর বিশেষ জোর দেন।

প্রবন্ধটির ওপর আলোকপাত কালে কবি আজহারুল ইসলাম বলেন, আমাদের সাহিত্যে যত বেশী আরবী-ফারসী শব্দ আমদানী হইবে, ততই সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি ধর্মগত ঐক্যের কথাও উল্লেখ করেন। জনাব মুজীবর রহমান খাঁ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার অধিবাসী ও উপজাতীয়দের মুখের ভাষার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সমন্বয় সাধন করিয়া উহাকে একটি সুষ্ঠু পন্থায় আমাদের সাহিত্যের মানে উন্নীত করা যাইতে পারে। তিনি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, আমার মতে এ পথেই পাকবাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ সম্ভব। কবি মঈনুদ্দীন আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া বলেন যে, অন্যান্য ভাষাও যদি আমাদের পাক বাংলা ভাষার মধ্যে সহজ ও সাবলীলভাবে ঝুঁকিয়া পড়ে, তাতেও আপত্তি করার কিছু নাই। উদাহরণ হিসাবে তিনি কনট্রোল, রেশন ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ করেন। জনাব সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন বলেন, আমাদের ঘরের ভাষার সাথে সাহিত্যের ভাষার কোনই মিল নাই। তিনি বলেন, সাহিত্যকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে মুখের ভাষার সাথে সাহিত্যের একটা সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।......

কবি আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী বলেন, আমাদের ভাষা ও সাহিত্য কি হইবে ইহা নির্ধারণ কোন বড় সমস্যা নয়। সমস্যা হইল ঘরের ভাষার সাথে সাহিত্যের ভাষার মিল সাধন। তিনি বলেন, বর্তমানে নতুন করিয়া কোন শব্দ আমদানীর প্রয়োজন নাই। কারণ যে শব্দ ভাণ্ডার আমাদের রহিয়াছে, উহাকে মূলধন করিয়া সাহিত্যের আসরে নামিলে, আগামী দুই শ' বছরেও তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে না। কবি আজিজুর রহমান ও জনাব মতিনউদ্দীন আহমদ যুগে যুগে ভাষার বিবর্তন ধারার উল্লেখ করিয়া বলেন, পাক-বাংলা ভাষার রূপান্তর হইতে বাধ্য এবং তা স্বাভাবিকভাবেই হইবে। কিন্তু এজন্য বাড়াবাড়ি উদ্ভট ও অপরিচিত শব্দ আমদানী করিয়া ভাষার সৌন্দর্য ব্যাহত করা উচিত হইবে কিনা, সুধীজনই তা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন বলেন, আমরা যে ভাষায় এখন লিখি বা কথা বলি, তা পাক-বাংলা নয়। সুতরাং আদের কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষার মধ্যে অধিকতর আরবী-ফরসী ও উর্দু ভাষা থাকিলে নতুন একটা ভাষার জন্ম নিবে, এবং এই ভাষাই হইবে পাক-বাংলা ভাষা। ... ইহার

www.nagorikpathagar.org

পর জনাব মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান ও আবদুর রহমান এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

উপসংহারে জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন, ভাষার রূপান্তর সাধন সময় সাপেক্ষ হইলেও এখানে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের কবি-সাহিত্যকগণ লেখনী ধারণ করিলে ফল শুভ হইবে। নূতন একটা রাষ্ট্রে, নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করাও কম কথা নয়। ... তিনি সাধারণ মানুষের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার সমন্বয় সাধনের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

আলোচনার ধারায় ও সভাপতির সমাপ্তি ভাষণে এই সিদ্ধান্তই হয় যে, অতীতের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলা ভাষা হইতে হিন্দু ভাবধারার বাহক সংস্কৃত শব্দগুলি বর্জন করিয়া আমাদের রাষ্ট্রগত আদর্শের ভিত্তিতে ইহার সংস্কার সাধন সময়-সাপেক্ষ হইলেও পাক-বাংলা ভাষার রূপান্তর অবধারিত এবং ভাষার রূপান্তর স্বাভাবিকভাবে আসিলেও আমাদের লেখক সমাজের এ বিষয়ে সচেতন দৃষ্টির এবং জাতীয় সাহিত্যকে বেগময়ী ও সমৃদ্ধ করিতে আমাদের মুখের ভাষাকেই অবলম্বন করা উচিত। সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ নাজিরুল ইসলাম, জনাব আশরাফুজ্জামান, জনাব মোহাম্মদ নাসির আলী ও জনাব আবদুল মান্নান। সভাশেষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ফেরদৌসী বেগম ও ফরিদা ইয়াসমিন।[১২]

জুলাই মাসের সাহিত্য সভায় 'পাক-বাংলা ভাষার অভিধান' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী (জ. ১৯২৬)। এতে প্রাবন্ধিক ও আলোচকগণ এই মর্মে একমত হন যে, পাক-বাংলা ভাষার অভিধান অবিলম্বে প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে অধুনা প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বাদ দিয়ে পুঁথি সাহিত্য ও আঞ্চলিক লোক-সাহিত্যের শব্দের ওপর বেশী গুরুত্ব দেয়ার জন্য তারা সুপারিশ করেন। তারা বলেন যে, পাক-বাংলা ভাষার অভিধান পাক-বাংলা সাহিত্যের অনুসারী হবে এবং সেজন্যে বাংলা ভাষারও সংস্কার আবশ্যক।[১৩]

পরবর্তী সভায় খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন 'পাক-বাংলা সাহিত্যে উপমা' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন। সেই প্রবন্ধ ও আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল পাক-বাংলা সাহিত্যের উপমা প্রয়োগের প্রচলিত ধারা পরিবর্তন আনা। কারণ প্রচলিত উপমাসমূহ প্রধানত রাঢ় বাংলার সংস্কৃত রীতি অনুসারী এবং পাকিস্তানের জাতীয় তমদ্দুনের পরিপন্থী।[১৪]

বৈঠকের এই ধারা অব্যাহত থাকে। এতে পূর্ব বাংলার (পাক-বাংলা) ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিক্ষেত্রে নতুন নির্মিতির প্রয়োজনীয়তার ওপরই গুরুত্ব দেয়া হয়।

পরের বারে আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত আর এক বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'বাংলা

www.nagorikpathagar.org

পরিভাষা'। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও তামুদ্দনিক বুনিয়াদকে স্মরণে রেখে, পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরিভাষা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনবোধে আরবী–ফারসী শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত বলে বৈঠকে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ একমত প্রকাশ করেন।[১৫]

নবেম্বর '৫৯ সালের আলোচনা সভার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল বিদেশী বই–পুস্তক আমদানী প্রসঙ্গ। তাতেও 'রওনক' সদস্যরা 'সকল বিদেশী সাহিত্য', বিশেষত পশ্চিম বাংলার সাহিত্যপুস্তক আমদানীর ওপর বিধিনিষেধ আরোপের সুপারিশ করেন। কারণ হিসাবে তারা বলেন, ঐ–জাতীয় পুস্তক যা পাকিস্তানের আদর্শবিরোধী ভাবধারায় পুষ্ট, এদেশের সরলমতি ছাত্র–ছাত্রীদের বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে এবং পাকিস্তানী লেখক-লেখিকাদের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত করে তুলছে।[১৬] তবে তারা প্রয়োজনে বিদেশী সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে দেশে প্রচলনের ওপর গুরুত্ব দেন।[১৭]

এছাড়াও রওনকের বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। রওনকের বৈঠকে কবি মঈনুদ্দীনের 'আমাদের সাহিত্যের রূপ ও আঙ্গিক', আবদুল মান্নানের 'সঙ্গীতে মুসলমানের অবদান', কবি আজিজুর রহমানের 'গীতিকবিতা' মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর 'সমালোচনা প্রসঙ্গে', 'আমাদের সংস্কৃতি' ও 'আধুনিক বাংলা কাব্যে মুসলিম অবদান' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ ও তার ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

৩. প্রকাশনা

প্রথম দিকে রওনকের ভাবধারায় লিখিত রচনাবলী প্রকাশের সুনির্দিষ্ট কোন মাধ্যম ছিল না। পরবর্তীতে ১৯৫৯ সালের শেষ দিকে ৫নং স্যামসন রোডে 'রওনক পাবলিকেশন্স' খোলা হয়। এই পাবলিকেশন থেকেই ১৯৬০ সালে মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত বই 'নজরুল সাহিত্য' প্রকাশ করা হয়। এতে ২৩ জন লেখকের রচনা সংকলিত হয়। কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য ও সঙ্গীতসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখার সঙ্কলন ছিল এটি। তাতে লিখেছিলেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮২৬–১৯৫৪), আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবদুল কাদির (১৯০৬–৮৪), আবদুল মওদুদ, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, অজিতকুমার গুহ, আবুল ফজল, সৈয়দ আলী আশরাফ (জ. ১৯২৪), মুহম্মদ আবদুল হাই, আহমদ শরীফ, আহসান হাবীব (১৯১৭—১৯৮৬), হাসান হাফিজুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মুজীবুর রহমান খাঁ, আনিসুজ্জামান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আতোয়ার রহমান, কাজী মোতাহার হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখ।

এই সঙ্কলনটিই ছিল পূর্ব বাংলায় নজরুল বিষয়ক প্রথম সমালোচনা গ্রন্থ।

এছাড়া রওনক পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জুলেখার মন', কবি আবদুস সাত্তারের (জ. ১৯৩১) 'বৃষ্টিমুখর,' আবদুল হাই মাশরেকীর (জ. ১৯১৯–) 'কুলসুম' প্রভৃতি গ্রন্থ। কিন্তু 'রওনক পাবলিকেশন্স অল্পকালের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যেই ব্যবসায়ে মার খেলো। পুঁজির অভাবে এবং অন্যান্য কারণে শেষ পর্যন্ত বন্ধই করে দিতে হলো।'[১৯]

৪. সঙ্কট ও অবলুপ্তি

রওনক সাহিত্য সংস্থার সঙ্কটের প্রধান কারণ ছিল এর সাংগঠনিক কাঠামোর অভাব। তাছাড়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এর উদ্যোক্তারা সমাজে নানাভাবে প্রতিষ্ঠা পান। সেই অবস্থায় ব্যাপক কোন সাহিত্য আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণ এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত তরুণদের সম্পর্কে এদের মনোভাবে কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভাবও ছিল বলে মনে হয়। তার কারণ, এরা ভাবতেন, তরুণরা পাকিস্তান আন্দোলনের অংশীদার ছিল না। ফলে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত নয়। এতে সংগঠনের ব্যাপ্তি বাধাগ্রস্ত হয়।

এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ লিখেছেন :

> 'রওনক'-এর একাধিক সভায় আমি কবিতা ও প্রবন্ধ পড়েছি। অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আমি 'আধুনিক বাংলা কাব্যে মুসলিম অবদান' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করি। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা। আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন কয়েকজন নবীন-প্রবীণ সাহিত্যিক। আমার প্রবন্ধটিতে আধুনিক বাংলা কাব্যে মুসলমান কবিদের অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ছিল। মাইকেলী যুগ থেকে শুরু করে সমকাল পর্যন্ত কবিদের কাব্য সাধনার ধারা, তাদের মানসরূপ, রচনারীতির বৈশিষ্ট্য ও অবদান সম্পর্কে আমি যথাসম্ভব আলোকপাত করেছিলাম। তাদের সীমাবদ্ধতা, রচনার ত্রুটি বিচ্যুতিও কিছু কিছু তুলে ধরা হয়েছিল। আমার বক্তব্যের সপক্ষে তাদের রচনা থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিও দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার এই মূল্যায়ন উপস্থিত দু'একজন কবি-সাহিত্যিকের মনঃপূত হয়নি। প্রশংসার কথাগুলো শুনে খুশী হয়েছিলেন, কিন্তু সমালোচনার দিকটা সহ্য করতে পারেননি। সভাপতির ভাষণে কবি গোলাম মোস্তফা আমার প্রবন্ধটি সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেন। এর কারণ প্রবন্ধটিতে তার কবিতার সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কিছুটা সমালোচনা ছিল। . . .
>
> তিনি অবশ্য আমার প্রবন্ধটির চুলচেরা বিশ্লেষণ করেননি। তিনি বোঝাতে চাইছিলেন, যারা সৃষ্টিশীল রচনার ক্ষেত্রে কোন বড় অবদান রাখতে পারেন না, তারাই সাধারণত সমালোচক হন।[২০]

এই সব কারণেই শেষ পর্যন্ত রওনকের অস্তিত্ব ১৯৬১ সালের দিকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন, 'ভূরি-ভোজের দিক দিয়ে এ সাহিত্য বৈঠকের যত

www.nagorikpathagar.org

খ্যাতি বা অখ্যাতিই হোক না কেন, গুরু গম্ভীর সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে বৈঠকগুলির গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব বিভাগ নিয়ে গবেষণাপূর্ণ ও মূল্যবান প্রবন্ধ প্রায় প্রতিমাসে পঠিত হয়েছে এবং তা নিয়ে উন্নতমানের আলোচনাও হয়েছে। কাজেই এমন একটি সাহিত্য সংস্থার অকাল-বিলুপ্ত পাক-বাঙলা সাহিত্যেই পক্ষে নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর হয়েছিল।'[২১]

৫. উপসংহার

'রওনক সাহিত্য সংস্থা' ঘরোয়া ধরনের সাংস্কৃতিক সংগঠন হলেও এদের কর্মকাণ্ড ছিল সুচিন্তিত। এর সদস্যরা সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে শ্রমসাধ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেন। তারা পূর্ব বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে যে গভীরভাবে সচেতন ছিলেন, তা-ও তাদের প্রবন্ধগুলো থেকে উপলব্ধি করা যায়। তাছাড়া রওনকের সকল সদস্যই ছিলেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। ফলে তাদের বক্তব্য সকলেই গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে। এতে সংগঠনটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

তথ্যনির্দেশ

১. সাঈদ-উর রহমান তাঁর *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩] গ্রন্থে উল্লেখ করেন : ১৯৫৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ ও মতিনউদ্দীন আহমদ মিলে 'রওনক' নামক একটি ঘরোয়া সাহিত্য সংস্থা গঠন করেন। পৃ ৫৫

২. দৈনিক আজাদ। ২৭ এপ্রিল, ১৯৫৮

৩. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি* (খোশরোজ কিতাবমহল, ১৯৮৫) পৃ ২৯১

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত

৬. পূর্বোক্ত, পৃ ২৯২

৭. পূর্বোক্ত

৮. পূর্বোক্ত

৯. পূর্বোক্ত, পৃ ১৯২-৯৩

১০. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *সাহিত্যের রূপকার* (ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮১) পৃ ১৩৬

১১. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ ২৯৩

www.nagorikpathagar.org

১২. দৈনিক আজাদ, ১৩ মে ১৯৫৮

১৩. দৈনিক আজাদ, ২২ জুলাই, ১৯৫৮

১৪. দৈনিক আজাদ, ১৯ আগস্ট ১৯৫৮

১৫. দৈনিক আজাদ, ১১ আগস্ট, ১৯৫৯

১৬. দৈনিক আজাদ, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৯

১৭. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সাক্ষাৎকার ১৭-৪-১৯৮৭

১৮. পূর্বোক্ত

১৯. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *পূবালীর দিনগুলি*, দৈনিক সংগ্রাম, মার্চ-১৯৮৫

২০. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *সাহিত্যের রূপকার*, পৃ ১৩৭-৩৮

২১. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ ২৯৩

www.nagorikpathagar.org

ছয়. পাকিস্তান লেখক সংঘ ১৯৫৯

১. প্রতিষ্ঠা ও পটভূমি

'পাকিস্তানী জনসাধারণের জন্য উন্নততর অধিকতর সুখী ও আনন্দদায়ক এবং পূর্ণতা ও অধিকতর সৃজনশীল ও সুনির্দিষ্ট জীবন অর্জ্জন করা'র[১] ঘোষণা সামনে নিয়ে ১৯৫৯ সালের ২৯, ৩০ ও ৩১ জানুয়ারী করাচীর গোয়ানিজ হলে (গোয়ান এসোসিয়েশন হল) সমস্ত পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকদের এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা সচিব বিশিষ্ট উর্দু-ছোটগল্পকার কুদরতুল্লাহ শাহাব ও আরও কয়েকজন উর্দু লেখকের উদ্যোগে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[২]

তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলনেই পাকিস্তান লেখক সংঘ বা Pakistan Writers' Guild গঠিত হয়।[৩]

২. করাচীতে লেখক সম্মেলন

করাচীর এই লেখক-সম্মেলনের নাম দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তান লেখক সম্মেলন বা Pakistan Writers' Convention। এই সম্মেলনের কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি ছিলেন শহীদ আহমদ দেহলভী। সম্মেলন উপলক্ষ্যে তাঁর পক্ষে ঢাকার লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগের কেন্দ্র ও সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করেন বাংলা একাডেমীর পরিচালক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক। তখনকার বিধি অনুযায়ী পরিচালকই ছিলেন বাংলা একাডেমীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। সম্মেলনে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশ থেকে আড়াই শ' লেখক যোগদান করেন।[৪] তাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৫০ জন লেখক আমন্ত্রিত হন।[৫]

আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন, খানবাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা, বেগম শামসুননাহার মাহমুদ, বেগম সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯—১৯৫৯), অধ্যাপক নূরুল মোমেন (জ. ১৯০৮), কবি মঈনুদ্দীন, জনাব মতিনউদ্দীন আহমদ, কবি আবদুল কাদির, কবি বেনজির আহমদ, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মুতী (জ. ১৯৩০), মাহবুব-উল আলম (১৮৯৮—১৯৮১), অধ্যাপক আবুল ফজল, অধ্যাপক শওকত ওসমান (জ. ১৯১৭), কবি মতিউল ইসলাম (জ. ১৯১৮—), কবি মোফাখখারুল ইসলাম (জ. ১৯২১—), কবি

www.nagorikpathagar.org

কাদের নেওয়াজ (১৯০৯—১৯৮৩), ডঃ এনামুল হক (জ. ১৯৩৭), মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, কবি আজহারুল ইসলাম, অধ্যাপক নাজিরুর ইসলাম সুফিয়ান (১৯০৬—১৯৮২), শামসুদ্দীন আবুল কালাম প্রমুখ।[৬] সম্মেলনের খরচ বাবদ বাংলা একাডেমী, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিটি ফান্ড ও লাহোর-করাচীর কয়েকজন ব্যবসায়ী প্রায় অর্ধলক্ষ টাকা দান করেন।[৭] মঈনুদ্দীন লিখেছেন, 'আলাপ-আলোচনার পর কয়েকজন এই সম্মেলনে যোগদান থেকে বিরত থাকেন'। (মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ-১৩৬৬)

৩. সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন

২৯ জানুয়ারী ১৯৫৯, সকাল সাড়ে দশটায় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে সম্মেলন প্রতিনিধিরা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র মাজার জেয়ারত করেন। তাতে পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক প্রদান অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল।[৮]

করাচীর গোয়ান এসোসিয়েশন হলে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কোরান পাঠ করেন খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান। করাচীর অধ্যাপক মির্জা মোহাম্মদ সায়ীদ উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

উদ্বোধনী ভাষণে জনাব সায়ীদ বলেন ঃ

> It had a special significance as it was for the first time that a large number of writers had assembled to consider proposals affective their economic welbeings. Writers and poets may make their due contribution towards the progress of the country through their activities, it was necessary to create proper atmosphere for writers to work. In other words writers should be very largely free from economic worries to concentrate on their creative works.[৯]

কনভেনশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি শহীদ আহমদ দেহলভী পাঠ করেন সম্মেলনের প্রস্তুতি সংক্রান্ত রিপোর্ট। এই রিপোর্ট থেকেই সম্মেলনের সূত্রপাত কী করে হয় তা জানা যায়। প্রথমে করাচীর আটজন লেখকের এক সমাবেশে স্থির হয়, পাকিস্তানের সকল ভাষার লেখকদের একটি বড় আকারের সম্মেলন আহবান করা হবে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরের ৪ তারিখে তাঁরা মিলিতভাবে একটি যুক্ত-বিবৃতি প্রচার করেন। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ওই বিবৃতির সূত্র ধরে করাচী লেখক সম্মেলন আয়োজিত হয়।[১০]

৮—

www.nagorikpathagar.org

সম্মেলনের এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কবি জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬)।

বাংলা ভাষায় প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে তিনি পাকিস্তানের সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেন : আজ প্রায় ১২ বৎসর পাকিস্তান কায়েম হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বহু সমস্যা নিয়ে নানা স্থানে নানা পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। দেশের উভয় অংশ হতে রাজনৈতিক সাংবাদিক শিক্ষাবিদ দল এ-দেশ ও-দেশ ভ্রমণ করছেন। কিন্তু দেশের লেখকদের নিয়ে কেউই মাথা ঘামাননি। সমস্ত দেশের লেখকদের একত্র সমাবেশের কথাও কেউ কল্পনা করেননি। আজ যারা প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে থেকে এই লেখক সমাবেশের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি তাদের আন্তরিক মুবারকবাদ জানান।[১১]

ভাষণে তিনি বই প্রকাশের সমস্যার ওপর আলোকপাত করে প্রকাশকদের অধিক বাণিজ্য-মানসিকতার স্বরূপ তুলে ধরেন। এ ক্ষেত্রে প্রকাশকরা স্বত্ব কিনে কীভাবে লেখকদের দেউলিয়া করে তোলে, তিনি তার স্বরূপ উন্মোচন করে বলেন, সৃজনশীল বইয়ের প্রকাশনার মানও উন্নত করে তুলতে হবে। তিনি বলেন :

> নানা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে আমাদের বইগুলি ছাপা হইয়া যখন বাহির হয়, তাহারা দেখিতেও যেমন কুৎসিত, দামও পড়ে তেমনি বেশী। সীমান্তপার হইতে যেসব চকচকে বই আমাদের বাজারে আমদানী হয়, তাহার দাম পড়ে আমাদের দামের অর্দ্ধেক। আমাদের মানস-কন্যারা ছেঁড়া ন্যাকড়া আর চটের বসন পরিধান করিয়া সেইসর রঙীন শাড়ী আর অলঙ্কারের জৌলুসভরা সুন্দরীদের পাশে পাঠকের উপহাসের পাত্র হইয়া বিরাজ করে।[১২]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন :

> সীমান্তপারের বই আসা বন্ধ করিলে ইহার প্রতিকার হইবে না। বই হইল জ্ঞান বিস্তারের পথ। এইসব বন্ধ হউক, ইহা কেহই চাহি না। বরঞ্চ আমরা সীমান্ত পারের বইগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়াই আমাদের পাঠকের অন্তর জয় করিতে চাহি। বিদেশী সাহিত্য যত বড় হউক, নিজের দেশের সাহিত্যের প্রতি আমাদের আর এক রকমের দরদ আছে। মাতৃদুগ্ধের মত দেশী সাহিত্য আমাদের অবচেতন মনে আকর্ষণের মদিরা ঢালিয়া দেয়।[১৩]

দেশীয় সাহিত্য ও প্রকাশনার মানোন্নয়নে সভাপতি কবি জসীমউদ্দীন কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন। সেগুলোর মধ্যে ছিল : কর্ণফুলী পেপার মিল থেকে আকর্ষণীয় কাগজ তৈরি ও তার সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং তার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার; প্রেস কেনার জন্য উদার লাইসেন্স ব্যবস্থা, ব্লক তৈরির খরচ হ্রাস করার উদ্যোগ; সৃজনশীল পুস্তক প্রকাশকদের কর রেয়াত; মাসিক পত্র-পত্রিকা সরকারীভাবে কিনে স্কুল-কলেজে বিতরণ; সরকার পরিচালিত পত্রপত্রিকায় বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য এক-চতুর্থাংশে নামিয়ে আনা; ডাকমাশুল হ্রাস করা, গ্রামে গ্রামে পাঠাগার গড়ে তোলা প্রভৃতি।[১৪]

www.nagorikpathagar.org

পাকিস্তানের সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় তথা পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যর তুলনা করে তিনি বলেন, তাদের সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো বইগুলো দেখে আমাদের পাঠক সমাজের চোখ ঝলসে যেতে চায়। অধুনা প্রকাশিত পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের ভালমত বিচার করলে তাদের তুলনায় সাহিত্য ক্ষেত্রে পাকিস্তানীরা যে কিছু করেনি, এমন প্রমাণিত হয় না। এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের কোন লেখকই আর্ন্তজাতিক খ্যাতি লাভ করতে পারেনি।[১৫]

কবি জসীমউদ্দীনের এই ভাষণের সারাংশ উর্দু ও ইংরেজীতে ছেপে বের করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি মূল বাংলা কপিটি কনভেনশন কমিটির কাছে পাঠাননি বলে তা বাংলায় ছাপিয়ে বের করা সম্ভব হয়নি।[১৬]

প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তির পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয় যে, সহজেই কমিটি গঠন করতে যেন গোলযোগের বা অযথা জটিলতার সৃষ্টি না হয়, এ জন্য বিকালে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হবে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করবেন ১১ জন।[১৭] এরা হলেন : অধ্যক্ষ ইবরাহিম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদদীন, আবদুল কাদির, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭১), বেগম শামসুননাহার মাহমুদ (১৯০৬-৬৪) আবুল হোসেন, ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ও মুহম্মদ আবদুল হাই।[১৮]

এ ছাড়াও স্টিয়ারিং কমিটিতে ছিলেন ১১ জন উর্দু লেখক এবং পশতু সিন্ধী ও পাঞ্জাবী লেখক ১ জন করে।[১৯]

৩০ জানুয়ারী, ১৯৫৯ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের সভায় সভানেত্রীত্ব করেন মিসেস রোজী হুসাইন। তাতে স্টিয়ারিং কমিটির রেজিলিউশন পেশ করা হয়। বাদ-প্রতিবাদের পর তা উপস্থিত প্রতিনিধিদের অনুমোদন লাভ করে।[২০]

৪. পাকিস্তান লেখক সংঘ গঠন : ৩১ জানুয়ারী ১৯৫৯

করাচীর পাকিস্তান লেখক সম্মেলন ও পাকিস্তান সাহিত্য সংঘ গঠনের কাজ সম্পন্ন হয় সম্মেলনের এই অনুষ্ঠানে।

এই দিন সকালের অধিবেশনেই গঠিত হয় পাকিস্তান লেখক সংঘ বা Pakistan Writers' Guild. সম্মেলনের এই অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করেন বাঙালী মহিলা মিসেস মোহাম্মদ হোসেন। তাতে ২৫ সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় : ১১ জন বাংলা লেখক, ১১ জন উর্দু লেখক এবং সিন্ধী পশতু ও পাঞ্জাবী লেখক একজন করে। আর সর্বসম্মতিক্রমে গিল্ডের সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন জনাব কুদরতুল্লাহ শাহাব। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়াও করাচী, লাহোর ও ঢাকায় গঠিত হবে তিনটি আঞ্চলিক সমিতি। পাকিস্তানের যেকোন লেখককে আঞ্চলিক সমিতি গিল্ডের সদস্যভুক্ত করে নিতে পারবে। আঞ্চলিক সমিতিগুলিতে সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া সদস্য থাকবেন ১১ জন করে।[২১]

www.nagorikpathagar.org

সমাপ্তি অধিবেশনের বিকালের বৈঠক বসে চারটায়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাবায়ে উর্দু মৌলবী (ডাঃ) আবদুল হক। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এই অধিবেশনে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন : The writers of Pakistan who were full of a fighting and creative spirit could make tremendous contribution towards the solidarity of Pakistan. তিনি বলেন : By directing the people through the channels of the spirit of Islam the writers could help them in living a fuller assertive and a better life.[২২]

তার আগে সম্মেলনে 'লেখক ও লেখকের স্বাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন কুদরতুল্লাহ্ শাহাব, 'আমাদের তামদ্দুনিক সংগ্রাম' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক মমতাজ হোসেন, 'লেখকের দায়িত্ব ও সংগঠন' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন ডাঃ আবদুল হক, আবু রুশদ পড়েন 'আজাদী-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানের সৃজনধর্মী রচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ, 'লেখকের জাতীয়তা ও ধর্মনিরপেক্ষতা' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন ডঃ জাবিদ ইকবাল (আল্লামা ইকবালের পুত্র) ও ডঃ সাজ্জাদ হোসায়েন।

কুদরতুল্লাহ্ শাহাব তাঁর প্রবন্ধে লেখকের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন : (১) লেখক কোনক্রমেই আইনের উর্ধ্বে নহে; (২) তিনি এক দেশে বাস করিয়া অন্য দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে পারেন না; (৩) তিনি একরূপ আদর্শ প্রচার করিয়া ভিন্নরূপ আদর্শে বিশ্বাস স্থাপনের কাব্যিক সম্পদ গ্রহণ করিতে পারেন না।[২৩]

পাকিস্তানী লেখকদের পাকিস্তানী আদর্শের প্রতি যত্নবান হবার আহবান জানিয়ে এ বিষয়ে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি বলেন :

> আমাদের চিন্তাধারাকে মক্কা হইতে মস্কো-ওয়াশিংটন-কলিকাতায় নিবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। মস্কো ও কলিকাতা আমাদের চিন্তাধারাকে বিপথগামী করিতে চাহে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎসস্থল পাকিস্তান, পৃথিবীর অন্য কোথায়ও নহে। পাকিস্তানের লেখকগণকে বিশ্বরাজনীতির পরীক্ষাগারে গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করা চলিবে না। আমরা দরিদ্র ও সংগ্রামী। কিন্তু আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি ও তামদ্দুনিক ক্ষেত্র রহিয়াছে।[২৪]

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের বিনির্মাণে লেখকদের বিরাট ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, লেখকদের "যথেষ্ট দিবার রহিয়াছে এবং নিজেদের লেখা ও অবাঞ্ছিত বস্তুবাদ হইতে জনসাধারণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আহ্বান জানাইয়া তাহারা উহা করিতে পারেন। বর্তমান পৃথিবীতে আপনারা বাস্তববাদের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন না; কিন্তু এছলাম নির্দেশিত পথে উহাকে প্রবাহিত করিয়া আপনারা আরও দ্রুত লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবেন।"[২৫]

www.nagorikpathagar.org

তবে একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে দেন যে, কোন লেখকের কোন লেখাই যেন পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যাহত না করে।[২৬]

৫. পাকিস্তান লেখক সংঘের ঘোষণাপত্র

পাকিস্তান লেখক সংঘের সুনির্দিষ্ট কোন ঘোষণাপত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু লেখক সংঘের সদস্যদের শপথপত্রকেই তাদের ঘোষণাপত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সেই শপথপত্র ছিল নিম্নরূপ :

> দেশের প্রচলিত সকল ভাষার প্রতিনিধি আমরা পাকিস্তানের লেখকগণ আমাদের মাতৃভূতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি, মর্যাদা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক শান্তি এবং মানব জাতির বিকাশের কার্যে আত্মোৎসর্গের শপথ গ্রহণ করছি।
>
> জাতি সংঘ রচিত মানবাধিকারের সনদে আমরা বিশ্বাসী। লেখক হিসাবে স্বাধীনভাবে মতামত জ্ঞাপন ও প্রচারের অধিকার আমাদের একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর, কারণ এ অধিকারের অভাবে সৃষ্টিধর্মী রচনা অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে।
>
> সত্যের যথাযথ রূপায়ণ, দেশাত্মবোধের অনুশীলন, আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং মানুষের মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক স্থাপন করার মহান কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা সজাগ, কারণ মানব জাতির মর্যাদা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও উন্নততর সম্পর্কের উপরই নির্ভরশীল।
>
> লেখক হিসাবে আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এমন একটি সুখী ও সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করছি যেখানে সকলের জন্য অবাধে সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে এবং যার ফলে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা, মানবিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা বিকাশের সহায়ক হবে। কাজেই আমরা বিজ্ঞানের উন্নতিকে পৃথিবীতে শান্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির উপায় বলে বিশ্বাস করি।[২৭]

এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হবার পর পরই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আনুকূল্যে লেখক সংঘ বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয়। পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের মুখপত্র 'পূরবী'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় বলা হয় :

(১) করাচী, লাহোর ও ঢাকায় নিজস্ব 'পাবলিশিং হাউস' স্থাপিত হইতেছে। গিল্ড উপযুক্ত রয়ালিটি দিয়া লেখকদিগের ভাল ভাল পুস্তক প্রকাশ করিবেন।

(২) গিল্ডর সদস্যের (৬০ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক) প্রত্যেকের জন্য ৫,০০০ টাকা পরিমাণ লাইফ-ইনসিওর করা হইয়াছে। দুস্থ সদস্যদিগকে প্রিমিয়াম হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। প্রিমিয়ামের টাকা গিল্ড হইতে দেওয়া হয়।

(৩) গিল্ডের সদস্যদিগকে অর্ধ-ভাড়ায় রেল স্টীমার ইত্যাদিতে যাতায়াতের

www.nagorikpathagar.org

সুবিধাদানের কথা চিন্তা করা হইতেছে।

(৪) গিল্‌ডের তরফ হইতে প্রতি বৎসর দেশ বিদেশে তামদ্দুনিক মিশন পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(৫) পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষায় গিল্‌ডের লেখকদিগের ভাল ভাল পুস্তক অনুবাদ করিয়া ছাপিবার চেষ্টা চলিতেছে।

(৬) পাকিস্তানী লেখকদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-পুস্তক ছাপাইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

(৭) গিল্‌ডের মুখপত্র রূপে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এইসব গঠনমূলক কাজের জন্য গত বৎসর পাকিস্তান গভর্নমেন্ট গিল্‌ডকে বিনাসুদে এক লক্ষ টাকা ধার দিয়াছেন।[২৮]

৬. পাকিস্তান লেখক সংঘের উদ্যোগে সাহিত্য সভা ও অন্যান্য কর্মতৎপরতা

লেখক সংঘের উদ্যোগে প্রথম বছরে তিনটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল ইঞ্জিনীয়ার্স ইন্সটিটিউশনে। প্রথমটির বিষয়বস্তু ছিল 'সাহিত্যে মীর মোশাররফ হোসেনের অবদান'। আলোচনার করেন সৈয়দ মুর্তজা আলী (১৯০৩—১৯৮১), মুনীর চৌধুরী, আনিসুজ্জামান এবং আরও অনেকে।

দ্বিতীয় সভার আয়োজন করা হয়েছিল ১৯৬১ সালের ৭ এপ্রিল তারিখে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে। পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যের সমস্যা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন স্থানীয় বেঙ্গলী একাডেমীর ডিরেক্টর সৈয়দ আলী আহসান। আলী আহসান সাহেব জাতীয় ভাবধারা নিয়ে সাহিত্যকে নবরূপে রূপায়ণ করার জন্য বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন, জাতি হিসাবে সাহিত্যকে যদি আলাদা করে চেনা না যায়, তবে সেই সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না। তিনি বিশেষ করে বলেন যে, কোরানের ভাবধারা এবং নানা প্রসঙ্গ থেকেই আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা নতুন করে সাহিত্য গড়ে তোলবার প্রেরণা পেতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের অনেক কিছু ভেবে দেখবার আছে। সৈয়দ আলী আহসানের বক্তৃতার পর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মুনীর চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (১৯২০—১৯৭১), আশরাফ সিদ্দিকী (জ. ১৯২৭) এবং আবুল কাশেম প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক।

পরবর্তী আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সামাজিক কুসংস্কার ও তার প্রতিকার। সামাজিক নানা প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখকদের মুক্তমন হওয়ার জন্য কতকগুলো নজির দিয়ে প্রসঙ্গের অবতারণা করেন আবুল হাসনাত। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নাজমুল করীম, হাসান জামান, আশরাফ সিদ্দিকী, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, জোবেদা খানম (জ. ১৯২০), ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন ও সায়িদুল হক।[২৯]

www.nagorikpathagar.org

লেখক সংঘ পত্রিকায় প্রথম সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষ্যে ঢাকা রেডিও পাকিস্তান প্রাঙ্গণে এক মনোজ্ঞ প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে গিল্ডের প্রায় আড়াই শ সভ্য ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জনাব খান বাহাদুর আবদুর রহমান, প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁ, সৈয়দ মুর্তজা আলী, কবি আবদুল কাদির, মীজানুর রহমান, কবি ফররুখ আহমদ, কবি তালিম হোসেন, প্রফেসর নূরুল মোমেন (জ. ১৯০৮), আহসান আহমদ আশ্‌ক, সরুর বরবঙ্কী, কাইসার নাদভী প্রমুখ।

১২ জুলাই ১৯৬১ তারিখে গিল্ডের এক্সিকিউটিভ কমিটির এক সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ডিসেম্বর (১৯৬১) মাসের মাঝামাঝি ঢাকায় একটি সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

ঐ সভাতে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক প্রাদেশিক গিল্ডের এক্সিকিউটিভ কমিটির সভ্যপদ ত্যাগ করে যে পদত্যাগ পত্র পেশ করেছিলেন, তা গৃহীত হয় এবং তদস্থলে জনাব এম নাসির আলী সাহেবকে নির্বাচিত করা হয়। প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই গিল্ড পত্রিকার সহসম্পাদক পদ ত্যাগ করে যে পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন, গিল্ডের কেন্দ্রীয় এক্সিকিউটিভ কমিটি কর্তৃক তা গৃহীত হয়। তদস্থলে বেগম সুফিয়া কামালকে মনোনীত করে অন্য একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।[৩০]

১৯৬১ সালের জুন মাসে জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় দফতরে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি বিরাট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী জনাব জমিলউদ্দীন আলী দর্শক হিসাবে এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। বেসরকারীভাবে তিনি রাইটার্স গিল্ডকে পরিচিত করেন।

১৯৬১ সালের একুশে জুন তারিখে জাতিসংঘ নিয়মিতভাবে গিল্ডকে বেসরকারী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।[৩১]

বেসরকারী শিক্ষা সংস্থানের জন্য পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড নিউইয়র্কে একজন স্থায়ী অবৈতনিক প্রতিনিধিও নিয়োগ করেছিলেন।

তখন পর্যন্ত সমস্ত পাকিস্তানে রাইটার্স গিল্ডই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিয়মিতভাবে রেজিস্টার্ড হয়েছিল।[৩২]

১৯৬১ সালের ১১ নবেম্বর তারিখে পূর্ব-পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের কার্য-নির্বাহক কমিটি প্রদেশের দুঃস্থ সাহিত্যিকদিগের সাহায্যকল্পে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। উক্ত প্রস্তাবে যে যে লেখকদিগের নাম গৃহীত হয় তারা যথাক্রমে: কাজী আবুল হোসেন, প্রজেশ কুমার রায় ও সৈয়দ আবদুর রব।

এদের মধ্যে কাজী আবুল হোসেন সাহেবকে মাসে পাঁচ শ' টাকা এবং অন্য চার জনের প্রত্যেককে মাসে আড়াইশ' টাকা সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৩৩]

১৯৬১ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন সপ্তাহব্যাপী কলম্বোতে

www.nagorikpathagar.org

UNESCO' র তত্ত্বাবধানে একটা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান থেকে ছয়জন প্রতিনিধি এই সেমিনারে যোগদান করেন। তম্মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে তিনজন ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তিনজন। পাকিস্তান লেখক সংঘের প্রতিনিধিত্ব করেন কবি গোলাম মোস্তফা।[৩৪]

১৪ জানুয়ারী '৬১ ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী হলে রাইটার্স গিল্ডের তত্ত্বাবধানে মার্জিত পরিবেশের মধ্যে আলাওল স্মৃতি-দিবস উদযাপিত হয়। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ মুর্তজা আলীর ভাষণের পর পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী ভাষণে গভর্নর আজম খান কবি আলাওলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। গভর্নরের বক্তৃতার পর সভাপতি ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর লিখিত ভাষণ দান করেন। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন, অধ্যক্ষ আবদুল হাই ও সৈয়দ মুর্তজা আলী। গোলাম মোস্তফা আলাওলের উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। আলাওলের কবিতা থেকে পাঠ করেন কবি তালিম হোসেন ও কবি বজলুর রশীদ। রেডিও পাকিস্তানের শিল্পীবৃন্দ আলাওলের ওপর একটি জীবন্তিকা অভিনয় করেন। এ উপলক্ষ্যে বাংলা ও উর্দুতে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।[৩৫]

১৯৬২ সালের ২৯ এবং ৩০ জানুয়ারী বাংলা একাডেমীতে পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে গিল্ডের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব কুদরতুল্লাহ শাহাব ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী জনাব জসীমউদ্‌দীন উপস্থিত ছিলেন। এ সময়ে গিল্ডের রিজিওন্যাল সেক্রেটারী ছিলেন ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান গিল্ডের বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করেন। এই সভায় গিল্ডের পক্ষ থেকে কপিরাইট সংক্রান্ত ছয় দফা সুপারিশ পেশ করা হয়।[৩৬]

৭. নির্বাচন

লেখক সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কমিটিতে যারা পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য ছিলেন, তারা ১৯৬২ সালের দিকে এসে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। তা ছাড়া পূর্বাঞ্চল শাখার নিজস্ব কার্যক্রমের আড়ালে কেন্দ্রীয় কার্যক্রম ঢাকায় প্রায় বন্ধই থাকে।

তবু ১৯৭০ সালের মার্চে করাচীতে পাকিস্তান লেখক সংঘের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জনাব মাহবুব জামাল জাহেদী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লেখক সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন।

সেই নির্বাচনে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন আবদুল্লাহ আল মুতী, মিসেস জাহানারা ইমাম, জনাব আহমেদ হোসেন, জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, জনাব আহমদ শফিক, জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মিসেস রাজিয়া খান, জনাব হাসান হাফিজুর রহমান,

www.nagorikpathagar.org

সৈয়দ মুর্তজা আলী, জনাব বিশার আলী, জনাব হামিদ আক্তার, জনাব জামিল মালিক, জনাব মঞ্জুর আরিফ, জনাব রাজার হামদানী, মিস উম্মে আমারা, জনাব হামেদ কাশ্মিরী, জনাব মহসিন ভূপালী, জনাব শওকত সিদ্দিকী, জনাব শওকত সবজওয়ারী, জনাব আশরাফ হোসেন আহমদ, জনাব বশীর মনজুর ও জনাব তানওয়ার আব্বাস।[৩৭]

৮. সাহিত্য পুরস্কার

পাকিস্তান লেখক সংঘের প্রবর্তনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি লেখকদের শ্রেষ্ঠ কর্মের স্বীকৃতি এবং তাঁদের আর্থিক সহযোগিতা দানের জন্য পুরস্কার প্রবর্তনে এগিয়ে আসেন। তার মধ্যে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার উল্লেখযোগ্য। সংঘ আদমজী কর্তৃপক্ষকে প্রতিবছর ২০.০০০ (বিশ হাজার) টাকা মূল্যের পুরস্কার দিতে রাজী করান। প্রথম বছরে আদমজী পুরস্কার লাভ করেন কবি রওশন ইয়াজদানী ও নাট্যকার আবদুস সাত্তার।

পরের বছরে ঔপন্যাসিক রশীদ করিম ও আবদুর রাজ্জাককে তাঁদের উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার দেওয়া হয়। উপন্যাস দু'টি যথাক্রমে 'উত্তমপুরুষ' ও 'কন্যাকুমারী'।

নিম্নলিখিত বিচারকমণ্ডলী দ্বারা আদমজী পুরস্কার স্থির হয়েছিল[৩৮] :

(১) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

(২) ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন

(৩) ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক

(৪) অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী

পাকিস্তান লেখক সংঘ আদমজী সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করলেও সে পুরস্কারের যাথার্থ্য কখনও প্রশ্নাতীত ছিল না। ১৯৬২ সালের আদমজী সাহিত্য পুরস্কার সম্পর্কে বলা হয় :

> এবার এখানে সাহিত্যে আদমজী পুরস্কার পাইয়াছেন খাতামুন নবিঈন–এর লেখক কবি রওশন ইয়াজদানী এবং 'কবিদা' নামক একটি নাটকের জনৈক লেখক। এই নির্বাচন কতটা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে সে সম্পর্কে ইতিপূর্বেই প্রশ্ন দেখা দিয়াছিল, বর্তমানে তাহা আরও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। কবি রওশন ইজদানীর পুরস্কার প্রাপ্তির তবু একটা যুক্তি রহিয়াছে। তিনি কবিতায় বিশেষ করে পল্লী কাব্যের ঢংয়ে শেষ নবীর জীবনী বর্ণনার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই জীবনী কতটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাতে সাহিত্যগুণ কতটা রহিয়াছে, তাহা পর্যালোচনার সৌভাগ্য অবশ্য এখনও আমাদের হয় নাই। জনৈক সাত্তার সাহেবের লেখা 'কবিদা' বইটি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। অসংখ্য ভ্রম–প্রমাদপূর্ণ এবং সাহিত্য গুণের দিক হইতে নিকৃষ্ট জাতীয় এই বইখানি কি করিয়া কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বিচারকের সুস্থ

www.nagorikpathagar.org

> বুদ্ধিকে প্রভাবিত করিয়া নির্বাচিত হইল, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। ইহাই যদি আমাদের সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড হয় এবং সাহিত্য প্রচেষ্টাকে পুরস্কৃত করার ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগসমূহকে যদি এইভাবে প্রহসনে রূপান্তরিত করা হয়, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ কোথায়?[৩৯]

এছাড়া রাইটার্স গিল্ড প্রতিবছর ৩১শে জানুয়ারী তারিখে দশটি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছিল। এই পুরস্কারের মূল্য ছিল ১০০০ (এক হাজার) টাকা প্রতিটি। এই পুরস্কারকে গিল্ডের বাৎসরিক পুরস্কার হিসাবে গণ্য করা হয়।[৪০]

'পূবালী' পত্রিকার সম্পাদক জনাব নূরুল ইসলাম সাহেব ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতি বছর ১০০০ (এক হাজার) টাকা মূল্যে একটি পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।[৪১]

পরবর্তীকালে শিল্পপতি দাউদের অর্থানুকূল্যে দাউদ পুরস্কার (১৯৬৩), ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃক ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কার (১৯৬৮) এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আইয়ুব খান কর্তৃক প্রবর্তিত হয় President's Award for Pride and Performances.

উল্লেখ্য সবগুলো পুরস্কারের পেছনে লেখক সংঘের প্রচেষ্টা ছিল, সরকারেরও উৎসাহ ছিল। এসব পুরস্কারের দ্বারা সাহিত্যের বিকাশ সহায়তা পেয়েছে না বিপথগামী হয়েছে— এ প্রশ্নও ছিল এবং আছে। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে ও পরে লেখক সংঘের মাধ্যমে সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার কাজে লেখকদের ব্যবহার নিন্দিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

৯. প্রকাশনা

রাইটার্স গিল্ড তাদের মুখপত্র হিসাবে বিভিন্ন সময়ে দু'টি সাময়িকী প্রকাশ করে। প্রথমটি ছিল ত্রৈমাসিক 'পূরবী'। সম্পাদক ছিলেন গোলাম মোস্তফা এবং সহসম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই। এক বছরের মধ্যেই সাময়িকীটির নাম বদল করে রাখা হয় 'লেখক সংঘ পত্রিকা'। প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন গোলাম মোস্তফা। পরবর্তী সংখ্যা থেকে গোলাম মোস্তফার সঙ্গে যৌথ সম্পাদক হিসাবে আসেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল।

রাইটার্স গিল্ড বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশেরও উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের কাজটি বেশী দূর এগোয়নি। তাদের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার মধ্যে ছিল ফররুখ আহমদের 'নওফেল ও হাতেম', মওলানা মোস্তাফিজুর রহমানের 'হযরত মোহাম্মদ (দঃ) জীবনী' ও ডঃ আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য'।

১০. ব্যক্তিত্ব

পাকিস্তান লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এই সংঘের সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের খ্যাতিমান ও প্রতিপত্তিশালী লেখক সাহিত্যিক সাংবাদিক

www.nagorikpathagar.org

বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই জড়িত ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ সরাসরি এই সংগঠনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে আবার কেউ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়ে কিংবা গিল্ডের পুরস্কার গ্রহণ অথবা অর্থভোগী হয়ে সংঘের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে — ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫—১৯৬৯), কবি গোলাম মোস্তফা, কবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩—১৯৭৬), কবি সুফিয়া কামাল, আবুল ফজল, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, মুনীর চৌধুরী, ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, সৈয়দ মুর্তজা আলী, কবি আবদুল কাদির, কবি ফররুখ আহমদ, কবি তালিম হোসেন, অধ্যাপক নূরুল মোমেন, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, নীলিমা ইব্রাহীম (জ. ১৯২১), সৈয়দ আলী আহসান (জ. ১৯২২), জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, আশরাফ সিদ্দিকী, হাসান জামান, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, জোবেদা খানম, ডক্টর আনিসুজ্জামান, আবুল হাশেম, মুজিবর রহমান খাঁ (১৯১০—১৯৮৪), গোলাম সাকলায়েন (জ.১৯২৬), মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৬—১৯৭৭), খোদেজা খাতুন (জ. ১৯১৭), বেদুঈন সামাদ (জ. ১৯২৬), আলমগীর জলিল (জ. ১৯২৮) প্রমুখ।[৪২]

১১. লেখক সংঘের ১৯৭০ সালের সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী

১৯৭০ সালের ৮ ও ৯ মার্চ করাচীতে পাকিস্তান লেখক সংঘের চতুর্থ কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়।[৪৩]

<u>মত প্রকাশের স্বাধীনতা</u>

পাকিস্তান লেখক সংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের এই সভা পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস অর্ডিনেন্সের আওতায় কতিপয় পুস্তকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও পশ্চিম পাকিস্তানে কয়েকটি পুস্তক বাজেয়াফত করণের কার্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং মনে করছে যে মতামতের স্বাধীনতা ব্যতীত লেখকের সৃষ্টিশীল কর্ম অসম্ভব। এই সকল কার্য লেখকের মতামতের সেই স্বাধীনতার অপরিহার্য অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ।

<u>লেখকদের আটক করা</u>

পাকিস্তান লেখক সংঘের এই সভা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিনা বিচারে অথবা বিনা কারণে লেখকদের বন্দী করার প্রবণতাকে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করছে। সভা সরকারের নীতি নির্ধারণকারীদের এমন একটি অটল নীতি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছে যাতে কোন লেখককেই তাঁর লেখার জন্য আটক করা না হয়। জনসাধারণের সঙ্গে এবং বিশেষভাবে লেখকদের সঙ্গে সৌহার্দ্য সৃষ্টির জন্য এই সভা বন্দী লেখকদের মামলাগুলি

www.nagorikpathagar.org

অতিসত্বর পর্যালোচনা করে লেখকদের মুক্তি দেয়ার জন্যও সরকারকে আহ্বান করছে।

হুমকি চাপ

পাকিস্তান লেখক সংঘের সাধারণ পরিষদের এই সভা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য সংস্থায় ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসহ জন-সংযোগ মাধ্যম প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত লেখকরা কতিপয় মহলের সহানুভূতিহীন মত ও ভাব পোষণ ও প্রকাশ করার দরুণ তাঁদের উপর ঐ সকল মহলের হুমকি ও চাপ প্রয়োগের প্রবণতাকে গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে। অনুরূপ কারণে লেখকদেরকে কাল-তালিকাভুক্ত করার চেষ্টাও সমর্থনযোগ্য নয়। এই সভা এই মত পোষণ করে যে, মত ধারণ ও প্রকাশ করার স্বাধীনতা প্রত্যেক লেখকের অবিভাজ্য অধিকার এবং এই অধিকারের উপর আক্রমণ লেখার পেশাকেই যে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করে না—লেখায় মানকেও আহত করে। এই সভা হুমকি প্রদর্শন ও কল্পিত দোষী খোঁজার নিন্দাযোগ্য অনুশীলনকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করার জন্য দাবী জানায়।

সংগঠনের গঠনতন্ত্র

এ ইউনিট ভেঙ্গে দেয়ার পরে পাকিস্তান লেখক সংঘের পুনর্গঠন প্রয়োজন হবে বলে কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ সেক্রেটারী জেনারেলকে একটি কমিটি নিয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। কমিটি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আইনগত কাঠামো ঘোষণার পরে পাকিস্তান লেখক সংঘকে পুনর্গঠন করার পথ ও পদ্ধতি উপস্থাপন করবে। গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার জন্য সেক্রেটারী জেনারেল কমিটির সুপারিশসমূহ কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদে পেশ করবেন। এ প্রসঙ্গে সাধারণ পরিষদ আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে সিন্ধি, বেলুচী, সারাইকী, পুস্তো এবং অন্যান্য ভাষার পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের দাবীর কথা উল্লেখ করে যে, উক্ত কমিটি যখন সংঘের পুনর্গঠনের কাজে হাত দেবে তখন এই প্রশ্নের আলোচনা হওয়া উচিত।

সাহিত্য পুরস্কার

পাকিস্তান লেখক সংঘের সাধারণ পরিষদের এই সভা আমাদের জাতীয় ভাষাগুলির প্রখ্যাত লেখকদের নামে সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং কেন্দ্রীয় কমিটিকে এই ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানায়।

পাকিস্তান লেখক সংঘের সাধারণ পরিষদের এই সভা সেক্রেটারী জেনারেলকে বাংলা এবং উর্দু ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় উপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা করার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য অনুরোধ করছে।

সাহিত্য একাডেমী

একাডেমী অব লেবারস প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা পুনরাবৃত্তি করে পাকিস্তান লেখক সংঘের এই সাধারণ সভা সেক্রেটারী জেনারেল ও তাঁর পূর্বসূরীকে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়

www.nagorikpathagar.org

এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করছে এবং শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে এর রির্পোট পেশ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।

জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার

পাকিস্তান লেখক সংঘের এই কেন্দ্রীয় সাধারণ সভা (ক) ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাশ্মীরী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন করে। (খ) আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতি অনুযায়ী ভিয়েৎনামী জনগণকে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে দেয়ার জন্য ভিয়েৎনাম থেকে সকল প্রকার বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার করার জন্য দাবী জানাচ্ছে। (গ) অবিলম্বে সকল দখলীকৃত আরব এলাকা থেকে ইসরায়েলী সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করে এই সকল এলাকার অধিবাসীদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন বন্ধ করার দাবী করছে। (ঘ) এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার অত্যাচারসহ সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য আফ্রো-এশীয় লেখক ও জনগণের সংগ্রামে একাত্ম ঘোষণা করছে। দক্ষিণ আফ্রিকা রোডেশিয়া ও এঙ্গোলায় শ্বেতাঙ্গ অত্যাচার ও সংখ্যালঘুদের শাসন প্রতিষ্ঠা ও টিকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রকেও এই সভা গভীরভাবে নিন্দা করে।

পূর্বতন সেক্রেটারী জেনারেল

পাকিস্তান লেখক সংঘের এই সাধারণ সভা বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেলের সংঘের সাথে সার্থকভাবে জড়িত থাকাকালীন তার প্রশংসনীয় কার্যাবলীর কথা স্মরণ করে। সংঘটিকে কৃতকার্যতা ও সার্থকতার দিকে টেনে আনতে প্রতিকূল সময়েও তিনি উদ্যোগ, সততা, সাহস ও কল্পনা নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং ব্যক্তিগত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। আমরা আশা করি তাঁর অভিজ্ঞতার ফল আমরা আসন্ন দিনগুলিতেও পাব।

অপরাধমূলক চলচ্চিত্র

এই সভা মনে করে যে নির্বিচারে ফুসলিয়ে নেয়া, অপহরণ, হত্যা ও অন্যান্য অপরাধমূলক বিদেশী ছায়াছবি টেলিভিশন আমাদের নিজস্ব কয়েকটি সাহিত্যকর্ম প্রদর্শন বন্ধ করে এই সকল চিত্র অবাধ প্রদর্শনের ফলে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তাতে পাকিস্তান লেখক সংঘ অসন্তোষ প্রকাশ করছে।

চাকরিতে বয়সসীমা

পাকিস্তান লেখক সংঘের এই সাধারণ সভা করাচী বাংলা ও উর্দু উন্নয়ন বোর্ড, কেন্দ্রীয় উর্দু উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলা একাডেমী, পিসিএসআই, আরওপি, এইসি-এর মত গবেষণামূলক সংস্থায় সরকারী বিভাগের পদ্ধতি অনুসারে নির্দিষ্ট বয়সীমায় পৌছার পর

www.nagorikpathagar.org

প্রখ্যাত ব্যক্তিদের স্ব স্ব বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণের করানোর কাজ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে। এই পরিষদ মনে করে যে নির্দিষ্ট বয়স হওয়ার সাথে সাথেই সাধারণভাবে পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীদের প্রয়োজন নিঃশেষ হয় না। সুতরাং সভা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে নীতি পুনর্বিবেচনা করে তাদের বয়সের ঊর্ধ্বে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই রকম পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীদের কাজ করার সুযোগ অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করছে।

উল্লিখিত মতানুসারে এই সভা বাংলা ও উর্দু উন্নয়ন বোর্ডকে স্ব স্ব ভাষায় কতিপয় প্রখ্যাত পণ্ডিত ও লেখক চাকরিজীবীর সম্বন্ধে তাদের ব্যবস্থা গ্রহণ পুনর্বিবেচনা ও তাদের নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য যথার্থ পরিমাণে পেনশন ও এককালীন দানের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছে।

<u>কাগজের দাম</u>

পাকিস্তান লেখক সংঘের এই সাধারণ সভা মনে করে যে ছাপার কাগজের অবিরাম মূল্য বৃদ্ধির ফলে বই-এর মূল্য অত্যধিক ধার্য্য করতে হয়। ফলে বই-এর প্রচার অবাঞ্ছিতভাবে ব্যাহত হয়। এতে সাধারণভাবে শিক্ষার প্রসার ও বিশেষভাবে সাহিত্যিক উন্নয়ন সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এই সভা তাই ছাপার কাগজের বিশেষ করে ছাপার জন্য ব্যবহৃত পুস্তক, সাময়িকী ও খবরের কাগজে মূল্য হ্রাস করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করছে।

<u>ভারতীয় বই</u>

পাকিস্তান লেখক সংঘের এই কেন্দ্রীয় সাধারণ সভা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য সাময়িকী বই ও পত্রিকা লেনদেন অপরিহার্য মনে করে বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়াও ভারত থেকে পুস্তক আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা সাহিত্য-শিক্ষা প্রদান ও অন্যান্য জ্ঞান-বৃদ্ধির উন্নয়নের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করে। এই সভা সরকারকে বই ও সাময়িকী আমদানী রফতানীকে অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি থেকে পৃথক বিবেচনা করে ভারতীয় বই ও পত্র-পত্রিকা পাকিস্তানে আমদানীর অনুমতি দান করার জন্য অনুরোধ করে। এই সভা সরকারকে বিষয়টি ভারত সরকারের নিকট উপস্থাপন করার জন্য ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে পাকিস্তানী বই ভারতে আমদানী করার জন্য অনুরোধ করতে আহ্বান জানাচ্ছে।

১২. উপসংহার

পাকিস্তান লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পাকিস্তানী জাতীয় আদর্শ সমন্বিতকরণ ও বিকাশের স্বার্থে। জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনকে সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে লেখকদের ব্যবহার করার ও নানা কাজে ব্যস্ত রাখার অঘোষিত

www.nagorikpathagar.org

লক্ষ্যও ছিল। এই সংগঠন লেখকদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দান করে এবং তাদের নানা রকম কল্যাণমূলক কাজেও শরীক হয়। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসক সম্প্রদায়।

কালক্রমে কেন্দ্রীয় শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিরোধ যত তীব্র হয়ে উঠতে থাকে, পাকিস্তান লেখক সংঘের কার্যক্রমও ততই পিছিয়ে পড়তে থাকে এবং ১৯৬৪ সালের পর এক পর্যায়ে এর কার্যক্রম প্রায় বন্ধই হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণ-লেখক শিল্পীরা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও অন্যান্য স্বাতন্ত্র্য চিন্তা চেতনা নিয়ে ১৯৬২ সালে নতুন করে গঠন করেন পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা। তাদের কার্যক্রম সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিক লেখক সংঘের কার্যক্রম থেকে পৃথক ছিল।

তথ্যনির্দেশ

১. জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান, *পাকিস্তানের সংহতি ও লেখকদের ভূমিকা* (মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন ১৩৬৫) পৃ ৩৪৯

২. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব-বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন* (ঢাকা, ১৯৮৩) পৃ ৫১

৩. মঈনুদ্দীন, *দেখে এলাম করাচী* (মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬) পৃ ৬১৯

৪. Dawn, Jan 30, 1959

৫. মঈনুদ্দীন, *দেখে এলাম করাচী*, (মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ, ১৩৬৬) পৃ ৫০৩

৬. মোহাম্মদ নাসির আলী, *করাচী লেখক সম্মেলন* (মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন ১৩৬৫) পৃ ৩৭৭-৩৮০

৭. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫৯

৮. পূর্বোক্ত

৯. The Pakistan Observer, Jan 30, 1959

১০. মোহাম্মদ নাসির আলী, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৭৯

১১. জসীমউদ্‌দীন, *আমাদের সাহিত্যের সমস্যা* (সভাপতির ভাষণ), মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন ১৩৬৫, পৃ ৩৫২

১২. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫৪

১৩. পূর্বোক্ত

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫২-৩৫৭

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫৬

www.nagorikpathagar.org

১৬. মঈনুদ্দীন, *দেখে এলাম করাচী*, (মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ, ১৩৬৬) পৃ ৫১০

১৭. পূর্বোক্ত

১৮. সাইদ-উর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ৫২

১৯. মোহাম্মদ নাসির আলী, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৭৯

২০. মঈনুদ্দীন, *দেখে এলাম করাচী* (মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬) পৃ ৬১৮

২১. মোহাম্মদ নাসির আলী, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৭৯

২২. The Pakistan Observer, Feb 1, 1959

২৩. কুদরতুল্লাহ শেহাব, *লেখক ও লেখকের স্বাধীনতা* (মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন ১৩৬৫) পৃ ৩৭৫-৩৭৬/ The Pakistan Observer, Feb 1, 1959 .

২৪. পূর্বোক্ত

২৫. জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান, *পাকিস্তানের সংহতি ও লেখকদের ভূমিকা* (মাসিক মোহাম্মদী, পূর্বোক্ত সংখ্যা

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫১

২৭. লেখক সঙ্ঘ পত্রিকা (রাইটার্স গিল্ডের মুখপত্র) সম্পাদক কবি গোলাম মোস্তফা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮

২৮. 'পূরবী' (রাইটার্স গিল্ডের মুখপত্র) প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৬৭ সম্পাদক : গোলাম মোস্তফা/মুহম্মদ আবদুল হাই

২৯. লেখক সংঘ পত্রিকা, (রাইটার্স গিল্ডের মুখপত্র) প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ পৃ ৭৭-৭৮

৩০. লেখক সংঘ পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, আজাদী সংখ্যা, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৬৮ পৃ ২০০

৩১. লেখক সংঘ পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৬৮, সম্পাদক : গোলাম মোস্তফা/সুফিয়া কামাল, পৃ ২৬৬

৩২. পূর্বোক্ত

৩৩. লেখক সংঘ পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৬৮, পৃ ৩৯০

৩৪. লেখক সংঘ পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, পৃ ৪৪৪

৩৫. লেখক সংঘ পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, অষ্টম-নবম সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৬৮, পৃ ৫৪৮

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৫৪৯

৩৭. পরিক্রম, সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ফেব্রুয়ারী-মে ১৯৭০

৩৮. লেখক সংঘ পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৬৮, পৃ ৩২৯

৩৯. মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ, ১৩৬৭, পৃ ২২০

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩০

www.nagorikpathagar.org

৪১. লেখক সংঘ পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৬৮, পৃ ৩৮৮

৪২. পূরবী, সম্পাদক গোলাম মোস্তফা এবং 'লেখক সংঘ পত্রিকা' সম্পাদক : গোলাম মোস্তফা/সুফিয়া কামাল

৪৩. পূর্বোক্ত

www.nagorikpathagar.org

সাত. ছায়ানট ১৯৬১

১. প্রতিষ্ঠা ও পটভূমি

১৯৬১ সালে সারা পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপনের পর একদল সাংস্কৃতিক কর্মী একটি প্রগতিশীল নতুন সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

সে উদ্যোগের অংশ হিসাবেই ৩১ র‍্যাংকিন স্ট্রিটের সিধু ভাই (মোখলেসুর রহমান), রোজ বু (শামসুন্নাহার রহমান); গোপীবাগের আহমেদুর রহমান (ইত্তেফাকের ভীমরুল), ছানা (মীজানুর রহমান), মানিক (সাইফউদ্দীন আহমদ), আরো অনেকে; অন্যান্য অঞ্চল থেকে সুফিয়া কামাল, সাইদুল হাসান ও ফরিদা হাসান, ওয়াহিদুল হক এবং আরো বহু কর্মী একত্র হয়ে বনভোজনে যাওয়া হল একদিন জয়দেবপুরে। সেখানেই বসে বিকাল বেলার সভায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যে সমিতি গঠন করা হল।'[১] এছাড়াও এই সংগঠন গড়ে তোলার জন্য তারা ঢাকায়ও আর একটি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন।[২] এটাই ছায়ানটের গোড়ার কথা।[৩]

তবে প্রধানত সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছায়ানটের উদ্ভবের পটভূমি ছিল আরও পেছনে :

> '৫৮-র সামরিক শাসনের পর থেকে সংস্কৃতিচর্চা স্তিমিত, অবরুদ্ধ, প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে উঠেছে। বাধা-নিষেধের বেড়াজাল ও ক্ষমতার দাম্ভিক আস্ফালনে যে আঁধারকে মনে হয়েছিল বুঝি বা অচ্ছেদ্য, সীমাহীন সেখানে আলোক রশ্মির ইশারা মিললো শতবার্ষিককে ঘিরে।
>
> দেশের সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিদের ভিতরে কর্মের সাড়া জাগলো। সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচীর মাধ্যমে শতবার্ষিকী উৎসব পালন করা হল। কারিগরি মিলনায়তনে আয়োজিত সংস্কৃতির এই উৎসব দেশবাসী আন্তরিকভাবে বরণ করে নিয়েছিলেন। উৎসব-কর্মী ও শিল্পীদের কাছে এই সাফল্য ছিল আশাতীত। প্রাণময় কর্মচাঞ্চল্যে ভয়ের আঁধি কিছু পরিমাণে অপসৃত হল। বিত্তের জড়তা কাটিয়ে শিল্পচর্চার দুর্গতি মোচনের একটি পথরেখা যেন পাওয়া গেল।
>
> শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান শেষে এই সম্মিলিত প্রয়াসের শক্তিকে কার্যকর পথে

www.nagorikpathagar.org

পরিচালনা করার তাগিদ সকলে অনুভব করেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই জয়দেবপুরে সমপ্রাণ সংস্কৃতিমনাদের এক বৈকালিক সমাবেশে গঠন করা হল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সমিতি—ছায়ানট।[৪]

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ছায়ানটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্‌জীদা খাতুন (জ. ১৯৩৩) লিখেছেন, 'সংগঠনের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রেরণা হলেও, ছায়ানট সঙ্ঘবদ্ধ হল বাঙালী সংস্কৃতির উজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলার জন্য।[৫] তাই 'শুরু থেকে কায়মনে বাঙালী হওয়ার ব্রত নিয়ে ছায়ানট অগ্রসর হয়েছে।'[৬] তাছাড়া 'ছায়ানট মূলত একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান। এটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতি ও সঙ্গীত–চর্চায় এদেশের ঐতিহ্য ও প্রকৃতিমুখী হওয়া।'[৭] এছাড়াও রাজনৈতিকভাবে প্রগতিশীল শিবিরের হয়ে বেশ তৎপরতা প্রদর্শন করেছে এই সংস্থা।[৮]

৩. কার্যনির্বাহী কমিটি

১৯৬১ সালের গোড়ার দিকে ছায়ানট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পর এর প্রথম (১৯৬১–৬২) সভাপতি হন বেগম সুফিয়া কামাল এবং প্রথম সম্পাদক ছিলেন মিসেস ফরিদা হাসান। অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন ঃ মিসেস মহিউদ্দীন, সাইফুদ্দীন আহমদ মানিক, সিধু ভাই, আহমেদুর রহমান, ওয়াহিদুল হক, সন্‌জীদা খাতুন, কামাল লোহানী প্রমুখ।[৯]

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আর যারা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদের মধ্যে ছিলেন কামাল লোহানী (জ. ১৯৩৭), জাহেদুর রহিম, সাইফ–উদ–দৌলা, ইফফাত আরা খান প্রমুখ।[১০] তবে এক সময় "নীতিগত কারণে কামাল লোহানী ছায়ানট ছেড়ে দিয়েছিলেন।"[১১]

এ সম্পর্কে কামাল লোহানী লিখেছেন :

> ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য ঢাকায় বেশ ক'টি কমিটি গঠিত হয় এবং তারা সামরিক শাসন উপেক্ষা করে বহু অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এরই সাফল্যজনক পরিণতিতে সৃষ্টি হয় ছায়ানট। বাঙ্গালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর গণসংস্কৃতির বিকাশমান ধারাকে অব্যাহত রাখার মানসেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সংগঠন। আমাদের বাসনা ছিল—গণসংগীতের চর্চা হবে অন্যতম প্রধান বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটি তখন সম্ভব হয়নি। ১৯৬৩ সালে যখন ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করা হলো তখন আমরা যারা জড়িত—ভেবেছিলাম এই বিদ্যায়তন থেকেই প্রগতিশীল সংস্কৃতির কর্মী বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আইয়ুবী মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনের পর আমরা ছায়ানট থেকে আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনের বিরুদ্ধে পল্টন ময়দানে (বর্তমানে

www.nagorikpathagar.org

> আউটার স্টেডিয়াম) একটি সাংস্কৃতিক সমাবেশ করে গণসঙ্গীত অনুষ্ঠান করতে চাইলাম, তখন আঘাত আসলো চূড়ান্ত। আমরা সবাই—আলতাফ মাহমুদ, আমিনুল ইসলাম (রংপুর), সায়েদুল ইসলাম, সিধু ভাই (মোখলেসুর রহমান) ও আমি সিধু ভাইয়ের র‍্যাংকিন স্ট্রীটের বাসায় বিকেলে প্রতীক্ষা করছি ছায়ানটের ছাত্রছাত্রীদের আসার। এর মধ্যে ছায়ানটের অন্যতম সহসভানেত্রী মিসেস মোশাররফ এসে জানালেন, "তোমাদের ছেলেমেয়েরা কেউ আসবে না। ওরা জানিয়েছে, ওদের বাবা-মা পল্টন ময়দানে গান গাইতে দিতে চায় না।" —এ কথাগুলো ছিল মর্মভেদী। ভাবতেও পারিনি এমন জবাব শুনবো ওদের কাছ থেকে। পল্টনে গণসঙ্গীতের আসর সেদিন হতে পারেনি।[১২]

পরে কামাল লোহানীর উদ্যোগে ক্রান্তি নামক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গঠিত হয়। ছায়ানটের সম্পাদক পদে পরিবর্তন হলেও প্রথম থেকেই সভাপতি রয়ে গেছেন বেগম সুফিয়া কামাল।

৪. কর্মতৎপরতা

যে সময়ে ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা 'সে সময়ে কলকাতার অনুসরণে বিদেশীদের অনুকরণে গলা-কাঁপানো আধুনিক গানই সাধারণ শ্রোতৃসমাজের চিত্তবিনোদন করছে। . . .উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শ্রোতৃরুচিতে দুঃসহ। আসরে গাইতে বসে, চুটকি গানের ফরমায়েশ শুনে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী মর্মাহত হয়ে ফিরেছিলেন ঢাকা থেকে। রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অন্যান্য মার্জিত রুচির গানও সাধারণ শিক্ষিত মনে ঢেউ জাগাতে পারছে না সে সময়।'[১৩]

তাই প্রথম থেকে শ্রোতাসাধারণের রুচি পরিবর্তনের উদ্যোগও গ্রহণ করে ছায়ানট। তারা বিভিন্ন ঘরোয়া ছোট খাট ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু করে তাদের কার্যক্রম।[১৪]

ছায়ানটের প্রথম জাঁকালো প্রকাশ্য অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ঢাকার ইঞ্জিনীয়ার্স ইন্সটিটিউশনে। তার শিরোনাম ছিল 'পুরোনো গানের আসর'। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন আবদুল আহাদ।

> 'সমগ্র বাংলার বিশিষ্ট সুরকার গীত-রচয়িতাদের সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে বাঙালী ঐতিহ্য স্মরণ করা হয়েছিল সেদিন। ফেরদৌসী রহমান যে দু'টি গান গেয়েছিলেন, তার উল্লেখ থেকেই সঙ্গীত নির্বাচনের কালপরিধি বোঝা যাবে। তাঁর প্রথম গান কাননবালার গাওয়া বিদ্যাপতির রচনা 'অঙ্গনে আওব যব রসিয়া', দ্বিতীয় গান হিমাংসু দত্ত সুরসাগরের 'রাতের ময়ুর ছড়ালো যে পাখা'।[১৫]

সনজীদা খাতুন লিখেছেন, 'প্রথম অনুষ্ঠানের পর নানা সাংগঠনিক অসুবিধার দরুন

www.nagorikpathagar.org

ছায়ানটের কাজ কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে।' পরবর্তীকালে কার্যনির্বাহী কমিটি পুনর্বিন্যাস করা হয়। এবং ধীরে হলেও তার কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। এক্ষেত্রে তারা প্রধানত যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিতেন তা হল, আমন্ত্রণপত্র থেকে শুরু করে মঞ্চসজ্জা, সকল ক্ষেত্রে সুরুচি এবং আভিজাত্যের ছাপ তুলে ধরা। 'কখনও কখনও শ্রোতাদের আসরে বিশাল থালায় করে ফুল সাজানো হত, ফরাস পেতে দেয়া হত তাদের জন্য, বিদ্যুতের বদলে মোমের আলো জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত।'[১৬]

এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে ১৩৭০ সনের (১৯৬৩ খৃ) পহেলা বৈশাখ প্রতিষ্ঠিত হয় ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন।[১৭] সন্‌জীদা খাতুনের উদ্যোগেই পরের বছর অর্থাৎ ১৩৭১ সনের ১ বৈশাখ ছায়ানট রমনার বটমূলে উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা নববর্ষ পালন করে।[১৮]

তবে ঐ একই বছর ১৩৭১ সনে ঢাকা শহরে পহেলা বৈশাখ প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়। প্রাদেশিক সরকার এ দিনটিকে ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করে এবং সেদিন ঢাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভূতপূর্ব জনসমাগম দেখা যায়। 'সে বছর বাংলা একাডেমী, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, ছায়ানট, তমদ্দুন মজলিস, নিক্কন ললিতকলা কেন্দ্র, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদ, ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্র সংসদ, গীতিকলা সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।'[১৯]

এছাড়াও ছায়ানট অন্যান্য যেসব নিয়মিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, তার মধ্যে ছিল 'রবীন্দ্র-নজরুল জন্মতিথি, নববর্ষ, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব ও বসন্তোৎসব পালন।'[২০]

ছায়ানটের কার্যক্রম শুধুমাত্র সঙ্গীত চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯৬৩ সালে প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাসের সময় জনগণকে সাহায্য করার জন্য 'ভিক্ষা দাও ওগো পুরবাসী' গান গেয়ে ছায়ানট তহবিল সংগ্রহ করে। সেই সংগৃহীত অর্থে বঙ্গোপসাগরের এক দ্বীপে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হল, যেখানে বন্যাবাত্যা বিপন্ন মানুষ আশ্রয় পাবে।[২১]

এছাড়া ১৯৬৪ সালে দেশে দাঙ্গা রোধে অন্যদের সঙ্গে মিলে ছায়ানট জনমত সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করে।[২২]

১৯৬৫ সালের ২২ শে শ্রাবণ ছায়ানট শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী পালন করে।[২৩]

৫. ছায়ানটের প্রতি সরকারী মনোভাব

ছায়ানটের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারী নানা বাধার কথা উল্লেখ করেছেন সন্‌জীদা খাতুন। সে কারণে ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যালয়কে স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে বারবার। কখনও তা আজিমপুরের অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ে, কখনও বাংলা একাডেমীতে,

www.nagorikpathagar.org

কখনও কলাবাগানে, কখনও বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী স্কুলে। এ ক্ষেত্রে সমস্যাও কম ছিল না।

> বিপদ কম আসেনি। সরকারী অর্থ নেওয়া হয় না, তবু জনশিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরেট থেকে বিদ্যালয় পরিদর্শন হল, আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করার নির্দেশ এল কড়া ভাষায়। আসল ব্যাপার, কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের কাছে ছায়ানট সম্পর্কে নানা তথ্য স্তূপীকৃত হওয়ায় তারা প্রাদেশিক সরকারকে এই বিপজ্জনক বাঙালী বা তথাকথিত হিন্দু সংস্কৃতির আখড়াটি সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাবার আদেশ করেন। গবর্নর মোনেম খাঁ সাহেব জনশিক্ষা বিভাগকে ঘন ঘন তাগাদা দিয়ে ছায়ানটের প্রকৃত পরিচয় জানতে চান। ছায়ানটের ব্যয় নির্বাহ হয় কি দিয়ে—এইটেই প্রধান অনুসন্ধানের বিষয়। ঢাকার অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য লাভের পর ব্যয় সঙ্কুলান করতে পারে না। অথচ ছায়ানট সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে এমন সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কিসের জোরে? তথাকথিত হিন্দু অর্থাৎ বাঙালী সংস্কৃতির চর্চা যখন ছায়ানটের লক্ষ্য—তবে নির্ঘাৎ ভারতীয় অর্থেই এই প্রতিষ্ঠান পুষ্ট।[২৪]

তবে সন্‌জীদা খাতুনও তার প্রবন্ধে ছায়ানটের অর্থ সংস্থানের কোন সুনির্দিষ্ট সূত্রের কথা উল্লেখ করেননি।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বা কমিটির অর্থ সংস্থান সম্পর্কে সাঈদ-উর-রহমান একটি তথ্য দিয়েছেন। "ঢাকার প্রেস ক্লাবে তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক সাংবাদিক সমবায়ে 'রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কমিটি' গঠিত হয়েছিল। সিম্পোজিয়াম, নাটক মঞ্চায়ন, চিত্র-পুস্তক প্রদর্শনী, শিশুদের অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে কমিটি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।"[২৫] এ সম্পর্কে ডঃ সাঈদ-উর রহমান (জ. ১৯৪৮) লিখেছেন :

> ঢাকার এই কমিটিকে ভারতীয় দূতাবাস অর্থানুকূল্য করেছিলেন বলে প্রাদেশিক সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গোপন রিপোর্টে উল্লেখ আছে। রিপোর্টটি একবার আমি দেখেছিলাম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের অফিসে। কিন্তু পরবর্তীকালে সেটা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।[২৬]

৬. ছায়ানট সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকীতে ছায়ানট বরাবরই দুটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এই দুটি দিবস পালন করার সময় দেশের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হত। শান্ত পরিবেশে মোটামুটি শ্রদ্ধা নিবেদনই যথেষ্ট ছিল। আর যখনই

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলন থাকত—তখনই সঙ্গীত চয়নে—আবৃত্তির অংশ নির্বাচনে সচেতনভাবে কালোপযোগী বিষয় অবলম্বন করা হত। ফলে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীতে কখনও কখনও শুধু দেশাত্মবোধক গান হ'ত। এক এক সময় রবীন্দ্রনাথের এক এক দিক রূপায়িত হ'ত। তাছাড়া পরিবেশ শান্ত থাকলে কখনও ভক্তি ভাবের গান, কখনও প্রেমের গান, কখনও ধ্রুপদাঙ্গের গান আবার নজরুল জন্ম তিথিতে সচরাচর নজরুলের সব ধরনের গান পরিবেশনের চেষ্টা করা হ'ত। ছায়ানটের চেষ্টা ছিল নজরুলের সমগ্র রূপের মাধ্যমে বাঙালী ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্তত নজরুলের সূত্রে যে যোগ আমাদের স্পষ্ট, তা ঘোষণা করা। নজরুলের জাগরণী গান যেমন, তেমনি তাঁর শ্যামা সঙ্গীতও ছায়ানটের অনুষ্ঠানে গাইতে উৎসাহ পেতেন গুণী শিল্পীরা। ভক্তিরসের গান হিসাবে এই সব গান, উদ্দীপনার গান, গজল, রাগসঙ্গীত সব কিছুই ছায়ানটের আসরে সমান আদরে স্থান পেত। এইভাবে নজরুলকে প্রচার করার চেষ্টা করত ছায়ানট। এই রকম একটি নজরুল জন্মোৎসবকে অক্লান্ত পরিশ্রমে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছিলেন আলতাফ মাহমুদ। 'বিদ্রোহী' কবিতার অংশবিশেষে সুর দিয়ে সম্মেলক কণ্ঠে গাইয়েছিলেন তিনি।[২৭]

৭. উপসংহার

ছায়ানট তার উন্মেষকালে নানা ধরনের অনুষ্ঠান করলেও শেষ পর্যন্ত তা 'ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন'-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তবে প্রথম থেকে এই বিদ্যায়তনের ছাত্র-ছাত্রীরা রমনার বটমূলে ১লা বৈশাখে যে বর্ষবরণ সঙ্গীতানুষ্ঠানের রীতি চালু করেন, তার ধারাবাহিকতা স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও বজায় থাকে।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শুদ্ধতা ও সুরুচি ছায়ানটের প্রধান অবদান বলে স্বীকার করে নেয়া যায়। তাছাড়া 'এদেশের বাঙালী সংস্কৃতির পরিশীলিত, সমৃদ্ধ রূপটি ছায়ানটের সাধনার মধ্যে দিয়েই ষাট দশক ধরে মূর্ত ও প্রতিভাত হয়েছে।'[২৮] তবে ছায়ানটের সবচেয়ে বড় অবদান হল, এই সংগঠন পূর্ব বাংলায় 'রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রশিক্ষণ, পরিবেশন এবং প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।'[২৯]

তথ্যনির্দেশ

১. সন্‌জীদা খাতুন, *ছায়ানট : সবারে কবির আহবান* (স্মরণিকা, ৮ জানুয়ারী, ১৯৮৭) পৃ ৭-৮

২. সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা,* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩) পৃ ৮২

৩. সন্‌জীদা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ ৮

৪. *ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন, পরিচিতি, শিক্ষাক্রম ও বিভাগ পরিচয়,* আষাঢ়, ১৩৮৫

www.nagorikpathagar.org

৫. সন্‌জীদা খাতুন, পূর্বোক্ত পৃ ৮

৬. *ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন,* (ফোল্ডার) পূর্বোক্ত

৭. সাঈদ-উর-রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ৮২

৮. কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম* (ঢাকা, ১৯৯৪), পৃ ৭৬

৯. ছায়ানটের দফতর সম্পাদক প্রদত্ত তথ্য, (১০-০৯-১৯৯৩)

১০. পূর্বোক্ত

১১. আসাদ চৌধুরী, *সংস্কৃতির বিকাশধারা* (প্রবন্ধ, *রক্তাক্ত বাংলা,* কলকাতা, ১৯৭১) পৃ ৩০৩

১২. সন্‌জীদা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ ৯

১৩. কামাল লোহানী, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৫-৫৬

১৪. সন্‌জীদা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ ৯-১০

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৮

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৮-৯

১৭. *ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন* (ফোল্ডার)

১৮. পূর্বোক্ত ফোল্ডার, পৃ ১৪-১৫

১৯. সাঈদ-উর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ৮৪

২০. পূর্বোক্ত, পৃ ৮২

২১. *চলায় চলায় বাজাব জয়ের ভেরী,* (ছায়ানট পুনর্মিলনী উৎসব, ফোল্ডার), ১২ জানুয়ারী, ১৯৯০

২২. সন্‌জীদা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩

২৩. পূর্বোক্ত

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ ১৯

২৫. দৈনিক আজাদ, ২৯-৩-১৯৬১

২৬. সাঈদ-উর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ৮১

২৭. সন্‌জীদা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩

২৮. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশ আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পর্যায়* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৭৬) পৃ ২০০

২৯. কামাল লোহানী, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৬

www.nagorikpathagar.org

আট. পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা ১৯৬২

১. পটভূমি

১৯৬২ সালে করাচীতে পাকিস্তান লেখক সংঘের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্য দিয়েই পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা স্বতন্ত্র মর্যাদায় দাঁড়িয়ে যায়। ওই নির্বাচনে পাকিস্তান লেখক সংঘের ভেতরে অপেক্ষাকৃত তরুণরা প্রবীণদের বাদ দিয়ে নতুন করে পূর্বাঞ্চল শাখা গঠন করার উদ্যোগ নেন।[১] সেই নির্বাচনে কবি আবদুল কাদির, মতিনউদ্দীন আহমদ, কবি মঈনুদ্দীন, আবদুর রহমান খান, মোস্তাফিজুর রহমান খান, মোসলেম আহমদ, আমিনুল ইসলাম ও মহীউদ্দীন খানকে হারিয়ে দিয়ে পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার কার্যকরী সংসদের সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, শামসুন্নাহার মাহমুদ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক আশকার ইবনে শাইখ, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কবি আবদুর রশীদ খান, মাহবুব জামান জাহেদী, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ।[২]

এই কমিটি গঠনের প্রক্রিয়ায় তমদ্দুন মজলিসের সমর্থকদের সঙ্গে প্রগতিশীল বামপন্থী বলে পরিচিত লেখকেরাও ছিলেন। পূর্বাঞ্চল শাখার এই লেখকদের মধ্যে নতুন চিন্তা চেতনা এবং পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীদার লেখকরাও ছিলেন। পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা অধিকতর সক্রিয়তার সঙ্গে কাজ শুরু করে।

১৯৬২ সাল থেকেই লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার নিজস্ব কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৬২ সালের ১১ মে এর কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় মুনীর চৌধুরী ও আশকার ইবনে শাইখ সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বচিত হন।[৩] বলা বাহুল্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাশীলতার দিক দিয়ে এঁরা দুই জন ছিলেন দুই বিপরীত মেরুর।

নবগঠিত এই কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মাজার জিয়ারত করতে যান। তারা সেখানে গিয়ে ফাতেহা পাঠ করেন এবং শেরে বাংলার রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন। এর আগে কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ওপর বিভিন্ন রচনা-সমৃদ্ধ একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করবেন।[৪]

১৯৬২ সালে পাকিস্তান লেখক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পূর্বাঞ্চল শাখা থেকে কবি

www.nagorikpathagar.org

গোলাম মোস্তফা বাদ পড়েন। এর পর কবি গোলাম মোস্তফা সম্পাদিত লেখক সংঘ পত্রিকা 'পরিক্রম' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। পরিক্রম প্রথম সংখ্যায় ব্রাকেটে লেখা হয় 'লেখক সংঘ পত্রিকা একত্রীভূত'। প্রথম সংখ্যায়ই এক ঘোষণায় বলা হয় :

> লেখক সংঘ পত্রিকার সম্পাদক জনাব গোলাম মোস্তফা ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করায় পত্রিকা সম্পাদনার জন্য কার্যকরী পরিষদ নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই নতুন ব্যবস্থানুযায়ী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলামকে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই সময়ই পত্রিকার নাম পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর নতুন নাম পরিক্রম।[৫]

২. কর্মতৎপরতা

লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার কার্যক্রম প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল 'পরিক্রম' পত্রিকা নিয়েই। কখনও কখনও নির্বাহী কমিটির দু'একটি সভা হয়েছে। কিন্তু অন্য কার্যক্রম কমই ছিল। তবে পরিক্রম পত্রিকায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার কার্যক্রম আরও স্তিমিত হয়ে পড়ে।

১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সময় লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার কার্যক্রম প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হয়। তখন লেখক সংঘের সক্রিয়তা কমে যায়।

১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে বিতর্কের ফলে লেখক সংঘের সদস্যদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। ফলে এর কার্যক্রম আরও ঝিমিয়ে পড়ে।[৬]

তবে ১৯৬৮ সালেই লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে লেখক সংঘ উপমহাদেশের বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের পাঁচ জন খ্যাতিমান কবির স্মরণে 'মহাকবি স্মরণোৎসবে'র আয়োজন করে। ৫ জুলাই থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত ইঞ্জিনীয়ার্স ইন্সটিটিউশনে এই অনুষ্ঠান বসে। যাদের স্মরণে এই অনুষ্ঠান—তারা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর্জা গালিব, আল্লামা ইকবাল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম।[৭]

৩. মহাকবি স্মরণোৎসব

<u>৫ জুলাই, ১৯৬৮</u>

৫ জুলাই রবীন্দ্র দিবসের সভাপতি ছিলেন আবুল হাশিম। প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ আনিসুজ্জামান। তিন পর্যায়ের এই অনুষ্ঠানে আলোচনা সভার পর বসে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও আবৃত্তির আসর এবং পরিবেশিত হয় নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'।

অনুষ্ঠানে জনাব আবুল হাশিম বলেন, 'রবীন্দ্র সাহিত্য বা যে কোন সাহিত্য সম্পর্কে

www.nagorikpathagar.org

আমি সব সময় একটি কথা বলি—সাহিত্য ও সংস্কৃতি এক বস্তু নয়। সাহিত্য এক শিল্প। যে কোন শিল্পকেই যে কোন আদর্শের বাহন হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব'। জনাব আবুল হাশিম বলেন যে, 'একে আমরা সব সময় স্মরণ রাখি না—একের সঙ্গে অপরকে মিলিয়ে দিয়ে সংস্কৃতির সঙ্কট সৃষ্টি করি'।

তিনি বলেন, এই বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের আস্বাদ নেবো। বাংলা ভাষাকে একটি শিল্প হিসেবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে হবে। জনাব আবুল হাশিম বলেন, গত এক শ' বছরের বাংলা সাহিত্যকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

জনাব আবুল হাশিম বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ মত ও পথের উর্ধ্বে। পরিবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও একটি বিষয়ে সারা জীবন তিনি কন্সিস্ট্যান্ট ছিলেন। তা হলো স্বাধীন চিন্তা।[৮]

পাকিস্তানবাদী পত্র-পত্রিকা আবুল হাশিমের এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে।

ডঃ আনিসুজ্জামান তাঁর প্রবন্ধে বলেন, 'চলতে চলতে রবীন্দ্রনাথ মত বদলেছেন, পথ বদলেছেন। ক্রমে সকল সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভেদ করে তিনি মানুষের পৃথিবীর নাগরিক হতে চেয়েছেন। আশি বছর ধরে তাঁর মধ্যে একই ব্যক্তি বসবাস করেননি। এই নানা রবীন্দ্রনাথের সহযোগ ঘটেছিল বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল বাংলা ভাষার শক্তিকে শতগুণে বৃদ্ধি করা, আর যা ছিল প্রাদেশিক সাহিত্য, তাকে বিশ্বসভায় স্বগর্বে স্থান দেওয়া।' আনিসুজ্জামান বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের ভাষা সাহিত্যের নির্মাতা, সে কথার গুরুত্ব কারো পক্ষেই বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়'।[৯]

রবীন্দ্র দিবসের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে বসে আবৃত্তি ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসর। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠের আসরে অংশগ্রহণ করেন জনাব গোলাম মোস্তফা, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও জনাব সিকান্দার আবু জাফর। সঙ্গীতের আসরে অংশ নেন ফাহমিদা খাতুন, মালেকা আজিম, বিলকিস নাসিরুদ্দীন, জাহানারা ইসলাম ও জাহেদুর রহিম।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা। পরিবেশন করে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী। এতে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের ভূমিকায় ছিলেন কাজল মাহমুদ ও রাম সিং। অনুষ্ঠান পরিচালনা ও পরিকল্পনা করেন আতিকুল ইসলাম।

প্রথম দিনের এই অনুষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ দর্শক সমাবেশ ঘটে। বহু দর্শক আসনের অভাবে দাঁড়িয়েই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

দৈনিক পাকিস্তান ওই দিনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মন্তব্য করে যে, লেখক সংঘের এই অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন করে মনে হয়েছে, সংস্থাটি আবার জীবন্ত হয়ে উঠছে।[১০]

<u>৬ জুলাই ১৯৬৮</u>

মহাকবি স্মরণোৎসবের দ্বিতীয় দিনে আল্লামা ইকবালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

ইকবাল দিবসের সভাপতি ছিলেন ডক্টর এনামুল হক এবং প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও জনাব মনিরুদ্দীন ইউসুফ।

সভাপতির ভাষণে ডক্টর এনামুল হক বলেন :

> আনন্দ সৌন্দর্য সব কবিই সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু জাতিকে ভবিষ্যতের পথনির্দেশ দেওয়া ও চলার পাথেয় হওয়ার মতো কবি খুব বিরল। আল্লামা ইকবাল ছিলেন এমনি এক বিরল কবি।
>
> আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা আমাদের মধ্যে এমন এক কবি পেয়েছি। এদেশের দু'জন কবি ঘুমন্ত জাতির জাগরণের বাণীতে ছিলেন বজ্রকণ্ঠ। তাঁদের একজন ইকবাল, আরেকজন নজরুল। এঁরা আমাদেরকে আপন সত্তায় জাগ্রত করার শক্তি দিয়েছেন।[১১]

জনাব মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ বলেন, নিজের সত্তাকে যিনি মোমের মতো জ্বেলে দিয়ে মহৎ জীবন শিখা জ্বালিয়ে রাখতে চান, তেমন শিল্পীর সংখ্যা সব দেশেই বিরল। এই বিরল শিল্পীদেরই অন্য নাম জীবন-শিল্পী। দার্শনিক কবি ইকবাল ছিলেন জীবন শিল্পীদেরই একজন। শুধু সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা নয়, জীবনের অর্থ ও সংগ্রামী প্রেরণায় তাৎপর্য আবিষ্কারও ছিল তাঁর কাব্যশিল্পের লক্ষ্য।

তিনি বলেন, ইকবালের কবিতায় মানুষের মহিমা গাঁথা রচিত হয়েছে ধর্মীয় আদর্শের আলোকে উদার মানসিকতার পটভূমিকায়। ধর্মকে ইকবাল শুধু শাস্ত্রবচন বা পরলোকের পাথেয় রূপেই বিবেচনা করেননি, ধর্ম তাঁর দৃষ্টি ও বোধে ধরা দিয়েছিল মানবতাবাদী উপলব্ধি হিসেবে। ইসলামকে তিনি পেয়েছিলেন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে নয়, বরং বলা যেতে পারে, মানবতাবাদের সত্যিকার বিকাশের পরীক্ষিত অবলম্বন হিসেবে।[১২]

জনাব মনিরুদ্দীন ইউসুফ তাঁর প্রবন্ধে ইকবালের রচনার প্রগতিশীল ভূমিকা ও যুগের অন্তর্নিহিত বোবা কণ্ঠকে ভাষা দেওয়ার প্রচেষ্টা এবং তাঁর কবিতায় সত্যানুসন্ধানের পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, ইকবাল দার্শনিকের মতোই সত্যের সন্ধানী ছিলেন এবং অনুভূতি-প্রবণ কবি-মন নিয়েই তিনি সেই সন্ধানে তৎপর হয়েছিলেন।

গালিব বড় না ইকবাল বড় এবং রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ না ইকবাল— এ সম্পর্কে তিনি কালের প্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করে বলেন, এই তিনটি ফুলেরই গন্ধ আলাদা, কোনটিই কোনটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, এ কারণে প্রকৃতি তাঁদের মৌসুম অনুযায়ী ফুটিয়েছে।

জনাব মনিরউদ্দীন ইউসুফ বলেন, ইকবাল ইসলামের ঐতিহ্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি যে সব মূল্যবোধের প্রবক্তা হয়েছেন সেগুলিকে তিনি ইসলামের মূল নীতির সঙ্গে অভিন্ন দেখতে পান। ফলে প্রকারান্তরে ইসলামই তাঁর জন্যে সর্বজনীন আদর্শ হিসেবে দেখা দেয়। প্রত্যয়ের এই দৃঢ়তা কবি কিংবা দার্শনিক কিংবা রাজনীতিকের

www.nagorikpathagar.org

পক্ষে দূষণীয় নয়। বরং এই প্রত্যয় ইকবালের ফারসী কাব্যগুলোকে পরবর্তী উর্দু কবিতাগুলোকে শক্তিতে স্বকীয়তায় ও সৌন্দর্যে অনবদ্য করে তুলেছিল।[১৩]

অনুষ্ঠানে ইকবালের গজল পরিবেশন করেন ফিরোজা বেগম, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, বশীর আহমদ, খুরশীদা নূরানী। ইকবালের কবিতার বাংলা অনুবাদ পাঠ করে শোনান জনাব সিকান্দার আবু জাফর ও জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

<u>৭ জুলাই, ১৯৬৮</u>

মহাকবি স্মরণোৎসবের তৃতীয় দিনটি ছিল গালিব দিবস। পাক-ভারত উপমহাদেশের অষ্টাদশ শতকের উৎক্ষিপ্ত, অনিশ্চিত ও ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দিনের এই মানবতাবাদী কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় ৭ জুলাই। এই দিনের অনুষ্ঠানটি তিন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথমে আলোচনা সভা, পরে গালিবের গজলের জলসা এবং সবশেষে মুশায়েরা।

গালিব দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতি ছিলেন বিচারপতি জনাব এস এম মুর্শেদ। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব আবদুল ওয়াহাব ও জনাব আহসান আহমদ আশক। মুশায়েরায় সভানেত্রীত্ব করেন কবি সুফিয়া কামাল। গালিবের কাব্য সৌন্দর্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বিচারপতি জনাব এস এম মুর্শেদ বলেন যে, তিনি অমরদের মধ্যে অমর এবং মহৎদের মধ্যে মহৎ। গালিব এক যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি। বিচারপতি মুর্শেদ তাঁর আলোচনায় বলেন, 'জাতীয়তাবাদের উপর ভাষার প্রভাব থাকলেও; ভাষা জাতীয়তাবাদের অঙ্গ নয়'।

জনাব মুর্শেদ বলেন, আমাদের দুই মহান জাতীয় ভাষাকে রাজনৈতিক বিতর্কের ঝড়ের উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। তিনি বলেন, ভাষা-'বিতর্ক' এই কথাটি একটি দুঃখজনক কথা, যার কোন অর্থ নেই। এই বিতর্কটি চিরদিনের মতো অবসান হয়ে যাবে। তিনি বলেন, একথা মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই যে আমি বিশেষ কোন ভাষায় ভাব প্রকাশ করলে আমার দেশপ্রেম খর্ব হবে বা আমি কম দেশপ্রেমিক হব এবং অন্য কোন ভাষায়, ভাব প্রকাশ করলে আমার দেশপ্রেম বেড়ে গেছে বলে বিবেচিত হবে।[১৪]

জনাব আহসান আহমদ আশক তাঁর প্রবন্ধে বলেন,

> গালিব যে যুগের কবি তা হলো এক উৎক্ষিপ্ত, অস্থির, কোলাহলময়, অনিশ্চিত ও অনিরাপত্তার যুগ। শতাব্দীর জ্ঞান সাধনায় পাকভারতের সভ্যতার ভিত্তিমূলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ এখন আঘাত হানছে। গালিব তাঁর এই সময়কে সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছেন। তিনি পরাজয় স্বীকার করে নেননি। অব্যাহতভাবে অক্লান্ত সাহসিকতার সাথে তিনি মোকাবেলা করেছেন সময়ের বাস্তবতাকে। তাঁর কাব্যের মূল উপজীব্য মানুষ। এই বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে মানুষের ভাগ্যকে নিয়ে তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। তিনি মূলতঃ মানবতাবাদী। তাঁর কাব্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও যন্ত্রণা।[১৫]

www.nagorikpathagar.org

জনাব আশক প্রখ্যাত ভারতীয় সমালোচক কানাইলাল কাপুরের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। কাপুর বলেছেন, পাক–ভারত উপমহাদেশে দুইটি স্বর্গীয় গ্রন্থ আবির্ভূত হয়েছে– তার একটি বেদ অপরটি দীওয়ান–ই–গালিব। আহসান আহমদ আশক এ প্রসঙ্গে বলেন– এই উদ্ধৃতির সাথে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। তা হল বেদ বোঝা এবং অনুবাদ করা সহজ। কিন্তু গালিবের কাব্য তা নয়। কব্যের দুর্বোধ্যতা এবং অস্পষ্টতার জন্যে গালিবকে জনসমক্ষে লাঞ্ছনাও পেতে হয়েছে। কিন্তু এ কথাও সত্য তিনি কোন গোষ্ঠীর জন্য কবিতা লেখেননি। তাঁর কবিতা বোঝা সহজসাধ্য নয়। ছন্দের ঝংকারে শব্দের যোজনার মাধ্যমে তিনি প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছেছিলেন। পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও সে মানুষ তাঁর কাব্যের বাণীকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হত।

জনাব আশক বলেন, গালিব জীবনকে ভালোবেসেছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি জীবনের জয়গান করে গেছেন। তিনি বলেন, গালিব হলেন আধুনিক উর্দু কবিতার পথিকৃত।

জনাব আবদুল ওয়াহাব বলেন, কবি হিসেবে গালিবের তুলনা নাই। কিন্তু তাতেই শেষ নয়—তিনি একজন মহান পথপ্রদর্শক। তিনি বলেন, গালিব ছিলেন বস্তুতন্ত্রবাদ বিরোধী। তিনি এই নীতিতে বিশ্বাস করতেন—কেউ তাঁর নিজস্ব সত্তা হারিয়ে যদি সমগ্র পৃথিবীকে পায়, তাহলে তাঁর আসলে কি–ই বা লাভ হবে?[১৬]

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিবেশিত হয় গালিবের গজলের জলসা। জলসায় ফিরোজা বেগম, লায়লা আরজুমান্দ বানু, বশীর আহমদ ও মুন্নী বেগম অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্যায়ে ছিল মুশায়েরা। এতে অংশগ্রহণ করেন জনাব জামীলউদ্দীন আলী, জনাব আহসান আহমদ আশক, ডঃ হানিফ দউফ, জনাব সালাহউদ্দীন মোহাম্মদ। মুশায়েরা অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল।

<u>৮ জুলাই, ১৯৬৮</u>

মহাকবি স্মরণোৎসবের ৪র্থ দিন ছিল মাইকেল দিবস। মাইকেল দিবসে সভাপতিত্ব করেন জনাব মুনীর চৌধুরী। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব শওকত ওসমান ও জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। এ ছাড়া এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদের স্পীকার জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী।

সভাপতির ভাষণে জনাব মুনীর চৌধুরী বলেন, নিজের শিকড় ও ভিত্তিমূলে প্রোথিত থেকে সাহিত্যকে বিশ্বমুখী হতে হবে—এই শিক্ষা মাইকেল মধুসূদন দিয়েছেন। কূপমন্ডূকতা পরিহার, আবদ্ধতা থেকে উত্তরণ—এ তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। মুনীর চৌধুরী বলেন :

www.nagorikpathagar.org

> মাইকেলকে তাঁর কালের পটভূমিকায় বিচার করতে হবে। মাইকেল প্রথমে নিজের প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃতি বর্জন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি উপলব্ধি করলেন—এগুলোকে বর্জন নয়, বরঞ্চ আধুনিক মনে ভাবের আলোকে নতুনভাবে গড়ে তুলত হবে। তিনি আরো বলেন, মাইকেলকে বিচার করলে যে কণ্ঠ আমরা শুনতে পাবো, তা হলো—শিল্পগত উৎকর্ষই আমার প্রধান সাধনা। প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যমূলক কাব্যের সঙ্গে আমার কোন বিশ্বাস বা প্রত্যয়গত যোগ নেই; যে যোগ তা হলো শিক্ষাগত উৎকর্ষ, স্মৃতি ও চেতনার যোগ।[১৭]

আজকের আধুনিক সাহিত্য-সাধকদের লক্ষ্য করে জনাব চৌধুরী বলেন, প্রত্যয়ের দিক থেকে যোগ না থাকলেও তাদের পূববর্তী সাহিত্য-সাধকদের সাহিত্যের ঐশ্বর্য সুকৃতি সম্পর্কে ধারণা বা অনুভূতি না থাকলে তাদের সাহিত্য সাধনা সুন্দরতর হতে পারবে না।

শওকত ওসমান তাঁর প্রবন্ধে বলেন, 'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে' শীর্ষক এই সমাধিলিপিটুকু মাইকেলের কবি মানসকে বোঝার জন্য যথেষ্ট। দান্তে ডিভাইন কমেডি মহাকাব্যে তাঁর গুরু ব্রুনেত্তো লাদিনীর প্রশস্তি গেয়েছেন। কারণ তিনি তাঁকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে জীবনকে অমরত্বের মর্যাদা দিতে হয়। প্রায় মৃত্যু শয্যা এবং দারিদ্র্যের নিপীড়ন-জাত হতাশার মধ্যে রচিত এই কয়েকটি পংক্তি। কিন্তু নেতি সুর নেই কোথায়ও, পুরস্কারের কণ্ঠে। মাইকেলের কাব্যের ধনাঢ্য প্রাঞ্জল প্রবহমানতা ও ধ্রুপদী গাম্ভীর্য এখানেও অটুট যদিও গীতিময়তা একই সঙ্গে বর্তমান। আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ কি সদম্ভ উচ্চারণ, মৃত্যুর সম্মুখে! যুগের রথচক্রধ্বনি অবশ্য তার আবহ সৃষ্টি করেছিল। মাইকেল-যুগের প্রতীক 'ইয়ং বেঙ্গল' এবং তখনকার চলমান জীবন ধারা বহমান মতাদর্শ ইত্যাদি টানাপোড়েন, দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রভৃতির আলোকে জনাব শওকত ওসমান তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে মাইকেলের সাহিত্য কীর্তির একটি চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন :

> বৃটিশ আমলে সৃষ্ট মধ্যবিত্ত আবার বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। ঐতিহাসিক কারণেই এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কিছু অগ্রগামী ভূমিকা নিহিত ছিল। ব্যক্তিতান্ত্রিকতার অভ্যুদয় বৃথা যায়নি। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে শুধু সমাজ কাঠামো ধ্বংস হয় না, তার মানসিক সৌধও চূরমার হয়ে যায়। ভিত নড়তে বাধ্য। তখন প্রয়োজন হয় চেতনার নবপ্রকরণ, নতুন আধার। এই নয়া শ্রেণী একদিকে বিপ্লবী—ব্যক্তিতান্ত্রিক সে। মাইকেল মধুসূদন তাদেরই কণ্ঠস্বর।[১৮]

জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর প্রবন্ধে বলেন, 'মধুসূদন শুধু মহৎ কবি বলেই আধুনিক বা আধুনিক বলেই মহৎ কবি নন। তাঁর আধুনিকতা ও মহত্ত্ব সমকালের পটভূমিতেই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও তাৎপর্যময়। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার

www.nagorikpathagar.org

উদ্‌গাতা। আধুনিক বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে তিনি অনন্যঅসাধারণ। কি জীবনশক্তির প্রাচুর্যে, কি প্রতিভার বিদ্যুৎ দীপ্তিতে, সৃষ্টির অসামান্যতায় তিনি অতুলনীয়। বিকাশমান মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হিসেবে একাধারে ধনৈশ্বর্য জ্ঞানৈশ্বর্য এই দুই বিপরীত বস্তুর জন্য তাঁর চিত্ত পিপাসিত ছিল'।[১৯]

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নাট্যরূপ থেকে অংশ বিশেষ পরিবেশন করা হয়। এতে অংশ নেন জনাব গোলাম মোস্তফা, জনাব মোহাম্মদ জাকারিয়া, জনাব হাসান ইমাম ও জনাব মোস্তফা মনোয়ার। গ্রন্থনায় ছিলেন জনাব সিকানদার আবু জাফর। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মাইকেলের প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' মঞ্চঅভিনয় করা হয়। এটা 'আজাদীর পর' ঢাকায় মাইকেলের প্রহসনের প্রথম অভিনয়। অভিনয়ে অংশ নেন আবদুল্লাহ ইউসুফ, আলী ইমাম, সাইফুদ্দীন, আশীষ কুমার লোহ, কেরামত মওলা প্রমুখ।

<u>৯ জুলাই, ১৯৬৮</u>

মহাকবি স্মরণোৎসবের পঞ্চম দিন অর্থাৎ সমাপ্তি দিনটি উদযাপন করা হয় কাজী নজরুল ইসলামের স্মরণে। নজরুল দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আবদুল কাদির। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও জনাব রফিকুল ইসলাম।

আলোচনা সভার সভাপতি আবদুল কাদির বলেন, নজরুল ছিলেন নিপীড়িত জনগণের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামী কবি। বাংলা সাহিত্যে তিনি 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রবক্তা'। নজরুলের সমগ্র সাহিত্য সাধনায় মানবাধিকার সুর হলো প্রধান ও প্রবল।

জনাব আবদুল কাদির নজরুলের সাহিত্য সাধনাকে চার পর্যায়ে ভাগ করেন। তা হলো–

(১) স্বদেশ–প্রেমিকতা ও স্বাদেশিকতা পর্যায়,

(২) লাঙ্গলের যুগ বা সাম্যবাদীর যুগ,

(৩) সুরলোকে নিমগ্ন সঙ্গীতকার নজরুল এবং

(৪) আধ্যাত্মিকতায় নজরুল।

প্রথম পর্যায়ের বিশ্লেষণকালে তিনি বলেন, নজরুলের আগেও অনেক স্বাদেশিক কবি রয়েছেন; যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ; কিন্তু নজরুলের মতো তাদের সাহিত্যে এত মানবিক আবেদন নেই। জনাব আবদুল কাদির বলেন, নজরুলের এই মানবিকতার উত্তরণ হলো লাঙ্গলের যুগ বা সাম্যবাদী যুগে। তৃতীয় পর্যায়ে সঙ্গীতকার নজরুল রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়। চতুর্থ পর্যায়ে আধ্যাত্মিকতার যুগেও নজরুল গেয়েছেন মানবিকতার জয়গান।

www.nagorikpathagar.org

বলেছেন নিপীড়িত জনগণের স্বাধিকার আদায়ের বজ্রনিনাদ। সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব সম্পর্কে আবদুল কাদির বলেন :

> নজরুল যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে এলেন তখন রবীন্দ্রনাথ ভাস্কর—তাঁর তখন পূর্ণ দীপ্তি। কিন্তু তাঁর আবির্ভাবে রবীন্দ্রনাথের কথা অনেকেই ভুলে গেলেন। নজরুলের যখন আবির্ভাব হলো, তখন দেখা গেলো—যুগের যৌবনের সব ধর্ম তাঁর কাব্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। নজরুল এ যুগের যৌবনকে বাণীরূপ দিয়েছেন।[২০]

নজরুল সাহিত্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে বলে কেউ কেউ যে অভিযোগ করেন, তার বিরোধিতা করে জনাব আবদুল কাদির বলেন যে, এই অভিযোগকারীরা বোধ হয় তাঁর সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাব বুঝতে পারেননি। এই সুরটি হলো জনগণের স্বাধিকার—গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। এই সুরটি যারা বুঝতে না পারবেন তাদের নজরুল সাহিত্য পাঠ পণ্ডশ্রম মাত্র।

তিনি বলেন, ইসলামের মধ্যে নজরুল পেয়েছেন নিপীড়িত জনগণের মুক্তির বাণী। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রকে তিনি ইসলামের মর্মবাণী হিসাবে পেয়েছিলেন এবং তারই প্রচার করেছিলেন। তিনি যে নয়া জামানার দাওয়াত-এর কথা বলেছিলেন তা হল এই নিপীড়িত জনগণের স্বাধিকারের জামানা।[২১]

জনাব বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর তার আলোচনায় বলেন, নজরুল ইসলাম বাঁশীর মত বেজেছেন। ব্যক্তি কিংবা ঘটনার অভিঘাত তাঁর কবিতায় প্রবল; যখনই কোন ব্যক্তি তাকে পীড়িত করেছে তখনই তিনি সাড়া দিয়েছেন।[২২]

জনাব রফিকুল ইসলাম তাঁর আলোচনায় বলেন, নজরুল ইসলাম হিন্দু মুসলমান উভয় ঐতিহ্য থেকেই কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। আর সে কারণেই তিনি একমাত্র মুসলমান সাহিত্যিক যার সাহিত্য উভয় সম্প্রদায়ের কাছে আদৃত হয়েছে। নজরুলকে গ্রহণ করতে হলে নজরুলকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে, খণ্ডিতরূপে নয়। তিনি বলেন, শিল্প সাহিত্য ক্ষেত্রে নেতিবাচক সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ক্ষতিকর। আমরা যেন নজরুলকে গ্রহণের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারি।[২৩]

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল আবৃত্তি ও গানের আসর। আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন সিকান্দার আবু জাফর, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও মিসেস রাশিদা জামান। তাঁরা কবির 'বিদ্রোহী', 'জীবনবন্দনা' ও 'ফাল্গুনী' কবিতা আবৃত্তি করেন। নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন লায়লা আরজুমান্দ বানু, শেখ লুৎফর রহমান, সোহরাব হোসেন, রওশন আরা মাসুদ ও ফিরোজা বেগম।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে পরিবেশিত হয় বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (বাফা) নিবেদিত নজরুল গীতি-নির্ভর নৃত্যনাট্য—'বাদল বরিষণে'। নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ

www.nagorikpathagar.org

করেন 'বাফা'র ছাত্র শিক্ষকগণ। নৃত্যনাট্যটি পরিকল্পনা পরিচালনা করেন জনাব রফিকুল ইসলাম।

লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার এই অনুষ্ঠানটি দর্শক-শ্রোতাদের যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল। এ সম্পর্কে সংবাদ জানায়, প্রবল বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও সমাপ্তি দিবসের অনুষ্ঠান দেখার জন্য অত্যধিক ভিড় হয়। অনেকে হলের ভেতরে জায়গা না পেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু লোক শেষ পর্যন্ত মঞ্চের পাশে গিয়েও দাঁড়ায়।[২৪]

৪. প্রতিক্রিয়া

পাঁচদিনব্যাপী মহাকবি স্মরণোৎসব সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক বিভিন্ন মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই উৎসবের পক্ষে যেমন সাড়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তেমনি বিপক্ষেও কম হৈ চৈ হয়নি। উৎসবের বিপক্ষবাদীরা মূলত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা এবং নজরুলকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করার দাবীকে মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্র দিবসের সভাপতি আবুল হাশিমের বক্তব্য তাঁদের ভালো লাগেনি। তাঁরা আবুল হাশিমের বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন। এ সমালোচনায় নেতৃত্ব দিয়েছিল 'দৈনিক পয়গাম' পত্রিকা। রবীন্দ্রদিবসের পরের দিনই দৈনিক পয়গামে 'সীমাহীন ধৃষ্টতা' শীর্ষক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া রবীন্দ্র প্রশ্নের কবর বা শ্মশান রচিত হইয়া গিয়াছে' এবং রবীন্দ্র দিবসের মাধ্যমে 'রবীন্দ্র অধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস' যেভাবে পালিত হয়েছে তা 'তৌহিদবাদী পূর্ব পাকিস্তানীদের' ওপর হামলা বিশেষ এবং 'পাকিস্তানবাদী মানুষমাত্রকেই আজ এই হামলা রুখিবার জন্য দাঁড়াইতে হইবে।'[২৫]

তবে দৈনিক পাকিস্তান এই উৎসবের ভূয়সী প্রশংসা করে ১১ই জুলাই সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। তাছাড়া দৈনিক পাকিস্তান এই উৎসবের খুটিনাটি খবর প্রতিদিন গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, এ সময় লেখক সংঘের হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন দৈনিক পাকিস্তানের সহকারী সম্পাদক। দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা এমন একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় স্মরণোৎসবের আয়োজন করিয়া ঢাকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে নিঃসন্দেহে নতুন প্রাণস্পন্দনের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মৃতপ্রায় সংস্থাটিতে যে আবার নব প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে, এই মহতী স্মরণোৎসবের মধ্য দিয়া এই সত্যও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমরা মহাকবি স্মরণোৎসবের আয়োজনের জন্য অভিনন্দন জানাই এবং এই জাতীয় সংস্থাটির কর্মতৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে—এই প্রত্যাশা করি।[২৬]

এর পরে আবার লেখক সংঘের কার্যক্রম পুনরায় স্থবির হয়ে আসে। ১৯৭০ সালে ফের কিছুটা কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।

www.nagorikpathagar.org

৫. সাহিত্য-সভা

১২ এপ্রিল, ১৯৭০ বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে লেখক সংঘের উদ্যোগে একটি সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নিজের লেখা কবিতা থেকে পাঠ করেন শামসুর রাহমান। আলোচনা করেন সৈয়দ আকরম হোসেন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, বেগম রাজিয়া খান আমীন, ফজল শাহাবুদ্দীন, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ও সাজেদুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন কবীর চৌধুরী।

১৯৭০ সালের ৩ মে লেখক সংঘের উদ্যোগে আবদুল গাফফার চৌধুরীর ছোটগল্প ও উপন্যাসের উপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জনাব গাফফার চৌধুরী তাঁর লেখা একটি গল্প পাঠ করেন। তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসের উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, মনসুর মুসা ও আহমদ কবির। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, মহাদেব সাহা, আহমেদ ছফা ও মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও সরদার ফজলুল করিমসহ বহু প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক সভায় উপস্থিত ছিলেন।[২৭]

৬. রবীন্দ্র জয়ন্তী

এরপর ৮ মে ১৯৭০ বাংলা একাডেমী মিলনায়তনে পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা। গোলাম মোস্তফা কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশেষ' কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন নির্মলেন্দু গুণ ও মোহাম্মদ সুলতান। হাসান হাফিজুর রহমান 'পুনরুজ্জীবিত রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এরপর আলোচনা করেন ডঃ এনামুল হক ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ কখনও সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। যারা তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেন তাঁরা মিথ্যাবাদী অথবা মারাত্মক অজ্ঞতাবশতই তা করতে সাহস পান। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত আলোচনার কথা উল্লেখ করেন।

ডঃ এনামুল হক বলেন, রবীন্দ্রনাথকে কিছুতেই আমাদের সাহিত্য থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে না। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা শুধু বাংলাদেশে নয়, দুনিয়ায় কয়েক শতাব্দীতেও জন্মে না। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে বিশ্বের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার ভার নিয়েছিলেন।

অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু মুসলমানদের ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য কলম ধরেন নাই, সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম ভারতীয় তথা বিশ্বের সর্বহারাদের অবস্থা এবং বিপ্লব সম্পর্কে লিখে বর্তমানের আলোড়ন সৃষ্টিকারী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ব্যক্ত করে দিয়েছেন।[২৮]

www.nagorikpathagar.org

৭. নতুন কার্যকরী কমিটি

১৯৭০ সালের মার্চে লেখক সংঘের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন হয়। জনাব মাহবুব জামাল জাহেদী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লেখক সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন।

কেন্দ্রীয় কমিটি

নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন আবদুল্লাহ্ আল-মূতী, মিসেস জাহানারা ইমাম, আহমেদ হোসেন, মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, আহমদ শরীফ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মিসেস রাজিয়া খান, হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ মুর্তজা আলী, বিশার আলী, হামিদ আখতার, জামিল মালিক, মঞ্জুর আরিফ, রাজার হামদানী, মিস উম্মে আমারা, হামেদ কাশ্মীরী, মহসিন ভুপালী, শওকত সিদ্দিকী, ডঃ শওকত সরজওয়ারী, আশরাফ হোসেন আহমদ, বশির মুঞ্জের ও তানওয়ার আব্বাস।[২৯]

৮. পূর্বাঞ্চলীয় কমিটি

ওই একই সভায় লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চলীয় কমিটি গঠিত হয়। তাতে ছিলেন ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদক), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (কোষাধ্যক্ষ), ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, রফিকুল ইসলাম, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নেয়ামূল বশীর, আবদুল কাদির, শামসুল হক ও মোস্তফা জামান আব্বাসী।[৩০] তবে লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা আর জোরদার হয়ে ওঠেনি।

১৯৭০ সালে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল রূপ নিতে থাকে। সেই পর্যায়ে লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার কোন কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। ওই বছরই পরিক্রম পত্রিকাও বন্ধ হয়ে যায়। সে সময়ে পত্রিকাটির সম্পাদনা করছিলেন এককভাবে ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

৯. উপসংহার

পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার কর্মতৎপরতা সামরিক সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে নানাভাবে নিন্দিত হলেও পরিক্রম পত্রিকার মাধ্যমে এর সদস্যরা সাহিত্য চর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন। তা ছাড়া পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ যখন তুঙ্গে ওঠে, তখন পূর্বাঞ্চল শাখা একলা চলারই প্রয়াস নেন। এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা তখন কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বায়ত্তশাসন ও শেষ পর্যন্ত স্বাধিকার আন্দোলনেও এগিয়ে যান।

www.nagorikpathagar.org

তবে লেখক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি, পশ্চিমাঞ্চল বা পূর্বাঞ্চল শাখা কমিটির সামগ্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে আইয়ুব খানের সরকারই বেশী লাভবান হয়েছে। আর সে লক্ষ্যেই আইয়ুব খান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই সংঘের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সাক্ষাৎকার, ২৫-০৪-১৯৯৩

২. মাসিক পূবালী, (সম্পাদক, মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ২য় বর্ষ, নবম সংখ্যা) পৃ ৭৯৩

৩. পরিক্রম, সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

৪. The Pakistan Observer, May 12, 1962

৫. পূর্বোক্ত

৬. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সাক্ষাৎকার, ২৫-০৪-১৯৯৩

৭. দৈনিক পাকিস্তান, ০৪-০৭-১৯৬৮

৮. দৈনিক পাকিস্তান/সংবাদ, ৬ জুলাই, ১৯৬৮

৯. পূর্বোক্ত

১০. পূর্বোক্ত

১১. সংবাদ/দৈনিক পাকিস্তান, ৭ জুলাই, ১৯৬৮

১২. পূর্বোক্ত

১৩. পূর্বোক্ত

১৪. দৈনিক পাকিস্তান, ৮ জুলাই, ১৯৬৮

১৫. পূর্বোক্ত

১৬. দৈনিক সংবাদ, ০৯-০৭-১৯৬৮

১৭. দৈনিক পাকিস্তান, ৯ জুলাই, ১৯৬৮

১৮. পূর্বোক্ত

১৯. পূর্বোক্ত

২০. দৈনিক পাকিস্তান, ১০ জুলাই, ১৯৬৮

২১. পূর্বোক্ত

২২. পূর্বোক্ত

২৩. পূর্বোক্ত

২৪. সংবাদ, ১০ জুলাই ১৯৬৮

২৫. দৈনিক পয়গাম, ১২-০৭-১৯৬৮

২৬. দৈনিক পাকিস্তান, ১১ জুলাই, ১৯৬৮

www.nagorikpathagar.org

২৭. পরিক্রম, (সম্পাদক, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী) ফেব্রুয়ারী-মে, ১৯৭০

২৮. পূর্বোক্ত

২৯. পূর্বোক্ত

৩০. পূর্বোক্ত

www.nagorikpathagar.org

নয়. নজরুল একাডেমী ১৯৬৪

১. নজরুল একাডেমী গঠনের পটভূমি

নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ সালে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনাকালে যে কয়জন লেখকের নাম সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ সাহিত্যে নজরুলের অবদানকে তেমন কোন গুরুত্বই দেননি। দেখা গেছে সুকুমার সেনের ২৮৬৪ পৃষ্ঠার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুল সম্পর্কে লেখা হয়েছে মাত্র ৪ পৃষ্ঠা এবং তাও ভুলে ভরা।

কাজী নজরুল ইসলাম অসুস্থতার জন্য সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে পড়েন ১৯৪৩ সালে। কিন্তু সে সময় পর্যন্ত শুধুমাত্র কোন কোন মুসলমান লেখকই নজরুল সাহিত্যের মূল্যায়নের কিছুটা প্রয়াস পেয়েছেন। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানে নজরুল চর্চা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। এখানে রবীন্দ্র চর্চার ধারাও অব্যাহত থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের রবীন্দ্রচর্চা নজরুল চর্চার চেয়ে বারবরই বেশী ছিল, এখনও আছে। 'যদিও বাংলার হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ রূপটি নজরুলই প্রথম আবিষ্কার করেন এবং তার সাহিত্যে এর বাস্তব রূপ দান করেন।'[১]

'প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নজরুলচর্চা এবং নজরুলের জীবন ও সাহিত্য-সঙ্গীত সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা সুদীর্ঘকাল থেকে অনুভূত হয়ে এলেও, বস্তুতপক্ষে, তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে ও পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকেই তা বিশেষভাবে অনুভূত হয় এবং আমাদের বুদ্ধিজীবী মহল বিশেষ করে নজরুলানুরাগী সাহিত্যিক সুধীবৃন্দের এবং নজরুলের ঘনিষ্ঠ সুহৃদদের অনেকে এর প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এ সময়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নজরুল চর্চার এবং নজরুল গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর যাঁরা বিশেষভাবে জোর দেন, তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিরাও ছিলেন, নজরুল সাহিত্যের মূল্যায়নে যারা বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকেই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। প্রসঙ্গত আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন ও কবি আবদুল কাদিরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকে ডক্টর কাজী মোতাহার

www.nagorikpathagar.org

হোসেন এবং বিশেষভাবে কবি আবদুল কাদির নজরুল চর্চা, নজরুল গবেষণা তথা নজরুল সাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন।'[২]

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নজরুল সঙ্গীত চর্চার ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে ডঃ রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, 'পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় ঢাকায় বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা এ দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ দেশে বুলবুল একাডেমীর পূর্বে আর কোন সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবে নজরুল-গীতি বিভাগ স্থাপিত হয়নি। ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যালয়-এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬৩তে। যদিও ছায়ানট রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার জন্যই সবিশেষ খ্যাত, তবুও সেই সূচনাকাল থেকেই এই প্রতিষ্ঠানে স্বতন্ত্র নজরুল-গীতি বিভাগ খোলা হয়।'[৩]

এই প্রেক্ষাপটে প্রধান কবি নজরুল ইসলামের অবদান এবং তার ভাবমূর্তির ব্যাপক চর্চা, উপস্থাপন, মূল্যায়ন, গবেষণা সংকলন, প্রকাশনা এবং সংরক্ষণের জন্য এবং সাধারণভাবে জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা উদ্দেশ্য হিসাবে একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থায় উন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে ১৯৬৪ সালে নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪] তৎকালীন পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণই নজরুল একাডেমীর উদ্যোক্তা ও সংগঠক ছিলেন।

যদিও এর আগে ১৯৫৩ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীর প্রবাসী বাঙ্গালীরা 'নজরুল একাডেমী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। তারপর ১৯৬১ সালে মরহুম আমীর হোসেন চৌধুরী ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় 'আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ঐ কমিটির সদস্য ছিলেন : মৌলভী তমিজউদ্দীন খান, এ কে ব্রোহী, এম হাদি হাসান, মীজানুর রহমান, এস এম আলী, ডাঃ আখতার হাসান ও মাহবুব জামাল জাহেদী প্রমুখ বাঙ্গালী ও অবাঙালী। কার্যকর পরিষদের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন এ কে ব্রোহী, কোষাধ্যক্ষ হন ফখরুদ্দীন বলিভয় এবং সম্পাদক হন মীজানুর রহমান। প্রতি বছর নজরুল জয়ন্তী পালন ও ইংরেজী ভাষায় দু' একটি পুস্তিকা ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য তেমন কোন কাজ করতে পারেনি।[৫]

২. নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠা

১৯৬৪ সালে কবি তালিম হোসেন ও তাঁর বন্ধু এডভোকেট এ কে এম নূরুল ইসলামকে (পরবর্তীকালে বিচারপতি এবং বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট) নিয়ে নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এর পটভূমি সম্পর্কে বলা হয় :

> দেশ বিভাগের পর অসুস্থ বিকল মস্তিষ্ক কবি ভারতেই পড়ে রইলেন। দেখা গেল সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে যিনি কখনো 'সর্বকালের সর্বমানবের কবি', কখনো 'বাঙালী জাতীয়তার কবি', কখনো 'মুসলিম জনতার কবি' বলে এপারে

www.nagorikpathagar.org

ওপারে কৃচিৎ উল্লিখিত হলেন—তার ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন সংরক্ষণ ও সম্প্রচারের একটা সুপরিকল্পিত সুসংহত ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত কোথাও হল না। কোন সংস্থা গড়ে উঠল না একান্তভাবে নজরুল চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে। ...সকল দিক থেকে পূর্ণাবয়ব প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'নজরুল একাডেমী' গড়ে তুলতে হবে। অমনোযোগ ও অবহেলার প্রায়ান্ধকার থেকে নজরুলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে স্ব-সমাজে তার উচ্চতম, উজ্জ্বলতম আসনে; তাকে পৌছে দিতে হবে বিশ্বের দরবারে, তার জন্য নির্ধারিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনে সসম্ভ্রম অভিষেকের জন্য।[৬]

১৯৬৪ সালেই (১৩৭১ বাং) কবি তালিম হোসেন ও এডভোকেট নূরুল ইসলাম মিলে নজরুলের জন্মবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে অনুসারে নূরুল ইসলামের ১১নং র‍্যাংকিন স্ট্রীটের বাসভবনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, ১৯৭১-৭২) সভাপতিত্বে একাডেমীর প্রথম নজরুল জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানেই নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় এবং একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়।[৭]

১৯৬৪ সালের ২৪ মে প্রাথমিক উদ্যোগ হিসাবে নজরুল একাডেমীর সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। তাতে অন্তর্ভুক্ত হন : আবুল কালাম শামসুদ্দীন (সভাপতি), তালিম হোসেন (সম্পাদক), এ কে এম নূরুল ইসলাম (কোষাধ্যক্ষ)। সদস্য হিসাবে যোগ দেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, খান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন, কবি সুফিয়া কামাল, সিরাজউদ্দীন হোসেন, কাজী আবুল কাসেম, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, জাহানারা আরজু, মাফরুহা চৌধুরী, আনসার আলী, আবদুর রহমান, মহীউদ্দীন, আবদুল হাই, মোসলেম আহমদ, জিয়াউর রহমান প্রমুখ।[৮]

নজরুল একাডেমীর কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করার জন্য এ কে এম নূরুল ইসলাম তার ১১নং র‍্যাংকিন স্ট্রীটস্থ বাড়ির একটি কামরা ছেড়ে দেন। তাতেই একাডেমীর কার্যক্রম চলতে থাকে।

অবশেষে ১৯৬৭ সালের ২৭ আগস্ট সাংগঠনিক কমিটির এক সভায় একাডেমীর গঠনতন্ত্র প্রণীত হয় এবং পরবর্তী সভায় সেই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একটি কার্যনির্বাহী কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন করা হয়। এই পরিষদে ছিলেন ঃ সভাপতি—বিচারপতি আবদুল মওদুদ (১৯০৮-১৯৭০); সহসভাপতি—আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, সাবির আহমদ চৌধুরী; সাধারণ সম্পাদক—তালিম হোসেন; কোষাধ্যক্ষ—এ কে এম নূরুল ইসলাম: সদস্য—আকবরউদ্দীন, বেনজীর আহমদ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, মুজীবুর রহমান খাঁ, এ এস এম মোহাম্মদ, এ আর ভুঁইয়া, মোহাম্মদ নাসির আলী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, কাজী নজমুল হক, শেখ মোসলেম আহমদ,

www.nagorikpathagar.org

জাহানারা আরজু ও মাফরুহা চৌধুরী। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পর্যায়ে ইবরাহীম খাঁ, ডক্টর কাজী দীন মোহাম্মদ, ডক্টর হাসান জামান ও ফেরদৌসী রহমানকে পরিষদে কো-অপ্ট করা হয়। একাডেমীর প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতার স্বীকৃতি হিসাবে পরিষদ খান এ সবুরকে একাডেমীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গ্রহণ করেন।[৯]

৩. নজরুল একাডেমী উদ্বোধন

একাডেমীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় ১৯৬৮ সালের ২৪ মে তারিখে।[১০]

ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশনে আয়োজিত এক সভায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক সাংস্কৃতিক সংগঠন 'নজরুল একাডেমী'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন দেশের সেইসব ক্ষণজন্মা বুদ্ধিজীবীদের একজন, যাদের লেখা এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। অনুষ্ঠানে তিনি নজরুলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন নজরুল একাডেমীর সভাপতি বিচারপতি আবদুল মওদুদ।[১১]

নজরুল একাডেমীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খানসহ দেশের বিভিন্ন পণ্ডিত বাণী পাঠান। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার বাণীতে বলেন :

> আমি জেনে অত্যন্ত খুশী হলাম যে, কাজী নজরুল ইসলামের ৬৯তম জন্মবার্ষিকীর শুভক্ষণে ঢাকায় নজরুল একাডেমীর উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
>
> আমাদের জাতীয় জাগরণে নজরুল ইসলামের অবদান অতুলনীয়। আমাদের সাহিত্যিক ও তামদ্দুনিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যময় ভঙ্গীতে তিনি আমাদের গণমানসের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এক বলিষ্ঠ ও তেজস্বী প্রকাশভঙ্গী দান করেছেন। ইতিহাস পরম্পরায় যে বিশ্বাস ও দর্শন আমাদের চিন্তা ও কর্মধারাকে উজ্জীবিত করেছে। যার মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন গতিপথের নির্দেশ, তার মর্মোপলব্ধির ব্যাপারে তিনি আমাদের মনে নতুন রেখাপাত করেছেন।
>
> আমি নজরুল একাডেমীর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।[১২]

এ উপলক্ষ্যে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার আবদুল জব্বার খান এক বাণীতে কাজী নজরুল ইসলামকে 'মুসলিম বাংলার জাগরণের কবি' হিসাবে অভিহিত করে আশা প্রকাশ করেন যে, 'নজরুলের নামাঙ্কিত একাডেমীর মাধ্যমে পাকিস্তানের জাতীয় সংস্কৃতি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করবে।' একাডেমীর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামান করে তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব সাহিত্য ও শিল্প একাডেমীর কার্যকলাপের মারফতে স্বকীয়

www.nagorikpathagar.org

বিকাশের পথ খুঁজে পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।'[১৩]

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী খান এ সবুর তার বাণীতে নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠায় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং কাজী নজরুল ইসলামকে একজন মহান কবি হিসাবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, 'কাজী নজরুল ইসলাম যা কিছু লিখেছেন তার সবটুকুই নিপীড়িত মানুষের কল্যাণের জন্য। যা কিছু তিনি করেছেন, তার সবটুকুই মানবতার মর্যাদার জন্য।' জনাব সবুর বলেন, 'তার জন্মবার্ষিকী উদযাপনের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, তার চিরন্তন বাণী মনে-প্রাণে অনুসরণ করা।'[১৪]

পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার আবদুল হামিদ চৌধুরী তার বাণীতে নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠায় অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, কবি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে এখনও আমাদের ধারণা পূর্ণাঙ্গ নয়। তিনি নজরুল সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা সৃষ্টিতে একাডেমীর ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৫]

পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদের স্পীকার মোহাম্মদ আনোয়ার এ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত তার বাণীতে বলেন, 'কাজী নজরুল ইসলাম এক মহান বিদ্রোহী কবি। তার কবিতার মাধ্যমে সুদীর্ঘকাল বিদেশী শাসনাধীনে জর্জরিত জাতির কাছে তিনি আযাদীর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। তার কাব্যে আমরা দেখতে পাই ছন্দ, সুর আর আবেগের অপূর্ব সংমিশ্রণ। তার কবিতা হচ্ছে বিক্ষুব্ধ ঝড়ের মত, যা পৃথিবীর বুক থেকে অত্যাচারের সকল চিহ্ন উড়িয়ে নিতে চায়। তার কাব্য আবাল-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে সকলের জন্য অনুপ্রেরণার এক মহান উৎস।'[১৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর করাচীর ডক্টর মাহমুদ হোসাইন তার বাণীতে বলেন :

> বিশ্বের এই অঞ্চলের মুসলিম জাগরণের মূলে যাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়, তাদের মধ্যে নজরুল ইসলামের অবদান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। পরাধীন জাতিসমূহের পক্ষে ততক্ষণ আজাদী হাসেল সম্ভব হয় না, যতক্ষণ না ক্ষণজন্মা ব্যক্তিবর্গ তাদের প্রভাবিত না করেন এবং তাদের অন্তরে আজাদীর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে তাদেরকে অনুপ্রাণিত না করেন। নজরুল ইসলাম তার কবিতার মাধ্যমে এই ভূমিকা পালন করেছেন এবং এর ফলই হচ্ছে পাকিস্তান।[১৭]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার বাণীতে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন :

> আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবকাল থেকে তার প্রতিষ্ঠা এখনও অম্লান আছে। আমি তার চিন্তায় ও সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়ে মুসলমান তথা নিপীড়িত মানব সমাজের জন্য গভীর মমতা ও বেদনার প্রতিচ্ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আপনারা তার সৃজিত সাহিত্যকে সজীব করে রাখার যে

www.nagorikpathagar.org

প্রচেষ্টা করছেন, তা শুভ হোক এবং আপনারা সাফল্যমন্ডিত হোন, এই আশীর্বাদ করি।[১৮]

এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মুহম্মদ ওসমান গনি, পাকিস্তানের কবি হাফিজ জলন্ধরী, শিল্পী আবদুর রহমান চুঘতাইও এ উপলক্ষে বাণী পাঠান।

ওই সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক, কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ নজরুল একাডেমী পরিদর্শন করে নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে অভিনন্দিত করেন।[১৯]

৪. নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

প্রধানত তিনটি লক্ষ্য সামনে নিয়ে নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেগুলো হলঃ (১) মুসলিম বাংলার রেনেসাঁর অগ্রদূত হিসাবে নজরুল-ভূমিকাকে চির-জাগরুক রাখা; (২) পাকিস্তানী জীবানদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আধুনিক ও প্রগতিশীল ভাবধারার সকল উপাদানকে আত্মস্থ করা এবং (৩) মুসলিম ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানী সংস্কৃতির সংহতি ও বিকাশ সাধন করা।[২০]

এছাড়াও নজরুল একাডেমীর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী হিসাবে যে সব বিষয় নির্ধারণ করা হয়, সেগুলো হল :

১। নজরুলের সমগ্র রচনা ও জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ, সংকলন, গবেষণা ও প্রকাশনা।

২। নজরুলগীতির বাণী ও সুর সংগ্রহ, সংকলন, স্বরলেখন ও প্রকাশনা।

৩। নজরুলগীতির চর্চা, প্রশিক্ষণ, প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ, নজরুল-গীতির প্রামাণ্য স্বরলিপি প্রণয়ন ও সংকলন এবং নতুন রেকর্ডিং।

৪। সাহিত্য ও সঙ্গীতে নজরুলের অমর সৃষ্টিসম্ভার অনুবাদ এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও অন্যান্য মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে তুলে ধরা।

৫। নজরুল সৃষ্টি সম্ভারের মূল্যায়ন ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষণা, চিন্তাধারা ও সৃষ্টিশীলতার নিয়মিত প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে একাডেমীর মুখপত্র প্রকাশ।

৬। বিশেষভাবে নজরুলের অবদান-ভিত্তিক এবং সাধারণভাবে দেশের সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য নির্ভর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রগতিশীল বিকাশের উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা।

৭। একাডেমীর উদ্দেশ্য ও আদর্শের সহায়ক গ্রন্থাদি প্রণয়ন প্রকাশ এবং এ জন্য পূর্ণাঙ্গ মুদ্রণ ও প্রকাশনালয় প্রতিষ্ঠা।

৮। অধ্যয়ন, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সুবিধা বিধানের

www.nagorikpathagar.org

জন্য লাইব্রেরী, পাঠাগার, বিদ্যালয়, মিলনায়তন, নাট্যমঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ, ষ্টুডিও ইত্যাদিসহ সমন্বিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে একাডেমীর গৃহ সংস্থা নজরুল-ভবন নির্মাণ।

৯। একাডেমীর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সহায়ক অন্য যে-কোন প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ।[২১]

. গঠনতন্ত্র

৯৬৭ সালের ২৭ আগস্ট সাংগঠনিক কমিটির সভায় নজরুল একাডেমীর গঠনতন্ত্র নুমোদিত হয় এবং ১৮৬০ সালের ২১নং ধারার অধীনে এই প্রতিষ্ঠানটি রেজিস্ট্রিভুক্ত করা য়। মূল গঠনতন্ত্র ইংরেজী ভাষায় রচিত ছিল।

নজরুল একাডেমীর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে গঠনতন্ত্রের ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয় :

এই একাডেমী হবে পাকিস্তানী জাতীয় ভাবধারায় পুষ্ট একটি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্ষা-কেন্দ্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এর প্রচেষ্টা হবে :

(ক) মহান কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাবমূর্তি এবং আদর্শকে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত ও জাগরুক রাখা।

(খ) পাকিস্তানের মন-মানসে ও সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এদেশের স্বকীয় চারিত্র্য ও ধ্যান-ধারণার সংগে সংগতিপূর্ণ আধুনিক ও প্রগতিশীল ভাবধারাকে সম্পৃক্ত ও সুসমন্বিত করা।

(গ) মুসলিম ঐতিহ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানী সংস্কৃতির নির্মাণ ও সংরক্ষণ।

ঠনতন্ত্রের ৪ অনুচ্ছেদে একাডেমীর কর্মসূচী সম্পর্কে বলা হয় :

(ক) নজরুল সাহিত্যের অধ্যয়ন, গবেষণা ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত কাজকর্ম সংগঠন ও পরিচালনা; নজরুল সাহিত্যের মর্মবাণী ও মূল্যবোধ ব্যাপকভাবে প্রচারের উপায় উদ্ভাবন, কবির রচনাবলী সংগ্রহ, সংকলন ও উর্দুসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা, কবির নিজের এবং তাঁর সম্পর্কে অন্যের লিখিত রচনা, সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য নজরুল জীবনী গ্রন্থ প্রস্তুত ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

(খ) দেশে এবং দেশের বাইরে নজরুল-সাহিত্য প্রচার এবং তা জনপ্রিয় করার বন্দোবস্ত করা, কবির সমস্ত গান ও গীতি-কবিতা সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ করা এবং তাদের বহু-বিচিত্র সুর টেপ-রেকর্ডে ধারণ ও সেসবের গ্রামোফোন রেকর্ড ও স্বরলিপি সংগ্রহ, প্রস্তুত ও প্রকাশ করা।

(গ) নজরুল সংগীত এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের উপরে বিশেষ গুরুত্ব সহ বিভিন্ন

www.nagorikpathagar.org

ধরনের কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীত, নৃত্য, নাটক এবং চারুকলার অন্যান্য শাখায় প্রশিক্ষণ দানের জন্য বিভিন্ন বিভাগ, বিদ্যালয় স্থাপন এবং পরিচালনার বন্দোবস্ত করা এবং সেসব বিষয়ে ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা প্রদান।

(ঘ) নজরুল সাহিত্য ও সংগীত, ধ্রুপদী, ঐতিহ্যগত ও আধুনিক সঙ্গীত এবং সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা বিষয়ক কাজ-কর্মের উপর সভা, সম্মেলন, সেমিনার, প্রদর্শনী এবং জলসার আয়োজন করা।

(ঙ) নজরুল সাহিত্য ও সংগীতের উপর গবেষণার জন্য নজরুল বৃত্তি প্রদান এবং এসব বিশিষ্ট অবদানের জন্য পুরস্কার, উপাধি ও সনদ প্রদান। মানবিক ও ইসলামিক ধারা এবং অন্যান্য অনুষঙ্গ বিষয়ে গবেষণার জন্য নজরুল বৃত্তি, পুরস্কার ও পদক প্রদান।

(চ) একাডেমীর মুখপত্র হিসাবে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করা এবং প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

(ছ) গ্রন্থাগার, পাঠচক্র, স্কুল, ইন্সটিটিউট, মিলনায়তন, মুদ্রণালয়, প্রেক্ষাগৃহ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।

(জ) জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং এসব ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তিদের কল্যাণ এবং একই ধরনের সংগঠন কর্তৃক গৃহীত অনুরূপ কর্মসূচীর সহযোগিতা করার জন্য যে কোন কর্মসূচীর পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও পরিগ্রহণ করা।

(ঝ) জাতীয় সংহতির জন্য দেশের যে কোন স্থানে এবং সমঝোতা, ভাব-বিনিময় ও উন্নততর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য বিদেশে লেখক, শিল্পী ও একাডেমী প্রতিনিধিদের সফর ও মিশন প্রেরণের আয়োজন ও ব্যবস্থা করা; প্রভৃতি।

একাডেমীর সদস্যপদ সম্পর্কে গঠনতন্ত্রে বলা হয় : লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক এবং যে কোনভাবে একাডেমীর লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হতে পারেন এরূপ অন্যূন ২১ বছর বয়স্ক পাকিস্তানের যে কোন নাগরিক একাডেমীর নিয়মিত সদস্য হতে পাবেন। একাডেমীর সদস্যরা হবেন চার ধরনের :

(১) যিনি এককালীন ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা একাডেমীকে দান করবেন, তাঁকে একাডেমীর আজীবন সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক করে নেয়া হবে।

(২) যিনি একাডেমীকে এককালীন ২৫০.০০ টাকা চাঁদা দেবেন, তিনি একাডেমীর আজীবন সদস্য হবেন।

(৩) বার্ষিক ২৫.০০ টাকা চাঁদা দিয়ে এক বছরের জন্য একাডেমীর সাধারণ সদস্য হওয়া যাবে।

www.nagorikpathagar.org

(৪) ছাত্র এবং পাকিস্তানে বসবাসকারী পাকিস্তানী নাগরিক বা বিদেশী নাগরিক একাডেমীর সহযোগী সদস্য হতে পারবেন। সহযোগী সদস্য ভোটাধিকার ছাড়া একাডেমীর সদস্যদের জন্য নির্ধারিত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। সহযোগী সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা ১০.০০ টাকা।

(৫) সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র একাডেমীর দু'জন সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হতে হবে। নির্বাহী পরিষদ সদস্য পদ বিবেচনা করবে। এ ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

এছাড়া 'নির্বাহী পরিষদ কোন জাতীয় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে একাডেমীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে।'

নজরুল একাডেমীর নির্বাচন সম্পর্কে গঠনতন্ত্রে বলা হয় :

(ক) বিদায়ী নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ১০ জন সদস্য বাদে বাকী ১০টি পদের নির্বাচন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একজন চেয়ারম্যান, একজন সচিব এবং একজন সদস্যকে নিয়ে 'নির্বাচন কমিশন' গঠিত হবে।

(খ) নির্বাচন কমিশন এমন ব্যক্তিদেরকে নিয়ে গঠিত হবে যাঁরা একাডেমীর নির্বাচনে প্রার্থী নন। নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র দাখিল এবং তা প্রত্যাহারের তারিখ ও সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখ উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করে নির্বাচন কমিশন ব্যালট পেপার প্রস্তুত করবেন এবং উপরোক্ত ২০ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা এবং তা নির্দিষ্ট সময়ে বিধিমত পরিচালনা করবেন।[২২]

৬. নজরুল একাডেমীর কর্মতৎপরতা

ক) উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১৯৬৭ সালের আগস্টে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের পর ১১৭নং আউটার সার্কুলার রোডে একটি দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে নজরুল একাডেমীর কার্য পরিচালনা শুরু হয়। এ বাড়ির ভাড়া ছিল মাসে পনের শত টাকা।[২৩]

পাকিস্তানের তদানীন্তন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী খান এ সবুরের চেষ্টায় কিছু বেসরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দান প্রায় পনের হাজার টাকা সম্বল করে একাডেমী তার কর্মসূচী বাস্তবায়নের যাত্রা শুরু করে। কয়েক মাসের মধ্যেই জনাব সবুরের সুপারিশ এবং তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হকের সৌজন্যে একাডেমী বার্ষিক পঁচিশ

www.nagorikpathagar.org

হাজার টাকা সরকারী অনুদান লাভ করে। এই পর্যায়ে একাডেমীর সাংবিধানিক ও আর্থিক সংগঠনে মোহাম্মদ মোদাব্বের, এ কে এম নূরুল ইসলাম, এ আর ভুঁইয়া, সবির আহমদ চৌধুরীর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।[২৪]

১৯৬৮ সালের মে মাসে নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সঙ্গে নজরুল একাডেমীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক তার ভাষণে বলেন :

> আমরা আমাদের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির সকল নিবেদিত কর্মীর সেবক ও নেতৃপুরুষকে এ একাডেমীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে এর সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে সাদর ও সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। নজরুলের অগণিত অনুরাগী ও সুধী সমাজ এবং দেশবাসীর আজ এ বিষয়ে অবহিত হওয়ার সময় এসেছে যে, বিদেশের কথা বলি না, নানা কার্যকারণে আজ আমাদের এ দেশেই অনেকে নজরুলকে হ্রস্ব বা বিকৃতকরণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টায় লিপ্ত। নজরুল যে অনন্য, তিনি যে আমাদের চিরকালের গর্ব এবং তিনি বিশ্ব কবিসভায়ও চির-উন্নত-শির দাঁড়াতে পারেন, একথা নতুন করে উপলব্ধি করে যথাযথ কর্তব্যে অবস্থিত হতে আমাদের আর বিলম্ব করা উচিত হবে না।[২৫]

এই অনুষ্ঠানের দু'দিন পর নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত দরিরামপুরে নজরুলের জন্মোৎসব পালন করা হয় নজরুল একাডেমীর উদ্যোগে। দরিরামপুরের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ। 'আল্লাতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান' গানের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠান রাত ১২টা পর্যন্ত চলে।[২৬]

খ) <u>হামদ নাত জলসা</u>

১৯৬৮ সালের ১ জুলাই ঢাকার কারিগরি মিলনায়তনে একাডেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় হামদ-নাত জলসা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর আবদুল মোনায়েম খান।

জলসায় একক ও সমবেত কণ্ঠে নজরুলের আঠারটি হামদ ও নাত পরিবেশন করা হয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে গবর্নর আবদুল মোনায়েম খান রাষ্ট্রের নবীন নাগরিকদের পাকিস্তানী আদর্শ তথা ইসলামী আদর্শকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরার আহবান জানান।[২৭]

গ) <u>সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান</u>

১৯৬৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের সম্মানে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের গ্রান্ড বল রুমে নজরুল একাডেমী এক

www.nagorikpathagar.org

অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানটিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথমটি ছিল সঙ্গীতানুষ্ঠান 'বুলবুল', দ্বিতীয় ভাগে ছিল নৃত্যানুষ্ঠান 'জুলফিকার'।

অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠানটি সেদিন শহরের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল। এ সম্পর্কে মাহে নও পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

> সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটে প্রেসিডেন্টের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একাডেমীর অর্কেস্ট্রায় জাতীয় সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে ওঠে।
>
> পবিত্র কোরান পাঠের পরে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে নজরুল একাডেমীর চেয়ারম্যান জাস্টিস আবদুল মওদুদ সাদর সম্ভাষণ পাঠ করেন। তার সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্যে ছিল নজরুল একাডেমীর অন্তর্নিহিত মৌল উদ্দেশ্যের বিবৃতি। ইসলামের ঐতিহ্য সমৃদ্ধিশালী, নজরুল ইসলাম তিমিরাচ্ছন্ন মুসলমানদের কর্ণে সেই কথাই বলেছিলেন বারংবার। নজরুল একাডেমীর মাধ্যমে পুনর্জাগরণের সেই অগ্রদূত নজরুল ইসলামকে পৌঁছে দিতে হবে অজ্ঞতা ও আত্মবিস্মৃতির দুয়ারে দুয়ারে—নজরুল একাডেমী সেই কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে একটা ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে; তার মধ্যে আছে নজরুলের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য গান ও সুর সংগ্রহ।
>
> মোট কথা, নজরুল একাডেমী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের পেছনে যে স্পিরিটটা বর্তমান তা হল মুসলিম ঐতিহ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জাতীয় সংস্কৃতির রূপায়ণ।
>
> অনুষ্ঠান শুরুর সাথে সাথে আমরা হৃদয়ঙ্গম করলাম ঐ আদর্শের তাৎপর্য। যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখলাম একদল সুসজ্জিত গায়ক-গায়িকা, নজরুল একাডেমীর শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রছাত্রী প্রেসিডেন্ট এবং সমবেত দর্শকদের উদ্দেশে সালাম জানিয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে শুরু করলেন নজরুল ইসলামের বিখ্যাত হামদ 'ফুলে পুছিনু বল ওরে ফুল'।
>
> নিস্পন্দ হল্ ঘরের চতুর্দিকে শিল্পী বেদারউদ্দীনের কণ্ঠের সাথে সাথে তার সহযোগীদের কণ্ঠ এক মোহিনী আবেশ সৃষ্টি করেছিল। তাঁর একক কণ্ঠে গাওয়া অংশটুকু যেমন ছিল মাধুরীময়, তেমনি সমবেত কণ্ঠে 'আল্লাহ আল্লাহ' ধ্বনিও সৃষ্টি করেছিল এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। সঙ্গীতার সেই প্রথম গানটি এবং তার শেষের গানটি 'শহীদী ঈদগাহে দেখ আজ জমায়েত ভারি' নিঃসন্দেহে দর্শককে সম্মোহিত করেছিল বলতে পারি। শিল্পী বেদারউদ্দীন সাহেবের ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠের পাশাপাশি শিল্পী সোহরাব হোসেন সাহেবের উদাত্ত স্বর এক আশ্চর্য শিহরণ জাগিয়ে তুলেছিল।

www.nagorikpathagar.org

প্রেসিডেন্ট খুশী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে এই অনুষ্ঠানটিকে Magnificient performance বলে প্রশংসা করেছিলেন।

একাডেমীর সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষ লায়লা আরজুমান্দ বানুর কুশলী কণ্ঠ "শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এল না" এই রাগ সঙ্গীতটিকে অনুপমভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। জনাব শেখ লুৎফর রহমান "করুণ কেন অরুণ আঁখি, দাও গো সাকী, দাও শারাব" গজলটিকে আবেগ-বিহ্বল সুরে পরিবেশন করেন এবং জনাব সোহরাব হোসেন "কাজলা দিঘীর জল তুই কানে কানে বল' পল্লী গীতিটির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের চিরশ্যাম রূপকে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। সঙ্গীতাংশে সর্বমোট ন'টি গান পরিবেশিত হয়। তার মধ্যে দু'টি গান ছিল কোরাস। 'ফুল পুছিনু বল ওরে ফুল', 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে', 'গগন সঘন চমকিছে কামিনী', 'শাওন আসিল ফিরে, সে ফিরে এল না', 'নদীর নাম সই অঞ্জনা', 'শহীদী ঈদগাহে দেখ আজ জমায়েত ভারি'—এ ক'টি গান কোরাস করে গাওয়া হয়েছিল। . . .

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে প্রদর্শিত একাডেমীর নৃত্য শিক্ষক আমানুল হক পরিচালিত নৃত্যনাট্যেও ফুটে উঠেছিল মহান উদ্দেশ্যের গোলাব। প্রতিটি দৃশ্য মনে করিয়ে দিয়েছিল সৈনিক নজরুল, প্রেমিক নজরুল এবং নব-রেনেসাঁর স্রষ্টা মানব-প্রেমিক নজরুল ইসলামকে। নৃত্যনাট্যের নামকরণ করা হয়েছিল 'জুলফিকার'। ওই নামের সাথে জড়িত আছে আমাদের অনেক কালের স্মৃতি, আমাদের বীর্যবত্তা, অন্যায়ের প্রতিপক্ষে দাঁড়ানোর সাহসিকতা।

নৃত্যনাট্যের শেষ দিকে 'পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন ইসলামী লাল মশাল' গানটি জনাব মীর কাশিম খানের অনবদ্য অর্কেস্ট্রায় এবং নজরুল একাডেমীর শিল্পীদের প্রাণময় নৃত্যস্পন্দে জাগিয়ে তুলেছিল ইসলামের নব-অভ্যুদয়ের অরুণ-রূপ। দর্শক বেদনা অনুভব না করে পারেনি গুটি তিনেক দৃশ্যে। ব্যথিত কবির সর্বমনে শৃঙ্খলিত জনতার মিছিল, শাসকের সংহার দৃষ্টি, জমিদারের অন্তহীন অত্যাচার, প্রেম এসেছিল জীবনে কবি নজরুল ইসলামের, কিন্তু আর্ত-মানবের বেদনা করুণ মূর্তি তাঁকে মহত্তর জীবনে টেনে নিয়েছিল।[২৮]

অনুষ্ঠান শেষে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, অনুষ্ঠানটি দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। তিনি বলেন :

নজরুল ইসলাম একজন মহান চিন্তাবিদ ও মহান ব্যক্তি। আল্লাহ তার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিন এটাই আমি কামনা করছি। তিনি নিরাময় হয়ে উঠলে এই সন্ধিক্ষণে তার প্রতিভা আমাদের প্রভূত কল্যাণ করতে পারত। তার সাহিত্য কর্ম থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত

www.nagorikpathagar.org

হলেও মুসলিম জাতির মৌল প্রেরণার উৎস একই। আর তা হল আল্লাহর একত্ব, মানব জাতির একত্ব, মানব জাতির সমতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রয়োজনীয়তা।[২৯]

এই অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলেন, এমন একদিন আসবে 'When we will probably have one Pakistani language, Which will be synthesis of all languages of the country.[৩০] তিনি বলেন, ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতি সত্ত্বেও পাকিস্তানীদের মৌল বিষয় একই। তাঁর মতে, একবার যদি আমাদের জনসাধারণ তাঁদের মৌলিক অনুপ্রেরণাসমূহ উপলব্ধি করে এবং সেগুলো তলিয়ে দেখে, এবং তাঁদের ইতিহাস ও সেই ইতিহাসের তাগিদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়, তাহলে দেশব্যাপী জনসাধারণের ব্যাপক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হবে।[৩১]

প্রেসিডেন্ট নজরুল একাডেমীর লক্ষ্য বাস্তবায়নে একাডেমীকে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রাদেশিক গবর্নর আবদুল মোনায়েম খান, জাতীয় পরিষদের স্পীকার আবদুল জব্বার খান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খান এ সবুর, অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী এবং সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ।[৩২]

ঘ) সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য

১৯৬৭ সালে ১১৭নং আউটার সার্কুলার রোডে বাড়ী ভাড়া নিয়ে নজরুল একাডেমীর কার্যক্রম শুরুর সঙ্গে একাডেমী দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে শুরু করে। এর একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়, অপরটি শিশুদের জন্য কিন্ডারগার্টেন স্কুল। পরবর্তীকালে দেশের খ্যাতিমান প্রায় সকল নজরুলসঙ্গীত-শিল্পী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হন।[৩৩]

নজরুল একাডেমী নজরুলের জন্মজয়ন্তী ছাড়াও দেশের প্রতিটি জাতীয় অনুষ্ঠান পালন করেছে। তারা সমান গুরুত্বসহকারে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে।[৩৪]

৭. প্রকাশনা

নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই উদ্যোক্তাগণ একাডেমীর মুখপত্র 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা' প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি তারা নজরুল গীতি সংগ্রহ ও তার স্বরলিপি তৈরি ও প্রকাশের উদ্যোগ নেন।

১৯৭১ সাল পর্যন্ত গবেষণামূলক 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা'র এগারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

নজরুল বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছাড়াও জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে এবং

www.nagorikpathagar.org

অন্য বিষয়ে এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ফলে শীগগীরই পত্রিকাটি দেশের প্রথম শ্রেণীর গবেষণা পত্রিকা হিসাবে সমাদৃত হয়। এই পত্রিকায় যারা লিখেছেন, তাদের মধ্যে ছিলেন : আবদুল মওদুদ, সুফী জুলফিকার হায়দার, আবদুল হক, শাহাবুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, জাহানারা আরজু, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, বেনজীর আহমদ, রাশীদুল হাসান, আনোয়ার পাশা, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, আবদুল কাদির, মুহম্মদ সিদ্দিক খান, আতোয়ার রহমান, মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, আবুল হাসানাত, তওফিক হোসেন, কবীর চৌধুরী, রাজিয়া সুলতানা, সিদ্দিকুর রহমান, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ, বজলুর রহমান, ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, সাদেক আলী, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মনিরউদ্দীন ইউসুফ।

১৯৭১–এ এসে পত্রিকার স্বাভাবিক প্রকাশনা বিঘ্নিত হয়। ফলে পত্রিকাটি পরবর্তীকালে আর আগের মত নিয়মিত প্রকাশিত না হলেও এখনও টিকে আছে। পত্রিকাটি বিভিন্ন সময় নজরুল একাডেমীর পক্ষে সম্পাদনা করেন আকবরউদ্দীন, শাহাবুদ্দীন আহমদ প্রমুখ।

৮. উপসংহার

শান্তি–নিকেতনের মত একটি প্রতিষ্ঠানে রূপদানের উচ্চাভিলাস নিয়ে নজরুল একাডেমী কার্যক্রম শুরু হলেও ১৯৬৯ সালের গণ–অভ্যুত্থানের সময় এই প্রতিষ্ঠানের বাইরের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরে প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র সঙ্গীত শিক্ষাদান কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

তবে নজরুল একাডেমীতে নজরুল গবেষণার মূল্যবান দলিলপত্র ও গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ করা হয়, নজরুল–সঙ্গীতের বাণী ও সুর সন্ধান করা হয়। কিন্তু '৭১ সাল পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীকালে একাডেমী তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে শুরু করে।

সব কিছু সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নজরুল একাডেমী নজরুল গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে।

তথ্যনির্দেশ

১. শাহাবুদ্দীন আহমদ, *নজরুল একাডেমী : পরিচিতি* (নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৩৮৮ বাং)

২. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *প্রাতিষ্ঠানিক নজরুল চর্চার ইতিবৃত্ত* (সুন্দরম, ত্রৈমাসিক, সম্পাদক : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম) অগ্রহায়ণ–মাঘ, ১৩৯৮

www.nagorikpathagar.org

৩. ডঃ রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশে নজরুল সঙ্গীত চর্চা* (নজরুল মৃত্যুবার্ষিকী ১৩৯৫ স্মারক গ্রন্থ। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা)

৪. কবি তালিম হোসেন, সাক্ষাৎকার, ১৬ জুলাই, ১৯৮৫

৫. শাহাবুদ্দীন আহমদ, *নজরুল-চর্চা দেশে বিদেশে* (উত্তরাধিকার, শহীদ দিবস সংখ্যা, ১৯৮৩)

৬. তালিম হোসেন, (সম্পাদক) নজরুল একাডেমী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৭৬ বাং

৭. শাহাবুদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত

৮. তালিম হোসেন, পূর্বোক্ত

৯. তালিম হোসেন, পূর্বোক্ত

১০. সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩) পৃ ১০৩

১১. সংবাদ/The Pakistan Observer, May 25, 1968

১২. নজরুল একাডেমী পত্রিকা, গ্রীষ্ম ১৩৮৮, পৃ ২৩১

১৩. পূর্বোক্ত

১৪. পূর্বোক্ত

১৫. পূর্বোক্ত

১৬. পূর্বোক্ত

১৭. পূর্বোক্ত

১৮. পূর্বোক্ত

১৯. পূর্বোক্ত

২০. তালিম হোসেন, পূর্বোক্ত, উদ্ধৃত, সাঈদ-উর-রহমান, পৃঃ ১০৩

২১. নজরুল একাডেমী স্মরণিকা, নজরুল জয়ন্তী, নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও চতুর্থ বাংলাদেশ নজরুল সঙ্গীত সম্মেলন, ১৯৮৩

২২. নজরুল একাডেমী কর্তৃক ছাপানো গঠনতন্ত্র থেকে অনূদিত

২৩. শাহাবুদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত

২৪. পূর্বোক্ত

২৫. পূর্বোক্ত

২৬. দৈনিক পাকিস্তান, ০১-০৬-১৯৬৮

২৭. দৈনিক পাকিস্তান, ০২-০৭-১৯৬৮

২৮. মাসিক মাহেনও, অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ ৮০-৮১

২৯. The Pakistan Observer, Sept. 26, 1968

www.nagorikpathagar.org

৩০. The Pakistan Observer, May 25,1968
৩১. সংবাদ, ২৫ মে, ১৯৬৮
৩২. তালিম হোসেন, সাক্ষাৎকার
৩৩. শাহাবুদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত
৩৪. তালিম হোসেন, সাক্ষাৎকার

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

সাংস্কৃতিক সম্মেলন

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

এক. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা ১৯৪৮

১. পটভূমি ও উদ্দেশ্য

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পর পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে নতুন সচেতনতা ও মতবিরোধ দেখা দেয় এবং রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সে সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠী ক্রমেই অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠে। শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে মতপার্থক্য ও বিতর্ক তীব্র বিরোধে রূপ নেয়। এ অবস্থায় ঢাকায় এসে পাকিস্তানের গবর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ যখন উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে তথা পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধেই গোটা পূর্ব বাংলা গর্জে ওঠে।

এই পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যই পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-সাহিত্য বিষয়ে বাংলার প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক হাবীবুল্লাহ বাহারের উদ্যোগে ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারী দু'দিন ব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ঢাকার কার্জন হলে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

২. অভ্যর্থনা কমিটি

সম্মেলনের জন্য গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হন হাবীবুল্লাহ বাহার এবং সম্পাদক মনোনীত হন অধ্যাপক অজিত গুহ ও সৈয়দ আলী আশরাফ।[১]

১৯৪৮ সালের ৫ ডিসেম্বর রবিবার অভ্যর্থনা কমিটির সভায় সম্মেলনের দিনক্ষণ স্থির হয়। সম্মেলনের বিভিন্ন শাখা এবং শাখার সভাপতি হিসাবে ওই বৈঠকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২]

অভ্যর্থনা - হাবীবুল্লাহ বাহার
মূল- ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
কাব্য- জসীমউদ্‌দীন
শিশুসাহিত্য- বেগম শামসুন্নাহার
ভাষাবিজ্ঞান- আবুল হাসনাৎ

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাস - অধ্যক্ষ শরফুদ্দীন
পুঁথিসাহিত্য ও লোকসাহিত্য- ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী
বিজ্ঞান - ডক্টর এস আর খাস্তগীর
চিকিৎসাবিজ্ঞান - ডক্টর আবদুল ওয়াহেদ
শিক্ষা- অধ্যক্ষ ইব্‌রাহীম খাঁ

অভ্যর্থনা কমিটির পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৭ ডিসেম্বর ১৯৪৮। বৈঠকে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ১ জানুয়ারী ১৯৪৯ একটি 'তাহজীব' অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর অনুষ্ঠানটির আয়োজনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় : সর্বজনাব হাবীবুল্লাহ বাহার, সৈয়দ আলী আহসান, নাজির আহমদ, শামসুল হুদা, আবদুল আহাদ, আমীরুজ্জামান, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, বেদারউদ্দীন আহমদ, মমতাজ আলী খান, লায়লা আরজুমান্দ বানু, মোহাম্মদ কাসেম, ফররুখ আহমদ, আবদুল কাইউম, ফতেহ লোহানী, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, মুজীবুর রহমান খাঁ, কাজী মোতাহার হোসেন, আহসানুজ্জামান খাঁ, মোহাম্মদ সোলায়মান এবং খায়রুল কবীর।[৩] কমিটির সদস্যগণ ১৭ ডিসেম্বর (১৯৪৮) বেলা সাড়ে তিনটার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল মিলনায়তনে এক বৈঠকে বসে অনুষ্ঠান সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

৩. প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রতিক্রিয়া

সাহিত্য সম্মেলনের প্রস্তুতি চলাকালে ঢাকা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের এক বৈঠকে মত প্রকাশ করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রগতি সাহিত্য বিরোধী এবং প্রকৃত গণতন্ত্র ও গণসাহিত্যের পরিপন্থী। সে অনুসারে তারা এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, অতঃপর লেখক সংঘের কোন সদস্য আসন্ন পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে কোন প্রকার সহযোগিতা করবে না।[৪]

প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক অজিত গুহ এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল দীর্ঘ দিনের। তার ওপর সংঘ ৩ ডিসেম্বর ১৯৪৮ অজিত গুহকে পরবর্তী বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচন করে। অন্যান্যের মধ্যে মুনীর চৌধুরী সংঘের সম্পাদক, এবং আবদুল্লাহ্ আলমুতী শরফুদ্দীন ও আলাউদ্দীন আল আজাদ যুগ্ম-সহকারী সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।[৫] এ সম্পর্কে অজিত গুহ জানান যে, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের যে বৈঠকে সাহিত্য সম্মেলন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সে বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য তাঁকে কোন খবরও দেয়া হয়নি।[৬]

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের মাত্র দুই দিন আগে সংঘের সম্মেলন বর্জনের সিদ্ধান্ত

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গে অজিত গুহ ও মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জনাব বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন :

> বস্তুতপক্ষে সম্মেলন বর্জন করার আংশিক সিদ্ধান্ত অজিত গুহের বিরুদ্ধে একটা শৃঙ্খলাগত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যই গৃহীত হয়। সম্মেলনের প্রস্তুতি বেশ কিছুদিন থেকেই চলে আসছিল এবং অজিত গুহ তার অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হিসাবেও কয়েক সপ্তাহ ধরে কাজ করে আসছিলেন। সম্মেলন সম্পর্কে লেখক সংঘ পূর্বেও একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারত। কিন্তু তারা তা নেয়নি। এর কারণ, বর্জন সংক্রান্ত তাদের প্রসঙ্গটির একটা পূর্ব ইতিহাস ছিলো, যেটিকে বাদ দিয়ে সেই সিদ্ধান্তের সত্যকার অর্থ ও তাৎপর্য বোঝা যাবে না।
>
> রবীন্দ্র গুপ্ত নামে ভবানী সেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'মার্কসবাদী'তে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে প্রগতিবিরোধী সাহিত্যিক হিসাবে চিহ্নিত করেন। সেই হিসাবে প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের রবীন্দ্র বর্জন করা একটি বৈপ্লবিক দায়িত্ব—এই মর্মেও তিনি প্রবন্ধটিতে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বাংলার সুধী ও সাহিত্যিক মহলে ১৯৪৮ সালে এক দারুণ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার প্রভৃতি ভবানী সেনের রবীন্দ্রবর্জনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং তারা ছাড়াও অন্যদের মধ্যে এই বিতর্ক বেশ ব্যাপক আকার ধারণ করে।
>
> ১৯৪৮-এর শেষের দিকে এই বিতর্কের ঢেউ পূর্ব বাংলায় বিশেষতঃ ঢাকাতেও এসে পৌঁছায় এবং লেখক সংঘের অধিকাংশ সদস্যের মধ্যেই রবীন্দ্রবিরোধী বক্তব্যই প্রাধান্য লাভ করে। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ প্রগতিবিরোধী। কাজেই তাঁকে সেই হিসাবে বর্জন করার সিদ্ধান্ত লেখক সংঘে নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়। মুনীর চৌধুরী, আখলাকুর রহমান, আবদুল্লাহ আলমুতী প্রভৃতি রবীন্দ্রবিরোধিতার পুরোভাগে ছিলেন। এখানেই অজিত গুহের সাথে তাদের সরাসরি বিরোধ বাধে। অজিত গুহ রবীন্দ্রনাথকে প্রগতিবিরোধী সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকার করতে অথবা তাকে বর্জন করতে সম্মত ছিলেন না।[৭]

এর আগে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে আয়োজিত এক সাহিত্য সভায় বিষয়টি একটি বিতর্কে পরিণত হয়। সেই সভার আলোচনায় ডক্টর শহীদুল্লাহ এবং অন্যরাও যোগ দেন। লেখক সংঘের সদস্য আখলাকুর রহমান এই সাহিত্য সভায় তাদের রবীন্দ্রবিরোধী বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের ভারত-তীর্থ কবিতা থেকে

> 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার
> দিবে আর নিবে মিলাব মিলিবে, যাবেনা ফিরে-
> এই ভারত মহামানবের সাগরতীরে।'

www.nagorikpathagar.org

— এই অংশটি উদ্ধৃত করে বলেন, কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ বস্তুত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ভারত অধিকারকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং সেই হিসাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা মূলত প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি তীব্র ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে এমনি আরও বক্তব্য তুলে ধরেন। সে সময় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সভাপতি অজিত কুমার গুহ আখলাকুর রহমানের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রগতিবাদী ভূমিকা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহও অজিত গুহকে সমর্থন করেন। ওই আলোচনা সভায় অজিত গুহ বলেন, তিনি (রবীন্দ্রনাথ) শ্রেণী সচেতন নন, কিন্তু তার মানবিকতা তাকে প্রগতির পথে নিয়ে এসেছিল। সে সভায় অজিত গুহ তেমন সমর্থন পাননি। বরং 'আখলাকুর রহমান খুব তালি পায়।'[৮]

যাই হোক, অজিত গুহের রবীন্দ্রপ্রীতির জন্যই প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ তাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য সম্মেলনের আগে আগে তাকে না জানিয়েই সম্মেলন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে তিনি সম্মেলনের সঙ্গে জড়িত থাকার ব্যাপারে অনড় থাকলে তাকে সংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

৪. সম্মেলনের প্রথম দিন : ৩১-১২-১৯৪৮

১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর শুক্রবার বিকাল আড়াইটায় কার্জন হলে বিপুল জনসমাগমের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। মওলানা আবদুর রহিমের কোরান পাঠের মাধ্যমে সম্মেলন উদ্বোধন করা হয়। তারপর কবি গোলাম মোস্তফা নবজাগ্রত রাষ্ট্রের নবচেতনা ও সাহিত্য সাধনার ভবিষ্যৎ ও সাহিত্যিক কর্তব্য সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বক্তব্য পেশ করেন। বেদারউদ্দীন আহমদ, বিমলচন্দ্র রায়, শেখ লুৎফর রহমান প্রমুখ রেডিও পাকিস্তানের শিল্পীবৃন্দ আবদুল আহাদের পরিচালনায় নজির আহমদ রচিত "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" নামে একটি গান পরিবেশন করেন।[৯]

তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হাবীবুল্লাহ বাহার তার ভাষণে 'শাহী জামানার' ঢাকা ও পূর্ব বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনার উপসংহারে তিনি বলেন,

> এদেশের সাহিত্যের ইতিহাস শাস্ত্রকার ও অভিজাতদের সঙ্গে জনগণের বিরোধের ইতিহাস। এ বিরোধে বারে বারে জনগণের জয় হয়েছে। জনগণের ভাষা বাঙ্গলাকে শাস্ত্রকাররা বর্জন করেছিলেন। তখন সেই ভাষা সাম্যবাদী এবং গণতন্ত্রী পাঠান সুলতান ও আমীর ওমরাদের সমর্থন পেয়েছিল। এজন্যই দেখি, কৃত্তিবাস বিদ্যাপতি থেকে আরম্ভ করে আদি যুগের হিন্দু কবিরা এদের বন্দনা করেছেন কৃষ্ণের অবতার বলে।

www.nagorikpathagar.org

শুধু সমর্থন নয়, রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে অসংখ্য আরবী-ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন মুসলিম সাহিত্যিকরা। এখনও মুসলিম কবিদের লেখা প্রায় দশ হাজার পুঁথি বঙ্গ সাহিত্যের জয় ঘোষণা করছে। বঙ্গ সাহিত্য পুষ্টি লাভ করেছে স্থানীয় ও মুসলিম তাহজিব-তমদ্দুনের সংঘাতের ফলে। এই সংঘাতের ফলে জন্ম হয়েছে শ্রীচৈতন্যের এবং চৈতন্য পরবর্তী সাহিত্যের, যার প্রাণবাণী 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

ইসলামী বিপ্লব বাঙ্গালায় সম্পন্ন হয় নাই নানা করণে। তা সত্ত্বেও ইসলাম এখানে যেটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে, তারই ফলে দেখি বাঙ্গালী ভারতের অন্য প্রদেশের চেয়ে বেশী গণতন্ত্রী, বেশী সাম্যবাদী, বেশী বিপ্লবী। ইংরেজ আগমনের পরে আবার হয় সংস্কৃতির সংঘাত। এদেশীয় মুসলিম এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির সম্মেলনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জন্ম। রবীন্দ্র পরবর্তী বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি যতখানি হয়ে থাকুক এ সাহিত্যের বিরাট ত্রুটি এই যে, এর সঙ্গে ছিল না গণমানসিকতার যোগ। এ ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের সাহিত্য যাকে বলা যায় শহুরে সাহিত্য।

আজ আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। পূর্ববঙ্গে জন্ম হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের। শহর থেকে দূরে স্বাধীনতার আবহাওয়ায় তৈরি হবে আমাদের নতুন যুগের নতুন সাহিত্য। এতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য জনগণের মধ্যে প্রতিপালিত হয় নাই। এবার তাই হবে, নূতন পাকিস্তানী সাহিত্যে আমরা দেখতে পাবো ঐ সব মানুষের জীবনের দাবি। যারা মাটিতে ফলায় সোনা, পদ্মা-মেঘনা, সাগর-মহাসাগরে দেয় পাড়ি, ধানের ক্ষেতে বাজায় বাঁশী। এ সাহিত্য দেশের দুঃসাহসী জনগণের সাহিত্য।

পাকিস্তানী সোনার মাটির স্পর্শে আজ পূর্ববঙ্গে জাগছে কবি, জাগছে শিল্পী, জাগছে নূতন যুগের সাহিত্যিক। শাক্তিধর সৃষ্টিধর্মী শিল্পীর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আজিকার সমবেত সাহিত্যিকদের মধ্য দিয়ে সেই অনাগত শিল্পীকে জানাই খোশ আমদেদ।[১০]

সম্মেলনের মূল সভাপতির অভিভাষণে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ভাষণের শুরুতে তিনি বলেন[১১] :

দয়াময় খোদাতায়ালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমরা আজ এক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রাদেশিক রাজধানীর বুকে মুক্ত আকাশের মুক্ত মানুষ রূপে সমবেত হতে সক্ষম হয়েছি। জাহাঙ্গীর, শায়েস্তা খান, ইসলাম খান ও আযীমুশ শানের স্মৃতিবিজড়িত জাহাঙ্গীরনগর ঢাকা আজ আযাদ পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। ঢাকার নিকটবর্তী পূর্ব বঙ্গের এককালীন রাজধানী সোনারগাঁও, ন্যায়বান বাদশাহ গিয়াসুদ্দীন

www.nagorikpathagar.org

> আযম শাহের পুণ্য স্মৃতি আজও বুকে ধারণ করে আছে। স্মৃতি আমাদের নিয়ে যায় ঢাকার অদূরবর্তী বিক্রমপুরে সেন রাজাদের শেষ রাজধানীতে। যেখানে একদিন লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন ও মধু সেন রাজত্ব করেছিলেন। দূর স্মৃতি আমাদের টেনে নিয়ে চলে বিক্রমপুরের সন্নিকট রাজা রামপালের স্মৃতি চিহ্ন রামপালে এবং বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত শীলভদ্র কমলশীল ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের স্মরণপূত অধুনাবিস্মৃত জন্মভূমিতে। এই অঞ্চল যেমন বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমানের স্মারকলিপি হয়ে আছে, প্রার্থনা করি, তেমনই এ যেন নতুন রাষ্ট্রের জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল নাগরিকের মিলনভূমি হয়। আমীন।
>
> পূর্ব বাংলার বিশেষ গৌরব এই যে, এই প্রদেশের প্রাচীন নাম বাঙ্গাল থেকে সমস্ত দেশের নাম হয়েছে বাঙ্গালা বা বাংলা।

তিনি তার বক্তৃতায় ইতিহাসের ধারায় পূর্ববঙ্গের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে বলেন, 'প্রাচীন রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গ নিয়েই আমাদের বাঙ্গালা দেশ। ... শুর বংশের পর সেন বংশ এই রাঢ় থেকেই রাজত্ব বিস্তার করেন। তারাও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা চালিয়ে আদিশূরের ধারাকেই স্থায়ী করেন। তুর্কীদের বাংলা বিজয়ের সূত্রপাত রাঢ় থেকে হলেও এখানে ইসলাম তেমন বিজয়ী হতে পারেনি। বরেন্দ্র ও বঙ্গ মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে বৌদ্ধ বা নাথপন্থী ছিল। তারা সনাতনপন্থীদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিল। এমন সময়ে আসে তুর্কীদের হামলা। তারা এই বিদেশীদের রক্ষাকর্তা মনে করে বোধ হয় সাহায্য করেছিল এবং পরে সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। তাই আজ পূর্ব পাকিস্তান হওয়া সম্ভবপর হয়েছে।'[১২] তিনি বলেন, পরবর্তীকালে কিছু কিছু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করলেও পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমান যে বৌদ্ধ বংশজাত, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন, 'স্বাধীন পূর্ব বাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্ব শাখায় সুসমৃদ্ধ এক সাহিত্য। এই সাহিত্যে আমরা আজাদ পাক-নাগরিক গঠনের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুশীলন চাই। এই সাহিত্য হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়। পৃথিবীর কোন জাতি জাতীয় সাহিত্য ছেড়ে বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হতে পারেনি। ইসলামের ইতিহাসের একেবারে গোড়ার দিকেই পারস্য আরব কর্তৃক বিজিত হয়েছিল, পারস্য আবরদের ধর্ম নিয়েছিল, আরবী সাহিত্যেরও চর্চা করেছিল। কিন্তু তার নিজের সাহিত্য ছাড়েনি।'[১৩]

এ প্রসঙ্গে তিনি বাংলার মুসলমান শাসকদের বাংলা সাহিত্য চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতার উদাহরণ হিসাবে কৃত্তিবাস ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের রাজপ্রশস্তি তুলে ধরেন। সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের প্রশংসায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর যে বলেছেন "কলিযুগ অবতার গুণের আধার/পৃথিবী ভরিয়া যার যশের বিস্তার/ সুলতান আলাউদ্দীন প্রভু গৌড়েশ্বর/ এই তিন ভুবনে যাঁর যশের প্রসার।" —সে কথাও ডঃ শহীদুল্লাহ উল্লেখ করেন। তিনি আদিকাল

www.nagorikpathagar.org

থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলার মুসলমান সাহিত্য সাধনার বিশ্বস্ত ইতিহাস লেখা ও প্রাচীন মুসলিম লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ব বঙ্গ সরকারের প্রতি আহবান জানান।[১৪]

বাংলা বর্ণমালা ও বানান সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'কিছুদিন থেকে বানান ও অক্ষর সমস্যা দেখা দিয়েছে। সংস্কারমুক্তভাবে এগুলির আলোচনা করা উচিত এবং তার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পরামর্শ সমিতি গঠন করা আবশ্যক। যারা পালী, প্রাকৃত ও ধ্বনিতত্ত্বের সংবাদ রাখেন, তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে বাংলা বানান অনেকটা অবৈজ্ঞানিক। সুতরাং তার সংস্কার দরকার। স্বাধীন পূর্ব বাংলায় কেউ বা আরবী হরফে, কেউ বা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখতে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলার শতকরা ৮৫ জন যে নিরক্ষর। তাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান বিস্তারের জন্য কি চেষ্টা হচ্ছে? যদি পূর্ব বাংলার বাইরে বাংলাদেশ না থাকত, আর যদি গোটা বাংলাদেশে মুসলমান-ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায় না থাকত, তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হত না। আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। পাকিস্তান রাষ্ট্র ও মুসলিম জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। তার উপায় আরবী হরফ নয়, তার উপায় আরবী ভাষা। আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে।'[১৫]

শিক্ষা ও অনুশীলনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> আমরা পূর্ব বাংলার সরকারকে ধন্যবাদ দেই যে তারা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করে বাংলা ভাষার দাবীকে আংশিক রূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সরকারের ও জনসাধারণের বিপুল কর্তব্য সম্মুখে রয়েছে। পূর্ব বাংলা জনসংখ্যায় গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, পর্তুগাল, আরব, পারস্য, তুর্কী প্রভৃতি দেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সোনার বাংলাকে কেবল জনে নয়, ধনে-ধান্যে, জ্ঞানে-গুণে, শিল্প-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যেকোন সভ্য দেশের সমকক্ষ করতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাকে উচ্চ আসন দিতে হবে। তার জন্য শিক্ষার মাধ্যম স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আগাগোড়া বাংলা করতে হবে।[১৬]

তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দু শিক্ষার প্রশ্নেও জোর দিতে গিয়ে বলেন :

> আযাদ পাকিস্তানে আমাদের অবিলম্বে শিক্ষা তালিকার সংস্কার করতে হবে। এই নূতন তালিকায় রাষ্ট্রভাষা উর্দুকে স্থান দিতে হবে। যারা এতদিন রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ইংরেজীর চর্চা করেছে, তাদের উর্দু শিখতে কি আপত্তি থাকতে পারে?[১৭]

www.nagorikpathagar.org

মূল সভাপতির ভাষণে ডক্টর শহীদুল্লাহর উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ ছাড়াও তাঁর বক্তব্যের যে অংশটি সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিতর্কের সৃষ্টি করে তা ছিল :

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা লুঙ্গী-টুপিতে-দাড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।[১৮]

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতির ভাষণ এবং প্রথম দিনের অধিবেশনের অন্যান্য লেখা পড়া শেষ হবার পর পূর্ব বাংলা সরকারের শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারী ফজলে আহমদ করিম ফজলী সৈয়দ আলী আহসানকে বলেন যে, তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশে বাংলায় কিছু বলতে চান। হাবীবুল্লাহ বাহার এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ বোধ না করলেও শেষ পর্যন্ত সম্মত হন।[১৯] ফজলী বলেন, 'আজ এখানে যে সমস্ত প্রবন্ধগুলি পড়া হলো সেগুলি শোনার পর আমি ভাবছি আমি কি ঢাকাতে আছি না কলকাতায়?' তিনি বলেন, পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলার কোন সংযোগ থাকার কারণ নেই। তিনি ডক্টর শহীদুল্লাহর অভিভাষণের কোন কোন বিষয়ের সরাসরি সমালোচনা করেন।

ফজলীর এই আচরণে হাবীবুল্লাহ বাহার তার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হন। সম্মেলন শেষ হওয়ার পরই তিনি চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদকে বলে তাকে স্বাস্থ্য দফতরের সেক্রেটারীর পদ থেকে অপসারণ করে অন্য একজনকে সেই পদে নিযুক্ত করেন।[২০]

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে শুরু থেকে দৈনিক আজাদ অনুকূল ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ডঃ শহীদুল্লাহ হিন্দু-মুসলমানের চেয়ে আমরা বেশী বাঙ্গালী—একথা বলায় আজাদ পত্রিকা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই ১ জানুয়ারী ১৯৪৯-এ আজাদ একটি কড়া সম্পাদকীয় লেখে ওই বক্তব্যের বিরুদ্ধে। এই সম্পাদকীয় প্রকাশ না করার জন্য মন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহার, অজিত কুমার গুহ, সৈয়দ আলী আহসান 'আজাদ' অফিসে তদবির করতে যান। কিন্তু সম্পাদককে না পেয়ে তারা সে তদবিরে ব্যর্থ হন। মন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহার নিজে প্রেসে গিয়ে কম্পোজিটরদের কাছ থেকে প্রুফ কপি নিয়ে তাদেরকেই তা না ছাপার অনুরোধ জানান। কিন্তু তারা জানায়, 'সম্পাদকের নির্দেশ ছাড়া সেটা সম্ভব নয়।'[২১]

১ জানুয়ারী ১৯৪৯-এ প্রকাশিত আজাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় :

> সভাপতি তার ভাষণের এক স্থানে বলিয়াছেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়। এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায়

www.nagorikpathagar.org

> বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, তা মালা তিলক টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।' অখণ্ড ভারতের যুক্ত বাংলায় সাহিত্যিক অভিভাষণে এমন কথা অনেকেই বলিয়াছেন বটে; কিন্তু বিভক্ত ভারতের দ্বিখণ্ডিত বাংলায় পাকিস্তানী পরিবেশে এই শ্রেণীর কথা শুনিতে হইবে একথা ভাবা একটু কঠিন ছিল বৈকি। তাছাড়া কোন হিন্দু লেখক নয়, একেবারে স্বয়ং ডক্টর শহীদুল্লাহ "মা-প্রকৃতি"র এমন স্তব গাহিবেন, একথাই বা কে ভাবিতে পারিয়াছিল।[২২]

দ্বিতীয় দিনের ভাষণে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ অবশ্য এ বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, ইসলাম সম্পর্কে কোন কথা বলার অধিকার দৈনিক পত্রিকাটির অপেক্ষা তারই বেশী। কাজেই এ বিষয়ে তাদের মন্তব্য অনধিকার চর্চা ব্যতীত কিছুই নয়।[২৩]

৫. সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন : ০১-০১-১৯৪৯

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সম্মেলনে একটি কার্যকরী সংসদ গঠনের প্রস্তাব আনা হয়। এই প্রস্তাবে হাবীবুল্লাহ বাহার, শামসুন্নাহার মাহমুদ, সৈয়দ আলী আশরাফ, সৈয়দ আলী আহসানের নামও ছিল। কিন্তু অধ্যাপক আবুল কাসেম এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। পরে আরও কয়েকজন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন যে, বাংলার প্রগতিবাদী তরুণ লেখক এবং ঢাকার বাইরের অনেক নামজাদা নামজাদা সাহিত্যিক এই কমিটিতে স্থান পায়নি। এর ফলে হাবীবুল্লাহ বাহার নিজেই প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ব্যবস্থাপক সভায় বাংলাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তাকে কার্যকর করার জন্য অধ্যাপক আবুল কাশেম একটি প্রস্তাব করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে সে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২৪]

১৯৪৯ সালের ৯ জানুয়ারী সাপ্তাহিক সৈনিক 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে কি দেখিলাম' শিরোনামে প্রত্যক্ষদর্শী আকালী চৌধুরীর একটি বিবরণ ছাপা হয়। তাতে বলা হয় :

> পুরা একটি বছর এত ঢোল শহরতের পর সম্মেলনে যা পরিবেশন করলেন তা বহু-কষ্টে পর্বতের মূষিক প্রসবের মতই হয়েছিলো। গিয়েছিলাম পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে, কিন্তু সেখানে না পেলাম পূর্ব পাকিস্তানকে আর না পেলাম পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যকে। ঢাকার বাইরে যে পূর্ব পাকিস্তান আছে, তা বোধহয় সম্মেলনের উদ্যোক্তারা মনেই করেননি।...
>
> মূল সভাপতি পণ্ডিত ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেব তো তবু নতুন কথা আমাদের কিছু শুনিয়েছেন— মুসলমানের চেয়েও বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী, প্রকৃতি মা যে

www.nagorikpathagar.org

আমাদের চেহারায় ছাপ মেরে দিয়েছেন, টিকি–টুপিতে আমাদের ফরখ করবে কি করে। —নতুন কথাই বটে। মিষ্টার জিন্নাহ আর তার চেলা ফেলাদের এই এত দিনকার পুরানো দুই জাতিত্বের রক্তক্ষয়ী চিৎকারের পর এবং পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরও মুসলমানের চাইতে আমাদের বাঙ্গালী পরিচয়টাই খাঁটি সত্য, এর চেয়ে অভিনব কথা আর কি হতে পারে? পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান পুরোহিতের যোগ্য কথাই বটে।

পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে ডক্টর শহীদুল্লাহ ১৯৪৮ সালের এই সাহিত্য সম্মেলনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন :

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টে বহু দিনের গোলামীর পর যখন আযাদীর সুপ্রভাত হল, তখন প্রাণে আশা জেগেছিল যে, এখন স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বাংলা সাহিত্য তার সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পাবে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে বড় আশাতেই বুক বেঁধে অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম, স্বাধীনতার নতুন নেশায় আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। .... করাচীর তাঁবেদার গত লীগ গভর্নমেন্ট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কিছু করা দূরে থাক, বাঙ্গালী বালকের কচি মাথায় উর্দুর বোঝা চাপিয়ে দিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আরবী হরফে বাংলা ভাষা লেখার এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টায় সহযোগিতা করেছেন। এইরূপ বিষাক্ত আবহাওয়ায় ১৯৪৮ সালের পর (ঢাকায়) আর কোন সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন সম্ভবপর হয়নি। আজ জনপ্রিয় পূর্ব বাংলার গভর্ণমেন্টের আশ্রয়ে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছি।[২৫]

৬. প্রসঙ্গ কথা

১৯৪৮ সালের সাহিত্য সম্মেলনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙ্গালীত্ব আর টুপি–দাড়ির প্রসঙ্গে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থে তা সন্নিবেশিত করা হয়নি ডঃ শহীদুল্লাহর নির্দেশেই।[২৬]

কাছাকাছি সময়ে ভারতীয় পন্ডিতরাও ভাষা ও জাতিসত্তার প্রশ্নে প্রায় একই রকম বক্তব্য রাখেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন :

এক একটি প্রদেশে এক একটি ভষা, এক একটি ভাষা অবলম্বন করিয়া এক একটি স্বতন্ত্র জাতি; সকলেই বৃহত্তর বৃত্ত স্বরূপ ভারতবর্ষের অন্তর্গত, সকলেরই প্রাদেশিক বা প্রান্তিক সত্তা বা সভ্যতা প্রাচীন ভারতের সার্বভৌম সত্তা বা

www.nagorikpathagar.org

> সভ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সকলকেই হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, ব্যবহার করিতে হইবে।[২৭]

তিনি লিখেছেন, 'অত্যন্ত গৌরবর্ণ পারসী অথবা কাশ্মিরী, অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি পাঞ্জাবী, খুব খাটো চেহারার এবং খুব কালো রঙের সাঁওতাল প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় জনসংঘের মধ্যে কতকগুলি Extreme type অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রতীক বাদ দিলে, যে কোনও প্রদেশ হইতে হউক না কেন, সাধারণ ভারতবাসী জনকতককে ধরিয়া তাহাদের দেহ হইতে কানের মাকড়ী, লম্বা চুল, গালপাট্টা, উড়ে খোঁপা, লম্বা টিকি, ফোঁটা বা বিভূতির ঘটা, মুসলমানী কায়দায় ছাঁটা গোঁফ, প্রভৃতি প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক লাঞ্ছনা দূর করিয়া দিয়া এক রকম কাপড় চোপড় পরাইয়া দিলে, তাহারা কোন প্রদেশের লোক তাহা বলা কঠিন হইবে।'[২৮]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে প্রায় একই রকম কথা বলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নানা বাস্তব কারণে তিনি এ মত আঁকড়ে রাখতে চাননি বলেই হয়ত 'শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ' থেকে তার ভাষণের এই অংশ বাদ দিতে বলেছিলেন।

তদুপরি ডক্টর শহীদুল্লাহ পূর্ব বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করেছিলেন, পূর্ববর্তী গবেষণার ক্ষেত্রে তা উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। যদিও সেই স্বাতন্ত্র্য প্রায় হাজার বছর ধরেই পূর্ব বাংলার মানুষের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

৭. উপসংহার

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই পূর্ব বাংলায় এই সাহিত্য সম্মেলনে এদেশের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে স্বতন্ত্র চিন্তার প্রতিফলন ঘটে। পাকিস্তানবাদিতার ওই জোয়ারের মুখেও এই সম্মেলন পূর্ব বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। কার্যক্ষেত্রে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের এবং মুসলিম লীগ সরকারের উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

তথ্যনির্দেশ

১. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ ১৭৪

২. আজাদ, ০৭-১২-১৯৪৮, উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন উমর

৩. আজাদ, ০৮-১২-১৯৪৮, উদ্ধৃত ঐ

৪. বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ ১৭৫

www.nagorikpathagar.org

৫. আজাদ, ০৪-১২-১৯৪৮
৬. বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলনপ্রসঙ্গে কতিপয় দলিলপত্র* (অজিত গুহের সাক্ষাৎকার, ১৯৮৫) পৃ ১৯৭
৭. বদরুদ্দীন উমর, ১৯৭০, পৃ ৩৩-৩৪
৮. অজিত গুহের সাক্ষাৎকার, বদরুদ্দীন উমর, ১৯৮৫, পৃ ১৯৭
৯. আজাদ, ০১ জানুয়ারী, ১৯৪৯
১০. পূর্বোক্ত
১১. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ (সম্পাদক) *শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ*, ১৯৬৭, পৃ ৩৬
১২. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৯
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৪১
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৪৫
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ ৪৭
১৮. আজাদ, ০১ জানুয়ারী, ১৯৪৯
১৯. বদরুদ্দীন উমর, ১৯৮৫, পৃ ১৯৭-২০৩
২০. সাক্ষাৎকার, সৈয়দ আলী আহসান, উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন উমর
২১. বদরুদ্দীন উমর, ১৯৭০, পৃ ১৮২ এবং ১৯৮৫, পৃ ১৯৭-২০৪
২২. উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন উমর, ১৯৭০, পৃ ১৮২
২৩. পূর্বোক্ত
২৪. সাপ্তাহিক সৈনিক, ০৯ জানুয়ারী, ১৯৪৯
২৫. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন ১৯৫৪, উদ্বোধনী ভাষণ, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা, উদ্ধৃত বদরুদ্দীন উমর, ১৯৭০, পৃ ১৮৫
২৬. বদরুদ্দীন উমর, ১৯৭০, পৃ ৩৭৫
২৭. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারত-সংস্কৃতি* (মিত্র ও ঘোষ। ১৯৬৪, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৭) পৃ ৮৮
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৮-৮৯

www.nagorikpathagar.org

দুই. পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, চট্টগ্রাম ১৯৫১

১. পটভূমি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মীরা পর পর দুটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সেগুলো হল, সংস্কৃতি পরিষদ ও প্রান্তিক। এদের মিলিত উদ্যোগে ১৯৫১ সালের ১৬, ১৭, ১৮ মার্চ চট্টগ্রামের হরিখোলা মাঠে পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।[১] তবে সম্মেলন চলে ১৬ ও ১৭ মার্চ দু'দিন।[২]

এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের আগে ১৯৫০ সালের জানুয়ারীতে একটি সফল সাহিত্য প্রদর্শনী ও সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তারও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল ফজল। ডিসেম্বরে তার নেতৃত্বেই আবার একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত হয় সেখানকার প্রগতিশীল তরুণদের উৎসাহে। তার অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি করা হয় আবুল ফজলকে। এ সম্পর্কে আবুল ফজল লিখেছেন, 'তাঁদের (প্রগতিশীল তরুণদের) ইচ্ছা ঢাকা–কলকাতা থেকেও আনাবেন বাছা বাছা শিল্পী আর সাহিত্যিক। বলা বাহুল্য তখনও পাসপোর্ট ভিসার প্রবর্তন হয়নি। সাহিত্য আর সঙ্গীত ছাড়া সঙ্গে একটা চিত্র প্রদর্শনীরও করা হয়েছিল আয়োজন। ঢাকার বন্ধুরা এগিয়ে এলেন এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করতে। শুরু হয়ে গেল সম্মেলনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রকমের প্রচারণা।'[৩]

২. প্রস্তুতি

সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পর্কে আবুল ফজল লিখেছেন, "কে বা কার প্ররোচনায় জানি না হঠাৎ 'আজাদ' আর 'মর্নিং নিউজে' শুরু হয়ে গেল সম্মেলনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রকমের প্রচারণা। ঢাকার যেসব অধ্যাপক আর পণ্ডিত ব্যক্তি সম্মেলনে প্রবন্ধ পড়তে আর সভাপতিত্ব করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন তারা সবাই ভয় পেয়ে বেঁকে বসলেন। এমন কি শেষ মুহূর্তে আসতেও অস্বীকার করলেন। ধুয়া তোলা হয়েছে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সবাই কম্যুনিস্ট। কর্মীদের মুখের পানি শুকিয়ে গেল। দমে গেলেন কর্মকর্তারাও। কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন সম্মেলন মুলতবী রাখার জন্য। আমি বেঁকে বসলাম এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। কি জানি কেন ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম সেদিন। জেদ চাপলো মনে, বল্লাম মাত্র তিন জনকে নিয়েও যদি সম্মেলন করতে হয় তা হলেও সম্মেলন আমরা করবই। পেছনে হঠা চলবে না। ভবিষ্যতে

www.nagorikpathagar.org

যা ঘটে ঘটুক। কর্মীরা এবার হৃত উৎসাহ যেন ফিরে পেলো। নবোদ্যমে শুরু হলো প্রস্তুতির কাজ। আমাকে বলা হলো, ঢাকা থেকে কেউ না এলে তো মুখ থাকে না।"[৪]

শেষ পর্যন্ত আবুল ফজল দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে 'সম্মেলনের পয়সায় জীবনের প্রথম হাওয়াই জাহাজে চড়ে' সুফিয়া কামালকে দাওয়াৎ করতে এলেন ঢাকায়। সুফিয়া কামাল রাজী হলেন। তারপর সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হল।

আবুল ফজল লিখেছেন, "কর্মীদের কারো কারো মনে তখনও ভয় ছিল। কারণ 'আজাদ' আর 'মর্নিং নিউজ' তখনো অনবরত সম্মেলনের বিরুদ্ধে লিখেই চলেছে। আর সরকারী মহলে এই দুটি পত্রিকার প্রতাপ তখন অসীম।"[৫]

'আজাদ' পত্রিকা অনবরত সম্মেলনের বিরুদ্ধে লিখেই চলেছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তাকে অনেকখানি অতিরঞ্জিত বলা যায়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে এক ধরনের 'আজাদ'-ভীতি সব সময় কাজ করেছে বলে মনে হয়।

সম্মেলন সম্পর্কে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রথম সংবাদটি প্রকাশিত হয় ১৬ মার্চ ১৯৫১। তার শিরোনাম ছিল 'চট্টগ্রামে সংস্কৃতি সম্মেলন'। দৈনিক আজাদ পত্রিকার চট্টগ্রাম প্রতিনিধি তারবার্তায় ১৩ মার্চ এ সংবাদটি চট্টগ্রাম থেকে পাঠান, যা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। সে সংবাদে বলা হয় :

> ঢাকা ও পূর্ব পাকিস্তানের অসংখ্য জেলা হইতে কোন নাম-করা সাহিত্যিক সংস্কৃতি সম্মেলনে যোগদান করিতে আসিতেছেন না। কিন্তু কলিকাতার কতিপয় প্রগতি লেখককে বিশেষভাবে দাওয়াৎ করা হইয়াছে।
>
> সম্মেলনের আহ্বায়কগণ সম্মেলনের সমর্থনে একটি বিবৃতিতে নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের স্বাক্ষর সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। তমদ্দুন মজলিসের কর্মীগণ ও ছাত্র লীগের পক্ষ হইতে এই সম্মেলন সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং স্থানীয় দৈনিক আজাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সম্মেলনের বিপক্ষে মন্তব্য করা হইয়াছে।[৬]

এর পরে ২২ মার্চ আজাদে ছাপা হয় দুটি বিবৃতি। তাতে কবি মতিউল ইসলাম ও নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম ছাত্র লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য সম্মেলনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।[৭] এর পর এপ্রিল পর্যন্ত সম্মেলন সম্পর্কে আজাদে আর কোন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি।

এদিকে কলকাতার যুগান্তর পত্রিকার ঢাকা প্রতিনিধি সরলানন্দ সেন আজাদের প্রথম দিনের সংবাদকে সম্পাদকীয় বলে উল্লেখ করে লেখেন, 'আজাদ সম্পাদক আরও যেসব অশোভন ইঙ্গিত সম্মেলন সম্পর্কে করেছেন, কোন সংস্কৃতিবান এবং রুচিবান সাংবাদিকের পক্ষে তা সম্ভব নয়।'[৮] কার্যত আজাদের রিপোর্টে অশোভন কোন উক্তি ছিল না।

যুগান্তরের এই প্রতিনিধিই 'ঢাকাসহ কয়েকটি শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায় মার্চের

www.nagorikpathagar.org

প্রথম সপ্তাহে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে' বলে সে খবর পাঠান[৯] তা-ও সত্যের অপলাপ ছিল মাত্র।

যেকোন কারণেই হোক চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আজাদ পত্রিকাকে একটু বেশীই দোষারোপ করেছেন। হতে পারে তা আজাদ গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবীদের ভয়ে। ১৬ তারিখে সম্মেলন উদ্বোধন করা হয়। তবে ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের না পাওয়ায় সম্মেলনের কর্মসূচীতে পরিবর্তন আনা হয়।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ছিলেন সম্মেলনের মূল সভাপতি। সুফিয়া কামাল প্রধান অতিথি মনোনীত হন।

৩. সম্মেলনের বক্তৃতামালা

এই সম্মেলনে কোন দিন কোন বিষয়ে প্রবন্ধাদি পাঠ হয়েছিল, তার বিবরণ পাওয়া যায়নি। তবে সীমান্ত পত্রিকায় ওই সম্মেলনে পঠিত বেশীর ভাগ লেখা ছাপা হয়েছিল।

সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তার ভাষণে পুরনো পুঁথিপত্রে ও তুলট কাগজে তাঁর কাজ নিবদ্ধ রাখার কথা উল্লেখ করে বলেন, "ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটী ধ্রুব লক্ষণ বিশেষ। ঐতিহ্যের অনুসরণ ও স্রোতধারাকে চিরবহমান করিয়া তোলাই সংস্কৃতি-সেবীর আসল কাজ। যাহারা তা মানেন না, তাহাদের কাছে আমার সাধনার কোন মূল্য নাই। তাহাদের সহিত আমি তর্কে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু আপনাদের বলিতে চাই, ঐতিহ্যের পটভূমির সহিত যাহাদের যোগ নাই, তরুলতার ক্ষেত্রে যেমন পরভোজী শব্দ ব্যবহার করা হয়—এখানে ঐ জাতীয় ব্যক্তিদের জন্য তেমন বিশেষণই আরোপ করা চলে। সমাজ জীবনেও দেখিবেন ইহারা পরভোজী। মানবতার সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। জনসাধারণের মস্তকে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া দিনাতিপাত করেন এই জাতীয় ব্যক্তিদের উপদেশ কোনদিন গ্রহণ করিবেন না।"[১০]

তিনি বলেন :

> ঐতিহ্যের প্রেম সংস্কৃতি সাধনার আসল সোপান। দেশের ইতিহাস এই জন্যেই ভাল রূপে জানা দরকার। ভুলিয়া যাইবেন না অতীত আমাদের ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শন করে। সেই আলোতে আমাদের বর্তমান নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। এই জন্যে ঐতিহ্যের কথা বারবার স্মরণ রাখা দরকার।
>
> ঐতিহ্যের কোন কিছু গড়িতে গেলে আপনারা ভুল করিবেন। সাধনা পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। অথবা জাতীয় বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে। এই কথা আমি বারবার স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। কারণ অনেকেই এই সোজা কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। হঠাৎ নূতন কিছু করার প্রয়াস অথবা স্বার্থসিদ্ধি—তাহাদের এষণার মূল যাই থাক না কেন এমন লোকের সংখ্যা কম নয়। ঐতিহ্য হইতে

www.nagorikpathagar.org

তাহারা দূরে সরিয়া যাইতে বলে। মনে রাখিবেন ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া।...

ঐতিহ্যের সহিত দেশের ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা, লৌকিক আচার, জলবায়ু, গাছপালা, এমন কি তরুলতা পর্যন্ত জড়িত।...বুকে দেশপ্রেম না থাকিলে তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া মুশকিল। অনেকে সবগুলি মানেন না। দেশের কোন একটি বিশেষ অঙ্গের উপর জোর দেন। এমন ক্ষেত্রে দেশ অঙ্গস্ফীতি পীড়ায় ভুগিবে। কোন একটি অঙ্গের উপর জোর দিলে তা হয়ত মোটা দেখাইতে পারে—অন্যগুলি শুষ্ক হইয়া যাইবে, ইহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়—স্বাস্থ্যের অভাবের লক্ষণ। এই দিকে সাবধান হউন। অনেকে এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া দেশের মাটিকে পর্যন্ত অস্বীকার করেন। ইহা বাতুলতা।'[১১]

তিনি অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের উদাহরণ দিয়ে বলেন, অবিভক্ত ভারতে দেড় শত বৎসর বাস করেও তারা কোন কৃষ্টির জন্ম দিতে পারেনি।

তিনি মধ্যযুগের কবি আলাওলের উদাহরণ টেনে বলেন, তার মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব থাকলেও বিশিষ্ট সাহিত্য ধারার প্রবর্তক রূপে তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেন, রাজত্ব স্থায়ী করার জন্য হুসেন শাহ, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রমুখ শাসকেরা দেশীয় ঐতিহ্যকে উৎসাহিত করেছেন এবং বাংলা সাহিত্য রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তারা ভাষার নিপীড়নও করেননি এবং অন্য ভাষা চাপিয়ে দেয়ার নির্বুদ্ধিতাও প্রকাশ করেননি।

মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রতিফলিত সমাজ ও শিল্পরীতি বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, স্থানকাল ভেদে সাহিত্যের আদর্শও পরিবর্তনশীল।

মনের সীমানা বিস্তৃত করার উপর জোর দিয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেন, 'তরুণ বন্ধুগণ, অগ্রসর হউন সর্বমানবের সংস্কৃতি গড়িয়া তুলুন। মধ্যযুগের কবি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তার সার্থক রূপায়ণে অগ্রসর হউন। তাহাদের পথে বাধা ছিল অনেক। জ্ঞান বিজ্ঞান আপনাদের সহায়। আপনারা সফল হইবেন। চার শ' বছরের সংস্কৃতির সম্পদে আজ আপনারা ঐশ্বর্য্যশালী। আপনারা সফল হইবেন। অগ্রসর হউন। জোর কদম।'[১২]

সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ থেকে আগত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন,'ভেদ-বিচ্ছেদের মধ্যে বিশ্বমানবের সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে অঙ্গীকার করে মনুষ্যত্বের কল্যাণময় পরিণতির ওপর বিশ্বাস রাখলেন যারা, তাদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য।'

তিনি বলেন, "দীর্ঘ পরাধীনতার অবসানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমরা আত্মকর্তৃত্ব পেয়েছি, সমাজ জীবনে এটা প্রসারিত করতে পারিনি। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচার-নিয়ম, অনুশাসন ও নিষেধের অন্ধ আনুগত্য করে যারা পঙ্গু হয়ে থাকাটাই জীবনধর্ম

www.nagorikpathagar.org

বলে মেনে নিয়েছে, আত্মকর্তৃত্ব তাদের সার্থক হতেই পারে না।"

তিনি বলেন, "আমাদের দেশেও অমানবিক নিষ্ঠুরতায় প্রতিবেশীর প্রতি বর্বর নির্দয়তাও দেখলাম। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাসের ধারা আলোচনা করলেই বোঝা যাবে, এর কারণ স্থানীয় বা আকস্মিক নয়। দেশ-দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত মানুষের সঙ্গে মানুষের সভ্য সম্পর্কে যতদিন সামঞ্জস্য না ঘটবে, ততদিন এর নিবৃত্তি হবে না।"

সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'তোমাদের উপর একটিই বুঝবার এবং বোঝাবার দায়িত্ব এসেছে, যা সর্বমানবের কল্যাণকর নয়, তাতে কারো কল্যাণ হতে পারে না। সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি শুভবুদ্ধিকে আক্রমণ করছে, গায়ের জোরে তাকে দমিয়েও দিচ্ছে।'

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন, 'বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান আমরা রাষ্ট্রগত পার্থক্যকে যখন স্বীকার করেছিলাম, তখন কেউ একথা মনে করিনি, শিক্ষা-সংস্কৃতির ভাষা ও সামাজিক লোক-ব্যবহারেও প্রাচীর তুলে কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করার চেষ্টা চলবে। কিন্তু মানুষের সংস্কৃতির সম্পদ চতুর পলিটিশিয়ানদের কূটনীতিক জুয়া খেলার পণ্য নয়। গোঁড়া অবিশ্বাসী ও নৈরাশ্যবাদীদের আস্ফালন ও বিলাপ এ দুই-ই অতিক্রম করে সর্বমানবের সংস্কৃতির বলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্বাভাবিক সুন্দর ও শোভন করা যে সম্ভব এইটি প্রমাণ করার দায়িত্ব আজকের তরুণদের। ধর্মকে আপাততঃ মনোরম নাম দিয়ে মানুষকে অবমাননা করা—এতে নিত্যধর্ম সত্যধর্ম পীড়িত হয়। এ যে অস্বাভাবিক অপবিত্র আত্মদ্রোহ সমাজ এটা বুঝবে।' তিনি বলেন :

> এই দুর্ভাগা দেশে সেদিন আসবে, যেদিন হিন্দু বলে নয়, মুসলমান বলে নয়, মানুষ মানুষ বলেই তার স্বকীয় অধিকারে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করবে। এই শুভ দিনকে তোমরা নিকটতম করো। তোমাদের সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প-সঙ্গীত সাধনার লক্ষ্য হোক, অতীতের মানসিক দাসত্ব থেকে মনের মুক্তি।[১৩]

বেগম সুফিয়া কামাল প্রধান অতিথির ভাষণে 'বাদ তসলিম' চট্টগ্রাম সম্পর্কে বলেন, "বার-আউলিয়ার পদরেণু স্পর্শে পবিত্র এই ভূমি আমার কাছে শুধু স্বপ্ন দিয়ে তৈরি বা স্মৃতি দিয়ে ঘেরা নয়—এই দেশ আমার কাছে পবিত্র তীর্থ-ভূমি স্বরূপ। এতদিন নানা অনিবার্য কারণে এই তীর্থভূমি জেয়ারৎ করা আমার দ্বারা হয়ে উঠেনি। তাই সেদিন যখন আপনাদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গিয়ে বল্লেন, আপনাকে নায়র নিতে এসেছি—আমার মন বিচলিত হয়ে উঠল, নায়রের নামে কোন মেয়ের মন না চঞ্চল হয়ে ওঠে?'

এরপর তিনি বলেন, 'ভাষা ও ভাবের চাকচিক্য, বিদেশী সাহিত্যের ধার করা জৌলুষ যার সঙ্গে লেখকের অন্তরের পরিচয় বা পরিণয় ঘটেনি, বৃন্তছেঁড়া বাসী ফুলের মত তা ম্লান হয়ে যেতে কিছু মাত্র দেরী লাগে না। গত বিশ বছরের মধ্যে এমন বহু চকচকে ও ধারালো অথচ জাতীয় চিত্তের সঙ্গে যোগসূত্রহীন কৃত্রিম লেখাই পাঠকের স্মৃতি থেকে চিরতরে মুছে গিয়েছে।'

www.nagorikpathagar.org

দেশের মাটি, বায়ু-পানি-মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে, দেশকে ভাল করে না জানলে যে নিজেদের বিকাশ সম্ভব নয়—একথা উল্লেখ করে বেগম সুফিয়া কামাল বলেন, 'সৃষ্টির জন্য ভালবাসার চেয়ে যাদুমন্ত্র আর নেই।' তিনি বলেন, 'ভালবাসুন, দেশকে ভালবাসুন, দেশের শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ভালবাসুন।...এই ভালবাসার শপথ ছাড়া কোন শপথ নেই।'[১৪]

তিনি তার 'সাঁঝের মায়া' কবিতা উদ্ধৃত করে বলেন, 'পুষ্প বিকাশের সাধনা কঠিনের সাধনা। কিন্তু মানুষের ভাগ্যলিপি তো আল্লাহ কুসুমাস্তীর্ণ করে রচনা করেননি। জীবনের দুর্গম পথেই মানুষের জয়যাত্রা।'[১৫]

সম্মেলনে 'কাব্যে সমাজচেতনা ও ঐতিহ্যবোধ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন মোতাহের হোসেন চৌধুরী। তিনি তার প্রবন্ধে কাব্যের প্রাচীন ও আধুনিক সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বলেন, 'একালের কবিরা যে দুঃখবেদনার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে, তাতে তাদের সজীবচিত্ততারই পরিচয় পাওয়া যায়। যে হৃদয়ে বেদনা যত বেশী বাজে সে হৃদয় তত বেশী সজীব। আর কবিরা যে সজীবচিত্ততা তথা সংবেদনশীলতার পরিচয় দেবে তা স্বাভাবিক। কেননা তারা আর যাই হোক নিরোর বংশধর নয়।'

মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেন, 'কবিরা প্রেমিক, পৃথিবী তাদের প্রিয়া।... পৃথিবী প্রিয়া যখন আজ পীড়িত, যখন তার ঘনঘন নাভিশ্বাস উঠছে, তখন কবিদেরও একটু কোবরেজি করতে হচ্ছে। সেবাশুশ্রূষা করতে হচ্ছে, রোগের নিদানটি কি তা ভেবে দেখতে হচ্ছে। নিছক সৌন্দর্যের পূজা তাদের আর আনন্দ দিতে পারছে না, বরং তাতে তারা বিরক্তই বোধ করছে।'

তিনি বলেন, 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের ধর্ম হলেও প্রয়োজনের তাগিতে তিনি তা পরিত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করনে নি।... সে জন্যে তার রচনায় অনেক সময় স্ববিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। এই বিরোধ দুর্বলতা নয়, মহত্ত্বেরই পরিচয় চিহ্ন।

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তিনি বলেন, 'তিনিও একই সঙ্গে সম্মোহন বংশীবাদক ও সংগ্রামী মানুষ হতে চেয়েছিলেন।'[১৬]

মোতাহের হোসেন চৌধুরী তার প্রবন্ধে সমাজ সচেতনতা ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন :

> দেশ যে শুধু আমাদের বাসস্থান তা নয়, আমাদের স্রষ্টাও। প্রবণতা আর পদ্ধতিতে পার্থক্য এই যে, পদ্ধতি বদলানো যায়, কিন্তু প্রবণতা বদলানো যায় না। একজন ইংরেজ খ্রীষ্টান সহজেই মুসলমান হতে পারে, কিন্তু জার্মান ফরাসী হতে পারে না। অর্থাৎ মতামত ও আচার বদলানো সহজ কিন্তু স্বভাব বদলানো সহজ নয়। দেশের মাটি তথা দেশের প্রবণতাই ঐতিহ্যের গোড়ায়, এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেনি বলে যথেষ্ট কবিত্ব শক্তি থাকা সত্ত্বেও ঐতিহ্যবাহী

www.nagorikpathagar.org

কবিদের রচনা দেশের মর্ম স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি। ঐতিহ্য তত্ত্বের মর্ম উপলব্ধি সম্ভব হয়নি বলেই তাদের এ ব্যর্থতা। ঐতিহ্যের খোঁজ করে তারা ইরান-তুরানে—বাংলাদেশে নয়। অথচ ইরানীরা যে নিজের খোঁজই করছিল, অপরের নয়—সে কথা তাদের মনে থাকে না।[১৭]

একথা মুসলমানদের জন্য যেমন সত্য ছিল, তেমনি সত্য ছিল হিন্দুদের জন্যও। সমসাময়িক লেখকরা এ ব্যাপারে মুসলমানদের যত দায়ী করেছেন, হিন্দুদের ব্যাপারে সে রকম উচ্চবাচ্য করেননি।

ঐতিহ্য অনুসন্ধানের সূত্র ধরে মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেন, 'প্রাক-পাকিস্তান যুগে ধর্মদ্বন্দ্বের দরুন আমাদের মন বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল বলে আমরা সেদিকে নজর দিতে পারিনি। আজ সুদিন এসেছে। ধর্মদ্বন্দ্বমুক্ত হয়ে আজ আমরা সুস্থ্য ও স্বস্থ হতে চলেছি। এখন আমাদের প্রাণ প্রকৃতির ওপর নজর দেওয়া দরকার।'[১৮]

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক আবুল ফজল সংস্কৃতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন : ইউরোপ আমেরিকা রাষ্ট্রকে সংস্কৃতি আর আমাদের দেশে সংস্কারকে সংস্কৃতি ধরে নিয়ে নিজেদের পশুমানসের সমর্থন খুঁজছে ধর্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতির আড়ালে। মানুষ মেরে গো-বধ বা মসজিদের সামনে বাদ্য বাজনা হিন্দু সংস্কৃতি বা মুসলিম সংস্কৃতি একথা অন্তত কোন সত্যিকার সংস্কৃতিবান লোক কখনো বিশ্বাস করবে না। আমার মতে সংস্কৃতির, সত্যিকার সুসংস্কৃতির কোন ধর্মগত বা দেশগত রূপ হতেই পারে না।[১৯]

তিনি বলেন, ধুতি-চাদর, আচকান-পাজামা, কোট-প্যান্ট পরলেই তিনি সংস্কৃতিবান হন না, তেমনি ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গেও সংস্কৃতির কোন যোগ নেই। 'আজাদী বা স্বাধীনতা যে সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক জীবনের সহায়ক এই বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাপনের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপরিহার্য। কারণ সভ্যতা বা সংস্কৃতি সৃষ্টি করে ব্যক্তি, রুচিবান, সুন্দরচিত্ত মানুষের প্রভাবেই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। রুচি, বিশেষ করে সুরুচি ব্যক্তি স্বাধীনতার ছায়াতলেই হয় বিকশিত। রাষ্ট্রের কাজ নিরাপত্তা ও অবসর সৃষ্টি করা।' এ প্রসঙ্গে তিনি সুশিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সত্যিকার সাহিত্য যেমন কালাকালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সত্যিকার সংস্কৃতিও দেশকাল বা সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।[২০]

উপসংহারে তিনি বলেন, মনষ্যত্বই তথা মানবধর্মের সাধনাই সংস্কৃতি। এবং একমাত্র এই সাধনাই জীবনকে করতে পারে সুন্দর ও সুস্থ। সবশেষে তিনি জীবনকে সুন্দর ও সুস্থ করার জন্য তরুণদের প্রতি আহবান জানান।[২১]

সম্মেলনে 'মাতৃভাষার মর্যাদা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন মোহাম্মদ ফেরদাউস খান। তিনি শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রয়োজন ও গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন।[২২]

www.nagorikpathagar.org

'সীমান্ত'র ওই সংখ্যায়ই সংস্কৃতি সংবাদ শীর্ষক আলোচনায় আবদুল গনি লেখেন : সাধারণত কোন বড় কাজ করতে যাওয়ার পথ মসৃণ নয়, অনেক ত্রুটি থাকে, বাধা বিপত্তি আসে। এ ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। উদ্যাক্তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা কিছুটা ছিল; প্রচারও আশানুরূপ হয়নি। এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে তারা, যারা চিরদিনই এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন। বিরুদ্ধ প্রচারের দরুন সম্মেলনের কর্মসূচী কিছুটা পরিবর্তন করতে হয়েছিল, কিন্তু তাতে সম্মেলনের সাফল্যের দিক থেকে কোন অঙ্গহানি হয়নি। একমাত্র কারণ দর্শকদের উপস্থিতি।[২৩]

৪. চিত্র প্রদর্শনী

সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাতে জয়নুল আবেদীন, শফীউদ্দীন আহমদ, কামরুল হাসান, আনওয়ারুল হক প্রমুখের চিত্রকর্ম স্থান পায়।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিভাগীয় কমিশনার এন এম খান। খানিকটা স্থানাভাবে এবং বেশিটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রদর্শনীর সাফল্য কিছুটা ব্যাহত হয়।

৫. সঙ্গীতানুষ্ঠান

সম্মেলনে সঙ্গীতও একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল। সলিল চৌধুরীর সুরে গাওয়া হয়, 'যখন প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধ না শান্তি/আমাদের বেছে নিতে হয় না ভ্রান্তি/আমরা জবাব দেই শান্তি শান্তি শান্তি।' ফরিদা হাসিন গান, 'শ্বেত কপোতের পাখায় পাখায় শান্তি আসে'।[২৪]

৬. সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় : আমরা বিশ্বাস করি সাহিত্য সমাজজীবনের নিছক প্রতিফলন নয়। সাহিত্য সমাজ উন্নয়নের শক্তিশালী অবলম্বন। ক্ষুধা বেকারী এবং অশান্তির হাত থেকে সমাজ জীবনকে রক্ষা করা এবং গতিশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পবিত্র দায়িত্ব আজ শিল্পী সাহিত্যিকদের...মানুষের কল্যাণের জন্য যে সাহিত্য সামাজের গতিশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সাহিত্য, আমরা সে সাহিত্যের প্রতি আস্থাশীল।[২৫]

এছাড়া সম্মেলনে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে, ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশের স্বাধীনতার ওপর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

অপর একটি প্রস্তাবে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সরকারী সাহায্যে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার আবেদন জানান হয়।

সম্মেলনে ভবিষ্যতে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলারও প্রস্তাব গ্রহীত হয়।

www.nagorikpathagar.org

৭. শুভেচ্ছা বাণী

সম্মেলনে প্রদত্ত বাণীতে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বলেন, যে জাতির সাহিত্য নেই তারা মৃত।

অন্নদাশঙ্কর রায়কে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি আসতে অপরাগতা প্রকাশ করে প্রদত্ত এক বাণীতে বলেন, Pure art সৃষ্টি করে যাওয়া উচিত। কেননা রস পিপাসাও মানুষের শাশ্বত পিপাসা।

মুহম্মদ এনামুল হক তার বাণীতে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।[২৬]

তবে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন বহু মানুষ। কলকাতা থেকে অনেক গায়ক-গায়িকা এসেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে ঐ সম্মেলনেই কলিম শরাফির প্রথম আত্মপ্রকাশ। 'দুদিন ধরে সম্মেলনে এত অভূতপূর্ব লোক সমাগম হত যে, পাশের সড়কেও তিল ধরনের জায়গা থাকত না।'[২৭]

উদ্যোক্তাগণ সম্মেলন উপলক্ষ্যে রচিত ইশতেহারে নিজেদের প্রাচীন বাংলা ও আধুনিক রবীন্দ্র-নজরুল সাহিত্যের উত্তরাধিকারী বলে দাবী করেন।[২৮]

এভাবে সম্মেলন 'ভালোয় ভালোয়' সমাপ্ত হয়।

৮. উপসংহার

প্রধানত কমিউনিস্ট-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে চট্টগ্রামে এই সাহিত্য আন্দোলনের আয়োজন করা হয় বলে দেশের পাকিস্তানপন্থী পত্র-পত্রিকায় তাদের কোন প্রচার হয়নি। তার ওপর ভারত থেকে লেখকরা যোগ দেয়ায় এদের ভারতপন্থী বলেও মনে করা হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা মানতে হবে যে, চট্টগ্রাম সম্মেলনে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করে। এতে নতুন চিন্তারও প্রকাশ ঘটে।

তথ্যনির্দেশ

১. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা,* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩) পৃ ৩৫

২. আবুল ফজল, *রেখাচিত্র* (বইঘর, ১৯৬৮) পৃ ৩০০-৩০১

৩. পূর্বোক্ত

৪. আবুল ফজল, পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৩০১

৬. আজাদ, ১৬-০৩-১৯৫১

www.nagorikpathagar.org

৭. আজাদ, ২২-০৩-১৯৫১

৮. যুগান্তর, ২১ মার্চ ১৯৫১ (উদ্ধৃত সরলানন্দ সেন, *ঢাকার চিঠি*, মুক্তধারা, কলকাতা, ১৯৭১) পৃ ৫৫

৯. আজাদ, ১৯-০৩-১৯৫১

১০. সীমান্ত (মাসিক) ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৫৭ বাং

১১. পূর্বোক্ত

১২. পূর্বোক্ত

১৩. পূর্বোক্ত

১৪. পূর্বোক্ত

১৫. পূর্বোক্ত

১৬. পূর্বোক্ত

১৭. পূর্বোক্ত

১৮. পূর্বোক্ত

১৯. পূর্বোক্ত

২০. পূর্বোক্ত

২১. পূর্বোক্ত

২২. পূর্বোক্ত

২৩. পূর্বোক্ত

২৪. পূর্বোক্ত

২৫. পূর্বোক্ত

২৬. পূর্বোক্ত

২৭. আবুল ফজল, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০১

২৮. ধনঞ্জয় দাশ, *আমার জন্মভূমি ঃ স্মৃতিময় বাংলাদেশ* (মুক্তধারা, কলকাতা, ১৯৭১) পৃ ৮৩

www.nagorikpathagar.org

তিন. পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, কুমিল্লা ১৯৫২

১. পটভূমি, প্রস্তুতি

১৯৫২ সালের ২২, ২৩ ও ২৪ আগস্ট কুমিল্লা শহরে 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনের আয়োজন করে কুমিল্লা প্রগতি মজলিস। ১৯৫২ সালের প্রথম দিকে কুমিল্লার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা মিলে কুমিল্লা প্রগতি মজলিস নামের এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে।[১]

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক অজিত নাথ নন্দী, অধ্যাপক আবুল খায়ের আহমদ ও অধ্যাপক আশুতোষ চক্রবর্তী যথাক্রমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হন।

অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ এবং আরও কয়েকজন কর্মী এক বিবৃতিতে সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং আর্থিক সহায়তা করার জন্য প্রদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানান। আহ্বানে বলা হয়, 'পাকিস্তানোত্তর কালে জাতীয় সংস্কৃতির ভিন্ন দিকের অগ্রগতি মোহমুক্ত চিত্তে পর্যালোচনা করা সম্মেলনের লক্ষ্য।' সেজন্য উদ্যোক্তারা 'জাতি-ধর্ম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিত্তহীন-বিত্তশালী নির্বিশেষে এবং যে বিশাল জনতা যুগ যুগ ধরিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নীরবে সভ্যতার ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ গঠন ও ধারণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের সবাইকে' সম্মেলনে যোগদানের আহ্বান জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে সমিতির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও ছিলেন ভিক্টোরিয়া কলেজের সহ-অধ্যক্ষ জোৎস্নাময় বসু, অধ্যাপক সেকান্দর আলী ভূঁয়া, অধ্যাপক আসহানউদ্দীন আহমদ, কুমিল্লা পৌরসভার সভাপতি অতীন্দ্র মোহন রায়, আজিজুর রহমান বিএল, সৈয়দ আবদুল ওয়াদুদ বিএল, আশুতোষ সিংহ বিএল ও আবদুর রহমান খাঁ বিএল।[২]

সম্মেলন অনুষ্ঠানে ফরওয়ার্ড ব্লক, যুব লীগ, কম্যুনিস্ট পার্টি, রেভোলিউশনারী সোশালিস্ট পার্টিসহ অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের কুমিল্লা শাখাসমূহ সহযোগিতা করেছিল।[৩]

সম্মেলনের ব্যয়ভার বহনের জন্য উদ্যোক্তারা প্রধানত শুভাকাঙ্ক্ষীদের আর্থিক চাঁদার ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন। চট্টগ্রাম বিভাগের খাদ্যনিয়ন্ত্রক কবীর চৌধুরী এবং ভোগ্যপণ্য

www.nagorikpathagar.org

সংস্থার উপপরিচালক ফজলুল হক চৌধুরী যৌথভাবে ২,২০০ (দুই হাজার দুইশ' টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কুমিল্লার জননেতা কামিনী কুমার দত্ত দিয়েছিলেন ১,০০০ টাকা।[৪] কবীর চৌধুরী পরবর্তী কালে খাদ্য বিভাগের চাকুরি ছেড়ে সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং বুদ্ধিজীবী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান আর্থিক আনুকূল্য ছাড়াও ঢাকা থেকে শিল্পী-সাহিত্যিকদের কুমিল্লায় যাবার জন্য নারায়ণগঞ্জ থেকে দাউদকান্দি পর্যন্ত বিনাভাড়ায় লঞ্চের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।[৫]

মোটামুটিভাবে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরোধী প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এর নেপথ্যে কাজ করেছে। উদ্যোক্তাগণ এই সম্মেলনকে 'সরকারবিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্মেলন' হিসাবে রূপ দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। সে জন্য সরকারী কলেজের শিক্ষক হওয়ায় শওকত ওসমান সম্মেলনে এসেও প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ পাননি।[৬]

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রচারিত পুস্তিকায় সম্মেলনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও পটভূমি ব্যাখ্যা করা হয়। পুস্তিকায় সম্মেলনের পটভূমি সম্পর্কে বলা হয়, 'যাঁহারা এদেশে বিভিন্নস্তরে শিক্ষাদানে নিরত, যাঁহারা সাহিত্য রচনা করেন, সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ অন্তরে পোষণ করেন; সঙ্গীতে চিত্রে যাহারা প্রাণের সন্ধান পান, দর্শন বিজ্ঞানের সাধনায় যাঁহাদের জীবন ব্যয়িত হয়, সেইসব শিক্ষাব্রতী সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী, শিল্পী-দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের উপরই পড়িয়াছে জাতির মানস-সংস্কৃতি উন্নয়নের মহৎ ভার। লক্ষ লক্ষ ম্লান মূঢ় অন্তর আজ তাঁহাদেরই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাঁহারাই যে জাতির প্রতিনিধি। তাঁহাদিগকেই যে আজ জাতির মূক মুখে ভাষা দিতে হইবে। অন্তরে আশা ধ্বনিয়া তুলিতে হইবে। বহির্জগতের সর্বাধিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে মানুষের মানসিক উৎকর্ষ। এই মানসিক উন্নতি বিধানের সাধনায় একটি দিনও সময় নষ্ট করিবার মত নাই। কীভাবে এই কার্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, তাহাই প্রশ্ন। চিন্তানায়ক, কবি-শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সমবেত প্রচেষ্টাই এই কার্যকে দ্রুত সাফল্যের পথে লইয়া যাইতে পারে। অবকাশ ও সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ইহার জন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্মেলন প্রয়োজন। এই সমস্ত প্রয়োজনে শিল্পী-সাহিত্যিক ও চিত্রনায়কেরা সমবেত হইয়া পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারেন এবং উহার মাধ্যমেই নব নব সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন। এভাবে নিজ নিজ সৃষ্ট বিষয়ের গুণাগুণও বিচার করিবার সুযোগ পান। তাহাদের ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়াই জাতির মানস-সংস্কৃতির ধারা প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া নূতন নূতন খাতে প্রবাহিত হয় এবং বিরাট প্রসার লাভ করিয়া অপরিস্ফুট জনগণের অবজ্ঞাত সৃজনী ক্ষমতাকে উদ্বোধিত করিয়া

www.nagorikpathagar.org

ভাব ও কর্মের বিপুল শস্যভাণ্ডারে জাতীয় সমৃদ্ধি ঘোষণা করে।'[৭]

সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, তাদের প্রস্তাবিত সম্মেলনের প্রধান বিশেষত্ব হবে আত্মসমীক্ষা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিকরা বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কত দূর অগ্রসর হতে পেরেছেন; শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে কি তারা দিতে পেরেছেন, কি পারেননি, তাই তারা 'মোহমুক্ত চিত্তে' পরীক্ষা করে দেখতে চান। এই আত্মসমালোচনার মধ্য হতেই শিল্পী সাহিত্যিক ও বিজ্ঞান সাধকগণ নিজেদের বলাবল বুঝতে পারবেন এবং তারই প্রেক্ষিতে রচিত হতে থাকবে ভবিষ্যতের কর্মধারা।[৮]

তাই উদ্যোক্তাদের আহ্বান :

> আসুন, জ্ঞান, বুদ্ধি অর্থসামর্থ্য যাঁহার যাহা আছে তাহাই দিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে মহৎ রূপ দান করুন। আমাদের এই আহ্বান শুধু দেশের কতিপয় শিক্ষিত ও বিত্তশীল ব্যক্তির প্রতিই সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু যে বিশাল জনতা যুগ যুগ ধরিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ও নানাবিধ শ্রমজনক কার্য্যের দ্বারা নীরবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ গঠন ও ধারণ করিয়া আসিতেছে তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া বটে। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টান অধিবাসী সমন্বিত সমগ্র পাকিস্তানী জাতির চিত্ত শতদল বিকশিত করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অবিচল নিষ্ঠা সহকারে আমরা কর্মের পথে অগ্রসর হইব। আমাদের সমবেত সাধনা ও তপস্যা সকল কলুষ-কালিমা, সকল মোহ, সকল ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া জাতিকে এক মহৎ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবে। আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। আজ যাহা উজ্জ্বল কল্পনামাত্র, কাল তাহা গৌরবমণ্ডিত বর্তমানে রূপায়িত হইবেই।[৯]

এই সম্মেলন সংগঠনের পেছনে প্রধানত যা কাজ করেছিল, তা হল এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্য এদেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করা। সে কারণেই উদ্যোক্তাগণ পূর্ব বাংলার বাইরের কোন লেখককে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাননি। অনুষ্ঠানের প্রেরণা হিসাবে ভাষা আন্দোলনের আদর্শ ও এদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারাকে সংহত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য কাজ করেছিল।[১০]

অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা ও প্রতিষ্ঠানের শিল্পীগণ অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ছিল চট্টগ্রামের প্রান্তিক শিল্পীসংঘ ও রেলওয়ে শিল্পীসংঘ, ঢাকার আর্ট স্কুল, পূর্ব পাকিস্তান শিল্পী সংসদ, প্রচার বিভাগের শিল্পীগণ, বেতার শিল্পী, অগ্রণী শিল্পীসংঘ, অগত্যা গ্রুপ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক।[১১]

এছাড়া Urdu progressive Writers' Association-এর পক্ষে সালাহউদ্দীন আহমদ, দিনাজপুর থেকে শরদিন্দু ব্যানার্জী, রাজশাহী থেকে সচীন্দ্র প্রসাদ মজুমদার,

www.nagorikpathagar.org

বগুড়া থেকে ইবনে জশমতুল্লাহ এবং সিলেট থেকে নূরুল রহমানের নেতৃত্বে একটি ছোট দলও এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে।[১২]

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠিয়েছিলেন কলকাতা থেকে কাজী আবদুল ওদুদ, বিষ্ণু দে ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম থেকে আবুল ফজল, All India Peoples Theatre Association-এর পক্ষে নিরঞ্জন সেন এবং East Pakistan Cultrral Society'র পক্ষে মোহাম্মদ কাসেম আলী।[১৩]

ঢাকা আর্ট স্কুল একটি চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করে কুমিল্লা টাউন হলের থিওসফিক্যাল ভবনে। এর দায়িত্বে ছিলেন কামরুল হাসান। বেগম সুফিয়া কামাল চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। কুমিল্লা জিলা স্কুলের শিক্ষক আলী আহমদ তার সংগৃহীত হাতে লেখা পুঁথির একটি প্রদর্শনী করেছিলেন টাউন হল প্রাঙ্গণে।[১৪]

সম্মেলনের প্রতিদিনের অনুষ্ঠান দুই পর্বে বিভক্ত ছিল : সকালে প্রবন্ধপাঠ, কবিতা-আবৃত্তি ও বক্তৃতা; আর বিকালে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন সালাহউদ্দীন আহমদ।[১৫]

৩. সম্মেলনের প্রথম দিন : ২২ আগস্ট ১৯৫২

১৯৫২ সালের ২২ আগস্ট সকালে সম্মেলন উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান। এরপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অজিত নাথ নন্দী লিখিত ভাষণ দেন। তিনি তার ভাষণে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, এর পুনর্বিন্যাস ও সমন্বিতকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইংরাজ রাজত্বকালে অশিক্ষিত ও শিক্ষিতের ব্যবধানের ফলে যে 'ভদ্র' সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের যে সংস্কৃতি পরাধীনতার আওতায় বেড়ে উঠেছে তা পরাধীনতার অপরিহার্য বিকৃতি ও সংকীর্ণতা বহন করবেই। আত্ম-ভ্রষ্ট সমাজ-জীবন বিদেশী প্রভু শক্তির দ্বারস্থ হয়ে আত্মাবমাননার চরমে গিয়েছিল। অনুকরণ ও অনুগ্রহ-লিপ্সাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দেশের গভীরে যে প্রাণস্রোত প্রবহমাণ তার বেগ ও প্রবাহ হতে এই সঙ্কীর্ণ সংস্কৃতি নিজের নিজের কল্পিত সূচি বাঁচিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যকে অভ্রভেদী করে তুলেছিল।[১৬]

অজিত নাথ নন্দী লোকসংস্কৃতিকেই মূলত দেশের প্রাণ হিসাবে উল্লেখ করে বলেন :

> এই লোক-সংস্কৃতি যাহা প্রকৃতির কোলে লালিত-পালিত, যাহা আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রার সরল সুষমায় রমণীয়, সেই সংস্কৃতির মুমূর্ষু শক্তি ও সাধনাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই সংস্কৃতি সহজ জীবনের আত্মপ্রকাশ, ইহার উপকরণ ও প্রেরণা প্রতি দিবসের দুঃখ-সুখে চঞ্চল, সরল জীবনযাত্রা। এই জীবন মেঠো সুরে, রাখালিয়া সঙ্গীতে বাণীময় হইয়াছে। এই জীবনেরই রসবোধের তৃপ্তিসাধন করিয়াছে পল্লী আসরের জারী গান ও কবি গান। নানা অনুষ্ঠান ও উৎসব এই জীবনের রসতৃষ্ণায় তৃপ্তি আনিয়া দিয়াছে।[১৭]

www.nagorikpathagar.org

পরিশেষে তিনি বলেন যে, মূল সত্য এই যে, সংস্কৃতির বিচিত্র সৃষ্টি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এই সত্যকে পাথেয় গ্রহণ করেই আমাদের কর্তব্যে অগ্রসর হতে হবে।[১৮]

সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বাঙলা সাহিত্যে ইসলাম-পন্থী ধারা ও আধুনিক ইউরোপীয় ধারা সম্পর্কে বলেন : সত্যের খাতিরে বলিতে হয়, ইসলাম-মুখী ধারা বড়ই ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হইতেছে; যদিও আমরা মুখে ইসলাম-প্রীতি জাহির করিতেছি, কার্যতঃ তাহার যেন আশানুরূপ প্রতিফলন হইতেছে না। অপর ধারাটি তরুণ-মন আচ্ছন্ন করিয়া আছে। এমতি অবস্থায় চিরদিন যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই ঘটিবে বলিয়া আমার আশঙ্কা, তাহা হইল আদর্শসংঘাত, ফলতঃ বিপ্লব অনিবার্য্য। অনভিপ্রেত হইলেও তাহা এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। সকল দেশেই তাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।'[১৯]

রাষ্ট্রভাষা বিতর্কের প্রশ্নে তিনি বলেন, 'আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে, "বাংলা আমাদের সংস্কৃতির ভাষা হইতে পারে না। আমাদের ধর্ম, ঈমান এই ভাষায় অটুট থাকিতে পারে না।" এই প্রশ্নের কোন জবাব দেওয়া আমার কাছে লজ্জার ব্যাপার। বাদুড়ের ডানার ঝাপটায় চাঁদ কি মুখ কুণ্ঠিত করিয়া থাকে?... সংস্কৃতি ধ্বংসের অনেক পথ আছে। জনসাধারণ-বিরোধী ও সমাজ-বিরোধী গোয়ার-নীতি তার অন্যতম উপায় বটে। কিন্তু তার পরিণামফল পারস্যে আরবদের ভাগ্যের মতই হইতে বাধ্য।'[২০]

শেষে তরুণ সংস্কৃতিসেবীদের উদ্দেশে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেন : 'আমাদের সংস্কৃতি ধ্বংসের যে হীন আয়োজন নেপথ্যে চলিতেছে, তাহা ব্যর্থ করিতে পারেন কেবল আপনারাই। কারণ সংস্কৃতির নির্বাণোন্মুখ দীপ-শিখা আবার আপনারই জ্বালাইতে পারেন। একটা কথা আপনারা প্রায়ই শুনিয়া থাকেন—জীবনবোধ। কিন্তু দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছবি সম্মুখে থাকিলেই শুধু জীবনবোধ জাগ্রত হইতে পারে। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে দেশের ও মানুষের ইতিহাস জানা দরকার। এক কথায় স্বদেশ-প্রেমের মালা গাঁথিয়া গলায় পরা আবশ্যক। জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রেম ছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ নজরুল জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। আজ আপনাদের মত তরুণ হৃদয়ের সংস্পর্শে আসিয়া মৃত্যুর পূর্বে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লইয়া মরিতে পারিব আশায় আসড় দেহ-মন লইয়া, বার্দ্ধক্যের নানা উপসর্গ সঙ্গে করিয়া আমি এখানে আসিয়াছি। আমার এই বিশ্বাস আছে যে, আমার দেশের মৃত্যু নাই, আমার দেশের আত্মা যে জনগণ, তারও মৃত্যু নাই, তেমন অমর আমার এই বাঙ্গালা ভাষা।'[২১]

৪. সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন : ২৩ আগস্ট ১৯৫২

তেইশ তারিখের সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মাহবুব-উল-আলম। তিনি তার

www.nagorikpathagar.org

ভাষণে বিভাগ-পরবর্তীকালের পূর্ব বাংলার সাহিত্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। একই সঙ্গে তিনি দেশের বিপরীতমুখী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন : আমার এক একবার মনে হয়, আমরা যেন বারুদ-স্তূপের উপর বসে আছি। সাহিত্যকের দৃষ্টি দিয়ে আমি দেখতে পাই, আমরা একটা বিপ্লবের মুখে ছুটে চলেছি। এই বিপ্লবের ফল হবে দু'টো। প্রথমতঃ সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে পড়বে। তার স্থানে মাথা তুলবে নতুন নীতি, ধনসাম্যের একটা অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সেটা ইসলামিক হতে পারে, যদি সময় থাকতে আমরা সাবধান হই এবং কাজ করি। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম এবং উহার আচার স্বীকৃত হবে মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে। আমি বিশ্বাস করি, এই স্বীকৃতির মধ্যেই রয়েছে আমাদের নিরাপত্তার আভাষ।[২২]

অধিবেশনে অধ্যাপক আহমদ শরীফ 'অন্তসংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন। তিনি পাকিস্তানের তরুণদের মনে ইসলামী আদর্শ ও সাম্যবাদী আদর্শের যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিরাজমান তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, এর যথাযোগ্য সমাধানের ওপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। তিনি বলেন : আজ পাকিস্তানের মনীষীদের সুমুখে এই যে আদর্শ-সংঘাত, এই যে অন্তসংকট দেখা দিয়েছে, এর সুষ্ঠু সমাধানের উপরই ব্যক্তির, সমাজের, জাতির এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। শিল্পে সাহিত্যে সমাজে রাষ্ট্রে এই আদর্শ-সংকট মারাত্মক রূপে দেখা দিয়েছে। এ সমস্যার সমাধান ব্যতীত সমাজ-মানুষের বিশৃঙ্খলা দূর হবে না। আমাদের দিশা দেবার দায়িত্ব আমাদের চিন্তানায়কদের। সুতরাং তাদের নিষ্ক্রিয় থাকলে চলবে না। আলোর মশাল তুলে ধরতে হবে।[২৩]

৫. সম্মেলনের তৃতীয় দিন : ২৪ আগস্ট ১৯৫২

চব্বিশ তারিখের সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লার ঈশ্বর পাঠশালার শিক্ষক অবনীমোহন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'স্বাস্থ্যপ্রদ বায়ু পৃথিবীর যেদিক হইতেই আসিয়া দ্বারে আঘাত করুক, তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার শিক্ষাই আমাদের বড় শিক্ষা, নতুন দিনের সাহিত্যিকদের ইহাই কাজ। এই পথে তাহারা অগ্রসর হইয়া নব-সাহিত্য, নব-জাতি, নব-সমাজ, নব-সংস্কৃতি রচনা করুন, ইহাই কামনা।'[২৪]

চব্বিশ তারিখের অধিবেশনের বিশেষ বক্তা ছিলেন কবি জসীম উদ্দীন। সম্মেলনের সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেও অসুস্থ অবস্থাতেই বক্তৃতা দেন।[২৫] তিনি বলেন :

> আমাদের রাষ্ট্র কেবল নাজিমউদ্দীন বা নুরুল আমীনের নয়, এ রাষ্ট্র জনগণের। এ রাষ্ট্র রক্ষার দায়িত্ব তাদেরই। তাদেরকে তাদের রাষ্ট্র বুঝিয়ে দিতে হবে। সত্যিকারের স্বাধীনতা সেদিনই আসবে যেদিন আমাদের দেশের চাষী মাঝি-মাল্লা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সাহিত্য বা সঙ্গীত সৃষ্টি করবে এবং তা আদৃত হবে।[২৬]

ওইদিন বিকালের অধিবেশনের পরই সাহিত্য-আলোচনা শেষ হয়। কুমিল্লা পৌরসভার

www.nagorikpathagar.org

চেয়ারম্যান অতীন্দ্র মোহন রায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সম্মেলনে যোগদানকারী সাহিত্যিকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন : রাত্রির অন্ধকার যত গভীর হোক, অরুণোদয় ঘটবেই। আমাদের বিগত ঐতিহ্যকে স্মরণ রেখে আমাদের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে মুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও সাম্যবাদের উপর ভিত্তি করে।....ধন্যবাদ জানাই তাঁদের, যাঁরা এ কয়দিনের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, আমাদের চোখ পেছনে না— সামনে।[২৭]

তিন দিনের এই আলোচনা–অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ–কবিতা পাঠ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মৌলিক আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। সময়ের অভাবে অনেক প্রবন্ধ পাঠ করাও সম্ভব হয়নি। নিম্নলিখিত প্রবন্ধ, আলোচনা ও কবিতাগুলির কথা উল্লেখ করা যায়।[২৮]

ক. প্রবন্ধ

১. শরদিন্দু ব্যানার্জী : শিল্পীর ডাক, ২. শচীন্দ্র প্রসাদ মজুমদার : বিজ্ঞান ও ধ্বংস, ৩. ইবনে জশমতুল্লাহ : লোক সাহিত্যের কথা, ৪. রাসমোহন চক্রবর্তী : পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতি, ৫. আবদুল কুদ্দুস : ছড়ার একটা ছেঁড়া পাতা, ৬. মাহবুবুল আলম চৌধুরী : সমাজ ও সাহিত্য, ৭. সিরাজুল ইসলাম : শিল্প ও সাহিত্যে নিরপেক্ষতা, ৮. শাহাবুদ্দীন : অনুবাদ সাহিত্য; রবীন্দ্রসঙ্গীত, ৯. গোপাল বিশ্বাস : সমালোচনা সাহিত্য, ১০. সুচরিত চৌধুরী : পরিহাস, ১১. ডঃ এ বি এম হাবীবুল্লাহ : ইতিহাস, ১২. ডঃ এ এইচ দানী : Archeological Possibilities of East Bengal. ১৩. আহমদ শরীফ : তন্ত্র সংকট, ১৪. অধ্যাপক আবুল কাসেম : বিপ্লব ও বিজ্ঞান, ১৫. আ ন ম বজলুর রশীদ : পশ্চিম পাকিস্তানের লোকগাথা, ১৬. নূরুদ্দীন আহমদ : পাকিস্তানের জাতীয় মুখচ্ছবি, ১৭. বসুধা চক্রবর্তী : সংস্কৃতির সন্ধানে, ১৮. লায়লা সামাদ : সংস্কৃতি সঙ্কট, ১৯. বেগম হাশমত রশীদ : নারী প্রগতি, ২০. রওশন ইয়াজদানী : ময়মনসিংহের লোকগাথা, ২১. ফয়েজ আহমদ : পূর্ব বাংলার শিশু–সাহিত্য, ২২. আবুল খায়ের মোসলেহউদ্দীন : পূর্ববঙ্গে সাহিত্যের গতি–প্রকৃতি, ২৩. শওকত ওসমান : পূর্ববঙ্গের নাটক ও রঙ্গমঞ্চ (প্রবন্ধটি তিনি জমা দিয়েছিলেন, পড়তে পারেননি), ২৪. কামরুল হাসান : পূর্ব বাংলার চিত্র–শিল্প, ২৫. বিজন চৌধুরী : শিল্পের বিকাশ ধারা, ২৬. খালেদ চৌধুরী : ইতিহাস ও যুদ্ধ, ২৭. রুহুল আমিন নিজামী : চলচ্চিত্র শিল্প, ২৮. মিসেস জিনাত গণি : নৃত্য প্রসঙ্গে, ২৯. আবদুর রউফ : সংস্কৃতির স্বরূপ।

খ. আলোচনা

১. নাসিরউদ্দীন আহমদ : শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত, ২. সুনীল বিকাশ চক্রবর্তী : কাব্য–সাহিত্য, ৩. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্য, ৪. ফজলে লোহানী : শিক্ষা।

www.nagorikpathagar.org

গ. স্বরচিত কবিতা পাঠ

১. হাসান হাফিজুর রহমান : হে আমার দেশ, ২. তসিকুর আলম খাঁ : ভালোবাসি এই দেশকে, ৩. নেয়ামাল বশির : তোমরা ও আমরা, ৪. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ : একুশের কবিতা, ৫. সমরেন্দ্র দত্ত : কর্ণফুলী।

৬. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন বসে নজরুল সঙ্গীতের আসর। উদ্বোধন করেন মাহবুবুল আলম চৌধুরী। দ্বিতীয় দিনে আয়োজন করা হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের। সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদ বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটক মঞ্চস্থ করে। তৃতীয় দিন বসে লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীতের আসর। চট্টগ্রামের পাকিস্তান শিল্পী গোষ্ঠী চাটগাঁর আঞ্চলিক ভাষায় রচিত লোকগীতি পরিবেশন করে। বাঁশী বাজিয়ে শোনান সুচরিত চৌধুরী। সেদিন দুটি পালা গান গাওয়া হয়। নোয়াখালীর বৃদ্ধ কবিয়াল কোরবান আলী সর্দার পাকা দাঁড়িতে খেজাব লাগিয়ে ঘুঙুর পায়ে শ্লথ ধুতি পরিধান করে নাচের ভঙ্গীতে 'চৌধুরীর লড়াই' পালা পরিবেশন করেন। দর্শক-শ্রোতারা মাইকের কথা বললেই কবিয়াল প্রমাদ গুণলেন। কারণ ও জিনিসটা তিনি সহ্য করতে পারেন না। তবু মাইক আনা হলে কবিয়াল বসে পড়লেন।[২৯] এরপর চট্টগ্রামের করিয়াল রমেশ শীল 'যুদ্ধ বনাম শান্তি' পালা গাইলেন। তিনি নেন যুদ্ধের পক্ষ। আর তাঁর শিষ্য বায় গোপাল নেন শান্তির পক্ষ।[৩০] সবশেষে গৌরীপুর স্কুলের 'স্কাউট' ছেলেরা তাদের শিক্ষক মুহম্মদ ওয়াজেদ আলীর নেতৃত্বে সমবেত সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে।[৩১]

৭. শোক প্রস্তাব

সম্মেলনের গৃহীত শোক প্রস্তাবে কবি মোহিতলাল মজুমদার ও উর্দু লেখিকা রশিদ বাহারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়।

সভার দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেশের সংস্কৃতি যথা বাংলা ভাষা আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টার নিন্দা করা হয়। এরপর এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, যুদ্ধ সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। অতএব যুদ্ধ বন্ধ করা এবং শান্তির অনুকূল প্রচার চালান আবশ্যক। তাই প্রগতি শান্তি ও জীবন সৃষ্টি করার জন্য সম্মেলন বদ্ধপরিকর।[৩২]

'এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে শুধু এদেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টির' যে উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল, তা বহুলাংশে সফল হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আহমদ শরীফ লিখেছেন : 'চিত্রে গানে

www.nagorikpathagar.org

নাচে নাটকে ভাষণে বক্তৃতায় প্রবন্ধে কবিতায় এমন কি কবির লড়াইতেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। সেই সুর মানবতার সুর—গণজাগরণের সুর; সুন্দর সুস্থ জীবনের আবাহনের সুর।'৩৩

৮. উপসংহার

কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত ১৯৫২ সালের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষভাবে তাৎপর্যমন্ডিত ছিল। এই সম্মেলনেও বামপন্থীরা জড়িত ছিলেন। কিন্তু সম্মেলন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১৯৫১ সালের চট্টগ্রাম সম্মেলনের অভিজ্ঞতার আলোকে কুমিল্লা সম্মেলনে কোন ভারতীয় লেখককে উদ্যোক্তারা আমন্ত্রণ জানাননি। উদ্যোক্তারা পূর্ব বাংলায় নিজেরাই নিজেদের সাংস্কৃতিক ভাগ্য নির্মাণের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। ফলে বামপন্থীদের উদ্যোগে হলেও এই সম্মেলন দক্ষিণপন্থীদের মধ্যেও আলোড়ন তোলে।

তথ্যনির্দেশ

১. সাঈদ-উর-রহমান, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম*, পাণ্ডুলিপি, (আনিসুজ্জামান সম্পাদিত) ষষ্ঠ খন্ড, ১৩৮৩, পৃ ৯১

২. সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রচারপত্র—*আহ্বান*

৩. অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল খায়েরের সাক্ষাৎকার, উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* পৃ ৩৬

৪. মফিজুল ইসলাম এডভোকেটের সাক্ষাৎকার, উদ্ধৃত, পাণ্ডুলিপি, ষষ্ঠ খন্ড, পৃ ৯২

৫. আহমদ শরীফ, *এবারের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে,* ইসনাফ, ১২ আশ্বিন, ১৩৫৯

৬. মফিজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত

৭. আহ্বান, সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পুস্তিকা

৮. পূর্বোক্ত

৯. পূর্বোক্ত

১০. আবুল খায়ের আহমদের সাক্ষাৎকার, উদ্ধৃত, পাণ্ডুলিপি, পূর্বোক্ত

১১. মাহবুব-উল-আলম, *কুমিল্লা সাংস্কৃতিক সম্মেলন* (১৯৫২), সঙ্কট কেটে যাচ্ছে, ঢাকা, পৃ ৫-৬

১২. সাঈদ-উর রহমান, উদ্ধৃত, পাণ্ডুলিপি, পূর্বোক্ত

১৩. মাহবুব-উল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ ৯

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ ১৫

১৫. সাঈদ-উর রহমান, উদ্ধৃত, পাণ্ডুলিপি, পূর্বোক্ত

www.nagorikpathagar.org

১৬. অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ, উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান, পাণ্ডুলিপি, পূর্বোক্ত
১৭. পূর্বোক্ত
১৮. পূর্বোক্ত
১৯. মূল সভাপতির অভিভাষণ, উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান, পাণ্ডুলিপি, পূর্বোক্ত
২০. পূর্বোক্ত
২১. পূর্বোক্ত
২২. মাহবুব-উল আলম, সঙ্কট কেটে যাচ্ছে, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৭-৪৮
২৩. *ইনসাফ,* ঈদসংখ্যা, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১
২৪. মাহবুব-উল আলম, পূর্বোক্ত গ্রন্থের প্রচ্ছদ দ্রষ্টব্য
২৫. আহমদ শরীফ, *এবারের সংস্কৃতিক সম্মেলনে,* ইনসাফ, ১২ আশ্বিন, ১৩৫৯
২৬. মাহবুব-উল আলম, পূর্বোক্ত
২৭. পূর্বোক্ত
২৮. মাহবুব-উল আলম, *কুমিল্লা সাংস্কৃতিক সম্মেলনে* (১৯৫২), সঙ্কট কেটে যাচ্ছে
২৯. মাহবুব-উল-আলম, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ ৪-২৩
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ ২৩-২৪
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ ২৪
৩২. সরলানন্দ সেন, *ঢাকার চিঠি,* ১ম খন্ড (মুক্তধারা, কলকাতা, ১৯৭১) পৃ ২১৬
৩৩. আহমদ শরীফ, *এবারের সাংস্কৃতিক সম্মেলন,* ইনসাফ, ১২ আশ্বিন, ১৩৫৯

www.nagorikpathagar.org

চার ঃ ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ঢাকা ১৯৫২

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগ ১৯৫২ সালের ১৭ থেকে ২০ অক্টোবর ঢাকার কার্জন হলে 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে'র আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় :

> আমরা যদি পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে চাই, তবে প্রথমে 'ইসলামী রাষ্ট্রে'র স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা পরিষ্কার ধারণা করে নেবো। আমরা আধুনিক দুনিয়ার বিভিন্ন মতবাদ ও সমস্যাবলীর তুলনায় ইসলামকে যাচাই করে নিতে চাই। ইসলামই যে শ্রেষ্ঠতম মানব কল্যাণকর আদর্শ তা আমরা কোন গোঁজামিল না দিয়ে বুঝে নিতে এবং অন্যান্যদের বুঝিয়ে দিতে চাই।[১]
>
> তাছাড়া 'ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা দূর করা এবং ইসলামের গতিশীল ভূমিকা সুধী সমাজের সামনে তুলে ধরাও ছিল এ সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য।'[২]

২. প্রস্তুতি ও আয়োজন

চারদিনব্যাপী এই ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল : সমাজবিজ্ঞান, ইসলামী আন্দোলন, লোকসংস্কৃতি, সাহিত্য অধিবেশন ও বিচিত্রানুষ্ঠান। সম্মেলনে পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার কয়েকজন এবং সিরিয়ার একজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমান নেতাদের দাওয়াৎ করা হয়। সম্মেলন উপলক্ষে মিশরের ক্ষমতাসীন দলের নেতা হাসান আল হুদায়বি, ইন্দোনেশিয়ায় ক্ষমতাসীন দলের নেতা, ইরানের ফেদায়েনে ইসলামী পার্টি, পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মীয় নেতা মওলানা আবু আলা মওদুদী বাণী পাঠিয়েছিলেন। এছাড়া সোভিয়েট মধ্য এশিয়ায় মুসলমানদের ওপর কম্যুনিস্ট নির্যাতনের একটি বিবরণ পাঠান সেখানকার মুসলিম নেতা রুহী উইঘোর।[৩]

www.nagorikpathagar.org

৩. উদ্বোধন ও সম্মেলনের বিবরণ

সম্মেলনের মূল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১)।[৪]

সম্মেলন অনুষ্ঠানের আগে প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁকে (১৮৯৪-১৯৭৮) সভাপতি ও অধ্যাপক আবদুল গফুরকে সম্পাদক করে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিতে মাঝখানে কিছুদিন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন হেদায়েতুল ইসলাম।[৫]

সমাজবিজ্ঞান বিভাগে সভাপতিত্ব করেন করাচীর সমাজবিজ্ঞানী ডঃ মাজহারউদ্দীন সিদ্দিকী। তিনি নিজে Historical Matterialism in Islam শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৬]

ইসলামী আন্দোলন বিভাগে প্রবন্ধ পড়েন অধ্যাপক আবদুল গফুর। তার প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলন।' এতে 'ইসলামী তমদ্দুন' ও 'Political Science and Islam' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ পড়েন ডঃ হাসান জামান (১৯২৮-৮১)। তিনি তার প্রথম প্রবন্ধে ইসলামের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সংস্কৃতি পুনর্গঠনের আহবান জানান। সে বৈশিষ্ট্যগুলো হল : ইসলামের মৌলিকভাব ও নীতিবোধ মানবিক ও সর্বজনীন; এর সামাজিক ফল মঙ্গলজনক; এবং এর মধ্য থেকে পাওয়া যেতে পারে অনাবিল আনন্দ, যা সুকুমার ও মানবিক বৃত্তি বিকাশের অনুকূল।

সাহিত্য অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করেন কাজী মোতাহার হোসেন। এতে অংশগ্রহণ করেন কবি শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৫), সৈয়দ আলী আহসান ও হাসান জামান। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ছিলেন গদ্য শাখার সভাপতি।

লোকসংস্কৃতি বিভাগে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। এর শাখা সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক আবু তালেব। বিপুল জনসমাগম ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৮]

ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সাহিত্য শাখার উদ্বোধনী ভাষণ দেন কবি শাহাদাৎ হোসেন। তিনি বলেন :

> জাতি গঠনে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা কতখানি সে কথা আপনারা সবাই ভাল করে জানেন। আজকার এই সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতিতে আমাদের সাহিত্য কোন দিকে চলবে বা চলা উচিৎ-তার রূপ ও দৃষ্টিভঙ্গী কেমন হবে তার গতি কোন খাতে প্রবাহিত হবে-প্রতিভা, দূরদৃষ্টি এবং বিচক্ষণতার সমন্বয়ে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিগত ও দলগত সাহিত্য জাতির অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ন করে, একথা বোধ হয় কেউই অস্বীকার করবেন না। সেই জন্য জাতীয় সাহিত্যকে

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তি ও দলের ঊর্ধ্বে তুলে ধরে তাকে অখন্ড জাতীয় সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। সমগ্র জাতির জ্ঞান, কৃষ্টি, ধ্যান-ধারণা সেই সাহিত্যের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হবে।.....

পুরাতন ও নূতনের মধ্যে যদি কোন অবাঞ্ছিত বিরূপতা থাকে তা' হোলে তাকে সমূলে দূর করে দেওয়াই সাহিত্য ব্রতীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। পুরাতনের কাছ থেকে যেমন নূতনের, তেমনি নূতনের কাছ থেকেও পুরাতনের অনেক কিছু নেয়ার আছে। আজিকার সঙ্কট-সমস্যা-দ্বন্দ্বের দিনে এ কথাটা সব সময় আমাদের মনে রাখতে হবে। সাহিত্যের নূতন পরিস্থিতিতে নূতন অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ যারা নূতন অভিযানের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন। পুরাতনের ভূয়োদর্শনের বিপুল অভিজ্ঞতা তাদের যাত্রাপথের দিশারী হোক। পুরাতন ও নূতনের মধ্যে আবার নূতন করে সেতুবন্ধ রচিত হোক। আপনাদের কাছে এই আন্তরিক আবেদন জানিয়ে আমি আজিকার এই সাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধন করছি। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।[৯]

সম্মেলনে আবদুর রশীদ খান পড়েন 'পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক কাব্য-সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ। এতে তিনি বলেন : 'পূর্ব পাকিস্তানের বয়স মাত্র ছয় বছর হতে চলল। এই ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে সৃষ্ট কাব্য সাহিত্যকে আর যাই বলি পুরনো বলতে পারিনে। শুধু বর্তমানের সৃষ্ট হলেই আধুনিক হতে পারে না। সত্তর বছর পূর্বে সৃষ্ট জিরাউ ম্যানলী হপকিনসের ইংরাজী কাব্য আশ্চর্যরূপে আধুনিক। বর্তমান মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট কাব্য-সাহিত্য যদি বর্তমানকে গভীরভাবে নাড়া দিতে সমর্থ হয় এবং সত্যিকারের রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠে, তা হলে তাকেই আমরা আধুনিক কাব্য-সাহিত্য বলবো, তা যতো পুরনোই হোক।....বর্তমান কাব্য সাহিত্যের পটভূমি হিসাবে প্রাক-বিভাগ যুগের সৃষ্ট সাহিত্যের বিশেষত পূর্ব বাংলার অধিবাসীর সৃষ্ট কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।'

আবদুর রশীদ খান তার প্রবন্ধে বলেন :

আমাদের কাব্য-সাহিত্যের আদর্শ ও গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য বর্তমান মানুষের এবং পূর্ব পাকিস্তানী ভাবধারার সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ধারণা থাকা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

আধুনিক মন দ্বন্দ্বপীড়িত, ক্ষত-বিক্ষত। দুনিয়া জোড়া দুই অসুরের লড়াই : সাম্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। উভয়ের লক্ষ্যই শোষণ ও প্রভাব বিস্তার। শুধু নামে মাত্র তফাৎ; কিন্তু গতি ও প্রকৃতি একই। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বিরাট জনগণের আশা, ভাষা, সুখ ও সুবিধার চাবিকাঠি। তার উপর গত মহাযুদ্ধ ও তার অবশ্যম্ভাবী ফল মানব-সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। অর্থনৈতিক কাঠামো ও বহু দিন টিকিয়া থাকা ও পরীক্ষিত মূল্যজ্ঞান আজ

www.nagorikpathagar.org

ধ্বংসপ্রাপ্ত। যুদ্ধোত্তর যুগের মানুষ রুটির লড়াইয়ে পর্যুদস্ত। আদর্শের দোদুল দোলায় বিভ্রান্ত। আধুনিক মন তাই বিরাট একটা ফাঁকি। তার উপর কালোবাজার স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ধনীরা আরও বেশী ধনশালী হয়ে যাচ্ছে এবং গরীব দু'বেলা অন্নসংস্থানে পাঁজরভাঙ্গা। ...স্নায়ুযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক অচল অবস্থা মানুষকে হতাশ ও বিভ্রান্ত করে তুলেছে। আধুনিক মনের এই হতাশা ও বিভ্রান্তির প্রতিকারের উপায় আপাতত সুদূরপরাহত মনে হয়। এর প্রতিফলন দেখতে পাই আধুনিক সাহিত্যে। আধুনিক সাহিত্য তাই হতাশা আর বিভ্রান্তির করুণ আর্তনাদ।[১০]

তিনি বলেন, 'বিরাট জনগণের আশা-ভরসাকে রূপ দেবার মত মনের বল, আশাবাদ ও অভিজ্ঞতার অভাবে তাদের (আধুনিক সাহিত্যিকদের) লেখা আজ অনাদরণীয় ও উপেক্ষিত। ক্রমেই তারা জনগণের মুখপাত্রের গৌরবময় স্থান থেকে দূরে ছিটকে পড়ছে এবং তাতে সাহিত্যিক ও পাঠকের যোগসূত্র হয়েছে ছিন্ন; তা ছাড়া কিছু সংখ্যক সাহিত্যিক পুরনো মূল্যজ্ঞানের ভিত্তিতে সাহিত্য সৃষ্টি করে আধুনিক মনের কাছ থেকে পেয়েছে অবহেলা ও অনাদর। কারণ আধুনিক মন যথার্থভাবে রূপায়িত হয়নি তাদের লেখায়। এইভাবেই ফাটল ধরেছে লেখক আর পাঠকের সমবেদনা, সহানুভূতি ও সমঝোতার। সাহিত্যিকও এই দুঃখময় পরিবেশে তাই হয়ে পড়েছে আত্মকেন্দ্রিক, ফলে পাঠকেরা আরও বেশী দূরে সরে পড়েছে, আধুনিক মন তাই তাদের লেখাকে উপহাসের বস্তুই মনে করে।'[১১]

তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের উপর বর্তমান সামাজিক পরিবেশের প্রভাবও উপেক্ষার বস্তু নয়। বর্তমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক গলৎ দূর হয়েই হবে জাতীয় আদর্শের বিকাশ। পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা নব্বই (৯০) জনই কৃষিজীবী এবং শতকরা পঁচাশি (৮৫) জনই অশিক্ষিত। সুতরাং শতকরা নব্বই জনের প্রতিফলন যদি আমাদের সাহিত্যে না হয়, তা হলে সেই সাহিত্যকে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য বলে স্বীকার করতে অস্বীকার করলে অন্যায় করা হবে না বলেই ধারণা।.... মাটির কাছের মানুষেরই মাটির অভিজ্ঞতা বেশী কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সাহিত্যিকদের অধিকাংশই শহুরে। সবচেয়ে বড় অভাব তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার। তাই তাদের লেখা আমাদের মনে সাত্যিকারের স্পন্দন জাগাতে প্রায়ই ব্যর্থ হয়। সত্যিকারের সম্পর্কের কথা দূরে থাক, সত্যিকারের লেখার পটভূমির প্রতি তার উপেক্ষা ও সহানুভূতির অভাব চক্ষুকে পীড়া দেয়। এ অপ্রিয় হলেও সত্য।[১২]

আবদুর রশীদ খান বলেন, 'এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পশ্চিম বঙ্গের বাংলা সাহিত্যকে আমাদের সাহিত্য বলতে পারিনে, যেমন পারেনি আইরিশগণ ইংরেজী সাহিত্যকে নিজেদের সাহিত্য বলে স্বীকার করতে। আদর্শের ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীরই

www.nagorikpathagar.org

যে পার্থক্য। ...পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যের ধারা হবে পশ্চিম বঙ্গ বা যুক্ত বঙ্গের ধারা হতে স্বতন্ত্র। এই সাহিত্যের রূপক উপমায় থাকবে না কোন পৌত্তলিকতার ছাপ, যা আমাদের আদর্শের পরিপন্থী। আমাদের মহান ঐতিহ্য থেকে পুঁথি ও লোকসাহিত্য থেকে সংকলিত হবে আমাদের রূপক ও উপমা। উভয় বাংলা ভাষা বাংলা হলেও তাদের মধ্যে (বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানী বাংলা ভাষার মধ্যে) আসবে পরিবর্তন। আমাদের জীবন দর্শন, আমাদের বিশিষ্ট জীবন পদ্ধতি ও ঐতিহ্য এই ভাষাকে করে দেবে স্বাতন্ত্র্য, যেমন আইরিশ ও ইংরাজী সাহিত্য ইংরাজী ভাষার মাধ্যম হয়েও স্বতন্ত্র। যেমন আমেরিকার ইংরাজী ও ইংলন্ডের ইংরাজীর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।'[১৩]

তিনি বলেন, সুতরাং উপর্যুক্ত পর্যালোচনা হতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পূর্ব-পাকিস্তানী কাব্য-সাহিত্যে—

(১) জাতীয় তাহজীব ও তমদ্দুনের প্রতিফলন হবে।

(২) আমাদের সামাজিক পরিবেশ রূপ পাবে।
অগণিত কৃষক ও শ্রমজীবীই হবে আমাদের সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। তাদের হাসিকান্নার বিচিত্র লীলাই দেখাবো আমাদের সাহিত্যে।

(৩) বর্তমান গণমানুষ ও তার দুষ্কৃতকে দেখিয়ে দেয়া হবে সাহিত্যিকের কর্তব্য।

(৪) পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা হবে পশ্চিমবঙ্গের ভাষা হতে স্বতন্ত্র, উপমা-রূপক ইত্যাদি আসবে আমাদের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, পুঁথি ও লোকসাহিত্য প্রভৃতি থেকে। আমাদের দৈনন্দিত ব্যবহার্য শব্দগুলো অবাধে ঢুকবে আমাদের কাব্যে ও সাহিত্যে।[১৪]

এরপর তিনি সমসাময়িক মুসলিম কবিদের কবিতার ওপর আলোচনা করেন।

সম্মেলনে 'সমসাময়িক ইসলামিক চিন্তাধারা' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন আহমদ ফরিদউদ্দীন। প্রবন্ধে তিনি বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণের রচনা, আল্লামা ইকবাল, ডাঃ খালিফা আবুল হাকিম, আবুল হাশিম, মজহারউদ্দীন সিদ্দিকী, মৌলানা আবু আলা মওদুদী, আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী, মৌলানা আজাদ, মৌলানা আকরাম খাঁ, অধ্যাপক হাসান জামান, অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক আবুল কাশেম প্রমুখের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রয়াস পান। সেই সঙ্গে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার পরিহারের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৫]

সম্মেলনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন আব্বাসউদ্দীন আহমদ, সলিল চৌধুরী প্রমুখ।[১৬]

এই সম্মেলন সম্পর্কে দ্যুতির কার্তিক ১৩৫৯ সংখ্যায় মন্তব্য করা হয় :

> গত ১৭,১৮,১৯ ও ২০ অক্টোবর ঢাকার কার্জন হলে অভূতপূর্ব সফল্যের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক আয়োজিত "ইসলামী সাংস্কৃতিক

www.nagorikpathagar.org

সম্মেলন" হয়ে গেল। এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বিদেশ থেকে যেসব প্রতিনিধি ও মণীষীবৃন্দ যোগদান করেছিলেন তাদের মধ্যে সিরিয়ার আহমদ বিন আহমদ, লাহোরের 'তাসনীম' পত্রিকার সম্পাদক জনাব নসরুল্লাহ্ খান আজিজ, পাকিস্তানের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মজহারউদ্দীন সিদ্দিকী ও লন্ডনের ওকিং মসজিদের প্রাক্তন ইমাম জনাব আফতাবউদ্দীনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দূর দূরান্তর থেকে যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন, তাদের ছাড়াও এদেশের আনাচ কানাচ থেকে ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন অসংখ্য শিল্পী, সাহিত্যিক, কর্মী ও চিন্তাবিদ। এই সম্মেলনের চার দিবসব্যাপী অধিবেশন শুধু পাকিস্তানের নয়—প্রাচ্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ও অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন সত্যই সাংস্কৃতিক জগতে একটি সুদূরপ্রসারী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। যে আদর্শকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান আন্দোলনের সৃষ্টি, যার জন্য লক্ষ লক্ষ পাক-ভারতের আদম সন্তান মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে, তার সম্বন্ধে এমন বিজ্ঞাননির্ভর সুষ্ঠু ধারণা আর কোন অনুষ্ঠান দিতে পারেনি। অজ্ঞতা স্বার্থান্ধতা এবং পাশ্চাত্যের অন্ধানুকরণপ্রিয়তা যেভাবে আমাদের পঙ্গু করে রেখেছে, যেভাবে মানব-স্বভাব-ধর্ম ইসলামকে বিকৃতভাবে পরিবেশন করে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ধূম্রজালের সৃষ্টি করা হয়েছে, তার বিদূরণের জন্য এমন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

অতীতে অনেক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। প্রায় সবটাতেই দেখেছি সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির চাইতে ধনীদের ও পদপ্রার্থীদের প্রদর্শনীর মহড়া। অর্থব্যয়ের আড়ম্বর চাঞ্চল্য এবং হৃদয়ের চাইতে মস্তিষ্কের বাড়াবাড়ি। আর এই সম্মেলন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে কিভাবে এক দল দরিদ্র নিঃস্বার্থ কর্মী দিনরাত পদ-আরাম-আয়াস হারাম করে সর্বনিম্ন ব্যয়ে একটা বিরাট সাফল্যের অধিকারী হতে পারে।

চারদিন ব্যাপী এতগুলি শাখা এতগুলি অধিবেশন অন্য কোন সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সাহিত্য, লোক সংস্কৃতি-সমাজবিজ্ঞান, ইসলামী আন্দোলন, মহিলা অধিবেশন, প্রকাশ্য সম্মেলন, প্রতিনিধি সম্মেলন, কর্মী সম্মেলন, মফস্বলের কবি, জারী, বাউল, গাজী প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির অপূর্ব অনুষ্ঠান ও প্রায় প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত একই সময়ে একাধিক অধিবেশন সত্যি অপূর্ব। এর অভিভাষণগুলিও অপূর্ব এবং অসাধারণ। প্রায় ৪০টি অভিভাষণের মধ্যে যে ২০টি অভিভাষণ ছাপা হয়েছে দু একটি বাদ দিলে তার সব কটিই মননশীলতায়, যুক্তিবিজ্ঞানে ও

www.nagorikpathagar.org

সমস্যা সমাধানের ইংগিতে সম্পদশালী। যেন তেন প্রকারের অভিভাষণ দিয়ে নাম জাহির করার প্রচলিত রেওয়াজ এর একটিতেও নেই। সর্ব প্রকারের মিথ্যা আবর্জনা দূরীভূত করে আমাদের বর্তমান বিভ্রান্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্ত করে একটি সুষ্ঠু সুন্দর ও মহৎ পথ প্রদর্শনের মহান ব্রতই অনুষ্ঠান ও অভিভাষণগুলির প্রতিটি ধাপে ও ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা এই মহান সম্মেলনের কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয়ে বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করে এ রকম সুষ্ঠু সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যতবেশী হয়, ততই আমাদের জন্য মঙ্গল।[১৭]

তবে দ্যুতি ও সমসাময়িক অন্যান্য পত্র-পত্রিকা অনুসন্ধান করে সম্মেলনে পঠিত অন্যান্য প্রবন্ধের বিবরণ পাওয়া যায়নি।

৪. প্রস্তাব

সম্মেলন শেষে গৃহীত প্রস্তাবে বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ও যুদ্ধবিরোধী তৃতীয় ব্লক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দেয়া হয়। তাছাড়া পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ ও মনপ্রীতি বৃদ্ধি করার জন্য 'ইসলামিক কালচারাল কনফারেন্স' নামের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করা, দেশী-বিদেশী সকল প্রকার অশ্লীল যৌন প্রচার-পত্রিকাকে পাকিস্তানে বেআইনী ঘোষণা করা, পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে দেশ শাসন করার জন্য সরকারের নিন্দা করা হয়।[১৮]

৫. মন্তব্য

সম্মেলন সম্পর্কে তৎকালে মুসলিম লীগ নিয়ন্ত্রিত দৈনিক সংবাদ ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিলেটের মাহমুদ আলীর পত্রিকা 'সাপ্তাহিক নওবেলালে' বিরূপ মন্তব্য করা হয়। নওবেলালের ৬ নবেম্বর ১৯৫২ সংখ্যা এই সম্মেলনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মন্তব্য করা হয়। তাতে বলা হয়, 'এই সম্মেলনের উদ্যোক্তারা ইসলামের নামের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে।'[১৯]

সম্মেলনকে তৎকালে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নিজেদের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাদের প্রতি বিরূপ বলে মনে করে।[২০] ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন সম্পর্কে প্রগতিশীল সম্পাদকেরা প্রচার করতে থাকে যে, 'সম্মেলনের রাষ্ট্রবিরোধী প্রচার করা হয়েছে, সলিল চৌধুরীর গান গাওয়া হয়েছে, তমদ্দুন মজলিসের কর্মীরা ছদ্মবেশী কম্যুনিস্ট।'[২১]

www.nagorikpathagar.org

৬. উপসংহার

এই সম্মেলনে ইসলামী ভাবধারা প্রচারিত হলেও এই সম্মেলনে পূর্ব বাংলার ভাষা-সাহিত্যর ও সংস্কৃতির নিজস্বতার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. *ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন* (পুস্তিকা), সম্মেলন উপলক্ষ্যে অক্টোবরে ('৫২) মজলিস কর্তৃক প্রচারিত। পৃ ৯-১০
২. অধ্যাপক আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার, ২৭ এপ্রিল, ১৯৯২
৩. অধ্যাপক আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার, ঐ
৪. সাপ্তাহিক সৈনিক, ২১ নবেম্বর, ১৯৫২
৫. অধ্যাপক আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার
৬. পূর্বোক্ত
৭. সাপ্তাহিক সৈনিক, ৭ নবেম্বর, ১৯৫২
৮. অধ্যাপক আবদুল গফুর, ঐ
৯. দ্যুতি, ১০-১১ সংখ্যা, ১৩৬০ বাং
১০. দ্যুতি, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯
১১. পূর্বোক্ত
১২. পূর্বোক্ত
১৩. পূর্বোক্ত
১৪. পূর্বোক্ত
১৫. পূর্বোক্ত
১৬. পূর্বোক্ত
১৭. মাসিক দ্যুতি, সম্পাদক ওবায়েদ আশকার, কার্তিক, ১৩৫৯
১৮. সৈনিক, ৭ নবেম্বর, ১৯৫২
১৯. সাপ্তাহিক নওবেলাল, ৬ নবেম্বর, ১৯৫২/সৈনিক, ২১ নবেম্বর, ১৯৫২
২০. অধ্যাপক আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার
২১. সৈনিক-এ উদ্ধৃত, ২১ নবেম্বর, ১৯৫২

www.nagorikpathagar.org

পাঁচ. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা ১৯৫৪

১. পটভূমি

১৯৫৩ সালের শেষ দিকে নবেম্বরে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী জোট 'যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হলে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি কর্মীরাও ঐক্যবদ্ধভাবে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগী হন। কয়েকবার তারিখ পরিবর্তন হওয়ার পর ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১] তার আগে মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা উদ্যোগী হয়ে এর আয়োজন করে। তাঁদের ১০৮ জন এক 'আবেদনপত্রে' সম্মেলনের যে মূলনীতি ঘোষণা করেন তা ছিল ঃ 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য পূর্ববাংলার শিল্পী সাহিত্যিকদের ব্যাপকতম ঐক্য'। তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন 'জাতীয় প্রগতি, বিশ্বশান্তি, দেশ-মানবের হিতার্থে সৃষ্টিক্ষমতাকে নিয়োজিত করা। বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে প্রবহমান ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সকল রকম বিকৃতি, কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত সকল প্রকার বৈরিভাবের বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শকে সাহিত্যের উপজীব্য করা',[২] প্রভৃতি।

এই সম্মেলন প্রথমে ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ এপ্রিল ১৯৫৪ হবার কথা থাকলেও পরে তা একদিন সম্প্রসারণ করা হয়। অর্থাৎ সম্মেলন চলে ২৩শে এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল ১৯৫৪ পর্যন্ত পাঁচ দিন।[৩]

এর আগে ৩ এপ্রিল ১৯৫৪ এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

২. প্রস্তুতি

সম্মেলনের কর্মসূচী সম্পর্কে ২২ এপ্রিল ১৯৫৪ দৈনিক আজাদে নিম্নরূপ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ঃ

'পূর্ব্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সামতির যুগ্ম সম্পাদক জনাব আবু

www.nagorikpathagar.org

জাফর শামসুদ্দীন ও আবদুল গণি হাজারী জানাইতেছেন যে, আগামী ২৩, ২৪, ২৫ এবং ২৬ শে এপ্রিল কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন এবং ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ মূল সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন। ইহাতে পূর্ব্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা হইতে চারি শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করিবেন। পঞ্চাশ জনের অধিক মহিলা প্রতিনিধিও সম্মেলনে যোগদান করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

'২২শে এপ্রিল হইতে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সমাগত প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য ঢাকা স্টেশনে পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছাসেবক থাকিবেন। পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধিদের থাকার ও খাওয়ার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

'সাধারণ প্রতিনিধিদের চাঁদা ২ টাকা এবং যাহারা সম্মেলনের খরচে থাকিবেন ও যাইবেন তাহাদের জন্য ৫ টাকা চাঁদা ধার্য্য হইয়াছে।

'সম্মেলনের চূড়ান্ত কর্মসূচী নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

'২৩শে এপ্রিল সকাল ৮।।. টা হইতে দুপুর ১২।।. টা

'উদ্বোধন, মূল সভাপতির ভাষণ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ, যুগ্ম সম্পাদকের রিপোর্ট, চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন এবং পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

'ঐ দিন বিকাল ৩টা হইতে ৫টা কথাসাহিত্য ও কাব্য সাহিত্য শাখার অধিবেশন, সভাপতি যথাক্রমে জনাব আবুল ফজল ও জনাব আবদুল কাদির।

'ঐ দিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। লোকসঙ্গীত, শকুন্তলা নৃত্যনাট্য, একাংকিকা।

'২৪শে এপ্রিল সকাল ৮।।. টা হইতে ১২।।. টা (ক) লোকসাহিত্য শাখা ও শিশু সাহিত্য শাখার অধিবেশন। সভাপতি মিঃ রমেশ শীল ও জনাব বন্দে আলী মিঞা।

'ঐ দিন ৩টা হইতে ৫ টা—

'মনন সাহিত্য শাখা—সভাপতি জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন। ঐদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সঙ্গীতানুষ্ঠান, গণসঙ্গীত, দুঃখীর ঈমান অভিনয়।

'২৫শে এপ্রিল সকাল ৮।।. টা হইতে ১২।।. টা—ভাষা ও সাহিত্য শাখা এবং বিজ্ঞান শাখা। সভাপতি যথাক্রমে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই এবং ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা।

'অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৫।।. টা—

'চারু ও কারুশিল্প শাখা এবং সমসাময়িক শিল্প ও সাহিত্য—সভাপতি যথাক্রমে জনাব জয়নুল আবেদীন ও ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন। ঐদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ নবজীবনের (গান?) নাটক অভিনয়।

'২৬শে এপ্রিল সকাল ৮।।. টা হইতে ১০।।. টা—আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা—সভাপতি জনাব আবুল মনসুর আহমদ।

www.nagorikpathagar.org

'১১ টা হইতে ১২ টা—

'প্রতিনিধি সম্মেলন, রিপোর্ট পাঠ ও প্রস্তাব গ্রহণ।

'ঐদিন অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৫টা—প্রতিনিধি সম্মেলন, প্রবন্ধাদি পাঠ।

৫।।. টা হইতে ৭টা—

'বাহির হইতে আগত প্রতিনিধিদের সহিত যুক্ত আলোচনা সভা—কবর নাটিকা অভিনয় ঢাকা নাট্য (?)।'

২১ এপ্রিল আবদুল হক 'পূর্ববঙ্গ সাহিত্য পরিষদ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেন: 'আগামী সাহিত্য সম্মেলন ভাবী কালে যেন একটা নিছক সাময়িক খেয়াল বা উদ্যম হিসেবে বিবেচিত না হয়, এই আমরা চাই। বাংলা বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর পূর্ব্ব বাংলার সাহিত্যিক সমাজ মূল সাহিত্য ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, কিন্তু তারা নিজেরাও কোন নির্দিষ্ট ধারাকে রূপ দিতে পারেননি। অন্ততঃ উল্লেখযোগ্যভাবে পারেননি। পূর্ব্ব বাংলা একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা লাভ করেছে, তার নিজস্ব অনেক সমস্যা আছে এবং নতুন রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিতে এখানে নতুন নতুন সমস্যা জন্ম হচ্ছে; এই পরিপ্রেক্ষিতে তাকে নিজস্ব সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে; বাংলা সাহিত্যে তার গৌরবময় অবদানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

জনাব আবদুল হক তার প্রবন্ধে সাহিত্য সম্মেলনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রতি বছর এ ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠান, সারা প্রদেশ ভিত্তিতে একটি সাহিত্য সংগঠন যার নাম হতে পারে 'পূর্ববঙ্গ সাহিত্য পরিষদ গঠন'; এবং পরিষদের একটি মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের সুপারিশ করে বলেন, 'নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং নিজের বৃদ্ধির জন্য অন্য সকলেই চেষ্টা করে, সকলেই নিজের চারপাশে একটা অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলে। সাহিত্যিকরাও একই কাজটি করবেন না কেন? অনুকূল পরিবেশ অনেকখানি গড়ে উঠেছে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, কিন্তু সাহিত্যিকের জন্য জনসাধারণের মধ্যে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ জাগ্রত করতে না পারলে এবং সাহিত্য সৃষ্টি করতে না পারলে দেশ সমাজ কিছুই পাবে না।'[৪]

তিনি সাহিত্যিকদের বিচ্ছিন্নতা দূর করার ওপরও জোর দেন। এই সম্মেলন অনুষ্ঠানে সরকারের তরফ থেকেও সহযোগিতা করা হয়েছিল। দৈনিক আজাদ-এ দেখা যায়, 'পূর্ব্ববঙ্গে শিক্ষা সচিব জনাব সৈয়দ আজিজুল হক পূর্ব্ব বঙ্গের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন 'বর্ধমান হাউসকে' আসন্ন সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে বর্ধমান হাউসে একটি সাহিত্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইতেছে।'[৫]

২৩ এপ্রিল '৫৪-এর খবরে বলা হয়:[৬]

'অদ্য শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটায় ঢাকার কার্জন হলে চারদিনব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন আরম্ভ হইবে। সম্মেলনে মূল সভাপতির আসনগ্রহণ করিবেন ডঃ আবদুল

www.nagorikpathagar.org

গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন। পাকিস্তান ও ভারতের বহু খ্যাতনামা উর্দু ও বাংলা সাহিত্যিক এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন।

'অদ্য রাত্রি ১০ টা ৫ মিনিটে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র হইতে বাংলায় সম্মেলনের বিবরণী প্রচার করা হইবে।

'সাংস্কৃতিক ও প্রতিনিধি সম্মেলনের জন্য এক টাকা ফি লাগিবে।

'গতকাল মঙ্গলবার অভ্যর্থনা সমিতির এক জরুরী বৈঠকে প্রাদেশিক শিক্ষা সচিব সৈয়দ আজিজুল হককে সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

'জগন্নাথ কলেজ ও ইডেন কলেজে যথাক্রমে সম্মেলনের পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধিদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।'

৩. প্রথম দিনের অধিবেশন : ২৩ এপ্রিল, ১৯৫৪

২৩ এপ্রিল ১৯৫৪ বিপুল সমারোহে সম্মেলন শুরু হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে দৈনিক আজাদ-এ বলা হয়, 'গত একমাস কাল ধরিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের যে প্রস্তুতি চলিতেছিল এবং দেশের সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী যে সম্মেলনের প্রতীক্ষায় ছিলেন, গতকল্য (শুক্রবার) কার্জ্জন হলে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে তাহার চার দিবস ব্যাপী অধিবেশন শুরু হয়। প্রদেশের বিভিন্ন জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গ হইতে মহিলাসহ প্রায় পাঁচ শত প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং সভাপতিত্ব করেন ডঃ আবদুর গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ। জনাব আবদুল্ লতিফ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' গান গাহিয়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

'সকাল ৯ টায় কার্জ্জন হলে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। তাহার বহু পূর্বেই বিভিন্ন স্থান হইতে আগত প্রতিনিধি ও দর্শকে হল ভরিয়া যায়। সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও সাহিত্য সম্মেলনকে রূপ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কবি ও সাহিত্যিকদের এত বড় সমাবেশ প্রদেশে আর হয় নাই বলিলে চলে। প্রদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে পাঁচ শত প্রতিনিধি ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গ হইতে কাজী আবদুল ওদুদ, মনোজ বসু, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধীরেন্দ্রনাথ রায় সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে সব চাইতে বেশী সংখ্যক প্রতিনিধি যোগদান করেন চট্টগ্রাম জেলা হইতে। বঙ্গোপসাগরের বারিবিধৌত ও পাহাড়ঘেরা চট্টগ্রাম হইতেই প্রায় দুই শত প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং ইহাদের মধ্যে প্রায় কুড়ি জন মহিলা রহিয়াছেন।

'সম্মেলনে উপস্থিত না হইতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, রাজশাহী

www.nagorikpathagar.org

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর জনাব এ এইচ জুবেরী, ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রমথ নাথ বিশী, প্রবোধকুমার সান্যাল, অন্নদাশঙ্কর রায়, হীরেন্দ্রনাথ সেন, সুচিত্রা মিত্র, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

'দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব শওকত ওসমান, জনাব মুনীর চৌধুরী, ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন ও বক্তৃতা করেন পল্লীকবি জসিমুদ্দীন।'

'রাত পৌনে আটটায় কার্জন হলে অধ্যাপক অজিত গুহের সভাপতিত্বে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। "একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি" গানটির দ্বারা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। বাংলা ভাষার গানে অংশগ্রহণ করেন আবদুল লতিফ ও তার সঙ্গীরা এবং চিরঞ্জীব শর্মার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের শিল্পীরা। গণসঙ্গীতের আসরে অংশগ্রহণ করেন ঢাকার অগ্রণী শিল্পী সংঘ, শেখ লুৎফর রহমান, চট্টগ্রামের প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ ও মলয় ঘোষ দস্তিদার।

'ইহা ছাড়া প্রান্তিক নবনার্ট্য সংঘ 'শিল্পীর নবজন্ম' নামক নৃত্য প্রদর্শন করেন।'[৭]

সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন :

> ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট বহু দিনের গোলামীর পর যখন আজাদীর সুপ্রভাত হল, তখন প্রাণে আশা জেগেছিল যে, এখন স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বাংলা সাহিত্য তার সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পাবে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে বড় আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম স্বাধীনতার নতুন নেশায় আমাদের মতিভ্রম করে দিয়েছে। আরবী হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবী পারসী শব্দের অবাধ আমদানী, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি আকুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিক পেয়ে বসল। তারা এইসব মাতলামিতে এমন মেতে গেলেন যে, প্রকৃত সাহিত্য সেবা, যাতে দেশ ও দশের মঙ্গল হতে পারে, তার পথে আবর্জ্জনার স্তূপ দিয়ে সাহিত্যের উন্নতির পথ রুদ্ধ করেই খুশীতে ভূষিত হলেন না, বরং খাঁটি সাহিত্যসেবীদিগকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও বিপদগ্রস্ত করতে আদা জল খেয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। তাতে কতক উচ্চতর সরকারী কর্মচারী উস্কানি দিতে কসুর করলেন না। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, এবং অন্যান্য পশ্চিম বঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা এমন কি বাঙ্গালী নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে থাকলেন। কেউ বা এতে মিলিত বঙ্গের ভূতের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে দিলেন এবং

www.nagorikpathagar.org

বেজায় হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন। করাচীর তাঁবেদার গত লীগ গবর্নমেন্ট বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কিছু করা দূরে থাক, বাঙ্গালী বালকের কচি মাথায় উর্দুর বোঝা চাপিয়ে দিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আরবী হরফে বাংলা ভাষা লেখা এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টায় সহযোগিতা করেছেন। এইরূপ বিষাক্ত আবহাওয়ায়ই ১৯৪৮ সালের পরে আর কোন সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন সম্ভবপর হয়নি। আজ জনপ্রিয় পূর্ব বাংলার গবর্নমেন্টের আশ্রয়ে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছি।[৮]

উর্দুকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মেনে নেয়াকে তিনি পূর্ববঙ্গবাসীদের উদারতা হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, 'যারা জবরদস্তিক্রমে সমস্ত পাকিস্তানের উপর কোন একটি ভাষা চাপিয়ে দিতে চায় তারাই পাকিস্তানের দুশমন, তারাই পাকিস্তান ধ্বংস করছে।'[৯]

রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সুখের বিষয়, মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির কিঞ্চিত সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তারা উর্দু ও বাংলা উভয়কেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, যদিও অন্য কতকগুলি ভাষার বিষয় তারা বিবেচনা করতে স্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার আসনে আসীন দেখলেই আমরা চরিতার্থ হব না, যদি না সেই সঙ্গে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিকেও না পাই। তার জন্য সর্ব প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে পূর্ব্ব বঙ্গের সমস্ত সাহিত্যিকের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং সাহিত্যের উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনের জন্য একটি সুপরিকল্পিত পন্থা নির্দেশ করা। এজন্য এরূপ সাহিত্য সম্মেলনের আজ বিশেষ গুরুত্ব দাঁড়িয়েছে। আশা করি সমবেত সাহিক্যিকগণ এ বিষয়ে অবহিত হবেন। ... আমরা আশা চাই, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায় একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি যার পরিচালনাধীনে প্রতি বৎসরে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনীর অধিবেশন হবে। যাতে সাহিত্যিকরা আমাদের সাহিত্যিক উন্নতির পন্থা নির্ধারণ ও ভাবের আদান প্রদানে সমর্থ হবেন। এই জন্য একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি স্থাপন বা গ্রহণের কথাও এই সম্মেলনে প্রতিনিধিবর্গ বিবেচনা করবেন, এই আশা করি। ঘরে ঘরে সাহিত্য সভা মন্দ কথা নয়, কিন্তু চাই একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি, যার নিজস্ব কার্যালয় থাকবে আর মুখপত্র থাকবে। আমরা অবিভক্ত পরাধীন বঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি স্থাপন করেছিলুম। এখন স্বাধীন পূর্ব্ববঙ্গে কি একটি উন্নততর কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি স্থাপন করতে পারব না?'[১০]

এরপর তিনি সকল পর্যায়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সম্মেলনের মূল সভাপতি ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ তার ভাষণে বলেন, 'আজ জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হইয়া এখানে নতুন ও পুরাতন সাহিত্যিকদের যে অপূর্ব সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে আমার মনে কিরূপ আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না।'[১১]

www.nagorikpathagar.org

বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমাদের অতীত ভাঙ্গিয়াছে, বর্তমান নাই, ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। ইংরেজ আমলে জাতি সর্ব্বদিক হইতে পিছাইয়া পড়িয়াছে'। সে রকম সময়ে মুসলমান সাহিত্যিকরা যে প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করেছেন, তার উল্লেখ করে সেই সময়ের সাহিত্যিকদের অবদানের কথা সশ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মীর মশাররফ হোসেন, শেখ আবদুর রহিম, মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, মুনশী শেখ আবদুর রহিম, রেয়াজউদ্দীন আহমদ মশহাদী, মুনশী মেহেরউল্লাহ, কবি মোজাম্মেল হক, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, কায়কোবাদ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রমুখ লেখক-সাহিত্যিকের কথা স্মরণ করেন।[১২]

তিনি দুঃখ করে বলেন :

> নানা পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে পুরাতন ও নতুন সাহিত্যিকদের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। প্রাচীন সাহিত্যিকদের অনেকেরই গ্রন্থাদি আর প্রকাশিত হইতেছে না। ইহার ফলে স্বভাবতই তাহাদের অক্ষয় কীর্তি বিস্তৃতির অতল গহ্বরে তলাইয়া যাইতেছে। ... বাস্তবিক পক্ষেই এই অবস্থা অতি দুঃখজনক। যাহারা আমাদের বর্তমান অবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, বর্তমান তাহাদিগকে কিছু দেয় নাই, ভবিষ্যৎও কি তাই বলিয়া সেই অবদানের স্বীকৃতি দিবে না? ... জাতির মধ্যে ইহাদের স্মৃতি জাগরুক রাখিবার ব্যবস্থা করা আমাদের পরম কর্তব্য।[১৩]

বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে নতুন ও পুরাতনের সম্মিলনীর ওপর বিশেষ জোর দেন।[১৪]

তিনি নারী সমাজে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করার জন্যও আহ্বান জানান।[১৫]

৪. দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন : ২৪ এপ্রিল ১৯৫৪

প্রথম অধিবেশন বসে সকাল সাড়ে আটটায়। লোকসাহিত্য শাখার এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কবিয়াল রমেশ শীল, আর শিশু সাহিত্য শাখায় সভাপতিত্ব করেন বন্দে আলী মিঞা। বক্তৃতা করেন অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন, প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ, আলাউদ্দীন আল আজাদ, হাবীবুর রহমান ও হোসনে আরা। এই দিন পাঁচজন উরদু কবি পাঞ্জুরাস শফি, আজগর আলী, রেজা পারভেজ, আহসান আহমদ আশক (১৯১৮-১৯৯৩) ও পারভেজ শাহিদী সম্মেলনে যোগদান করেন। তাদের মোশায়েরা অনুষ্ঠিত হয়। কবি পারভেজ শাহিদী বাঙ্গালী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি কবিতার উর্দু অনুবাদ পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে আবদুল লতিফ ও শেখ লুৎফর রহমান সঙ্গীত পরিবেশন করেন।[১৬]

বেলা তিনটায় দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। মনন সাহিত্য শাখার সভাপতি আবুল কালাম শামসুদ্দীন সম্মেলনে উপস্থিত হতে না পারায় এই শাখার সভাপতিত্ব করেন মুনীর চৌধুরী।

www.nagorikpathagar.org

সম্মেলনে জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীনের অভিভাষণ পড়ে শোনানো হয়। প্রবন্ধ পড়েন অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক নজমুল করিম ও কবীর চৌধুরী।[১৭]

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের অভিভাষণে বলা হয় :

> জীবনের গতিধারা ও তাহার বিকাশের রূপায়ণই হইতেছে সাহিত্যের বিষয়বস্তু।...সাহিত্য ক্ষেত্রে অনুভূতি ও মননশীলতার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। অনুভূতিহীন মননশীল সাহিত্য নিরস, আবার মননের সম্পর্কহীন অনুভূতি-প্রধান সাহিত্য নিতান্তই পানসে।...এর কোনোটাই সত্যকার সাহিত্য পদবাচ্য নয়। কারণ রসের উৎস অনুভূতি। এই উৎস থেকে নিসৃত রসধারা উপযুক্ত পরিবেশনের পাত্র হচ্ছে মনন। তাই অনুভূতি ও রসের মত মননও সাহিত্যে অপরিহার্য।[১৮]

'বিভাগ পূর্ব্বকালীন বাংলা ও পূর্ব্ববাংলার সাহিত্য সম্মেলনের পটভূমি' বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন যে, 'এখানকার সাহিত্য সমাজ যে হাল ছাড়িয়া দেন নাই, তাহার প্রমাণ এই সাহিত্য সম্মেলন। সব দল মত ও পথের সাহিত্যামোদীদের লইয়া এই সাহিত্যানুষ্ঠান হইতে পারিয়াছে, ইহাতেই স্বাভাবিকভাবে মনে হয় যে, আমাদের সাহিত্যের দুর্যোগ সম্ভবত কাটিয়া যাইতেছে।'[১৯]

রাত সাড়ে আটটায় জনাব মোহাম্মদ বরকতউল্লাহর সভাপতিত্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। মওলানা ভাসানী তার ভাষণে বলেন, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছাড়া কোন জাতি বাঁচিতে পারে না। আমাদের এই সম্মেলন জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিবে।' তিনি সমষ্টিগতভাবে সাহিত্য আন্দোলন করার জন্য সাহিত্যিকদের প্রতি আবেদন জানান।[২০]

অনুষ্ঠানের শুরুতে মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ বেগম সালেহা মাহমুদ কর্তৃক ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকীর নিকট লিখিত একটি পত্র পাঠ করা হয়। সরকার মরহুম সাহিত্যবিশারদকে মাসিক যে ২০ টাকা বৃত্তি দিতেন, তা 'বৃদ্ধ সাহিত্যিক ও অনুসন্ধানবিশারদ ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকীকে' দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। এই সভায় ডঃ সিদ্দিকীকে মাল্যভূষিত করা হয়। মালার সহিত মোট ২১ টাকার নোট ও একটি ফাউন্টেন পেন গাঁথা ছিল।[২১]

৫. তৃতীয় দিনের অধিবেশন : ২৫ এপ্রিল ১৯৫৪

যথারীতি সকাল সাড়ে আটটায় অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনে ভাষা ও সাহিত্য শাখা এবং বিজ্ঞান শাখায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও ডঃ কুদরত-ই-খুদা।

এই অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর বিরুদ্ধে "স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল কর্তৃক

www.nagorikpathagar.org

জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার অপচেষ্টার" প্রতিবাদ জানানো হয় ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের নিন্দা করা হয়। প্রস্তাবে পাকিস্তানের দুই অংশের সংহতি রক্ষার জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানানো হয়।[২২]

অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এই সম্মেলনে চার শ' টাকার বই পাঠিয়েছে।[২৩]

ডক্টর কুদরত-ই-খুদা তার ভাষণে বলেন, 'বাংলার এই গণজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা মাতৃভাষাকে বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ দিয়া পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।'[২৪]

বিজ্ঞানের জন্য সাহিত্য রচনার সহজ উপায় হিসাবে তিনি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ধারায় বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করেন।[২৫]

অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেন আবু জাফর শামসুদ্দীন, ডাঃ শচীন্দ্র মোহন মিত্র, আবদুল্লাহ্ আল মুতী, বেগম মেহের কবির। অধ্যাপক কাজী দীন মুহম্মদের অনুপস্থিতিতে তার প্রবন্ধ পাঠ করেন আনিসুজ্জামান।[২৬]

বিকালের অধিবেশনে চারু ও কারুশিল্প শাখায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদীন। প্রবন্ধ পড়েন শফিকুল হোসেন, কামরুল হাসান ও নাজির আহমদ।[২৭]

এই অধিবেশনে সমসাময়িক শিল্প ও সাহিত্য শাখায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন শামসুর রাহমান, আতোয়ার রহমান, কলিম শরাফী, ফয়েজ আহমদ ও অধ্যাপক হানিফ দউফ।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কার্জন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। বেগম সুফিয়া কামালের অনুপস্থিতিতে সভানেত্রীত্ব করেন বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ। প্রথমেই নজরুল গীতির আসরে অংশ নেন আবদুল লতিফ, শেখ লুৎফর রহমান, আতিকুল ইসলাম, শেখ মোহিতুল হক, মোখলেসুর রহমান ও মাহবুবা হাসনাত। এরপর 'নবজীবনের গান' পরিবেশন করে চট্টগ্রামের প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ। অনুষ্ঠানে 'ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা' নামক একটি ছায়ানাট্য পেশ করে চট্টগ্রামের লোক সংস্কৃতি পরিষদ। এতে 'লবণের দুর্মূল্য, খুলনার দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও প্রদেশের গত সাধারণ নির্ব্বাচনের দৃশ্য দেখানো হয়।'[২৮]

এরপর খান বাহাদুর আমিনুল হক লিখিত পূর্ণাঙ্গ নাটক 'কাফের' মঞ্চস্থ হয়। পরিচালনা করেন ফজলুর রহমান ও লায়লা সামাদ।[২৯]

২৬ এপ্রিল '৫৪ দৈনিক আজাদ জানায়, "সম্মেলন অদ্য সোমবার শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু উহা আর একদিন বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। মঙ্গলবার সম্মেলনের শেষ অধিবেশন হইবে। সম্মেলনের শেষ দুই দিনের সূচীতেও কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে।'[৩০]

www.nagorikpathagar.org

৬. চতুর্থ দিনের অদিবেশন : ২৬ এপ্রিল ১৯৫৪

এই দিনের অধিবেশন শুরু হয় সকাল সাড়ে আটটায়। 'আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা' শাখার অধিবেশনে সভাপতি করেন আবুল মনসুর আহমদ।

অধিবেশনে 'সাম্প্রতিক সাহিত্যের বাজারবাদ (?)' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন সিরাজুল ইসলাম, 'সাম্প্রতিক নাট্য আন্দেলন' সম্পর্কে বাহাউদ্দীন আহমদ এবং 'সাহিত্য ও মহিলা সমাজ' সম্পর্কে লায়লা সামাদ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সভাপতি আবুল মনসুর আহমদ তার বক্তৃতায় বলেন : "ভালমন্দ লইয়াই কালচার। ইহার কারণ হইতেছে, কালচার জীবনের প্রতিচ্ছবি। ভালমন্দ, সুখদুঃখ, আলোছায়া লইয়াই মানুষের জীবন। তাহার জীবনের প্রতিচ্ছবি কালচারও ভালমন্দেরই সংমিশ্রণ। এইখানেই কালচার ধর্ম্ম ও সভ্যতা হইতেও পৃথক জিনিস। ধর্ম্ম ও সভ্যতা ফরমাইসী হইতে পারে না। ইহা একটি বোধ। কালচারের জন্ম আছে, বৃদ্ধি আছে, এবং মৃত্যু আছে। ধর্ম্ম ও সভ্যতার সেই হিসাবে এবং সেই ধরনের গ্রোথও নাই, মৃত্যুও নাই। ইতিহাসে আমরা যাহাকে ধর্ম্ম ও সভ্যতার মৃত্যু বলিয়া থাকি, তাহা আসলে কালচারের মৃত্যু।"[৩১]

তিনি বলেন :

সামন্ততন্ত্রের দোসর যাহাতে জনতার গলায় আবার শিকল পরাইয়া সর্ব্বজনীন কালচার গড়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে, আপনারা, বাংলার চিন্তানায়করা, লেখক ও শিল্পীরা যদি সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখেন, আপনাদের মনীষা ও সাধনা যদি এই গণআজাদীর কার্য্যে নিয়োগ করেন, তাহা হইলেই দেখিবেন, আপনারা পূর্ব্ব পাকিস্তানে স্বাধীন ও শোষণহীন সামাজ এবং সুন্দর, শুভ্র, নির্মল, সফল ও শক্তিশালী কালচার গড়িয়া তুলিয়াছেন।[৩২]

বেলা তিনটায় শুরু হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। সম্মেলনের মূল সভাপতি ডঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ সভাপতিত্ব করেন।

এতে জেলা প্রতিনিধিরা পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জেলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। সম্মেলনে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

'পূর্ব্ব বঙ্গের বিভিন্ন জেলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দেলন' সম্পর্কে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রতিবছর একটি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি—ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক—ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ—অধ্যক্ষ আবদুর রহমান খান। এ ছাড়া সাতজন সহসভাপতি ও ৩০ জন সদস্য নিয়ে "পূর্ব্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন পরিচালনা সমিতি" গঠন করা হয়।[৩৩]

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শওকত ওসমান।

অনুষ্ঠানে মেঘনাদবধ কাব্যের একটি দৃশ্য পরিবেশন করেন ঢাকা সংস্কৃতি সংসদের

www.nagorikpathagar.org

শিল্পীরা। পরিচালনা করেন শরফুল আলম। দু'টি কবিতা পড়েন পশ্চিম বঙ্গের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে অংশ নেন ফরিদা বারী মল্লিক, সনজীদা খাতুন, হরি পাল, বিলকীস নাসিরুদ্দীন, মালেকা আজিজ। পরিচালনা করেন কলিম শরাফী। 'কবর' একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ করে ঢাকা সংস্কৃতি সংসদ।৩৪

চট্টগ্রামের প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ কয়েকটি গণসঙ্গীত পরিবেশন করে। চট্টগ্রামের লোকনৃত্য পরিবেশন করেন নৃত্যানন্দ দত্ত ও শঙ্কর দাশগুপ্ত। চট্টগ্রাম নবনাট্য সংঘ এর পর পরিবেশন করে গীতিনকশা 'আর যুদ্ধ নয়' ও একাংকিকা 'অরুণোদয়ের পথে'।[৩৫]

৭. পঞ্চম দিনের অধিবেশন : ২৭ এপ্রিল ১৯৫৪

সম্মেলনের মূল সভাপতি ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে সকাল সাড়ে আটটায় বসে সম্মেলনের পঞ্চম ও শেষ অধিবেশন। তাতে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যিকরা মুক্ত বৈঠক করেন।

বৈঠকে বক্তৃতা করেন মনোজ বসু, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারানী দেবী। স্বরচিত কবিতা পড়েন নরেন্দ্র দেব। "পশ্চিম বঙ্গের কবিতা সৃষ্টি ও তাহার সমস্যা" সম্পর্কে আলোচনা করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'দর্শন ও বিজ্ঞানের সমস্যা ও তাহার সমাধান' সম্পর্কে আলোচনা করেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়া দেরাদুনের প্রতিনিধি রঘুনাথন সম্মেলন অনুষ্ঠানে সন্তোষ প্রকাশ করে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন।[৩৬]

মনোজ বসু পূর্ব বঙ্গের আতিথেয়তার প্রশংসা করে বলেন, 'আমরা এখান হইতে খালি হাতে ফিরিয়া যাইব না। এখানে আসিয়া সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি তাহাই লইয়া পশ্চিম বঙ্গে ফিরিয়া যাইব।'[৩৭]

তিনি বলেন যে, এখানকার মৃত্তিকাকে তিনি তীর্থস্থান বলিয়া মনে করেন। শহীদদের রক্তাক্ত মাটিকে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।[৩৮]

বেলা তিনটায় পুনরায় অধিবেশন বসে।

রাত সাড়ে আটটায় ফেডারেশন ময়দানে কবিয়াল রমেশ শীল ও তার দলের কবি-গান হয়।

৮. প্রতিক্রিয়া

মোটামুটি সফলভাবেই এই সম্মেলন সমাপ্ত হয়। কিন্তু সম্মেলন শুরুর পর থেকেই এই সম্মেলন ও তার বক্তব্য, এর 'সর্বদলীয়' চরিত্র, ভারত থেকে লেখকদের দাওয়াত দেওয়া, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এমন কি প্রগতিশীল লেখকদেরও না ডাকা, পূর্ব-বাংলার খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিকদের, বিশেষত যারা ইসলামী ও পাকিস্তানী মনোভাবাপন্ন ছিলেন, তাদের আমন্ত্রণ না জানানো নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়, তেমনি সমালোচনা হয় এই

www.nagorikpathagar.org

সম্মেলনে সঙ্গীতানুষ্ঠানে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতাদি স্থান না দেওয়ায়।

এ সম্পর্কে পরে আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন :

> ১৯৫৪ সালে ঢাকার কার্জন হলে বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের এক অধিবেশন হয়। তাতে আমাকে মনন সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচন করা হয়। যাঁরা এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন, খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারা গেল, তাদের অধিকাংশই ছিলেন 'বাংলা সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য' নীতির পরিপোষক এবং পাক-বাংলা সাহিত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি দানের বিরোধী। তাছাড়া একথাও শোনা গেল, 'বাংলা সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য' এই নীতির জয় ঘোষণার জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা না কি পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন প্রবীণ ও তরুণ সাহিত্যিককেও আমন্ত্রণ করেছেন। যাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তাদের মতামত আগে থেকেই আমার জানা ছিল। তারা শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবিভাজ্যতা নয়, বাংলাদেশের অবিভাজ্যতা সম্পর্কেও দৃঢ়মত পোষণ করতেন।[৩৯]

পরবর্তীকালে অন্যদের বক্তব্যেও এর সমর্থন মেলে।

সম্মেলনের শুরুর দিনই ২৩-০৪-১৯৫৪ তারিখে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মোহাম্মদ হোসেন খসরু, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, আবদুল আহাদ, আব্দুল হালিম চৌধুরী, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, খাদেম হোসেন খান ও বেদারউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে এর উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, সম্মেলনে "হয়তো কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠী প্রাধান্যের চেহারা ঢাকা দেওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের সর্ব্বদলীয় কথাটার ঢাক এমন অস্বাভাবিকভাবে পিটাতে হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহের যে সূচী আমাদের নজরে পড়েছে, তাতে পূর্ব্ব বাংলার ছাপ নাই বললেও চলে।"[৪০]

সঙ্গীতানুষ্ঠান সম্পর্কে তারা বলেন, 'দেশের সত্যিকারের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলনে যদি সেই দেশের অকৃত্রিম প্রাণের সুর ধ্বনিত না হয়, তা হলে সে সম্মেলনকে বিশেষ দলের বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অথবা একেবারেই উদ্দেশ্যহীন ভূঁইফোড় বলা ছাড়া গতি কি?' তারা সঙ্গীতানুষ্ঠানে জারী, মুরশিদী, মারফতী, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া না রাখার সমালোচনা করে বলেন, পূর্ব বাংলার এইসব সঙ্গীতের জন্য দুনিয়ার যে কোন জাতি গর্ব বোধ করতে পারে।[৪১]

অনুষ্ঠানে দেশের প্রধান প্রধান শিল্পীদের আমন্ত্রণ না জানানোর বিষয়ে প্রশ্ন তুলে তারা বলেন, যে দু এক শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তাদের সঙ্গেও সম্মেলনের উদ্যোক্তারা অশোভন আচরণ করে বলেছেন, "যেখানে বাইরের অমুক অমুক শিল্পীরা আসছেন সেখানে গান গাইতে সুযোগ পাওয়াই সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করা উচিত।"[৪২]

www.nagorikpathagar.org

তারা বলেন, 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলন হিসাবে বর্তমান সম্মেলনকে আমরা মেনে নিতে পারি না। কাজেই এ সম্মেলনের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্কেরও এই সঙ্গে আমরা পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করছি।"[৪৩]

২৫ এপ্রিল (১৯৫৪) কবি ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, আশকার ইবনে শাইখ, আবদুর রশীদ খান, আবদুল হাই মাশরেকী ও নূরুননাহার এক বিবৃতিতে এই সম্মেলনকে "সর্ব্বদলীয় নয়" বলে অভিহিত করেন। তারা বলেন, 'প্রদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতীয় বোধ, ঐতিহ্য ও আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে পরিষ্কার মতবিরোধ কারও অজানা নয়। এ নিয়ে অদূর অতীতে প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডাও চরম আকারে দেখা দিয়েছিল। এর অব্যবহিত পরেই সর্ব্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে বলে রটনা করা হয় এবং উদ্যোক্তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় কয়েকজন প্রবীণ সাহিত্যিকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। প্রধান সাহিত্যিকদের অনেকেই তাদের স্বভাব-সারল্য ও প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনবহিততার জন্য উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হয়ে যান'।[৪৪]

তারা বলেন, 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ক্ষেত্রে নবীন মহলের যে অংশ পাকিস্তান-ভাবাদর্শের প্রতি মনে প্রাণে বিদ্বিষ্ট, তারা নানান ছদ্মবেশে এদেশের শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিকল্প ও বিজাতীয় আদর্শে প্রভাবিত করার অপচেষ্টায় মত্ত।' আর সে কারণেই তারা এই সম্মেলনের সঙ্গে সহযোগিতা থেকে বিরত হয়েছেন। তারা 'সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই অশুভ অনুপ্রবেশের বিপদ' সম্পর্কে জনসাধারণকে সজাগ করে তোলার আহবান জানান।[৪৫]

২৭ এপ্রিলের 'আজাদ' পত্রিকায় তিনটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠি তিনটি লেখেন ইসলামী কালচারাল এসোসিয়েশনের সভাপতি মফিজউদ্দীন আহমদ, আব্দুল জলিল ও মোহাম্মদ রইসউদ্দীন। চিঠির নিচে কোন ঠিকানা নেই। এসব চিঠি সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়বস্তু, ইসলামের 'ভুল ব্যাখ্যা' ও ডঃ শহীদুল্লাহর বক্তৃতার সমালোচনা করা হয়।

২৮ এপ্রিল কবি জসীমউদ্দীন এক বিবৃতিতে বলেন, 'সর্ব্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনে ৪ দিনব্যাপী যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখলাম কোন সাহিত্য সম্মেলনেই এমন দেখিনি।' সাময়িক সাহিত্য শাখার অধিবেশনে পরস্পরের প্রতি 'কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি' হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এই শাখাটি না থাকলেই ভাল হত।'[৪৬]

কবি জসীমউদ্দীন বলেন, 'যে প্রতিভার প্রদীপ্ত আগুনে সাহিত্যের জন্ম, তাকে ফুটিয়ে তুলতে এখানে বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি। এখানে যেসব গান গীত হয়েছে, তারও অনেকগুলি উদ্দেশ্যমূলক। হয়ত তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু নিছক আমাদের 'যে মানুষের প্রাণের গান, তারও প্রচুর সমাবেশ থাকা উচিত ছিল। কবি গানের সঙ্গে জারী, মারফতী, মুরশিদী প্রভৃতি গানের অনুষ্ঠান হওয়া উচিত ছিল।'[৪৭]

www.nagorikpathagar.org

ওই দিন একজন 'নিরপেক্ষ দর্শক' আলীমউল্ল্যা চৌধুরী সম্মেলন উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সাতজন সঙ্গীত শিল্পীর বিবৃতির সমালোচনা করেন।[৪৮]

একই দিন সিরাজুর রহমান এক চিঠিতে 'সম্মেলনে সাহিত্যে অশ্লীলতা, একদেশদর্শী, গোষ্ঠীপ্রীতিমূলক সমালোচনা এবং প্রবীণ সাহিত্যিকদের প্রতি আপত্তিকর মন্তব্যে'র বিরোধিতা করেন।[৪৯]

বিশিষ্ট কথাশিল্পী শাহেদ আলী ২৮ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন যে, সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বহুবার দেখা হওয়া সত্ত্বেও কেউ তাকে পত্র মারফত বা মৌখিকভাবেও আমন্ত্রণ জানাননি—একথা তিনি শওকত ওসমানকে বলেছেন।[৫০]

তিনি বলেন, 'ভারতীয় হিন্দুরা যে এককালে মুসলমানদিগকে 'ম্লেচ্ছ যবন' বলিয়া গালি দিত, পূর্ব পাকিস্তানের অতি প্রগতিশীল 'সাংস্কৃতিজীবীরা' ঠিক তেমনি যেন পাকিস্তান যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাকেই 'বিশেষ কোন এক মতবাদের সংস্কৃতি বলিয়া ব্রাহ্মণদের মত নাক সিঁটকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।'[৫১]

শাহেদ আলী বলেন, সম্মেলনে গঠিত পূর্ব্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন পরিচালক সমিতিতে সদস্য হিসাবে তার নাম দেওয়া হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা না করেই। এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।[৫২]

২৮ এপ্রিলই পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান এক বিবৃতিতে বলেন, 'এই সমিতিতে যারা সদস্য হিসাবে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে, তাদের অধিকাংশ সদস্য বিশেষ একটি দলভুক্ত। (তা হল পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ)। তাই ওই কেন্দ্রীয় কমিটিকে তারা 'সর্ব্বদলীয় বলে গ্রহণ করতে অপারগ' বলে জানান।[৫৩]

৩ মে এক বিবৃতিতে আবুল কালাম শামসুদ্দীন ওই সমিতির সদস্য থাকতে তার অপারগতা প্রকাশ করেন। [৫৪]

৪ মে অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু তালিব এক বিবৃতিতে সমিতির সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই বলে জানান। তিনি সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করলেও এর কার্যকলাপের সমালোচনা করেন।[৫৫]

৯ মার্চ ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী এক বিবৃতিতে সম্মেলনের সাফল্যের উল্লেখ করে কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মেলনে প্রদত্ত কূট মন্তব্যের সমালোচনা করেন।[৫৬]

৯. উপসংহার

সম্মেলনকে মোটামুটিভাবে সফল বলা গেলেও এর উদ্যোক্তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। যাঁরা পাকিস্তানী সংস্কৃতি ও সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাইতেন তাদের সঙ্গে যারা বাঙালীর কিংবা পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র সংস্কৃতি চাইতেন তাঁদের বিরোধের প্রকাশ ঘটে এই সম্মেলনে। ফলে এই সম্মেলন পরবর্তীকালে সমাজে কোন প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়। সে

www.nagorikpathagar.org

সময় ফররুখ আহমদের মত কবি, শাহেদ আলীর মত কথাশিল্পী এবং আব্বাস উদ্দীনের মত গায়কদের বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্য-সঙ্গীত সম্মেলন অভাবনীয় ছিল। এদের বাদ দিয়ে সম্মেলনের আয়োজন করে উদ্যোক্তারা সঙ্কীর্ণতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। সম্মেলনে গঠিত 'পূর্ব্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন পরিচালনা সমিতি' থেকে একে একে অনেক সাহিত্যিক তাদের সম্পর্কচ্ছেদ করলে এটা যে মহল বিশেষের স্বার্থপ্রণোদিত ছিল, তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এছাড়া এই সম্মেলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নবগঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার। সে সরকারের প্রধান ছিলেন এ কে ফজলুল হক। তিনি অখণ্ড বাংলার পক্ষে ছিলেন। সে মত তিনি অস্পষ্ট রাখেননি। ১৯৫৪ সালের ৩ মে কলকাতায় তাকে প্রদত্ত সংবর্ধনার জবাবে জনাব ফজলুল হক বলেছিলেন :

> একটি দেশের রাজনৈতিক বিভাগে আমি বিশ্বাস করি না। প্রকৃত পক্ষে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান—এই দুইটি বিভেদাত্মক শব্দের সঙ্গে আমি এখন পর্যন্ত সুপরিচিত হতে পারিনি।...যারা আমার এই সোনার দেশকে দু'ভাগ করেছে, তারা দেশের দুশ্মন। আমার মতে পাকিস্তান বলতে কিছুই বোঝায় না। এই শব্দটি বিভ্রান্তি সূচনা করবার ও স্বার্থ সিদ্ধির একটি পন্থা মাত্র।[৫৭]

তৎকালে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পশ্চিম পাকিস্তানী শাসনের বিরোধী অনেক বুদ্ধিজীবীও এই মতের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন না। ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সহযোগিতায় আয়োজিত এই সম্মেলনের প্রভাব পরবর্তীকালে স্থায়িত্ব পায়নি।

তথ্যনির্দেশ

১. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব-বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৬, পৃ ৩৮

২. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৯

৩. দৈনিক আজাদ, ২৭-০৪-১৯৫৪

৪. দৈনিক আজাদ, ২১-০৪-১৯৫৪

৫. দৈনিক আজাদ, ২২-০৪-১৯৫৪

৬. দৈনিক আজাদ, ২৩-০৪-১৯৫৪

৭. দৈনিক আজাদ, ২৪-০৪-১৯৫৪

৮. দৈনিক আজাদ, ২৪-০৪-১৯৫৪

www.nagorikpathagar.org

৯. পূর্বোক্ত

১০. পূর্বোক্ত

১১. পূর্বোক্ত

১২. পূর্বোক্ত

১৩. পূর্বোক্ত

১৪. পূর্বোক্ত

১৫. পূর্বোক্ত

১৬. দৈনিক আজাদ, ২৫-০৪-১৯৫৪

১৭. পূর্বোক্ত

১৮. দৈনিক আজাদ, ২৭-০৪-১৯৫৪

১৯. দৈনিক আজাদ, ২৫-০৪-১৯৫৪

২০. পূর্বোক্ত

২১. পূর্বোক্ত

২২. দৈনিক আজাদ, ২৬-০৪-১৯৫৪

২৩. পূর্বোক্ত

২৪. পূর্বোক্ত

২৫. পূর্বোক্ত

২৬. পূর্বোক্ত

২৭. পূর্বোক্ত

২৮. পূর্বোক্ত

২৯. পূর্বোক্ত

৩০. পূর্বোক্ত

৩১. দৈনিক আজাদ, ২৭-০৪-১৯৫৪

৩২. দৈনিক আজাদ, ২৭-০৪-১৯৫৪

৩৩. পূর্বোক্ত

৩৪. পূর্বোক্ত

৩৫. পূর্বোক্ত

৩৬. দৈনিক আজাদ, ২৮-০৪-১৯৫৪

৩৭. পূর্বোক্ত

৩৮. পূর্বোক্ত

৩৯. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি* (খোশরোজ কিতাব মহল, ২য় সংস্করণ,' ৮৫) পৃ ২৭৫

www.nagorikpathagar.org

৪০. দৈনিক আজাদ, ২৪-০৪-১৯৫৪
৪১. পূর্বোক্ত
৪২. পূর্বোক্ত
৪৩. পূর্বোক্ত
৪৪. দৈনিক আজাদ, ২৬-০৪-১৯৫৪
৪৫. পূর্বোক্ত
৪৬. দৈনিক আজাদ, ২৯-০৪-১৯৫৪
৪৭. পূর্বোক্ত
৪৮. পূর্বোক্ত
৪৯. দৈনিক আজাদ, ২৮-০৪-১৯৫৪
৫০. দৈনিক আজাদ, ২৯-০৪-১৯৫৪
৫১. দৈনিক আজাদ, ২৯-০৪-১৯৫৪
৫২. পূর্বোক্ত
৫৩. পূর্বোক্ত
৫৪. দৈনিক আজাদ, ০৪-০৫-১৯৫৪
৫৫. দৈনিক আজাদ, ০৫-০৫-১৯৫৪
৫৬. দৈনিক আজাদ, ১০-০৫-১৯৫৪
৫৭. অমিতাভ গুপ্ত, বাংলাদেশ (কলকাতা, ১৩৭৮), পৃ ৫৪

www.nagorikpathagar.org

ছয়. কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, টাঙ্গাইল ১৯৫৭

১. পটভূমি

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন বসে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে। তখন পাকিস্তানের কেন্দ্রে ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ সরকার। সে সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। এই সরকার (আওয়ামী লীগ) গঠিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। তার আগে ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্ব বাঙলায় 'যুক্তফ্রন্ট' নামে রাজনৈতিক দলসমূহের যে জোট গঠিত হয়েছিল, ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তার দুর্বলতা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পেতে থাকে। ৯২-ক ধারা জারির পরে যুক্তফ্রন্ট আর অটুট থাকেনি।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন সে সময় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। 'সংগঠনের সভাপতি-কর্তৃক নিজের দলেরই ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের অনুসৃত নীতি ও কার্যকলাপের বিরোধিতা ও সমালোচনার উদ্দেশ্যে এ ছিল এক বিরল আয়োজন।'[১]

২. প্রস্তুতি

সম্মেলন দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগে ছিল কাউন্সিল অধিবেশন—৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী। অপরভাগে ছিল সাংস্কৃতিক সম্মেলন ৮, ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭)। এই কাউন্সিল অধিবেশন পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাতে সোহ্‌রাওয়ার্দী সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতির তীব্র সমালোচনা হয়েছিল তাঁরই দল আওয়ামী লীগের ভেতর থেকে।

এই সম্মেলনের ৮-১০ ফেব্রুয়ারী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালার নাম দেয়া হয়েছিল 'পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন।' সাংস্কৃতিক সচেতনতার ব্যাপারে মওলানা ভাসানী ছিলেন অবিসংবাদী নেতা। 'মওলানা ভাসানীই ছিলেন পূর্ববাংলার একমাত্র নেতা, যিনি সংস্কৃতিকে

www.nagorikpathagar.org

রাজনীতি থেকে আলাদা করে দেখেননি। আমৃত্যু তিনি শিক্ষার ও সংস্কৃতির অগ্রগতির জন্য ভেবেছেন এবং সাধ্যমত কাজ করেছেন। সেই আসাম-যুগ থেকেই তিনি তার রাজনৈতিক সভা ও কৃষক সম্মেলনের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত রাখতেন নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এমনকি তার আয়োজিত ধর্মীয় সভাগুলোতেও অনেক সময় গান-বাজনার ব্যবস্থা রাখতেন। সারা জীবন তিনি তার জনসভাগুলোতে প্রায়ই আমন্ত্রণ জানাতেন দেশের ভাবুক ও চিন্তকদের ভাষণ দেবার জন্য। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল যুগপৎ উচ্চ শিক্ষিত নাগরিক, সংস্কৃতিসেবীদের এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লেখক-শিল্পীদের।'[২]

সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রায় শতাধিক সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীকে দাওয়াত দেওয়া হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর লোককে আমন্ত্রণ জানানো হয় অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে। কাগমারীতে যাওয়ার জন্য হ্রাসকৃত ভাড়ায় বাসের ব্যবস্থা করা হয়। অতিথিদের বিছানাপত্র ও মশারি সঙ্গে নিতে বলা হয়। সম্মেলনের পক্ষ থেকে খাওয়া-দাওয়া ও বাসস্থানের আয়োজন করা হয়।[৩]

সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পর্কে আবু জাফর শামসুদ্দীন তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন :

> আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ এবং তার ফল স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাংস্কৃতিক (দার্শনিকও বটে) ভিত-ভূমি নির্মাণের তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার অন্যতম।
>
> জাতি মাত্রেরই সংস্কৃতি আছে। বাঙ্গালি জাতি একটি সুপ্রাচীন যৌথ সংস্কৃতির অধিকারী। এ সংস্কৃতিতে আদিবাসী, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় ও বর্ণের বিশিষ্ট অবদান আছে। বাঙালি জাতির যৌথ উদ্যমে ও আয়োজনে শত শত বৎসরব্যাপী গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে সৃজিত বাঙালীর আলাদা জাতীয় সত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করে কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন। সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী উদ্যোগে আয়োজিত এবং অনুষ্ঠিত কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন বাংলাদেশে প্রথম আর্ন্তজাতিক সাংস্কৃতিক-কাম-রাজনৈতিক সম্মেলনের রূপ পরিগ্রহ করে।[৪]

তিনি লিখেছেন : '১৯৫৬ সালের শেষ দিকে, সম্ভবত ডিসেম্বর মাসের কোন এক সময়ে পরলোকগত ইয়ার মোহাম্মদ খান সাহেবের কারকুনবাড়ী লেনের বাড়ীতে অবস্থানরত মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী একদিন আমাদের কয়েকজনকে লক্ষ্য করে বললেন, কাগমারীতে একটা বড় রকমের সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন কর। প্রস্তাবের সঙ্গে তিনি একটি ছোটখাটো বক্তৃতাও দিলেন। কাগমারী তখন মওলানা সাহেবের স্থায়ী আস্তানা। মওলানা সাহেব কর্তৃক কয়েক বৎসর পূর্বে বাহাদুরাবাদ ঘাটে আয়োজিত কৃষক সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম। কীভাবে তাঁর আয়োজিত সম্মেলনের ব্যয় নির্বাহ হয়, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল। তাই তার বাসস্থানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের খরচাপাতি সম্বন্ধে

www.nagorikpathagar.org

আমরা কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিনি। আমরা শুধু বললাম, একটি কমিটির মত কিছু থাকা আবশ্যক। ঠিক সেদিনই কিনা মনে নেই, তবে দু'চার দিনের মধ্যেই মওলানা সাহেব নিজেই একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে দিলেন।'[৫]

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মনোনীত প্রস্তুতি কমিটির সদস্যবৃন্দ ছিলেন : ১। ইয়ার মোহাম্মদ খান, ২। কাজী মোহাম্মদ ইদরিশ, ৩। ফকীর শাহাবুদ্দীন আহমদ, ৪। খায়রুল কবির, ৫। খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, ৬। সদরি ইসপাহানি, ৭। আবু জাফর শামসুদ্দিন। তখন উপস্থিত সবাই মিলে মওলানা ভাসানীকে প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানালে তিনি সম্মত হন এবং কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি আবু জাফর শামসুদ্দিনকে প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক নিযুক্ত করেন। ইয়ার মোহাম্মদ খান ও সদরি ইসপাহানিকে যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ করা হয়। প্রস্তুতি কমিটি প্রথমে ৪৯ নং নরেন্দ্র বসাক লেন, ঢাকায় তার অফিস স্থাপন করে। পরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে একটি বাড়ীর দোতলা কক্ষে প্রস্তুতি কমিটির অফিস স্থানান্তরিত হয়। কমিটি ১৯৫৭ সালের ৮-১০ ফেব্রুয়ারী তারিখে কাগমারীতে সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৬]

আবু জাফর শামসুদ্দিন লিখেছেন, সম্মেলনটিকে একটি আন্তর্জাতিক রূপ দেবার জন্য দূতাবাসের মাধ্যমে চিঠিপত্র লিখে, টেলিফোন-টেলিগ্রাম করে দেশ-বিদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের দাওয়াত করা হয়। প্রস্তুতি কমিটির সদস্যরা ছাড়াও অসংখ্য প্রগতিশীল তরুণ কর্মী সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কঠোর প্ররিশ্রম করেন।

কাগমারীর পথে মির্জাপুর থেকে সম্মেলন কেন্দ্র পর্যন্ত ১৩ মাইল রাস্তায় ৫১ টি সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মনীষীদের স্মরণে এসব তোরণ নির্মাণ করা হয়। এ সম্পর্কে কমিউনিস্ট নেতা নূরুল হক চৌধুরী (কমরেড মেহেদী) লিখেছেন :

> আমি ডেলিগেট হিসাবে সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম। টাঙ্গাইল ঢুকেই দেখি হযরত মোহাম্মদ তোরণ। তারপর তোরণ আর তোরণ। গান্ধী তোরণ, মওলানা মোহাম্মদ আলী তোরণ, নজরুল তোরণ, ইকবাল তোরণ, নেতাজী সুভাষ বসু তোরণ, হাজী শরিয়ত তোরণ, তীতুমীর তোরণ, নেহেরু তোরণ, হাজী মোহাম্মদ মহসীন তোরণ, সি আর দাস তোরণ, লেনিন তোরণ, স্ট্যালিন তোরণ, মাও সেতুং তোরণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রণ, শেলী, হালী, রুমী, ইমাম আবু হানিফা, গাজ্জালী তোরণ। টাঙ্গাইল থেকে সন্তোষ পর্যন্ত মোট ৫১টি তোরণ। সর্বশেষ ও সর্ব প্রথম তোরণ ছিল কায়েদ-ই-আযম তোরণ। সন্তোষ পৌঁছে দেখি এলাহী কাণ্ড। মনে হল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী সাময়িকভাবে সন্তোষে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।[৭]

সম্মেলন পথে আরও যাদের নামে তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল, তারা হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন, জর্জ ওয়াশিংটন, ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল, শেকসপীয়র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ।[৮]

www.nagorikpathagar.org

সম্মেলনে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা ছাড়াও যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মিশর ও ভারত থেকে প্রতিনিধি দল যোগ দেন। সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন সেখানকার শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবির (বাংলার কাব্য-খ্যাত)। ভারত থেকে অন্যান্যের মধ্যে এসেছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রবোধকুমার স্যান্যাল, রাধারানী দেবী, মিসেস সুফিয়া ওয়াদিয়া প্রমুখ। মিসরের প্রতিনিধিত্ব করেন ডঃ হাসান হাবাসী। কানাডা থেকে আসেন ডঃ চার্লস জে. অ্যাডামস। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসেন ডেভিড গার্থ, বৃটেন থেকে ডঃ এফ এইচ কওসন।[৯]

৩. প্রথম অধিবেশনে : ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন তথা পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) বিকাল ৩ টায়। সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। মওলানা ভাসানীকে মহামানব হিসাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘দেশের রাজনৈতিক দুর্যোগের দিনে তিনি (ভাসানী) আমাদের গণতন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, আজ তিনিই আবার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নবজীবন দান করতে এগিয়ে এসেছেন।’[১০]

সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন মওলানা ভাসানী। তিনি তার ভাষণে বলেন, পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ও পৃথিবীর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সমঝোতার ভাব সৃষ্টিই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। তিনি এদেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের কারণগুলো খুঁজে বের করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১১]

সভাপতির ভাষণে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন দেশে দেশে বিরাজিত আপাতবিরুদ্ধ সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করেন এবং সেই অন্তর্নিহিত ঐক্যের ভিত্তিতে সর্বজনীন সংস্কৃতি নির্মাণের আহ্বান জানান।[১২]

৪. পরবর্তী অধিবেশন : ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারী তিনটি বড় অধিবেশন বসে। এই দু'দিনের সম্মেলনের দিন ভিত্তিক বিবরণ পাওয়া যায়নি। সম্মেলনে কয়েকজন অংশগ্রহণকারী এবং তাদের বক্তৃতা ও আলোচনার বিষয় ছিল ঃ (১) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : *পাকিস্তানের ভাষা প্রসঙ্গে*; (২) ডক্টর কুদরত-ই-খুদা : *পূর্ব পাকিস্তানের রাসায়নিক শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি*; (৩) ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব*; (৪) ডক্টর মাহমুদ

www.nagorikpathagar.org

হোসেন : *On the Concept of Islamic Culture;* (৫) ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব : *পূর্ব পাকিস্তানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব;* (৬) ডক্টর আখলাকুর রহমান : *Thoughts on the Financial Aspect of the Development of Agricuture in Pakistan;* (৭) অধ্যক্ষ ওসমান গণি : *পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম*; (৮) শওকত ওসমান : *আধুনিক বাংলা সাহিত্য;* (৯) ডক্টর মুহম্মদ ওসমান গণি : *বিকল্প খাদ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা ও পন্থা;* (১০) আবদুল হাকিম : *পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা;* (১১) ডক্টর নূরুল ইসলাম : *পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা;* (১২) বিএম আব্বাস এটি : *সেচ ব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ;* (১৩) ডাঃ শামসুদ্দীন আহমদ : *On Heart Disease;* (১৪) ডাঃ এম এ নন্দী : *পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের ভূমিকা;* (১৫) ডেভিড গার্থ (যুক্তরাষ্ট্র) : *On the cultural Life of USA;* (১৬) চার্লস অ্যাডামস (কানাডা) : *On Iqbal;* (১৭) ডঃ এফ এইচ কওসন (যুক্তরাজ্য) : *On the Cultural Life of Great Britain;* (১৮) জাপানী প্রতিনিধি : *On the Cultural Life of Japan;* (১৯) অধ্যাপক হুমায়ূন কবির : *ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন;* (২০) ডঃ হাসান হাবাসী (মিশর) : *The Renouned Historian of the Fifteenth Century Muslim World : On Ibn-Hazar Al Askalani;* (২১) অধ্যাপক মওলানা আবদুল কাদির (পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়) : *পশতু সাহিত্য প্রসঙ্গে;* (২২) ম্যাডাম আজুরী (করাচী) : *নৃত্যশিল্প প্রসঙ্গে;* (২৩) ডঃ হেদায়েতউল্লাহ : *উন্নত ধরনের কৃষির জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবহার;* (২৪) ডঃ এম এন হুদা : *পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।* এছাড়া খ্যাতনামা পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ও তৎকালে ঢাকা জাদুঘরের কিউরেটর ডঃ আহমদ হাসান দানীর সম্মেলনে প্রবন্ধ পড়ার বিষয় ছিল *On Historical Relics of East Pakistan;* কিন্তু ঢাকায় ৬–৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ তারিখে নিখিল পাকিস্তান ইতিহাস সম্মেলন ও জাদুঘর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেননি।[১৩]

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। এতে অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলির মধ্যে ছিল ইয়ুথ লীগ, চট্টগ্রামের দল, ঢাকার কল্লোল, করাচীর আজারী দল, ফরিদপুরের কাঞ্চন যাত্রা, কুষ্টিয়ার লালন শাহ'র দল, রংপুরের ভাওয়াইয়া দল। ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দীন আহমদ ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ। তাছাড়া নওশের আলী ও শেরপুর সম্প্রদায়ের জারীগান, রমেশ শীল ও ছড়া সম্প্রদায়ের ছড়া ও কবিগানও ছিল উল্লেখযোগ্য। একই সঙ্গে চলেছিল রাম দা ও লাঠিখেলাও। পাম্মাপাড়ের ঢালার চর থেকে মজিবর সরদারের নেতৃত্বে আগত লাঠিয়াল দল হাজার হাজার দর্শককে মুগ্ধ করেছিল।[১৪]

এছাড়া সম্মেলনে নানা রকম কুটির শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের একটি সুন্দর প্রদর্শনীও খোলা হয়েছিল।[১৫] সম্মেলনে ভারতীয় দল পথের পাঁচালি ও আমেরিকান দল Cow Boy চলচ্চিত্র

www.nagorikpathagar.org

প্রদর্শন করে। মার্কিন দল *Hungery Fights for Freedom* দেখাতে চাইলে প্রতিবাদের মুখে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। (দৈনিক সংবাদ, ১০-২-৫৭)।

৫. বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার শুভেচ্ছা বার্তা

সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আসতে না পেরে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করে ও সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর কাছে তারবার্তা ও পত্র পাঠান।[১৬]

করাচীর সোভিয়েট দূতাবাসের কালচারাল সেক্রেটারী মিঃ মোরগুনভ তারবার্তায় জানান :

> Due to delay of your final reply to our enquiry and shortage of time caused it was impossible to send Russian Cultural Delegation. Many thanks for your invitation. We wish Pakistan Cultural Conference great success and looking forward for promotion Pakistan Soviet Cultural relations. Regards.

পিকিং থেকে ২৮ জানুয়ারী (১৯৫৭) ভাসানীর কাছে আসে আর এক তারবার্তা। তাতে বলা হয় :

> On occasion of convocation of East Pakistan Cultural Conference I on behalf of Chinese Peoples Association for Cultural Relations with Foreign Countries render warm congratulation to you and all representatives present at conference. We wish success to conference and further developments to cultural interflow between China-Pakistan.
>
> -Chu Tu-nan, President.

করাচীর চীনা দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ চ্যাঙকো ৩১শে জানুয়ারী (১৯৫৭) মওলানা ভাসানীর কাছে এক চিঠিতে মিঃ চু তু-নানের বার্তার উল্লেখ করে জানান :

> Due to the shortage of time, neither the Chinese cultural organisation nor the Embassy is able to send delegates or observers to take part in your conference. Chinese cultural films supplied by the Embassy have been sent to you by air cargo. It is hoped that they will be appreciated by your conference...etc.

সময়ের স্বল্পতার জন্য তুরস্কের প্রতিনিধিও যোগদান করতে পারেননি। এ জন্য তুর্কী রাষ্ট্রদূতের পক্ষে Ercument Yavuzalp এক চিঠিতে দুঃখ প্রকাশ করেন। লাহোরে

www.nagorikpathagar.org

জরুরী কাজে আটকা পড়ায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম আফজাল হোসেনও Agricutural Condition in Pakistan শিরোনামের প্রবন্ধ পাঠ করতে পারেননি।

জানুয়ারীর ২১ তারিখে (১৯৫৭) বিশ্বভারতীয় রেজিস্ট্রার এস সি চক্রবর্তী মওলানা ভাসানীর কাছে এক চিঠিতে উপাচার্য বিজ্ঞানী ডঃ সত্যেন বসুর এবং বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের সম্মেলনে যোগদানে অপারগতার কথা জানিয়ে লেখেন :

> As Prof. S. N. Bose, our Vice Chancellor, recieved you letter of January 16.1957 just on the eve of his departure from Santiniketan, be could not acknowledge the same personally.
>
> We here are indeed very happy to learn about the proposed Cultural conference and do hope that the conference would go a long way in strengt hening the cultural bonds and cementing the friendship betwen the Peoples of different nations.
>
> Nothing would have given us the greater pleasure than to have been able to send a group of students and members of the staff of this University to take part in the conference; but a number of very real difficulties make it impossible for us to arrange a trip to Mymen-singh on the proposed dates.
>
> I sincerely regret our inability to accept your kind invitation to participate in the programme and do hope you will kindly excuse us for the same.
>
> I send you our very best wishes for the success of the conference.
>
> Yours faithfully.

প্রখ্যাত উর্দু কবি এবং সে সময় 'The Pakistan times' পত্রিকার সম্পাদক ফয়েজ আহমদ ফয়েজ এক চিঠিতে জানান :

> I am very happy to learn that an all Pakistan Cultural Coference is being held at Kagmari in East Pakistan. I am sure that the proposed conference will stimulate interest in the current cultural activities and traditional cultural patterns of both halves of the country, and being about greater understanding and unity between cultural workers of East and West Pakistan.
>
> I am very greateful for your invitation to attend the confer-

www.nagorikpathagar.org

ence and should have felt happy and honoured to do so but the dates, unfortunately conflict with another commitment previously undertaken. I, therefore, deeply regret my inability to be present in the conference in person, but I shall try to send you a short paper on Urdu Literature in time for the conference.

I hope you will accept my greeting and best wishes for the success of the conference.

Yours truely.

এছাড়াও দেশী-বিদেশী আরও অনেক মনীষী সম্মেলনে যোগদান করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি ও তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন।

৬. সম্মেলনের তাৎপর্য

কাগমারীর এই সাংস্কৃতিক সম্মেলন নানা কারণে তাৎপর্যবাহী ছিল। প্রথমত এই সম্মেলনে উপস্থিত হাজার হাজার ডেলিগেট ও সংস্কৃতি কর্মীর মধ্যে এই সম্মেলন সাংস্কৃতিক উজ্জীবন ঘটায়, দ্বিতীয়ত এই সম্মেলনেই মাওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের আশুপ্রতিকার না হলে ভবিষ্যতে, আজ থেকে দশ বৎসর পর এমন এক সময় আসতে পারে যখন পূর্ব বাংলা আসসালামুআলায়কুম বলার প্রবণতা অনুভব করতে পারে।'[১৭] "বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম সুস্পষ্ট দাবী এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রাম ও আগের সংকল্প ওই আসসালামু আলায়কুম ধ্বনির মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছিল।"[১৮]

৭. প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে এই সম্মেলনের বক্তব্য ও কর্মকান্ড গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মুসলিম লীগের মুখপত্র 'দি ডন' 'দি মর্নিং নিউজ', 'দৈনিক আজাদ' আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দী উপদলের 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও তমদ্দুন মজলিসের সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পত্রিকা একসঙ্গে মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, স্বনামে-বেনামে লিখিত নিবন্ধে, চিঠিপত্র ও ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে সমালোচনা করা হয় ওই সম্মেলনের আয়োজনের ও বক্তব্যের। তবে আওয়ামী লীগের ভিন্ন গ্রুপের পত্রিকা কাজী মোহাম্মদ ইদরিশ সম্পাদিত 'দৈনিক ইত্তেহাদ' মওলানা ভাসানীকে সমর্থন করে।

www.nagorikpathagar.org

সম্মেলন সম্পর্কে দৈনিক আজাদ–এ প্রকাশিত এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় :

> কাগমারী সম্মেলনের বিভিন্ন দিক লইয়া আমরা দুই দিন আলোচনা করিয়াছি। এই সম্মেলন ও তার সকল সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে যা স্পষ্ট হইয়া উঠে, তা হইল একটি দলের কুচক্রী হাতের খেলা। তারা মুষ্টিমেয় হইতে পারে এবং সাধারণভাবে আওয়ামী লীগ তার সাথে লিপ্ত না-ও থাকিতে পারে। কিন্তু এই কুচক্রীরা একটি সুনির্দ্ধারিত পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইয়াছিল। যারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের চাইতে ভারতীয় নীতির বেশী ভক্ত, যারা কাশ্মীরের দাবী তুলিলে মিথ্যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিতে চায়, যারা সাহিত্য ও তমদ্দুন বলিতে পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্য ও তমদ্দুনকে বুঝিয়া থাকে এবং যাদের মুখে 'পূর্ব পাকিস্তান' কথাটাই আজতক মুহূর্ত ছাড়া উচ্চারিত হয় না এবং যারা 'পূর্ব বাংলা' বলিতে অজ্ঞান, যুক্তবাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির ঢোল নিত্য এবং অহরহ যাদের হাতে বাজে, তাদের কুচক্রই কাগমারীতে বিষাক্ত ফণা বিস্তার করিয়াছিল। তাদের মতলব ছিল ঘরে ও বাইরে পাকিস্তানী স্বার্থের উপর আঘাত।... বস্তুত এই কুচক্রীরা পাকিস্তানের দেশাত্মবোধ, জাতীয়তা ও সংহতিকে আজ চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছে। তবে আমরা বিশ্বাস রাখি, জাতির জাগ্রত দেশপ্রেমের বন্যার মুখে এইসব কুচক্রী কুটা ও আবর্জনার মতই ভাসিয়া যাইবে।[১৯]

ওই সময় 'দৈনিক ইত্তেফাক' সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মুসাফির নামে তার রাজনৈতিক কলামে লেখেন :

> জাতির এই সঙ্কটকালে যখন জনাব সোহরাওয়ার্দী দিনের আহার রাতের নিদ্রা হারাম করিয়া দেশ-দেশান্তরে উল্কার মত ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন তখনই এই পূর্ব পাকিস্তানে ওই মুষ্টিমেয় লোক তার পররাষ্ট্রনীতির বিরোধিতায় আকাশ-বাতাস উত্তপ্ত করিয়া তোলে, জনমত হারাইয়াও তারা নিরস্ত হয় নাই। শত্রুর হস্তে শক্তি যোগাইবার উদ্দেশ্যে তারা কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ভারত ও রাশিয়ার নেতাদের নামে গেট-নির্মাণ ও নামজাদা পাকিস্তানবিরোধীদের আমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করে। স্বাভাবিক অবস্থায় একটি আন্তর্জাতিক মেলায় বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দকে সম্মানপ্রদর্শনে আপত্তির কিছু না থাকিতে পারে, কিন্তু যেসময় পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কাশ্মীর নিয়া জীবন-মরণ লড়াই চলিতেছে, ভারত রাশিয়ার সহিত হাত মিলাইয়া শুধু কাশ্মীরের প্রশ্নে নয়, পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জও প্রদান করিতেছিল, সেই সময় যখন ওই নিরপেক্ষ নীতির ধ্বজাধারীরাই শত্রু রাষ্ট্রের নেতাদের সম্মান প্রদর্শন করিতে তৎপর হয়, তখন তার দুরভিসন্ধি উপলব্ধি করিতে কাহারো কষ্ট

www.nagorikpathagar.org

> হয় না। ভারত কাগমারীর ওই সকল অনুষ্ঠানকে তদীয় স্বার্থে ব্যবহার করিতে ছাড়ে নাই। জাতিসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধি কাগমারীর অনুষ্ঠানাদি পয়সা খরচ করিয়া বুলেটিন আকারে ও সংবাদপত্রে প্রকাশ করাইয়াছে। ভারতীয় পত্রিকাগুলি পুরোদমে উহার সদ্ব্যবহার করিয়াছে। মওলানা ভাসানীর উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে, ভারত সরকার পাকিস্তান অর্জনের পরও তাঁকে ধুবড়ীতে গ্রেফতার করিয়া জেলে আটক রাখিয়া পরে মুক্তি দিয়া আসাম হইতে বহিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই ভারতের সংবাদপত্রগুলি আজ কেন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেন তাঁরা তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা আখ্যা দিয়া ফুলায় এবং সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে প্রতিদিন জঘন্য কুৎসা রটায় ও তাঁর রক্ত পান করিতে উদ্যত।[২০]

তবে মওলানা ভাসানীকে সমর্থন করে লেখা দৈনিক ইত্তেহাদের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত দৈনিক আজাদ-এ লেখা সম্পাদকীয় প্রতিবাদে বলা হয় :

> পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী জনতার প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ মওলানা আকরাম খান সাহেবদের কী সর্বনাশটাই না করিয়াছে। ... কায়েমী স্বার্থবাদীদের জা'নী দুশমন, শোষকদের ক্ষমাহীন শত্রু জনতার বন্ধু মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত করিয়াই তো মওলানা আকরাম খান সাহেবগণের সর্বনাশটি ঘটাইলেন। এমন দুর্ধর্ষ সংগ্রামী নেতাও তো বড় একটা দেখা যায় না। একাধিকবার তাহাকে গ্রেফতার করিয়া বছরের পর বছর বিনাবিচারে কয়েদখানায় আটকাইয়া রাখা হইল, তাহার প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কর্মীদিগকে জেলজুলুম আর অত্যাচারে জর্জরিত করা হইল কিন্তু তবু এই প্রদেশে মুসলিম লীগওয়ালাদের ইমারতটি টিকাইয়া রাখা গেল না, মওলানা আকরম খানদের সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া গেল— পূর্ব পাকিস্তানের দুশমনদের, জনসাধারণের শত্রুদের মুখোশ খুলিয়া পড়িল। আওয়ামী লীগ কী কম সর্বনাশটা করিয়াছে?[২১]

৮. উপসংহার

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আগে এত ব্যাপকভিত্তিক আর কোন সাংস্কৃতিক সম্মেলন বাংলাদেশে হয়নি। পরবর্তীতে পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতিতে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবও লক্ষ্য করা গেছে।

এই সম্মেলন সম্পর্কে মওলানা ভাসানী নিজে বলেছিল, 'কাগমারীর সড়ক বিশ্বভ্রাতৃত্ব আর স্বাধীনতার সড়ক।'[২২] সে কথা পরবর্তীকালে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া এই সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের 'আসসালামু আলায়কুম' বলে বিদায় জানিয়ে মওলানা পূর্ব বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

তথ্যনির্দেশ

১. শাহ আহমদ রেজা, মওলানা ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম, গণপ্রকাশনী ১৯৮৬, পৃ ১

২. সৈয়দ আবুল মকসুদ, ভাসানী (প্রথম খন্ড) (প্রকাশক, সৈয়দ আবুল মাহমুদ, ১৯৮৬) পৃ ১৭১

৩. দৈনিক ইত্তেহাদ, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

৪. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *কাগমারী সম্মেলন ১৯৫৭ ঃ স্মৃতিচারণ,* দৈনিক সংবাদ, ৭-২-১৯৮২

৫. পূর্বোক্ত

৬. পূর্বোক্ত

৭. নূরুল হক চৌধুরী, শতাব্দীর উজ্জ্বল সূর্যের আকর্ষণে, সাপ্তাহিক প্রাচ্যবার্তা, মওলানা ভাসানী স্মরণিকা সংখ্যা, ১৯৭৭, ঢাকা

৮. দৈনিক ইত্তেহাদ, ৪-২-১৯৫৭

৯. আবু জাফর শামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত

১০. দৈনিক সংবাদ, ৯-২-১৯৫৭

১১. পূর্বোক্ত

১২. পূর্বোক্ত

১৩. আবু জাফর শামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত

১৪. সরদার জয়েনউদ্দীন, মনে পড়ে মওলানা ভাসানী, দৈনিক সংবাদ, ১ আগষ্ট, ১৯৮৫

১৫. আবু জাফর শামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত

১৬. পূর্বোক্ত

১৭. শাহ আহমদ রেজা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৯

১৮. আবু জাফর শামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত

১৯. দৈনিক আজাদ, ১৪-২-১৯৫৭

২০. মুসাফির, রাজনৈতিক মঞ্চ, দৈনিক ইত্তেফাক, ১২-৬-১৯৫৭

২১. দৈনিক ইত্তেহাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

২২. উদ্ধৃত, অমিতাভ গুপ্ত, *বাংলাদেশ,* আনন্দধারা প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৭৮ বাং, পৃ ৮৪

www.nagorikpathagar.org

সাত. 'সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান', ঢাকা ১৯৫৭

১. পটভূমি

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর থেকে এদেশে মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। এই ধারা কার্যত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিভিন্ন দুর্গে ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহ দেখা দেয়। সে বিদ্রোহই পরবর্তীকালে 'সিপাহী বিপ্লব' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই সিপাহী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ কয়েক দিনের জন্য পুনরায় ক্ষমতালাভ করেছিলেন। সিপাহী বিপ্লবে হিন্দু-মুসলিম সৈন্যরা একযোগে অংশ নিয়েছিল। ফলে পরবর্তীকালে একে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবে ইংরেজের পতন ঘটলে সম্রাট বাহাদুর শাহ'ই আবার ক্ষমতাসীন হতেন। সে প্রেক্ষিতেই উপমহাদেশের মুসলমানগণ এই সিপাহী বিপ্লবকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে অধিকতর সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য সিপাহী বিপ্লব ও তৎকালীন ইতিহাস চর্চার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

২. প্রস্তুতি

এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখেই ১৯৫৭ সালের ২৯, ৩০ ও ৩১ মার্চ সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি ঢাকার কার্জন হলে তিনদিন ব্যাপী এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। "১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন" পালনের জন্য গঠিত ওই কমিটিতে উদ্যোক্তা সংগঠনগুলোর মধ্যে ছিল : পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস সমিতি, পাকিস্তান সাহিত্য মজলিশ, শিল্প ও সংস্কৃতি পরিষদ, পাকিস্তান ছাত্র শক্তি, পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘ, [পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চলীয় কমিটি, পূর্বাঞ্চল শাখা নয়] পাকিস্তান ছাত্রী পরিষদ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ, পাকিস্তান মজলিশ, বিক্রমপুর সাংস্কৃতিক পরিষদ, গেন্ডারিয়া কালচারাল ক্লাব ও জমিয়তে তোলাবিয়া আরাবিয়া।১

www.nagorikpathagar.org

তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান প্রতিদিন দু'টি সেশনে বিভক্ত ছিল। সকাল সাড়ে ৯ টায় বসত আলোচনা সভা, বিকালে ছিল সঙ্গীতানুষ্ঠান ও আবৃত্তি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ছিলেন ডঃ হাসান জামান।

৩ সম্মেলনের প্রথম দিন : ২৯ মার্চ ১৯৫৭

এইদিন সকাল দশটায় সম্মেলন উদ্বোধন করা হয়। সম্মেলনে মূল সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মোহাম্মদ ইব্রাহীম (১৮৯০-১৯৬৬)।[২]

সম্মেলন উদ্বোধন করেন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। কোরান তেলাওয়াত, 'নারায়ে তকবির-আল্লাহু আকবর', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ' এবং পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত' 'পাক সারজমিন সাদবাদ' গানের মধ্য দিয়ে কার্জন হলে সম্মেলন শুরু হয়।[৩] উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "ওই শহীদেরা আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে মহিমান্বিত করার জন্যই ১৮৫৭ সালে রক্ত দিয়েছিলেন। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে ১৮৫৭ ছিল একটি সিদ্ধান্তমূলক বছর। ওই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তারও অনেক আগে।"[৪]

মূল সভাপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম শতবার্ষিকী উদযাপনের তাৎপর্য নির্দেশ করে বলেন, 'যে আদর্শ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধসমূহের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবশত বীর মুজাহিদগণ অকাতরে রক্তদান করেছেন, তার প্রতি আজও যদি আমরা উদাসীন থাকি, তবে আমাদের নবলব্ধ রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হবে।'[৫]

প্রথম দিনের আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন, আবদুল মওদুদ, মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক আশকার ইবনে শাইখ, মওলানা আবদুল্লাহেল কাফি, ডক্টর মুহম্মদ ইসহাক, আবু তালিব, আকবরউদ্দীন, ডঃ মফিজুল্লাহ কবির, দেওয়ান আবদুল হামিদ, অধ্যাপক তাফাজ্জুল হোসেন, আলীম আল রাজী, আবদুল হক ও মওলানা মহিউদ্দীন খান প্রমুখ।[৬]

আবদুল মওদুদ তার সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিকা শীর্ষক প্রবন্ধে ইংরেজ আমলে মুসলমানদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে বলেন :

> পলাশীর প্রান্তরে মুসলমানদের তখত-ই-তাজই শুধু ধূল্যবলুণ্ঠিত হয় নাই, তাদের রাষ্ট্রীয় সত্তা, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা, তাহজীব ও তমদ্দুন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে। ইংরাজরা এদেশে এসেছিল তুলাদন্ড হাতে তেজারত করতে এবং তার দরুন প্রায় দুশো বছরেরও অধিককাল তারা ব্যবসায়ে সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় মুসলমান নবাব-বাদশাহদের করুণা আকর্ষণের জন্য মুখের পানে তাকিয়ে থাকতো। অদৃষ্টের পরিহাসে সেই ইংরাজরা যখন বাঙলার মসনদ ও

www.nagorikpathagar.org

দিল্লীর তখ্‌ত অধিকার করে বসল, তখন তারা ভারতের পূর্বতন মালিক মুসলমানদেরকে স্বভাবতই সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগল এবং ব্যবহারও করতে লাগল রুক্ষ ও বিরূপ। রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে তাদের এমনভাবে দাবিয়ে রাখতে লাগলো, যাতে ভবিষ্যতে মুসলমানরা আর মাথা তুলতে না পারে। মুসলমানরাও নয়া শাসক সম্প্রদায় ইংরাজকে প্রীতির চক্ষে দেখে নাই, এমন কি তাদের সংস্পর্শে যাওয়াও মুসলমানরা আত্মসম্মানের খেলাফ মনে করতে লাগলো। ফলে মুসলমানরা দেশ-শাসন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো এবং ইংরাজরাও তাদেরকে সব দিক থেকে পিষে মারতে লাগলো।[৭]

মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র বর্ণনা করে তিনি বলেন, সমস্ত সরকারী চাকরি থেকে ক্রমশ মুসলমানদের হঠিয়ে দেয়া হয়। শেষে সরকারী নীতিই হয়ে দাঁড়াল যে, কোনও বিভাগে চাকরি খালি হলেই বিজ্ঞাপনে বিশেষভাবে দেওয়া হত যে মুসলমান ব্যতীত অন্য সকলেই উম্মেদার হতে পারবে (দূরবীন-জুলাই ১৮৬৯)।[৮] এছাড়াও লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াকত করা এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ব্যবসা-বাণিজ্যে পক্ষপাত প্রভৃতি মুসলমানদের অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। প্রবন্ধে তিনি বলেন, সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেলেও সে আত্মদান ব্যর্থ হয়নি। উপসংহারে তিনি বলেন :

> এখন সময় এসেছে এসব অমর শহীদের ত্যাগ ও গৌরবমন্ডিত অসামান্য সাহসিক কার্যাবলীকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং শ্রদ্ধা করার, কারণ তারাই প্রকৃতপক্ষে এই উপমহাদেশে একশো বৎসরেরও বহু পূর্বে পাকিস্তানের বুনিয়াদ স্থাপনে সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। যদিও পাকিস্তান অর্জনে তাঁদের সরাসরি দান নাই, তবু একথা মেনে নিতে হবে যে তাঁদের সাধনার মধ্যেই নিহিত ছিলো পাকিস্তান আদর্শিক বীজমন্ত্র এবং এই চেতনা উজ্জীবনে তাঁদের দানও ছিল অপরিসীম।[৯]

অনুষ্ঠানে 'মুজাহিদীন' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন মওলানা মুস্তাফিজুর রহমান। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মওলানা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী 'পরাধীনতার জিঞ্জির হইতে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে' উপমহাদেশে একটি মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলেন। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে বালাকোট যুদ্ধে এই মজাহিদগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাদের অনেকেই পরে সিপাহী বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

প্রবন্ধে মুস্তাফিজুর রহমান সেই মুজাহিদ বাহিনীর বেশ কয়েকজন সক্রিয় সদস্যের পরিচয় তুলে ধরেন। তারা হলেন : মওলানা বেলায়েত আলী, মওলানা আহমদ উল্লাহ আজিমাবাদী, সৈয়দ মুহাম্মদ আমীন, সৈয়দ আওলাদ হাসান, মওলবী জাফর আলী, মওলানা সাখাওয়াত আলী চৌধুরী, মওলানা সৈয়দ মুহম্মদ তাহের মওলানা ইয়াহইয়া আলী, মওলানা ইমামুদ্দীন, হাকীম মুনয়েম খান দেহলভী, শাহ মুহাম্মদ হুসাইন

www.nagorikpathagar.org

আজিমাবাদী, শাহ মজহার আলী, সূফী নূর মোহাম্মদ। এছাড়া অন্য যারা মুজাহিদ বাহিনীর সদস্য ছিলেন এবং পরবর্তীকালে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়, তারা হলেন : শেখ হাসান আলী, আবদুল আলী নাসিরাবাদী (মোমেনশাহী?) শেখ গোলাম আলী, ইনায়েত আলী গাজী, কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ, সৈয়দ মুহাম্মদ ইয়াকুব, শেখ হামদানী, মওলানা ওয়াইজুদ্দীন, মওলানা নেজামউদ্দীন দেহলভী, সৈয়দ নাসের আলী, মিয়া ইহসানউল্লাহ, শেখ মুয়াজ্জম, হাকীম মুনিসুদ্দীন, মুনওয়ার খান, সৈয়দ মুরতাজা হুসাইন, মওলানা মোহাম্মদ আলী রামপুরী, মুহাম্মদ আলী মহিলাবাদী, শেখ মুহাম্মদ আলী, সৈয়দ মুসা, শাহ মাহমুদ, সৈয়দ মুহাম্মদ হুসাইন, সৈয়দ মাহমুদ আলী দেহলভী, মওলানা ফসিহ গাজীপুরী, মওলানা ফরহাদ হুসাইন, সৈয়দ আবদুল বাকী, মওলানা আহমদ আলী, মওলানা আবদুল হাই।[১০]

এই পরিচিতি পূর্ণাঙ্গ নয়।

অধ্যাপক আশকার ইবনে শাইখ তার 'শহীদ তিতুমীর' প্রবন্ধে সিপাহী-বিপ্লবের সময়ে ভারতে মুসলমানদের অবস্থা পর্যালোচনা করে, তিতুমীরের উত্থান ও সংগ্রামের বিস্তারিত বিবরণ দেন।[১১]

সম্মেলনে পঠিত অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিবের প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'আযাদী আন্দোলনে বাঙালী মুসলমান'। প্রবন্ধে তিনি পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন থেকে ১৯৪৭ সালের ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ সময়কাল পর্যন্ত উপমহাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। এই দীর্ঘ সময়ে ভারতের যে প্রজাবিদ্রোহ ঘটে তাতে বাঙালী মুসলমানদের ভূমিকা ও নেতৃত্ব তুলে ধরা হয়।

ভারতে ইংরাজবিরোধী আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রামে বাঙালী মুসলমান নারী-পুরুষের ভূমিকা ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণসহ সন্নিবেশিত হয়। বৃটিশ ইতিহাসবেত্তা উইলিয়াম হান্টারের The Indian Musalmans গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন ঃ

> In Eastern Bengal, every district was tained with treason; and the Mohamedan peasantry down the whole course of the Ganges from Patna to the sea, were accustomed lay apart weekly offerings on side of the Rebel camp (p-91).[১২]

অধ্যাপক আকবরউদ্দীন তার 'আযাদী সংগ্রাম' প্রবন্ধে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বৃটিশবিরোধী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।[১৩]

'আঠারো শ সাতান্ন আন্দোলনের অগ্রণীদল' শীর্ষক প্রবন্ধে ডঃ মফিজুল্লাহ কবির বলেন :

> প্রাচীন ঐতিহাসিকরা এ-আন্দোলনকে বৃটিশ দফতর থেকে "সাময়িক বিদ্রোহ" হিসাবে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু বর্তমানের ইতিহাসবিদেরা একে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলন বলছেন। প্রকৃতপক্ষে

www.nagorikpathagar.org

> তথাকথিত বিদ্রোহীরা সমাজের বিভিন্ন দল থেকে নির্বিবাদে এসেছিল। যেমন হিন্দু-মুসলমান, সিপাহী-অসিপাহী, জমিদার-প্রজা, নারী-পুরুষ, তারা সবাই মিলে এ আন্দোলনকে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলন বলতে আমাদেরকে সমর্থন করবে। এ উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথম থেকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এক নতুন ধর্মীয় অনুপ্রেরণায়, ওহাবী আন্দোলন বলে যাকে ভুল বোঝা হয়, অনুপ্রাণিত, সীমান্তের মুজাহিদরা বৃটিশ এবং তাদের মিত্র শিখদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করে। ১৮৫৭-এর মুসলিম যোদ্ধারা তাদের পূর্বের আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করল। সে আন্দোলন সীমান্তে সবিরামভাবে ১৮৫৭ সালের পরও চলেছিল।[১৪]

এই প্রবন্ধেই তিনি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণগুলো ব্যাখ্যা করেন।

অধ্যাপক খন্দকার তাফাজ্জুল হোসেন 'সিপাহী বিপ্লবের অর্থনৈতিক পটভূমি' শীর্ষক প্রবন্ধে, সিপাহী বিপ্লব সমসাময়িককালে ভারতের চাল-ডালের দাম এবং উৎপাদন পরিস্থিতির একটি তথ্যবহুল চিত্র তুলে ধরেন। তার মধ্য দিয়ে ভারতে বৃটিশ শোষণের চিত্রও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাতে দেখা যায়, ষোড়শ শতকে ভারতে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তিন বার, ওই সময়ে ইংল্যান্ডে দুর্ভিক্ষ হয় ১৫ বার; সপ্তদশ শতকে ভারতে তিনবার, ইংল্যান্ডে ৬ বার; অষ্টাদশ শতকে ভারতে ১১ বার, ইংল্যান্ডে ৭ বার; উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে দুর্ভিক্ষ হয় ৩১ বার, ইংল্যান্ডে একবার।[১৫] তিনি এই অর্থনৈতিক পটভূমিতেই সিপাহী বিপ্লবের মূল্যায়ন করেন।

আবদুল হক তার 'আযাদী সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা (১৮৫৭-১৯৪৭)' প্রবন্ধে ষোড়শ শতকের সূচনাকাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এদেশে মুসলমানদের অবস্থান-আন্দোলন-সংগ্রামের বিবরণ দেন।[১৬]

২৯ মার্চ ১৯৫৭ বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৪. সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন : ৩০ মার্চ ১৯৫৭

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ।

এতে প্রবন্ধ পড়েন ডক্টর হাসান জামান, ডক্টর আহমদ হাসান দানী, ডক্টর আবুল হাসান, আবুল হাশিম, ডক্টর গোলাম আহমদ চৌধুরী, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বেগম শামসুননাহার মাহমুদ, ডক্টর আবদুল আজিজ, অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, সিরাজুল হক প্রমুখ।[১৭]

ডক্টর হাসান জামান তার 'সিপাহী বিপ্লবের পটভূমি' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, 'সিপাহী

www.nagorikpathagar.org

বিপ্লব কোন ভূঁইফোড় ঘটনা ছিল না। ইহা সুনিশ্চিতভাবে মুজাদ্দিদে আলফে সানী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ আহমদ শহীদ প্রমুখ বিপ্লবী চিন্তাবিদের ভাবধারা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল।'[১৮]

বেগম শামসুননাহার মাহমুদ তার 'আযাদী-সংগ্রামে নারী' শীর্ষক প্রবন্ধে সেই সংগ্রামে যে মায়েরা-পত্নীরা উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সে কথা উল্লেখ করে বলেন :

> মুসলমান আমলে পাক-ভারতের ইতিহাস মুসলিম নারীর দানে সমুজ্জ্বল। তাঁরা আশ্চর্য দক্ষতার সাথে রাজ্য শাসন করেছেন, সূক্ষ্ম রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করেছেন, আবার নিভৃতে করেছেন জ্ঞানের সাধনা এবং কাব্যের আরাধনা। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজপুত ললনাদের কথা বাদ দিলেও আরও বিস্তর মহিলা শৌর্যে বীর্যে অথবা শিল্প-চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহান মোগল সম্রাটদের গৌরবসূর্য যখন অস্তমিত হয়, সেই সময় থেকে পুরনারীদেরও গৌরবদীপ্ত ভূমিকার হল সমাপ্তি; অন্ধকারের কালো যবনিকার অন্তরালে তারা আত্মগোপন করলেন।[১৯]

ডঃ আবদুল আজিজ পড়েন 'মুসলিম রেনেসাঁয় সৈয়দ আহমদের অবদান' শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রবন্ধে তিনি বলেন:

> কয়েক শতাব্দীব্যাপী ভারত শাসনের পর ভারতীয় মুসলমানের যে অধঃপতন আরম্ভ হয়, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ তাকে চরমে পৌঁছাইয়া দেয়। বৃটিশ সরকার পরোক্ষভাবে ভারতীয় মুসলমানকে এই বিদ্রোহ ও তার সমূহ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য দায়ী করেন। ফলে যে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও নৃশংসতা সহযোগে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়—মুসলমানকে পুরোমাত্রায় তাহা ভোগ করিতে হয়। সরকারের এই নৃশংসতা সম্পর্কে অশোক মেহতা বলেন, "বিদ্রোহোত্তর যুগের মুসলিম-দমন নীতি তখন এত প্রচণ্ডতার সহিত পালন করা হয় যে, বিদ্রোহের পর আমরা এই গর্বান্বিত সাহসী জাতিকে ভগ্নহৃদয় অশিক্ষিত জাতির পর্যায়ে ও তাহাদের সমূহ গর্ব ধূলাবলুণ্ঠিত দেখিতে পাই।" বিদ্রোহের পর সরকার তাহার বিপ্লবোত্তর যুগের মুসলিম-দমন নীতি অত্যন্ত প্রচণ্ডতার সহিত পালন করিতে শুরু করেন।[২০]

সিপাহী বিপ্লবের পর ইংরেজদের মুসলমান বিদ্বেষ দূর করতে স্যার সৈয়দ আহমদ যেসব প্রয়াস নেন, প্রবন্ধে সে সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়।

সম্মেলন ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ-এর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'বাংলা-সাহিত্যে জাতীয় চেতনা'। প্রবন্ধে বাঙালী মুসলমানের জাতীয় চেতনা উন্মেষের পরিচয় তুলে ধরা

www.nagorikpathagar.org

হয়। কাজী দীন মুহম্মদ বাংলা সাহিত্যে বিদেশী প্রভাবের ফলে যে নতুন ভাব, নতুন প্রেরণার জন্ম হয়েছে তার মধ্যে বৃটিশ আগমনকেই মহত্তম বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ইউরোপীয় শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ইউরোপীয় তাহকীব তমদ্দুন আমাদের জীবনে অনেকখানি জায়গা করে নেয়। এই ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন :

> পরবর্তীকালে এ পাশ্চাত্য ভাবধারা আমাদের জীবনবোধের সীমা করে দিয়েছে প্রসারিত, উন্মুক্ত। আমরা আমাদের ধর্মে, কর্মে, শিক্ষায়, দীক্ষায় ভাবতে শিখেছি নিজস্ব দেশ, জাতি, সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে। ঈশ্বরগুপ্ত, বিহারীলাল, বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ, তথা রবীন্দ্রোত্তর যুগ পর্যন্ত চলেছে এরই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বোধন ও উপলব্ধি চর্চা। মীর মশাররফ হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, পণ্ডিত রিয়াজুদ্দীন, রিয়াজ-অল-দীন মাশহাদী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, শেখ ফজলুল করিম এ দলের ভাবুক ও কর্মী। সমসাময়িক সাহিত্য ও সমাজসেবায় ফুটে উঠেছে তাদের কীর্তির কুসুম। তারা বয়ে এনেছেন ইরান, আরব, ভারত, বাংলার ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ধারা—যা আমাদের কাল পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই ঋদ্ধতা ও তীব্রতা, ভাবের এই গভীরতা ও পরিচর্যায় সম্ভব হয়েছে—পাক-আযাদীর লড়াই। বাংলা সাহিত্যেই রয়েছে এর সোনার স্বাক্ষর।[২১]

অনুষ্ঠানে 'শতাব্দী পরিক্রমা' শীর্ষক প্রবন্ধে এ কে এম আমিনুল ইসলাম ইতিহাস-চর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষা-সাহিত্য-রাজনীতিতে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেন। প্রবন্ধে উনিশ ও বিশ শতকে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ যে রাজনীতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য সন্ধান করতে শুরু করে, তারও বিশ্লেষণ করা হয়।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তার 'উনিশ শ ছয় থেকে ছত্রিশ' শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলিম লীগের জন্ম থেকে ভারত শাসন আইন অনুসারে নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাক্রম বিশ্লেষণ করেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে মুসলমানদের জন্য 'বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ' ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন :

> দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত অঞ্চলের মানুষেরা একে অভিনন্দন জানিয়েছিল। এদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম এবং সাধারণ মুসলিমের রাজনৈতিক চেতনা যদিও তেমন প্রখর ছিল না তবু বঙ্গ বিভাগে যে তাদের কল্যাণ—এ তারা অনুভব করেছিল। বিশেষ করে সচেতন অংশ স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, নতুন প্রদেশ গঠিত হল,—তাতে তাদের মঙ্গল সাধিত হবে। নতুন প্রদেশের প্রস্তাবিত গবর্নর স্যার বাম্পফিল্ড ফুলার দেখেছিলেন যে, মুসলিমরা শোকরানা নামাজ পড়ে এ প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। ...কিন্তু হিন্দু মধ্যবিত্ত একে দেখেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তাদের মতে বিভাগ প্রস্তাবের অর্থ

www.nagorikpathagar.org

> বঙ্গমাতাকে দ্বিখন্ডিত করার প্রচেষ্টা। তাই এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন গড়ে তোলে। সে সংগঠিত আন্দোলনের স্লোগান ছিল 'বন্দে মাতরম'। মাতৃবন্দনার এই স্লোগান পরে সাম্প্রদায়িক অর্থ পেয়েছিল। এক পক্ষের বিভাগ সমর্থন এবং অন্য পক্ষের প্রবল বিরোধিতার ভেতর দিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যটাই নতুন করে উদঘাটিত হল। ... এই উদঘাটন নতুন হতে পারে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যটা নতুন নয়।[২২]

ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, চাকরিগত নিপীড়নের উল্লেখ করে উইলিয়াম হান্টারের উদ্ধৃতি দিয়ে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, "কলকাতায় এমন সরকারী অফিসের সংখ্যা ছিল না বললেই চলে, যেখানে একজন মুসলিম বাহক, আর্দালী, দোয়াত ভরা বা পেন্সিল কাটার কাজের চাইতে বড় কোন কাজ আশা করতে পারত।" চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেও মুসলমানদের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়, প্রবন্ধে সেকথা উল্লিখিত হয়। সে সময় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন, 'জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দুই সম্প্রদায়ের ভেতর পার্থক্যটা ছিল স্পষ্ট করে উচ্চারিত।'

এই স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করতে গিয়ে অধ্যাপক চৌধুরী মওলানা মোহাম্মদ আলী এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রসঙ্গে বলেন :

> এই পার্থক্যটা দু'জন মুসলিম মণীষীর জীবনে আরও স্পষ্ট করে দেখতে পাবো। এদের প্রথম জন মওলানা মোহাম্মদ আলী। যিনি এক সময়ে ঘোষণা করেছিলেন : খোদার কথা যখন উঠবে তখন আমি প্রথমে মুসলিম, দ্বিতীয় বারে মুসলিম এবং তৃতীয় বারেও মুসলিম। কিন্তু ভারতের কথা যখন উঠবে তখন আমি প্রথমে ভারতীয়, দ্বিতীয় বারে ভারতীয় এবং তৃতীয় বারেও ভারতীয় এবং জীবনের দীর্ঘ সময় যিনি ব্যয় করেছিলেন সম্প্রদায়-গত ঐক্য প্রচেষ্টায়, তিনিও শেষ প্রান্তে পৌছে উপলব্ধি করলেন যে, মুসলিমদের রাজনৈতিক বিকাশের পথ হবে স্বতন্ত্র। ... অপরজন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। পরবর্তীকালে কায়েদে আজম এক সময়ে ছিলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত। কিন্তু পরে তিনিই আবার স্বতন্ত্রভিত্তিক মুসলিম আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। প্রথম জীবনে আন্তরিকভাবে ঐক্য প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েও এরা যে পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র পথ গ্রহণের ব্যাপারে অত্যুৎসাহিত হয়ে উঠেছিলো, তার কারণ হল এই যে, দুই সম্প্রদায়ের ভেতরে স্বাতন্ত্র্যটা অত্যন্ত দৃঢ়মূল। জিন্নাহ'র রাজনৈতিক জীবনধারা সমকালীন মুসলিম মানসের গতিধারার প্রতীকও বটে।[২৩]

তা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনের জন্য জিন্নাহ'র নিরন্তর প্রয়াসের কথা তিনি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন।

www.nagorikpathagar.org

প্রবন্ধে ১৯৩৭ সালের ১২ ডিসেম্বর রাজা পঞ্চম জর্জ আহূত গোল টেবিল বৈঠকে হিন্দু প্রতিনিধিদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উল্লেখ করে বলেন, 'ছ থেকে ছত্রিশের এই খন্ড ইতিহাসে লীগের পরবর্তী অগ্রগতির প্রস্তুতি চলেছিল, আর সেই প্রস্তুতির ফলশ্রুতি পাকিস্তান আন্দোলনের ভেতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছে। এই আশা-নিরাশার যুগ থেকে বেরিয়ে এসেই মুসলিম-মানস ক্রমান্বয়ে পরিচ্ছন্ন আশার সুস্পষ্ট পথ ধরেই এগিয়েছে।'[২৪]

বিকালের অধিবেশন ছিল কবি সম্মেলন। তাতে কবিতা পড়েন বেগম সুফিয়া কামাল, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, বেনজির আহমদ, আহসান হাবীব, আবদুল হাই মাশরেকী, আজিজুর রহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ খান, জাহানারা আরজু, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ প্রমুখ।[২৫]

পঠিত সকল কবিতাই সিপাহী-বিপ্লব ও বিপ্লবে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল।

৫. সম্মেলনের তৃতীয় দিন : ৩১ মার্চ ১৯৫৭

এই দিন সকালের অধিবেশনে আলোচনা পর্বে অংশ নেন অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, মওলানা আবদুল্লাহেল কাফি, অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী, অধ্যাপক শাহেদ আলী, অধ্যাপক আবু তালিব, কবি আবদুল কাদির, আবদুল গফুর, আজিজুর রহমান প্রমুখ।[২৬]

'পাক-ভারতে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ পলাশী-যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সংস্কৃতিগতভাবে মুসলমানদের অবস্থান এবং পুনরুত্থানের আন্দোলনের ওপর আলোকপাত করেন।

কবি আবদুল কাদির তার 'আযাদী সংগ্রাম : ১৮৫৭' শীর্ষক প্রবন্ধে সিপাহী বিপ্লবের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করেন।

'পাকিস্তান আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধে আবদুল গফুর উপমহাদেশে মুসলিম জাতিসত্তা বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে 'বিপ্লবী আন্দোলনে দক্ষিণ বঙ্গের অবদান' সম্পর্কে আলোকপাত করেন আজিজুর রহমান।

সন্ধ্যায় অধ্যাপক আশকার ইবনে শাইখ (জ. ১৯২৫) রচিত নাটক '১৮৫৭' মঞ্চস্থ হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ দিনে অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষ থেকে অধ্যাপক মাহফুজুল হক। বক্তৃতায় তিনি বলেন, যে-সমস্ত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষার্থে সিপাহী বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে-সবের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসই ছিল অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।[২৭]

www.nagorikpathagar.org

৫. উপসংহার

সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর উদ্যোক্তারা সিপাহী বিপ্লবের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং তার মধ্য দিয়ে বাঙালী মুসলমান সমাজের ইতিহাস, ঐতিহ্য অনুসন্ধান করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সে প্রচেষ্টায় তাদের সাফল্য উপেক্ষা করার মত ছিল না।

তথ্যনির্দেশ

১. দৈনিক আজাদ, মার্চ ২৯, ১৯৫৭
২. সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব-বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ১৯৮৩, পৃ ৫৫
৩. সাপ্তাহিক সৈনিক, ০৫-০৪-১৯৫৭
৪. The Pakistan Observer, March 30, 1957
৫. The Pakistan Observer / সাপ্তাহিক সৈনিক, ৫-৪-১৯৫৭
৬. দৈনিক আজাদ, ২৯-০৩-১৯৫৭
৭. আবদুল মওদুদ, *সিপাহী-বিপ্লবের পটভূমিকা*, উদ্ধৃত, শতাব্দী পরিক্রমা, পৃ ৫৯-৬০
৮. পূর্বোক্ত
৯. পূর্বোক্ত
১০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মওলানা মুস্তাফিজুর রহমানের 'মুজাহিদীন', শতাব্দী পরিক্রমা, পৃ ১২৩-১৩৬
১১. পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৬-২০৩
১২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু তালিব, আযাদী আন্দোলনে বাঙালী মুসলমান, শতাব্দী পরিক্রমা, পৃ ১৬-২৫
১৩. শতাব্দী পরিক্রমা, পৃ ৭৭-৮১
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৩-৬৪
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৪৯-৫৬
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৭-১৫
১৭. The Pakistan Observer, 31-03-1957. দৈনিক আজাদ, ৩১-৩-১৯৫৭
১৮. পূর্বোক্ত

www.nagorikpathagar.org

১৯. শতাব্দী পরিক্রমা, পৃ ১৫৭
২০. মাহে নও, মে, ১৯৫৭, ৯ বর্ষ, ২ সংখ্যা
২১. শতাব্দী পরিক্রমা, পৃ ২৭৭-৭৮
২২. শতাব্দী পরিক্রমা, পৃ ২৫২-২৬৩
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ ২৬৪
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৩
২৫. দৈনিক আজাদ, ৩১-০৩-১৯৫৭
২৬. পূর্বোক্ত
২৭. সাপ্তাহিক সৈনিক, ০৫-০৪-১৯৫৭

www.nagorikpathagar.org

আট. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, চট্টগ্রাম ১৯৫৮

১. প্রস্তুতি

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য মাহ্‌ফিলের উদ্যোগে ১৯৫৮ সালের ২, ৩ ও ৪ মে চট্টগ্রামে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে'র আয়োজন করা হয়।[১] এ উপলক্ষ্যে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মওলবী আবদুর রহমান ও মওলবী নূরুল ইসলাম চৌধুরী।[২] চট্টগ্রামের দেশকর্মী ও ব্যবসায়ী রফিউদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী, তার পুত্র সাঈফুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী ও বড় ব্যবসায়ী এ কে খান সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[৩]

চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন (জে এম সেন) হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বড় রাস্তার ওপরই তৈরী করা হয়েছিল আলাওল গেট। তারপর নজরুল-ইকবাল গেট। ডায়াসের পেছনে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বিরাট ম্যাপ। পূর্ব পাকিস্তানের পরিবেশ অঙ্কিত তরুণ শিল্পীর আঁকা কতকগুলি চিত্র। মাঝে মাঝে নজরুল, ইকবাল আর হাদীস ও কুরআনের বাণী। 'কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উপায়ে সমগ্র হলে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, যা পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব।'[৪]

সম্মেলনের বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠান ও তার সভাপতিগণ ছিলেন :[৫]

২রা মে শুক্রবার বিকাল	:	উদ্বোধন
মূল সভাপতি	:	মওলানা আকরম খাঁ
৩রা মে শনিবার সকাল	:	পাক-বাংলার আদর্শ ও সাহিত্য
সভাপতি	:	অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ
৩রা মে শনিবার বিকাল	:	পাক-বাংলার ভাষা ও কালচার
সভাপতি	:	আবুল মনসুর আহমদ
৪ঠা মে রবিবার সকাল	:	পাক-বাংলার মনন
সভাপতি	:	আবুল কালাম শামসুদ্দীন
৪ঠা মে রবিবার বিকাল	:	পাক-বাংলার চিত্রশিল্প
সভাপতি	:	অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদীন

www.nagorikpathagar.org

২. পটভূমি

সম্মেলনের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে আবদুর রহমান তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন : "যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শিল্প ও সঙ্গীত, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনে ইতিপূর্বে যে ইসলামিক আদর্শ রূপায়ণের প্রস্তুতি চলছিল তা বাধাগ্রস্ত হল। তথাকথিত স্বাধীন চিন্তানায়কদের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার ছদ্ম আবরণে বৃহত্তর বাংলার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক একীকরণের অভিশপ্ত প্রচেষ্টা জোরদার হয়ে ক্রমশ পাকিস্তানী আদর্শকে ম্লান ও দুর্বল করতে লাগল। ঢাকা, কুমিল্লা ও কাগমারীতে পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে চিন্তা ও কর্মের সমুদয় ক্ষেত্রে কবরস্থ করার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে আনা হয়েছিল। এর প্রতিবাদে আমরা জনকয়েক মিলে স্থানীয় কর্মীদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের জন্মভূমি ইসলামাবাদে বা চাটগাঁয়ে পাকিস্তানী আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত দেশহিতৈষীদের কি করা কর্তব্য, যা সম্বন্ধে উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিন দিনব্যাপী এক সাহিত্য মাহফিলের আয়োজন করি।....পূর্ব পাকিস্তানের সমুদয় পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী লেখক-লেখিকা, কলা-শিল্পী ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ এতে যোগদান করেন।"[৬]

৩. সম্মেলনের প্রথম দিন : ২ মে ১৯৫৮

দোসরা মে বিপুল জনসমাগমের মধ্য দিয়ে সম্মেলন উদ্বোধন করা হয়। প্রথমে সমবেত কবি-সাহিত্যিকদের স্বাগত জানিয়ে কবিতা পড়েন মতিউল ইসলাম ও আবদুস সালাম।[৭] এরপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আবদুর রহমান তার ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, যে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে আদর্শ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে আলাপ আলোচনা তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে জাতীয় আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্য বিশিষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যেই জাতির 'চিন্তানায়ক' ও 'ভাবপ্রসারকদের' এই সম্মেলন ডাকা হয়েছে।[৮] তিনি উল্লেখ করেন যে, এর আগে মওলানা আকরম খাঁর সভানেতৃত্বে ১৯১৯ সালেও চট্টগ্রামে মুসলিম সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কম্যুনিজম ও ক্যাপিটালিজমের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পৃথিবীর স্বস্তি ও সমৃদ্ধি যেখানে বিপন্ন হয়ে পড়েছে, সেখানে ইসলামী আদর্শই প্রকৃত শান্তির সন্ধান দিতে পারে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর হঠাৎ করে বড়লোক হবার নেশায় পেয়ে বসল সকলকে। ফলে আদর্শ লুণ্ঠিত হল ধূলায়—ইসলামী নীতি-ধর্ম গোল চুলায়।' জনাব আবদুর রহমান বলেন :

www.nagorikpathagar.org

> আমাদের এই দুর্দশার দিনে আমেরিকান ও রাশিয়ানদের ভোগোন্মত্ত জীবন-দর্শন অনেকের মন হরণ করেছে। সম্পত্তি ও সঞ্চয়ের মোহ এক দলকে Capitalism এর দিকে আকর্ষণ করেছে। আর যাদের সম্পত্তি নেই, সম্বল নেই, কাড়াকাড়ির লড়াইয়ে যারা পিছিয়ে পড়েছে, তারা গেলেন রাশিয়ার দিকে। শুধু একদল মৌল্লা মৌলবীই অজ্ঞ ও সরল লোকদের নিয়ে ধর্ম্মের খেলায় মেতে রইলেন। আদর্শ বিভ্রাটের এই দুর্দিনে আমাদের সাহিত্যিকেরাও চুপ করে ছিলেন। তাদেরও একটা কিছু করা প্রয়োজন, এই মনে করে অনেকেই সচেতন হয়ে উঠলেন এবং নানা স্থানে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্মিলনের মাধ্যমে তাদের এই সচেতনতা আত্মপ্রকাশ করে। কুমিল্লা, ঢাকা ও কাগমারীতে এইরূপ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং যেহেতু সাহিত্য সেবকেরা চিরদিনই সম্পদ বঞ্চিত, মস্কো-অভিমুখী কাঙ্গালের মিছিলের অভিযানগীতি তাদের অনেকেরই মনোহরণ করেছে।[৯]

কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিকদের তিনি সমাজের রূপকার হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, "পাকিস্তান স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে টিকে থাকবার যদি কোন স্বার্থকতা থাকে, তবে ইসলামের শিক্ষাকে বর্তমান জগতে এক কল্যাণময় আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই সেই সার্থকতার সন্ধান নিতে হবে। নীট্‌স্, শোপেন হাওয়ার, গ্যেটে, মিলার এবং অন্যান্য মণীষিগণ যেমন ভূলুণ্ঠিত জার্মানীকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম করেছিলেন, ভলটেয়র ও রোসো ও তাঁদের সমকালীন মণীষীরা যেমন ফরাসীর জীবনে সর্ব্বাত্মক বিপ্লবের প্রেরণা যুগিয়েছিলেন, ম্যাটসিনি, গারিবল্ডি যেমন ইটালীর এবং শেক্সপীয়র ও বেকন, হবস ও লক প্রমুখ কবি ও দার্শনিকেরা যেমন ইংলন্ডের গৌরবময় ইতিহাসের গোড়াপত্তন করেছিলেন; টলষ্টয়, তুর্গেনিভ, ডস্‌টয়ভস্কি প্রমুখ মণীষিগণ যেমন নিপীড়িত, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চাৎপদ রাশিয়ার জাতীয় মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন, তেমনি আমাদের কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও শিল্পীগণকে ইসলামের আদর্শে পাকিস্তানকে উজ্জীবিত করার পণ গ্রহণ করতে হবে।...গভীর জ্ঞান ও মানুষের কল্যাণ কামনা ব্যতীত আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ নিষ্ঠা জন্মিতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আমাদের মধ্যে জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা ও তজ্জন্য যথোপযুক্ত কৃচ্ছ্র সাধনার অভাব আছে বলেই, দৃষ্টি আমাদের অস্বচ্ছ, কণ্ঠ আমাদের দুর্ব্বল ও দ্বিধাজড়িত এবং বিচারবুদ্ধি একদেশদর্শী।" ১০

জনাব আবদুর রহমান শেক্সপীয়ার, দস্তয়ভস্কি, রোমাঁ রোলাঁ, ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জ্ঞানার্জন প্রয়াসে শ্রমনিষ্ঠতার উদাহরণ দিয়ে বলেন, পৃথিবীর সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে যাঁদের আসন খুব উচ্চ তাদের জ্ঞানের পরিধিও অত্যন্ত বিস্তীর্ণ। তিনি বলেন :

> প্রত্যেক সাহিত্যসূরীকেই পূর্ব্বতন জ্ঞানের আলোকে বর্তমানকে আলোকিত করে ভবিষ্যতের জন্য আলোর মশাল প্রজ্জ্বলিত করতে হয়। সেই জন্য প্রথম

www.nagorikpathagar.org

> শ্রেণীর সাহিত্য রচনার জন্য প্রথম শ্রেণীর বিদ্বান হওয়া প্রয়োজন। যে জীবনে অবসরের প্রাচুর্য্য নাই, জ্ঞান আহরণের সঙ্গতি নাই এবং অজস্র আয়াসের কৃচ্ছ্রতা নাই, তার স্বাভাবিক প্রতিভা যতই উচ্চাঙ্গের হউক না কেন, তার পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। বাইরন, নজরুল, বার্ণ, গোবিন্দ দাস নিছক কবিত্ব শক্তির দিক দিয়ে হয়ত প্রথম শ্রেণীর; কিন্তু বিশ্ব সাহিত্য সভায় তাদের স্থান প্রথম শ্রেণীতে নয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, স্বাভাবিক প্রতিভা সম্বল করে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী না হয়েও উচ্চ শ্রেণীর কবি বা সাহিত্যিক হওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান যুগে এ ধারণা একেবারেই অচল। এই কারণে আমাদের সাহিত্যিকদের উচ্চাঙ্গের বিদ্যার্থী না হলে চলবে না।[১১]

এরপর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব কালচার, এখানকার শিল্পকলা, নিজস্ব ভাষারীতির রূপরেখা সম্পর্কেও আলোকপাত করেন।

মূল সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ তার ভাষণে দু'টি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তার একটি পাকিস্তানের সাহিত্যের অভাব এবং অপরটি সাহিত্যিকদের আর্থিক সমস্যা। তিনি বলেন :

> আমাদের বহু কিছুরই অভাব রহিয়াছে এই কারণে আমাদের অভিযোগও রহিয়াছে। এইরূপ অভিযোগ শুনা যায় যে, গত ১১ বৎসরে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকগণ সমাজকে কিছুই দিতে পারেন নাই। কিন্তু আমি বলিতে চাই যে আমাদের কবি সাহিত্যকগণ অতিমানব নন, তাঁহারা স্বাভাবিক ও সাধারণ মানুষ। তাঁহাদিগেরও অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হয় এবং পরিবার পরিজনের ভরন-পোষণের চিন্তা করিতে হয়। আমার মনে হয়, যতদিন পর্যন্ত এই সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান না হয়, ততদিন পর্যন্ত আমরা অভিযোগ করিতে পারিব না। আমাদের অভিধান, ইতিহাস, পাকিস্তানী বাংলা ভাষায় নতুন ব্যাকরণ, নাটক, উপন্যাস এবং অন্যান্য বহু জিনিসের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন যদি প্রকৃত ও বাস্তব হয়, তাহা হইলে আমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারি।[১২]

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নূরুল ইসলাম চৌধুরী তার ভাষণে সমবেত সাহিত্যিকদের 'ঐতিহাসিক নগরী ইসলামাবাদে' (চট্টগ্রাম) স্বাগত জানিয়ে বলেন, "আমরা আশা করেছিলাম, মুসলমান জাতির একটি নিজস্ব স্বার্বভৌম রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন আমাদের এই দেশের সাহিত্য জাতীয় ভাবধারার অনুসরণে সুগঠিত হবে—এর ধারক ও বাহকে পরিণত হবে। কিন্তু বড়ই আফসোসের বিষয় এই যে, আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের মহীয়ান নেতা, কবি-সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক, সুধীবৃন্দ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে জাতীয় সাহিত্য গড়ে তোলার কাজে এদ্দিন উদাসীনই রয়েছেন। পক্ষান্তরে অনেকে এই দেশের

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন স্থানে, এই দেশের সাহিত্যকে প্রগতির নামে নানা প্রকার ইজমের টাকা দিয়ে আমাদের জাতীয় ভাবধারাকে বিজাতীয় ভাবধারার অন্ধ অনুকরণে বিকৃত রূপে রূপায়িত করে ভ্রান্ত পথে চালিত করার প্রয়াস পাচ্ছে। এতে জনগণমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে—অথচ এর প্রতিকারের সুরাহা করতে এযাবৎ কেউ এগিয়ে আসেননি।[১৩]

সেই স্থবিরতা কাটানোর লক্ষ্যেই চট্টগ্রাম সম্মেলন ডাকা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এতে 'দিকে দিকে অপরিণামদর্শ ও জাতীয়তার বিরোধী তথাকথিত 'যুবক ও তরুণ সম্মেলন' প্রতিকার প্রতিরোধের লক্ষ্যেই ছিল মুখ্য। তিনি বলেন :

> তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম—যদি আমরা পূর্ব পাকিস্তানের সকল বিশিষ্ট খ্যাতনামা সাহিত্যিক, সংবাদপত্রসেবী, কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও মণীষীদের এই প্রকৃতির রম্যনিকেতনে একবার সমবেত করে, তাঁদের মণীষাকে, তাঁদের সৃজনী শক্তিকে, তাঁদের সাহিত্যনীতিকে আত্মকেন্দ্রিক না রেখে সংঘবদ্ধ সংগঠনের মাধ্যমে সাহিত্য সৃজনের ও জাতীয় সাহিত্যকে উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত করতে পারি—তবে আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা পাকিস্তানী সাহিত্যকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেবার একটি ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে পারে।[১৪]

এই গতিশীলতা অর্জনের জন্য সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা ও উপায় উদ্ভাবনের আহবান জানিয়ে তিনি সাহিত্যিকদের কেন্দ্রীয় সাহিত্য সংস্থা গড়ে তুলে জেলায় জেলায় তার শাখা স্থাপন করে সাপ্তাহিক ও মাসিক বৈঠকের সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, তবেই হবে এই সাহিত্য সম্মেলনের সার্থকতা; পাকিস্তানের জাতীয় অগ্রগতি।[১৫]

৪. সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন : ৩ মে ১৯৫৮

৩ মে ১৯৫৮ শনিবার সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ। তার লিখিত ভাষণের বিষয় ছিল 'আমাদের সাহিত্যে পাকিস্তানী আদর্শ'। এই অধিবেশনে কবি গোলাম মোস্তফা 'পাক-বাংলার সাহিত্য' ও কবি আশরাফ সিদ্দিকী 'আজাদী-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনায় অংশ নেন মোজহারুল ইসলাম (পরবর্তীকালে মাযহারুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক), কবি আবদুস সালাম ও রেজাউল করিম।[১৬]

অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী এই অঞ্চলের স্বাধীনতা অর্জনের আত্মত্যাগের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি আজাদী-পূর্ব ভারতের চোদ্দ আনা মুসলমান কেন পাকিস্তানের পক্ষ নিল সে পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি ইসলামের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, মহর্ষি মনু বলেন, 'মানুষে মানুষে সাম্য নাই; ব্রাহ্মণের পদসেবার মধ্যে শূদ্র

www.nagorikpathagar.org

তার মুক্তি 'খুঁজে ফিরবে।' মহানবী বলেন, 'মানুষে মানুষে ভেদ নাই। কালা-ধলা, দেশী-বিদেশী সবাই সমান। একমাত্র আল্লাহর কাছে মানুষ তার মাথা নত করে।' হিন্দু ধর্ম নেতারা শিক্ষা দিয়েছেন, চাঁদ, সুরুজ, নদী, সমুদ্র, মরুপতি—এরা মানুষের পূজা পাওয়ার অধিকারী; ইসলামের ধর্মনেতা শিক্ষা দিয়েছেন, চাঁদ-সুরুজ, নদী-পর্বতের সৃষ্টি মানুষের সেবার জন্য, মানুষ তাদের সেবা-পূজার, নদী-পর্বতের সৃষ্টি মানুষের সেবার জন্য, মানুষ তাদের সেরা-পূজার জন্য সৃষ্ট হয় নাই'। মহর্ষি মনু বলেন, 'শিক্ষায় শূদ্রের অধিকার নাই, বেদ পাঠ তার পক্ষে পাপ; মন্দির দুয়ার তার সামনে রুদ্ধ।' মহানবী বলেন, 'শিক্ষালাভ নর-নারী নির্বিশেষে সকলের পক্ষে অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্য; মসজিদের দুয়ার সকল ধর্মপিপাসুর জন্য সর্ব সময়ে অবারিত।'[১৭]

ধর্মীয় এই মূল্যবোধ ও সংস্কার শিক্ষিত মানুষের মন থেকেও মুছে যায় না বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'আমরা মানবতার সম্বন্ধে সেবার পথে আমাদের দেশকে বড় করতে চাই, আমাদের জাতিকে বড় করতে চাই, ব্যক্তিগত জীবনে আমরা বড় হতে চাই। এই মহত্ত্ব অর্জনের সাধনা বিচিত্র এবং সাহিত্য হচ্ছে সেই বিচিত্র সাধনার অন্যতম প্রশস্ত পথ।'[১৮]

তিনি বলেন, পবিত্র কোরানের মর্মবাণী বাংলা ভাষায় সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব সাহিত্যকেই নিতে হবে। তিনি বলেন :

> আমাদের সাহিত্য কেবল ইসলামের বাণী বহন করেই তৃপ্ত থাকবে, এ কিন্তু আমাদের বক্তব্য নয়। আমাদের সাহিত্যে বিহঙ্গম-বিহঙ্গমার কথা থাকবে, দস্যুরাজ রত্নাকরের কথা সেখানে স্থান লাভ করবে, নব আলিফ-লায়লা, নব সিন্দাবাদের সমুদ্র অভিযান বর্ণিত হবে, এ জামানার শিরী-ফরহাদের আখ্যানে সে সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্য আমাদের জনগণের সামনে তুলে ধরবে সেই জীবনাদর্শের মহিমাময় চিত্র। যার স্বপন বৈভবে আকৃষ্ট হয়ে ইকবাল-কায়েদ্ব পাকিস্তানের দুর্জয় সাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন।[১৯]

ইব্‌রাহীম খাঁ সাহিত্যের জন্য 'লন্ডন, প্যারিস, মস্কো, নিউইয়র্কের' মায়াপুরীর দিকে তাকানোকে শুধু জায়েজ নয় ফরজ বলে অভিহিত করে বলেন, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করা অপরিহার্য প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে 'আমাদের সাহিত্যে আমাদের আপনজনের জন্য আমাদের নিজস্ব দুই দশটি কথা বলে যদি তাদের বুকে নব মহত্ত্বের স্বপন জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করি, তবে তাতে অপরাধটা কি?'[২০]

উপসংহারে প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ বলেন : 'অতীতে আমাদের যা কিছু ছিল, তার সবই ভাল, এমন যুক্তিহীন কথা আমরা কোনদিনই বলব না। তার মধ্যে যা মন্দ ছিল তা আজও দূর না হয়ে থাকলে তাকে নির্মমভাবে ঝেড়ে ফেলতে হবে; আর তার মধ্যে যা কিছু ভাল, তা ভাল জিনিসের সঙ্গে রূপায়িত করে পাকিস্তানের জীবনকে সরস, সুন্দর, সমৃদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

করে তুলতে হবে—আমাদের তরুণ সাহিত্যব্রতী বন্ধুদের সকাশে আজকে এই আমাদের আবেদন।[২১]

এই অধিবেশনে কবি গোলাম মোস্তফা তার 'পাক-বাংলার কাব্য-সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় উদ্ভব, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্ব-বাংলার আধুনিক কবিতা, ভবিষ্যতের কাব্য ও সাহিত্যের ভিত্তি প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

তিনি ইতিহাসবেত্তা মার্শম্যান, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনী দাস, রামগতি ন্যায়রত্ন, নীহাররঞ্জন রায়, দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রমুখের বক্তব্য উদ্ধৃত করে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে দেখান যে, বাংলা ভাষার জন্ম সংস্কৃত থেকে নয়, বা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর নয়, বাংলা ভাষা বরং সেমেটিক গোষ্ঠীর, যারা এদেশে দ্রাবিড় নামে পরিচিত।

তিনি বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য আলোচনার গোড়াতেই আমাদের তাই এই উপলব্ধি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন যে, বাংলা ভাষা মূলত দ্রাবিড় ভাষা, সেমেটিক ভাষা এবং যেহেতু সেমেটিক, কাজেই মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ এ ভাষার সঙ্গে বিজড়িত আছে। বাংলা লিপি ব্রাহ্মী লিপি থেকে গৃহীত। আর এই ব্রাহ্মী লিপি অশোকের পূর্বেই দক্ষিণ আরব থেকে ভারতে এসেছিল। কালে সেই লিপিই বঙ্গ লিপিতে রূপান্তরিত হয়েছে।"[২২]

বাংলা ভাষায় আরবী, ফারসী শব্দের আধিক্য উপরিউল্লিখিত কারণেই ঘটেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি একথাও বলেন যে, এর পেছনে ধর্মীয় বোধও ব্যাপকভাবে কাজ করেছে। প্রবন্ধে তিনি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার এই রূপ সম্পর্কে বলেন

> এদের আরবী-ফারসী মিশানো ভাষা দেখলে অবাক হতে হয়। এ এক নতুন সৃষ্টি। আর কিছুর জন্য না হোক, বাংলা ভাষাকে এমন চমৎকার ইসলামী রূপ যে তারা দিতে পেরেছেন, এই কীর্তি তাদের অক্ষয় হয়ে থাকবে। আজ সংস্কৃত-মুখর বাংলা ভাষার শব্দ ঝঙ্কার ও বাক্যবিন্যাস আমাদিগকে সম্মোহিত করে রেখেছে, নৈলে অন্য চোখ দিয়ে ও অন্য মন দিয়ে, অন্য কান দিয়ে, অন্য অনুভূতি দিয়ে দেখলে আমরা নিশ্চয়ই ওদের ভাষার সহজ প্রকাশগুণ ও লালিত্যের প্রশংসা না করে থাকতে পারতাম না।[২৩]

প্রবন্ধে ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি বাংলা চিঠি তিনি উদ্ধৃত করেন সজনী দাসের বাঙ্গালার ইতিহাস থেকে। চিঠিটি ছিল নিম্নরূপ :

> গরিব নেওয়াজ শেলামত
>
> আমার জমিদারি পরগণে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশিকিশতি হইয়াছে সেই দুই গ্রাম পয়শতি হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রী হরেকৃষ্ণ চৌধুরী আজ বায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মাল গুজারির শরববাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার

www.nagorikpathagar.org

সরজমিনেতে পহুছিয়া তোরকেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেওয়া দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১ শ্রাবণ[২৪]

ওই প্রবন্ধে কাব্যের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনাকালে কবি গোলাম মোস্তফা এরিস্টোটল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলের সংজ্ঞা আলোচনা করে বলেন, "Art for art's sake" নীতি এখন পরিত্যক্ত হয়েছে। আর্টকেও আজ মানব কল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে। Art for man's sake এইটাই হবে আর্টের নীতি। এই আলোকে কাব্য লিখতেও হবে, কাব্যের বিচারও করতে হবে। জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্য শিল্পে সত্য মঙ্গল ও সুন্দরের গভীর আবেদন আছে। এই তিনটের কম-বেশীর উপরেই শিল্পের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। কোরআন শরীফে কবি ও কাব্য সম্বন্ধে এই ধরনেরই উক্তি রয়েছে। কবি যেখানে সত্য, সুন্দর আর কল্যাণের অভিসারী, সেখানে সে বরেণ্য, আর যেখানে সে মিথ্যার উপত্যকায় ঘুরে ঘুরে মরে সেখানে সে ব্যর্থ বিড়ম্বিত।[২৫] মুসলিম কাব্যের রূপ ও প্রকৃতি কী হওয়া উচিত এ সম্পর্কে আলোকপাত করে তিনি পাকিস্তানী আদর্শে কাব্য-সাহিত্য রচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন : 'উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলার মুসলমানেরা একটা Superiority complex নিয়েই বাংলা ভাষার সেবা করে এসেছে। অথচ তাদের মধ্যে কোন অনুদারতা ছিল না বা aggressiveness ছিল না। স্বাকীয়তা বজায় রেখে হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশেই তারা সাহিত্য কর্ম করে গেছেন। এইটেই ছিল স্বাভাবিক। মুসলমানের কথা মুসলমানকেই বলতে হবে, হিন্দুর কথা হিন্দুকেই বলতে হবে। একে সাম্প্রদায়িকতা বলা অন্যায়। এটা স্বাভাবিক। এতে সাহিত্য বরং পরিপুষ্টি লাভ করে। মুসলমানেরা নীতি হিসাবে তাই এই তামদ্দুনিক সহনশীলতা গ্রহণ করেছিল। হিন্দুর রামায়ণ মহাভারত তাই এত সহজেই মুসলিম সুলতানদের দ্বারা অনূদিত হতে পেরেছিল। হিন্দুরা যদি পাদ্রীদের সঙ্গে যোগ না দিয়ে জুদা হয়ে না যেত, তবে হয়ত অন্য কোন একটা নতুন যুগের আবির্ভাব আজ আমরা দেখতে পেতাম।'[২৬]

সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার ওপর জোর দিয়ে তিনি দেশী শিল্প-সাহিত্য রক্ষায়, পুস্তক আমদানী নীতির সমালোচনা করে আমদানী বন্ধ না করে করারোপের প্রস্তাব দেন।

পরিশেষে গোলাম মোস্তফা বলেন, 'তাজমহল দেখার চেয়ে তাজমহল সৃষ্টি করা বেশী গৌরবের। সেই সৃষ্টিধর্মী তরুণ শিল্পীদের আজ ডাক দিয়ে যাই। আজ আমরা এক নতুন যুগের প্রবেশ দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি। এ-যুগ নভোভ্রমণের যুগ। এ-যুগে শুধু স্থূল মাটির পৃথিবীর কথা বললে চলবে না। না-আসা যুগের ইঙ্গিতও তাদের দিতে হবে। সেই অনাগত যুগের তরুণ শিল্পীদিগকে জানাই আজ খুশ আমাদিদ ও মুবারকবাদ।'[২৭]

www.nagorikpathagar.org

সম্মেলনের এই অধিবেশনে পঠিত অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকীর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'আজাদী-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্য'। প্রবন্ধে তিনি কায়কোবাদ থেকে শুরু করে আজাদী-উত্তরকালে সাহিত্য সাধনায় রত তরুণতম সাহিত্যসেবীর সাহিত্যের ওপর আলোকপাত করেন। এতে শুধু মুসলমান নয়, ওই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু-ধর্মাবলম্বী যারা সাহিত্য রচনায় ব্রতী ছিলেন, তাদের কাব্য-সাহিত্য সাধনারও তিনি মূল্যায়ন করেন।

তিনি বলেন :

> নদী মেখলা অরণ্যকান্তার বেষ্টিত পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মপ্রাণ সহজ সরল মানুষের জীবন ও জীবন সংগ্রাম সাহিত্যে বাঙময় হবার অপেক্ষায় আছে; সে জন্য শক্তিশালী বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল কবি-সাহিত্যিকগণ দিন দিনই এগিয়ে আসছেন।...
>
> একুশে ফেব্রুয়ারীর সোনাঝরা সকালে পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ দল বাংলা ভাষার জন্য যে রক্তদান করে গেছেন, সে কথা দেশবাসী ভোলেনি। সে সাড়া পৌঁছেছে ধানের ক্ষেতে কর্মরত কৃষকদের পাড়ায়, কারখানায়, ফ্যাক্টরীতে, স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, মন্দিরে-মসজিদে।
>
> অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার এ-আহ্বান উত্তরে-দক্ষিণে-পূর্বে-পশ্চিমে দেশে-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে এ আশা আমরা সকলেই করছি। উদ্ভট এবং দুর্বোধ্য কবিতা রচনা করে পশ্চিম বাংলার কবি সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই পাঠকদের বিরাগভাজন হয়েছেন। শ্যামল আমাদের দেশ—শ্যামল আমাদের দেশের কবিদের মন। Sincerity হবে আমাদের কাব্যের প্রধান গুণ।[২৮]

ওই দিনের বিকালের অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিল 'পাক-বাংলার ভাষা ও কালচার'। এতে সভাপতিত্ব করেন আবুল মনসুর আহমদ। প্রবন্ধ পাঠ করেন কবি মঈনুদ্দীন, আজহারুল ইসলাম ও সুলতান আহমদ ভূঁইয়া। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ ও চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান চৌধুরী।[২৯]

কবি মঈনুদ্দীন তার 'এবার ফিরাও আঁখি' শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ব বাংলার সাহিত্যের নিজস্বতা সৃষ্টি ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়ে ব্যর্থতার জন্য তিনি সরকারী উদাসীনতা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবকেই বিশেষভাবে দায়ী করেন। তিনি অন্ন-বস্ত্রের অভাবের চেয়ে শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির নিজস্বতার অভাবকে বেশী মারাত্মক বলে অভিহিত করে বলেন : 'আমি ঘাবড়াই তখন, যখন দেখি, আমাদের শিক্ষা, আমাদের সাহিত্য, আমাদের তমদ্দুন অক্টোপাসের কবলে কবলিত হয়ে পড়েছে। তার ওপর হামলা শুরু হয়েছে চারদিক থেকে ষড়যন্ত্রকারীদের। আজি অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, সেই ঘাবড়াবার সময় আজ এসেছে। সেই সঙ্কটেরই এখন সম্মুখীন আমরা।'[৩০]

www.nagorikpathagar.org

তিনি এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের ভাষার ও সাহিত্যের স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, কোলকাতা-কেন্দ্রিক যে ভাষায় আমরা সাহিত্যচর্চা করছি, তা দু'দিনে যেমন গড়ে ওঠেনি, তেমনি দু'দিনে এর পরিবর্তনও সম্ভব নয়। এ জন্য সময় লাগবে। তবে তার জন্য চাই সচেতন প্রয়াস।[৩১]

অধিবেশনে আজহারুল ইসলাম পঠিত প্রবন্ধ ছিল 'পাক-বাংলা ভাষার লেখ্য ও কথ্য রীতি'। প্রবন্ধে তিনি কলকাতা-কেন্দ্রিক ভাষার মোহ কাটিয়ে পূর্ব-বাংলার ভাষারীতিকে সাহিত্যের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকদের প্রতি আহ্বান জানান এবং পূর্ব বাংলার ভাষায় যারা সাহিত্য রচনা করেছেন, তাদের সাহিত্য-কৃতি অনুসরণের পক্ষেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> জানি কেহ কেহ পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা কটমট ও দুর্বোধ্য বুলিতে পরিপূর্ণ বলিয়া অভিযোগ করেন। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা তো এই অভিযোগ করেনই, পরন্তু পূর্ব পাকিস্তানীদের কাহারো কাহারো মুখে এমন কথা শুনা যায়। পশ্চিমবঙ্গীয়দের এই অভিযোগ তাহাদের উচ্চমন্যতাসঞ্জাত। তাহাদের মতে পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা কোন ভাষার দরকার নাই। পশ্চিমবঙ্গে যাহা বলে তাহাই এখানে চলিবে।... দীর্ঘকাল কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সদর দফতর থাকায় তাঁহারা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও ভাবিতেছেন যে, পাক-বাংলা সাহিত্যের সকল প্রেরণা এখনও কলিকাতা হইতেই আসিবে।... পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ লোকের ব্যক্তিত্বকে সাহিত্যে রূপ দিবার জন্য যে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন তাহা তাঁহারা বুঝিতে চাহেন না।... আমাদের দেশের শিক্ষা যখন পূর্ণতা লাভ করিবে এবং তথাকথিত শিক্ষিতরা যখন সুস্থ ভাব ধারণ করিয়া চিন্তাশীল হইবেন, তখন তাঁহারা এই হীনমন্যতা হইতে রক্ষা পাইবেন।[৩২]

প্রবন্ধে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পূর্ব বাংলার ভাষায় অঞ্চলভেদে কথ্য ভাষায় ক্রিয়াপদের যে ব্যবহার-বৈচিত্র্য রয়েছে তা চর্চায় এক সময় একটি সমন্বিত রূপ নেবে।[৩৩]

সভাপতি আবুল মনসুর আহমদ পড়েন 'পাক-বাংলার কালচার ও ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ। তিনি তার দীর্ঘ প্রবন্ধে কালচারের বিস্তৃত সংজ্ঞা যেমন নির্ধারণ করেন, তেমনি পাক-বাংলার কালচারের স্বরূপ কী হবে, সে সম্পর্কেও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি পাক-বাংলা ভাষার সম্ভাব্য রূপ, কেতাবী বাংলা, পশ্চিমবাংলার বাংলা, পাক-বাংলার বাংলা, এর রূপ, বুলি, ক্রিয়াপদের ব্যবহার নিয়েও অনুপুঙ্খ আলোচনা করেন। তিনি তার প্রবন্ধে শুধু ইসলামকেই পূর্ব-বাংলার সংস্কৃতির নিয়ন্তা হিসাবে চিহ্নিত করেননি, সেই সঙ্গে সহস্র বছর ধরে পূর্ব বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকেও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়েছেন।[৩৪]

www.nagorikpathagar.org

তিনি বলেন, 'আগেই কইছি, রাষ্ট্রীয় জাতি হিসাবে আমরা নতুন। সেদিন মাত্র আমরার রাষ্ট্রের পয়দায়েশ। কাজেই আমরার জাতিত্ব ও কৃষ্টি সম্বন্ধে কারও সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা থাকবার কথা নয়। তাই বলে আমরার নিজস্ব একটা কালচার নাই, এবং সে কালচার আমরার প্রতিবেশী জাতি বা উপজাতির কালচার থেকে পৃথক নয়—এটা সত্য হতে পারে না।'[৩৫]

তিনি তার প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে,

> আমি এখানে সারা পাকিস্তানের কথা কইব না, শুধু পূর্ব পাকিস্তানের কথাই কইব। কারণ কৃষ্টি ও ভাষার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সত্তা পৃথক ও নিজস্ব।[৩৬]

পূর্ব বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবুল মনসুর আহমদ বলেন যে, বাঙালীদের ধর্ম ও সমাজজীবনে, বিশ্বাসে-ঈমানে, আচারে-ব্যবহারে, বিয়ে-শাদিতে, শোকে-মাতমে, আদব-কায়দায়, খেলাধুলায়, আর্টে-সাহিত্যে, নাচে-গানে এক গৌরবময় কালচার ছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলে তা প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি তার পুনর্বাসনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

পাক-বাংলার ভাষার রূপ আলোচনাকালে আবুল মনসুর আহমদ বলেন : "দ্বিজেন ঠাকুর ও রবি ঠাকুরের চেষ্টায় বাংলা ভাষা বড় জোর পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্তের ভাষা হতে পারছিল। প্রকৃত জনগণের ভাষা হতে পারে নাই। কারণ বাংলার আসল জনগণ যে মুসলমানরা এবং তারার ভাষাই যে জনগণের ভাষা, এ সত্য হয়ত ওই মণীষীরার নিকট ধরা পড়ে নাই। তারপর নজরুল ইসলাম তাঁর অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে ধূমকেতুর মত বাংলা ভাষার আকাশে উদিত হন এবং মুসলিম বাংলার ভাষাকে বাংলা সাহিত্যের ভাষা করবার সফল চেষ্টা করেন। নজরুলের এই চেষ্টার বিরুদ্ধতা আসে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা থেকে, তাতে শুধু সাম্প্রদায়িক তিক্ততাই বাড়ে না, হিন্দু বাংলা ও মুসলিম বাংলার কালচারের পার্থক্যও তাতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।"[৩৭]

তিনি বলেন, ভাষা ও সাহিত্যের ওপর এখন কলকাতার বদলে ঢাকার প্রভাব নিশ্চিত করতে হবে। এ অঞ্চলের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখের ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হওয়া আবশ্যক বলে তিনি মনে করেন। এ সম্পর্কে তার বক্তব্য :

> আমি আগেই বলছি, আমরার রাজধানীর তথা অন্যান্য শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালী ভদ্রলোকের কথ্য ভাষা হবে আমরার সাহিত্যের ভাষা। তারা তারার অফিসে-আদালতে, ক্লাবে-বৈঠকখানায়, স্কুলে-কলেজে যে ভাষায় কথা কয়, যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে, সেইটাই আমরার সাহিত্যের ভাষা। এ ভাষা এখন ফর্মেটিভ স্তরে।[৩৮]

www.nagorikpathagar.org

তার বক্তব্যের সমর্থনে তিনি এই প্রবন্ধেই "আমাদের"-এর বদলে "আমরার", "হয়েছিল"'র বদলে "হইছিল", "করছে"'র বদলে "করতেছে" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি নিজেও এ রীতি ধরে রাখতে পারেননি। এর বদলে তিনি প্রচলিত ভাষারীতি অনুসরণ করেন।

৫. সম্মেলনের তৃতীয় দিন : ৪ মে ১৯৫৮

এই দিন সকালে 'পূর্ব বাংলার মনন' শাখার অধিবেশন বসে। এতে সভাপতিত্ব করেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। প্রবন্ধ পাঠ করেন চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ আবদুস ছোবহান খান চৌধুরী, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক রেজাউল করিম, অধ্যাপক মাহফুজুল হক ও অধ্যাপক মুজফ্‌ফর আহমদ।[৩৯]

আবুল কালাম শামসুদ্দীন তার 'পাক-বাংলার মনন ধারার পটভূমি' প্রবন্ধে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মনন-বিকাশের বৈপরীত্যের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, পাকিস্তানের অভ্যুদয়ে সে স্বাতন্ত্র্যেরই বিজয় অর্জিত হয়েছে। তিনি বলেন, আজাদী-উত্তরকালের সাহিত্যে সেই স্বাতন্ত্র্যের কোন পরিচয় এখনও পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি, বরং এক শ্রেণীর লোকের মনে বিদেশী সম্মোহন ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে। তিনি তা প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন :

> কিন্তু পাকিস্তান-পূর্ব যুগে এখানকার মুসলমানদের মনে জাতীয় রেনেসাঁর বাণী যে রূপ জোর বেঁধেছিল, পাকিস্তান-উত্তর যুগে দেখা যাচ্ছে, তা যেন ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসছে। এটা নিশ্চিতভাবে দুঃসংবাদ। আবার বিদেশী বিজাতীয় ওয়স ওয়াসা পাকিস্তানী তরুণ মুসলিম মানসে মায়াজাল বিস্তার করছে দেখতে পাচ্ছি। তার ফলে যে আত্মস্থতার স্ফূরণ হয়েছিল জাতীয় জীবনে, তা ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে এবং আবার অন্ধ পরানুকারিতার সম্মোহন আমাদের জাতীয় জীবনকে কোন অন্ধকারের অতল গর্তে ঠেলে দেওয়ার আয়োজন করছে। নেপথ্যে দেখা যাচ্ছে, গত যুগের এক দল ছিট্‌কে-পড়া সম্মোহিত পাণ্ডিত্যাভিমানী এ অপচেষ্টার পেছনে ইন্ধন জোগাচ্ছেন। এর গতিরোধ করা দরকার। পাক-বাঙলার আত্মস্থ তরুণদের উদ্দেশে এ আহবান আমি জানিয়ে রাখলাম।[৪০]

মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ তার 'পাক-বাংলার চিন্তাধারার বিবর্তন' প্রবন্ধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে মানুষের চিন্তাধারায় যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সে কথা উল্লেখ করেন। তিনি মানুষের নানাবিধ মূল্যবোধে ধস ও ক্ষয় এবং আত্মস্বার্থমুখী-প্রবণতার ওপরও আলোকপাত করেন। প্রতিদিন মানুষ যে কঠোরতর বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে, প্রতিদিন যে দুর্দশা, প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের মুখোমুখি হচ্ছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা

www.nagorikpathagar.org

করে বলেন, সাহিত্যেও প্রতিফলিত হচ্ছে এই জীবনের চিত্র। তার তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে বিগত যুগের আদর্শবাদিতার ধারা। তিনি এই কাঠিন্য, হতাশা, অন্ধকারাচ্ছন্নতার চিত্র উদ্ধৃত করেন উর্দু কবি সাহের লুধিয়ানভী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর জীবনানন্দ দাশ থেকে। তিনি বলেন :

> সাহিত্যের পাতায় জাতির চিন্তাধারা তার গতিপথ এঁকে চলে যায়। আমাদের আজিকার এই নিষ্করুণ জীবনধারা হতে নির্গত যে চিন্তাধারা—ইহাই এ-যুগের সাহিত্যকে রূপদান করছে। তাই আজিকার দিনে যে সাহিত্য আমাদের সমাজে জন্মলাভ করছে, তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হচ্ছে realistic বা বাস্তবভিত্তিক। রূপকথার জামানা নিঃসন্দেহে আমরা পার হয়ে এসেছি। রাজরানী বা রাজকন্যাদের নাটকীয় জীবনের রোমান্স এখন বাসি হয়েছে। তার স্থলে গ্রামের চাষী অথবা কারখানার শ্রমিকের বঞ্চিত জীবনের সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার আলেখ্য আজ লেখকদের সহানুভূতি পাচ্ছে বেশী। কারণ এদের সংসার যাত্রার খুঁটিনাটি কাহিনী একান্তভাবে বাস্তব। আমাদের আশেপাশেই এদের আনাগোনা। ...পাক-বাঙলার কবিতায় ফেনিয়ে উঠছে এদের দুঃখময় জীবনের মর্ম্মোচ্ছ্বাস; পাক-বাঙলার উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে এদেরই পান্ডুর মুখচ্ছবি।[৪১]

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ক্ষুধাতাড়িত মেহনতী শ্রেণী যে অধিকমাত্রায় এবং স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যের পাতা দখল করছে, সে কথা উল্লেখ করে বলেন, ধনবৈষম্য দূর করায় উদ্যোগী হতে হবে, গরীবরা এখন কষ্ট স্বীকার করলে আখেরাতে বেহেশত পাবে, এই দোহাই এখন আর খাটছে না। এ ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশিত জাকাৎ, ফিৎরা, খয়রাত দেবার নীতিও অবহেলিত হচ্ছে। এই 'ক্ষুধার এলাকা যতই বেড়ে যাচ্ছে ততই মানুষ খোদার ওপর আস্থা হারিয়ে বসছে।'[৪২] আর এই সত্যই তাই এখন সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। তাই উঠে যাচ্ছে পাপ-পূণ্যের ভেদাভেদও। স্পর্ধিত কামতৃষ্ণা চিরন্তন ও বাস্তব হলেও এতকাল তার সঙ্গে সমাজ মনের যে ঘৃণার ভাব ছিল, আজ তা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এখন সাহিত্যে ওই বাসনা চরিতার্থের জন্য আর 'রজনীর অন্ধকারের প্রয়োজন হয় না। প্রকাশ্য দিবালোকেই উহার বিজয় রথের ঘর্ঘর ধ্বনি শুনা যাচ্ছে।'[৪৩]

তবে, তিনি বলেন, 'পাকস্থলীর দাবী বা আদিম প্রবৃত্তিসমূহের বুনিয়াদী মর্যাদাকে ভিত্তি করে রচিত সাহিত্য সমাজের সাময়িক প্রয়োজন মেটাতে পারে। সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করাও উহা দ্বারা সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের স্থান পূরণ উহা দ্বারা সম্ভবপর নয়, যদি না মহত্ত্বর আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। সাহিত্য বাস্তবতাভিত্তিক হলেই যে উহাকে উচ্চাদর্শ বর্জিত হতেই হবে, এ তর্কও অকাট্য মনে হয় না।'[৪৪]

তিনি জঠরের জ্বালা ও মনের ক্ষুধা উভয়ই নিবারণের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এর সমন্বয় সাধনের ওপর জোর দিন। উপসংহারে তিনি বলেন :

www.nagorikpathagar.org

> যে সাহিত্য ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং কামনার ইতিহাস হতে, এক কথায় ভূমির কোলাহল থেকে, উচ্চাদর্শের মহিমান্বিত রূপায়ণের ভিতর দিয়ে—ক্রমশঃ মানব-মনকে ভূমার জগতে পৌঁছাবার চেষ্টা করে, সেই সাহিত্যই চিরকাল বেঁচে থাকবার দাবী করতে পারে। বর্তমান যুগ বাস্তবতার যুগ হলেও সেরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি আকাশ-কুসুম বলে মনে হয় না। এই দুঃখ-বেদনা ও আনন্দ উৎসব সমর্থিত বাস্তব জগৎ যেমন সত্য, অবলুপ্ত চেতনার দুর্জ্ঞেয় রাজ্য হতে অলক্ষ্য পথে যে উহার গতি নিয়ন্ত্রণ হয়, সে কথাও তেমনি অনস্বীকার্য। একের সার্বভৌমত্ব ও অপরের অস্বীকৃতি একদেশদর্শিতার পরিচায়ক। দুইয়ের সমন্বয় দ্বারাই হতে পারে পাক-বাংলার চিন্তাধারার সুষ্ঠু ও সার্থক বিবর্তন।[৪৫]

অধিবেশনে 'তামদ্দুনিক পুনর্গঠন' শীর্ষক প্রবন্ধে আবদুস সোবহান খান চৌধুরী ভারতে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হিন্দু জাতীয়তাবাদ বিকাশ প্রয়াস এবং আল্লামা ইকবালের মুসলিম জাতীয়তাবাদ বিকাশ প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'একটা জাতি কি চিন্তা করে, তার আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি, তার ধর্ম্ম, তার ভাষা, তার সাহিত্য, তার সৃজনশীলতা এসব নিয়ে গড়ে উঠে একটা তামদ্দুনিক পূর্ণরূপ। এই যদি তমদ্দুনের পরিচয় হয়, তবে একথা কোনরূপ দ্বিধা না রেখেই স্বীকার করা যেতে পারে যে, অবিভক্ত বাংলার মুসলমানেরা হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক তমদ্দুনের অধিকারী ছিল।...যদিও অবিভক্ত বাংলা ছিল আমাদের স্বদেশ, বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলার উত্থান-পতনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আমাদের উত্থান-পতনের, তবু আমরা এক স্বতন্ত্র কৃষ্টির অধিকারী ছিলাম। ধর্ম্মে এবং আচারে ব্যবহারে আমরা ত' স্বতন্ত্র ছিলামই, এমন কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়াও আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য কিছুটা বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।'[৪৬]

সেই স্বাতন্ত্র্যকে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তোলার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। আবদুল সোবহান খান চৌধুরী বলেন, 'তার ভিত্তি হবে ইসলাম।'

প্রবন্ধে তিনি শিক্ষা, বিশেষ করে নারী শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেন, 'ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে নারী শি ব্যতীত কোন জাতি পূর্ণভাবে উন্নতির পথে কিছুতেই এগিয়ে যেতে সক্ষম হয় না।' তিনি দেশীয় কৃষ্টি বিকাশে গ্রামোন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি মুক্ত করার লক্ষ্যে বলেন :

> তরুণ মনের বিপুল শক্তিকে আমাদের সঠিক পথে চালনা করতে হবে। স্কুলে, কলেজে, গ্রামে, শহরে পাঠাগার, ব্যায়ামাগার, কৃষ্টি সংঘ, ইত্যাদি এই ধরনের আরও অনেক কিছু গঠন করে ছাত্র সমাজকে আমরা রাজনীতি থেকে বাইরে রাখতে অনেকটা সাহায্য করতে পারি এবং তাদের কাছ থেকে কৃষ্টিগত আমরা অনেক কিছু পেতে পারি।[৪৭]

www.nagorikpathagar.org

তিনি বলেন : 'পূর্ব পাকিস্তানে যদি কোথাও নিজস্ব কৃষ্টি থেকে থাকে, তা হচ্ছে এই অবহেলিত গ্রামগুলির মাটিতে ও বাতাসে। তাই এই সমস্ত সরল এবং সাধারণ গ্রামবাসীদের স্তিমিত কণ্ঠে আবার আমাদের রস ধরাতে হবে, বাঁচার মত তাদের বাঁচতে দিতে হবে, তবেই তাদের কণ্ঠে আবার গান বেজে উঠবে। গ্রামে গ্রামে কৃষ্টি সংঘ খোলার মাধ্যমে আমরা তাদের বেশ উৎসাহিত করতে পারবো। কৃষ্টি সংঘ থেকে খেলাধূলার ব্যবস্থা করে আমরা এ পথে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারি। এ-ব্যাপারে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে আন্তরিকতা নিয়ে।'[৪৮]

অধিবেশনে অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ পঠিত প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'আমাদের তামুদ্দনীন পুনর্গঠন'। তিনি কোন দেশের তমদ্দুন গঠনের পেছনে ক্রিয়াশীল ভাষা-সাহিত্য, শিল্প ও কারুকার্য, ধর্ম-দর্শন-রাজনৈতিক মতবাদ ও সমাজনীতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এর তাত্ত্বিক আলোচনা করেন। তিনি পাকিস্তানী তথা পূর্ব-পাকিস্তানী সংস্কৃতির পর্যায়ক্রমিক বিকাশ তুলে ধরেন।

তিনি ভারতবর্ষে ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণ করেন এবং উপমহাদেশে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম রীতি-নীতির যে মিশ্রণ ঘটেছে, তার স্বরূপ তুলে ধরে বলেন, পরবর্তীকালে 'সাধারণ ভারতীয় সংস্কৃতির মত বাংলাদেশের সংস্কৃতিও মুসলিম সংযোগের ফলে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।'[৪৯]

মুসলিম বাংলার সংস্কৃতি বিকাশে তিনি সাতটি আন্দোলনের উল্লেখ করে তার অবদান বিশ্লেষণ করেন। এই সাতটি আন্দোলন হল : (১) ফারাইজি আন্দোলন (২) আলিগড় আন্দোলন, (৩) আহলে হাদীস আন্দোলন, (৪) খেলাফত আন্দোলন, (৫) বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, (৬) রেনেসাঁ আন্দোলন ও (৭) পাকিস্তান আন্দোলন।[৫০]

বিভাগ পরবর্তীকালে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের তিনটি আন্দোলনের কথা তিনি উল্লেখ করেন। এ তিনটি হল : (১) জামাতে ইসলামী আন্দোলন, (২) তমদ্দুন মজলিসের আন্দোলন ও (৩) বিশ্বভারতীয় ও মস্কোপন্থী আন্দোলন।[৫১]

জামাতে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন, 'শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের কোন সুষ্ঠু কার্যক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়নি। একথা ভুললে চলবে না— সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সুকুমার কথাগুলো জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। জীবনের এ দিককে অস্বীকার করে কোন জাতিই টিকতে পারে না।'[৫২]

তমদ্দুন মজলিসের আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন, এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন।

বিশ্বভারতী ও মস্কোপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন, 'পরস্পরবিরোধী বিশ্বভারতী আন্দোলনের যারা সমর্থক, তারা ধর্মবিদ্বেষী নন বরং খুব নিষ্ঠাবান ধার্মিকের মত রবীন্দ্রধর্মের সর্মথক। রবীন্দ্রনাথের ধর্মকে, বৈদান্তিক ধর্মের সঙ্গে প্যাগানিজমের

www.nagorikpathagar.org

(নিসর্গবাদের) মিশ্রণ বলা যেতে পারে।...অপরদিকে মস্কোপন্থী মানুষ মাত্রেই ধর্মীয় সাধনা ঐতিহ্যের বিরোধী। তাদের চোখে মানুষের শ্রেণী ও তার সংগ্রাম দুনিয়া জুড়ে কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই একমাত্র সত্য।[৫৩]

এই ধারাকে তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংস্কৃতি-নির্মাণের পরিপন্থী হিসাবে উল্লেখ করে বলেন :

> বাংলা ভাষায় আমাদের আদর্শের রূপায়ণের জন্য ভাষাকেও ভাবের উপযুক্ত বাহন করে তুলতে হবে। আমাদের ভুললে চলবে না—ভাবের উপযুক্ত বাহন না হলে কোন ভাষাই তার কর্তব্য আদায় করতে পারে না। আমাদের তমদ্দুনের মূল কেন্দ্র কোরআন পাক আরবী ভাষায় লিখিত। ইসলামের বিস্তৃতির ফলে ইসলামী তমদ্দুনের সংস্পর্শে এলে পর ফারসিতে ইসলামী ভাবধারা প্রকাশের জন্য তাকে নতুন ঢং-এ ঢেলে গঠন করা হয়। তার ফলে ফারসি দ্বিতীয় আরবী ভাষায় পরিণত হয়। তেমনি তুর্কি বা উর্দু তৃতীয় আরবী ভাষায় পরিণত হয়েছে। বাংলাকে তেমনি আর একটি আরবী ভাষায় পরিণত করতে হবে। তবেই আমাদের তামুদ্দনীন পুনর্গঠন সম্ভবপর হবে।
>
> পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, নতুন রাষ্ট্রের নতুন জীবনে, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারার রূপায়ণের জন্য সকলকেই কাজে নামতে হবে। সাহিত্যের সকল দিকে যাতে ইসলামী ভাবধারার রূপায়ণ সফল হয়, তার জন্য প্রবন্ধকার, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, কবি সকলকেই—এই ধারণার আলোকে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে। আসুন, যে দায়িত্ব নিয়ে এ-দুনিয়ায় এসেছি—সকলে মিলে তাকে পালন করে এ-দুনিয়ায় আমাদের কর্তব্য পালন করে যাই। আমীন!![৫৪]

অধ্যাপক মাহফুজুল হক 'সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি' প্রবন্ধে সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতি-অর্থনীতির গভীর সংযোগের কথা উল্লেখ করে পূর্ব বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি নির্মাণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, 'সাংস্কৃতিক পরানুখতা বা সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব জাতীয় জীবনে চরম দুর্দিন ডেকে আনে। অন্যদিকে কোন জাতিকে ধ্বংস করার অশুভ উদ্দেশ্য থাকলে তাকে সফলভাবে কার্যকরী করার পন্থা হচ্ছে, তার সাংস্কৃতিক জীবনের গোড়া কেটে দেওয়া।'[৫৫]

তিনি ভারতে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক জাতি এবং তা রূপায়ণে হিন্দু লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাই যে বড় ছিল, তার স্বপ্রমাণ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এই উভয় জাতির মূলগত পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্ভব। কোন পার্থক্য নেই বলে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা দিয়ে সে বন্ধুত্ব বা মিলন সম্ভব নয়।[৫৬]

তিনি উল্লেখ করেন যে, 'এ দেশেরই কিছুসংখ্যক লেখক-শিল্পী সোজা পথ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে চাতকের মত তৃষিত নয়নে সীমান্তের ওপারের দিকে দৃষ্টি

www.nagorikpathagar.org

নিবদ্ধ করে আছেন।' এই মনোভাবকে হীনমন্যতা হিসাবে উল্লেখ করে অধ্যাপক ইসলাম বলেন :

> নিজেদের অজ্ঞতা, কাপুরুষতা ও চিন্তার ক্ষেত্রে দেউলিয়াপনাকে ঢাকতে গিয়ে এরা কেবল নিজেদের অপমান করছে না, সঙ্গে সঙ্গে জাতির জন্য বয়ে আনছে অপমানের বোঝা। নিজেদের ইতিহাস, তাহজীব তমদ্দুন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবই তাদের এই হীনমন্যতার কারণ। মূর্খের কাছে পরের ব্যাখ্যাকে সব সময় বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মনে হয়।[৫৭]

তিনি এই মনোভাব পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পদ্মাপাড়ের জীবনযাপন প্রণালীতে যে বিশেষ ছাপ রয়েছে, এদের জীবনের সকল গতিতে যে রঙ, বৈচিত্র্য ও জীবন-দর্শন প্রতিফলিত পরিস্ফুট' তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। আমাদের কাব্য-সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হবে তাদের জীবন।

অধ্যাপক মাহফুজুল হক তার প্রবন্ধে শিক্ষাঙ্গন ও আদালতের ভাষায় বাংলা পরিভাষা তৈরির ক্ষেত্রে মানুষের মুখের ভাষা ও জনমানুষের বোধগম্য ভাষা ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি 'আমাদের ঐতিহ্য, ইতিহাস ও কৃষ্টি সংবলিত অন্য ভাষায় লিখিত পুস্তকের বাংলায় অনুবাদ করারও সুপারিশ করেন। পরিশেষে তিনি বলেন :

> মূল্যবোধ, যুক্তি বিচার ও সহনশীলতাই হবে আমাদের কাজের মাপকাঠি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গোঁড়ামী, অন্ধ অনুকরণ ও রক্ষণশীলতা যেমন বর্জ্জনীয়, তেমনি নিজের মতকে একমাত্র সত্য বলে ভাবতে যাওয়াটাও অত্যন্ত মারাত্মক। Agree to differ করার মনোভাব আমরা যেন না হারাই। আজকের দিনে তাই দেশপ্রেমিক শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের পারস্পরিক সংহতি, সহযোগিতা ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।[৫৮]

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ওই অধিবেশনে পঠিত তার 'বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে পন্ডিতদের জনবিচ্ছিন্ন আর বুদ্ধিজীবীদের জনসম্পৃক্ত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেন। এক্ষেত্রে সংস্কৃতি-চিন্তা ও সংস্কৃতি-চর্চার সঙ্গে আজাদী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন : 'ব্যক্তির ভেতর যে অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে এবং পরাধীনতার বন্ধনে যে সম্ভাবনা আড়ষ্ট ও পঙ্গু হয়ে যাচ্ছিল, আজাদী চেয়েছিলাম তারই বিকাশকে নির্বিঘ্ন করার জন্যে। অর্থাৎ প্রয়োজনটা ছিল সাংস্কৃতিক। আমরা তাই অবিভক্ত ভারতের অন্তর্গত অবস্থায় যে শুধু রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চেয়েছি, তা নয়, বরং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও সংস্কৃতির বিকাশ-পরিশ্রুত স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন করেছি। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাটা প্রথম ধরা পড়েছিল সংস্কৃতি চিন্তাতেই, আর সেখান থেকেই তা সমাজ দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয়েছিল। প্রধানতঃ রাজনৈতিক কর্মের মধ্য

www.nagorikpathagar.org

দিয়েই আজাদী অর্জিত হয়েছে সত্য; কিন্তু সাংস্কৃতিক চেতনার ওপরই সে কর্মের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত ছিল।'[৫৯]

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পাকিস্তান আন্দোলনের লক্ষ্য, সেক্ষেত্রে রেনেসাঁর প্রতিশ্রুতি, ইকবালের রেনেসাঁ-চেতনা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি মানুষের ভৌগোলিক চেতনার ওপরও বিশেষ জোর দিয়ে বলেন :

> আমাদের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যে ইসলামের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ধর্মগত যে ঐতিহ্য আমাদের রক্ত-মাংস-মজ্জায় মিশে আছে, তার প্রভাব এতটা শক্তিশালী যে, পুরাতন ভূগোল কেটে নতুন ও অভূতপূর্ব ভূগোলের সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার ছিল। পাশাপাশি বাস করা সত্ত্বেও প্রতিবেশী হিন্দুর পৌত্তলিকতাকে মুসলিমরা যে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি তার ব্যাখ্যাও এখানে পাওয়া যাবে। আচার-আচরণে, লৌকিক ক্রিয়া-কলাপে, ধ্যান-ধারণায় এই দুই সম্প্রদায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে। রাম-রাবণ, কর্ণ-ভীমের কাহিনী শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মুসলিমই শুনেছে কিন্তু তাদের আপন বলে গ্রহণ করতে পারেনি। দুই সম্প্রদায় দুই প্রকারেই উপকথা-কাহিনী থেকে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছে। আর একথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, বহু বিষয়ে পৃথক হয়েও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যে ঐক্যবদ্ধ, তা এই আদর্শের বন্ধনে। বিচ্ছিন্নভাবে টিকতে পারে না বলেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এই ঐক্য—এমন যুক্তি দুর্বল। অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক ইউনিট হিসাবে বরং গোটা বাংলাদেশের এক থাকাটাই সঙ্গত হত। কিন্তু তা না থেকে বিচ্ছিন্ন দুটি ভূখন্ড আজ যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তার কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র—আদর্শিক চেতনার ঐক্যে। আজাদী আন্দোলনের যে সাধারণ ঐতিহ্য রাষ্ট্রের দুই অংশকে যুক্ত করেছে, তার সাথেও ধর্মের যোগ বর্তমান।[৬০]

এ প্রসঙ্গে তিনি ধর্ম হিসাবে ইসলামের গতিশীলতার বিষয়ের ওপরও আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, 'প্রগতিবাদী বললেন, ধর্মের সাথে সংস্কৃতির সংমিশ্রণের চেষ্টা প্রতিক্রিয়াশীল। কেননা মূলতঃ স্থবির বলে ধর্ম সংস্কৃতির চলিষ্ণুতার সাথে সংযোগ রাখতে অক্ষম। কিন্তু ধর্ম হিসাবে—ধর্ম না বলে আদর্শ বলাই সঙ্গত—ইসলামের বৈশিষ্ট্যই এই যে, অনন্ত বিকাশ সম্ভাবনায় সে সমৃদ্ধ। ইসলামের প্রধান দুটি মূল্যবোধ—আল্লাহর একত্ব ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব চিরন্তন। কিন্তু পরিবর্তনশীল সমাজ পরিবেশে এর প্রয়োগ-পদ্ধতির ভিন্নতাও সেই সঙ্গে স্বীকৃত। ইজতিহাদ অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা মূলনীতি দুটি কোন পরিবেশে, কীভাবে প্রযুক্ত হবে, তা নির্ধারণের নির্দেশের মধ্য দিয়ে এ আদর্শ সভ্যতা

www.nagorikpathagar.org

বিকাশের জন্য পথ কেটে রেখেছে। আর আল্লাহর একত্ব ও মানুষের প্রতিনিধিত্বের নীতি দুটির ভেতর জুলুমবিহীন সমাজ গড়ে তোলার পথ নির্দেশ রয়েছে।'[৬১]

তিনি বলেন, 'জীবনাদর্শ হিসাবে ইসলাম তাই কল্যাণ বিরোধী নয়, স্থবির ত নয়ই। পুরোহিত মোহান্তদের হাতে অন্য ধর্ম যেখানে শোষণ ক্ষমতা তুলে দিয়েছে, ইসলাম সেখানে মানুষের সর্বপ্রকার শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্যে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেছে। অন্য ধর্ম যখন প্রাচীন আচার ও আচরণের প্রতি প্রশ্নহীন ভক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়েছে, ইসলাম তখন মানুষের বিকাশ সম্ভাবনাকে মর্যাদা দিয়েছে।'[৬২]

জীবনাদর্শ হিসাবে ইসলাম যাতে সমাজের সকল কর্মে প্রতিফলিত হয়, তার ওপর নজর রাখার দায়িত্ব বুদ্ধিজীবীদেরই। জনসাধারণ যাতে হীনমন্যতা ও হতাশাকে পরিহার করে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার দায়িত্বও বুদ্ধিজীবীর বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। পরিশেষে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন :

> আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে আমেরিকার অস্তিত্ব-বার্তার নিশান যখন সদম্ভে উড়িয়েছিল, সে সময়ে জাতীয় মহিমার উপলব্ধিকে সজাগ করার কাজে বুদ্ধিজীবীরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, আমাদের বুদ্ধিজীবীরা সেখানে আদর্শ ও উদাহরণের সন্ধান পেতে পারেন। জ্বালাময়ী কণ্ঠে সেদিনের কবি ফিলিপ ফেন লিখেছিলেন, "আমি বুঝি না জ্ঞান আর মহিমার উৎপত্তি কি ওই বাজে জায়গাটা (অর্থাৎ বৃটেন) ছাড়া অন্য কোথাও হয় না।" উইলিয়াম এলারীর কণ্ঠে প্রায় তারই প্রতিধ্বনি শুনি—"বিদেশের সাহিত্যের ওপর ভর করার চাইতে সাহিত্য না থাকাই ভালো।" এডগার এলান পো কিছুদিন পরেই লিখেছিলেন—"এমন একটা যুগে আমরা এসে পৌঁছেছি যখন আমাদের সাহিত্য যদি দাঁড়ায় তো নিজ গুণেই দাঁড়াবে; আর ভেঙ্গে পড়ে যদি, পড়বে আপন গুণেই। বৃটিশ দাদীর সাথে আমরা সম্পর্কের প্রধান তারগুলো কেটে দিয়েছি।" দূর থেকে বিচার করলে আজ এ সকল উক্তিকে আবেগ-দুর্বল উচ্ছ্বাস বলে মনে হতে পারে; কিন্তু একথা আমরা বলি কি করে যে, এই মানসিকতা গড়ে উঠেছিল বলেই স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আমেরিকা বিকশিত হতে পেরেছিল— তার সমৃদ্ধির ইতিহাসের সূচনা এই উৎস থেকেই। দ্বিধায় দুলছে আমাদের যে মন, হীনমন্যতায় যে মুখ তুলে চাইতে পারে না, হতাশায় যার চোখ পাংশু— তার জন্য আত্মমহিমার অমন উপলব্ধির প্রয়োজন আছে বৈকি।[৬৩]

তিনি বুদ্ধিজীবীদের হতাশামুক্ত থেকে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেন।

সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধে অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ আত্মবিকাশের মহান ব্রত অবলম্বনের আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে ইসলামের মূল নীতি সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৬৪]

www.nagorikpathagar.org

এই দিন বিকালে পাক-বাংলার চিত্রকলা শাখার অধিবেশন বসে। এতে অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম 'পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পটভূমিকা', আবদুল মান্নান 'সঙ্গীত ও জাতীয় তমদ্দুন' এবং সভাপতি জয়নুল আবেদীন (শিল্পাচার্য) 'আমাদের চিত্রশিল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন।[৬৫]

অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম তার দীর্ঘ প্রবন্ধে পূর্ব-বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও ধর্মীয় কারণে পূর্ব বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যার মূল অবলম্বন ইসলাম। পাক-মুসলিম যুগের নানা ধ্যান-ধারণাকে আত্মসাৎ করে তা পুষ্ট হয়েছে। সুতরাং এদেশের সাহিত্যে মুসলিম সংস্কৃতি প্রাধান্য পাবেই। তিনি বলেন :

> মুসলিম সংস্কৃতিই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের বাহন হবে আর সাথে সাথে যেসব সংস্কৃতি আমাদের ঘরের জিনিস হয়ে গেছে তাকেও আমরা অবজ্ঞা করবো না। আর এমনি করেই জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশের মাটির প্রতি প্রেম, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং মানুষের প্রতি মমত্ববোধের মধ্য দিয়েই পূর্ব পাকিস্তানের এক সামগ্রিক সাংস্কৃতিক জীবনধারা ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবেই সর্বত্র প্রতিফলিত হয়ে উঠবে তার নিজস্ব স্বকীয়তায়।[৬৬]

আবদুল মান্নান তার 'সঙ্গীত ও জাতীয় তমদ্দুন' শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ব-বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও স্বকীয়তাহীনতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন :

> যে Culture ও Tradition-এর জোরে আমরা আজাদী হাসিল করলাম, সেই Culture ও Tradition হতে আমরা, দেখা যায়, এখন ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছি। তা না হলে পাক-বাংলার এত অসংখ্য মুর্শিদী, জারী, ভাটিয়ালী, লোকসঙ্গীতাদি থাকতে হঠাৎ ঐ গানটি (প্রাণ সাথীরে ওই শোন কদম্ব তলায়, বাঁশী বাজায় কে) কি করে পাকিস্তানী বলে চালান হল। 'আল্লাহ মেঘ দে পানি দে' এই গানটির যে আবেদন ক্ষমতা আছে এবং এর মধ্যে পাক-বাংলার মানুষের যে পরিচয় আছে, তার সত্যই তুলনা হয় না।[৬৭]

তিনি পাকিস্তানী সঙ্গীতের বিকাশ ও মানোন্নয়নে ব্যর্থতার জন্য সরকারকে দায়ী করে এর প্রতিকার দাবী করেন। আব্বাসউদ্দীন আহমদ তার 'সঙ্গীত ও আমরা' শীর্ষক প্রবন্ধে দেশীয় লোকসঙ্গীতের বিকাশের ওপর জোর দেন।[৬৮]

সভাপতি জয়নুল আবেদীন তার 'আমাদের চিত্রকলা' শীর্ষক প্রবন্ধে নিজস্ব মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, আমরা 'অনুকরণের চাপরাশ এঁটে সর্বত্র আপন দৈন্যকে জাহির করে বেড়াচ্ছি।' তিনি বলেন, 'বিদেশের ভাল জিনিস থেকে শিক্ষা নিতে হবে বৈ কি। কিন্তু তার জন্য প্রথমে নিজেদেরই ভাল করে জানা দরকার।' জয়নুল আবেদীন বলেন : "অনুভূতিই সকল সৃষ্টির প্রাণ, অনুকরণ নয়। অনুকরণ দ্বারা কখনও

www.nagorikpathagar.org

'কালচার' গড়ে ওঠে না। 'কালচার' অর্জন করবার জিনিস নয়, সৃজন করবার জিনিস। একথা যেদিন আমরা বাস্তবিক হৃদয়ঙ্গম করবো, সেদিন আমাদের অনেক সঙ্কটেরই নৈতিক সমাধানের পথ খোলাসা হয়ে যাবে।"[৬৯]

৬. সমাপ্তি অধিবেশন : ৫ মে ১৯৫৮

৫ মে ১৯৫৮ সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন বসে। মওলানা আকরম খাঁ সমাপ্তি ভাষণে সুধীজনদের প্রস্তাব ও বক্তব্যসমূহ কার্যকর করার জন্য সচেষ্ট হতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সবশেষে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি উদ্যোক্তাগণের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানান।[৭০]

৭. সভার প্রস্তাব

সভায় যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার মধ্যে ছিল : 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য মহফিল' নামক একটি স্থায়ী সংস্থা গঠন করা, সরকারী সাহায্যপুষ্ট সমবায় প্রকাশনীর মাধ্যমে দেশের সাহিত্যিকদের গ্রন্থাদি প্রকাশ করা, বাংলা একাডেমীর মাধ্যমে উপযুক্ত সাহিত্য গ্রন্থাদির জন্য প্রতি বৎসর পুরস্কার প্রদান করা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মিশনে সাহিত্যসেবীদের প্রেরণ করা, মুনাফা-শিকারী প্রকাশকদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা থেকে সাহিত্যিকদের রক্ষা করা প্রভৃতি।[৭১]

৮. উপসংহার

১৯৫৮ সালের এই চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনকে একটি সফল সম্মেলন হিসাবে অভিহিত করা যায়। এর আগে আর কোন সাহিত্য সম্মেলনেই পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী শিল্পী-সাহিত্যিকদের এমন সম্মিলন ঘটেনি। এমনভাবে একত্রিত হয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রশ্নগুলি এর আগে এভাবে কেউ খতিয়ে দেখেননি। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল সাহিত্যিক-শিল্পী অত্যন্ত পরিশ্রম করে তাদের বক্তব্যকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টা করেছেন, ঐতিহাসিক তথ্য-দলিল সন্নিবেশের মাধ্যমে। এই সম্মেলন পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব সংস্কৃতি নির্মাণে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে বলা যায়। এ সম্পর্কে তৎকালের পত্র-পত্রিকায়ও অনুকূল আলোচনা দেখা যায়। মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা সম্মেলনের সকল নিবন্ধ নিয়ে একটি 'সাহিত্য সম্মেলন সংখ্যা' প্রকাশ করে। তার সম্পাদকীয়তে সম্মেলনের প্রশংসা করে দুই বঙ্গের সাহিত্যের ভিন্নতা ও অভিন্নতা সম্পর্কিত সাহিত্যিক বিতর্কের পর্যালোচনা করে বলা হয় :

পাক-বাংলার সাহিত্যিক স্বকীয়ত্বের ঘোষণা গোলামীর প্রতিবাদ, ষড়যন্ত্রের

www.nagorikpathagar.org

মৃত্যুকামনা ও সুস্থতার জয়যাত্রার স্বাক্ষর। সুন্দরের রাজ্যে বাধা-নিষেধের প্রাচীর নাই সত্য, কিন্তু কঠিন বাস্তবের মাটিতে পা রাখিয়াই সুন্দরের স্বপ্নলোকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়। সুতরাং পাকিস্তানের সাহিত্য পাকিস্তানবাদের পশ্চাতভূমিতে দাঁড়াইয়াই মুক্ত আকাশতলের আলোক ও বৃদ্ধিধারায় নাহিয়া ফুলে-ফলে মঞ্জুরিত ও বিকশিত হইবে। এছলাম পাকিস্তানবাদের মূল ধারায় আবেহায়াতের যে অমৃতত্ব যুক্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের বিচ্যুতি চলে না। সে বিচ্যুতির অর্থ আত্মহত্যার শামিল। চাটগাঁও সম্মেলনের বিভিন্ন ভাষণে, বিভিন্ন প্রবন্ধ ও আলোচনায় বৈচিত্র্য আছে যথেষ্ট। নানাভাবে ও নানা দিক হইতে সাহিত্যিক ও সুধীরা আমাদের সাহিত্যিক সমস্যাকে দেখিয়াছেন এবং আমাদের ঐতিহ্য ও দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সমাধান খুঁজিয়াছেন। কিন্তু তাদের সকল বৈচিত্র্য বিভিন্নতাকে ছাপাইয়া যে সুরটি বারবার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, তাহা হইল পাক-বাংলার বৈশিষ্ট্যের কথা, তার স্বাতন্ত্র্যের কথা ও তার সিরাতুল মোস্তাকিমের কথা। এই ঘোষণার আজ প্রয়োজন ছিল। কারণ এতে বহু ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইল এবং আমাদের যাত্রাপথের সম্মুখবর্তী অধ্যায় আলোকদীপ্ত হইয়া উঠিল।[৭২]

এই সম্মেলনেও কার্যত পাক-বাংলা তথা পূর্ব-বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি নির্মাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তার রূপায়ণের পথনির্দেশ করা হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. মাসিক মোহাম্মদী, সাহিত্য সম্মেলন সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৬৫, পৃ ৮৬৬

২. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৬৫

৩. মঈনুদ্দীন, *চট্টগ্রামে সাড়ে তিন দিন*, মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৬৫

৪. পূর্বোক্ত

৫. দৈনিক আজাদ, ২৪-৪-১৯৫৮

৬. আবদুর রহমান, *যতটুকু মনে পড়ে*, চট্টগ্রাম, ১৯৫২ পৃ ৪৮২ (উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান, পাণ্ডুলিপি, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, ষষ্ঠ খন্ড, ১৩৮২)

৭. মঈনুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ ৯০০

৮. মাসিক মোহাম্মদী, সাহিত্য সম্মেলন সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৬৫, পৃ ৮৫৫

৯. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৫৭-৫৮

www.nagorikpathagar.org

১০. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৫৯
১১. পূর্বোক্ত
১২. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৫১
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৬৩
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৬৪
১৫. পূর্বোক্ত
১৬. দৈনিক আজাদ, ০৪-০৫-১৯৫৮
১৭. মাসিক মোহাম্মদী, সাহিত্য সম্মেলন সংখ্যা, পৃ ৭৫৪
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৫৫
১৯. পূর্বোক্ত
২০. পূর্বোক্ত
২১. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৫৬
২২. পূর্বোক্ত পৃ ৭৮৩-৮৪
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৮৫
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৮৪
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৮৭
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৮৮
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৯১
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৮১৪
২৯. দৈনিক আজাদ, ০৪-০৫-১৯৫৮
৩০. মাসিক মোহাম্মদী, সাহিত্য সম্মেলন সংখ্যা, পৃ ৮০৯
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ ৮১০
৩২. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৩৩-৮৩৪
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৩৫
৩৪. আবুল মনসুর আহমদ, *পাক-বাংলার কালচার ও ভাষা*, মাসিক মোহাম্মদী, সাহিত্য সম্মেলন সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৬৫
৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৬১
৩৬. পূর্বোক্ত
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৬৫
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৬৭
৩৯. দৈনিক আজাদ, ০৫-০৫-১৯৫৮
৪০. মাসিক মোহাম্মদী, সাহিত্য সম্মেলন সংখ্যা পৃ ৭৭২-৭৩

www.nagorikpathagar.org

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৭৯-৮০

৪২. পূর্বোক্ত

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৮০

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৮১

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৮১

৪৬. পূর্বোক্ত

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ ৮০৬

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৮০৭

৪৯. পূর্বোক্ত পৃ ৭৯৫

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৯৬

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৯৯

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৯১

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৮০০

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৮০২

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৩৬

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৩৮

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৩৮-৩৯

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৪০

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৪৬

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৪৮

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৫৮

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৪৮-৪৯

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৪৯

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৫০-৮৫৪

৬৫. দৈনিক আজাদ, ৫ মে, ১৯৫৮

৬৬. মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৬৫, পৃ ৮৮১

৬৭. মাসিক মোহাম্মদী, সাহিত্য সম্মেলন সংখ্যা, পৃ ৮৪২

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৭৬

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৭৫

৭০. দৈনিক আজাদ, ০৭-০৫-১৯৫৮

৭১. পূর্বোক্ত

৭২. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৫০-৭৫১

www.nagorikpathagar.org

নয়. ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৩

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ১৯৬৩ সালের ২২ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ।' বাংলা বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকদের অভিজ্ঞতাকে 'চার দেয়ালের পরিধি, পুঁথির পরিবেষ্টন ও গবেষণার অনুবীক্ষণ থেকে বিস্তৃত করে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে দেশবাসীর কৌতূহল, শ্রদ্ধা আর চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে' এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণের মধ্যে যারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহান্বিত, তাদের হাতে-কলমে এ ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের ধারার সঙ্গে যতটুকু সম্ভব পরিচয় করিয়ে দেওয়াই' ছিল এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।[১]

২. প্রস্তুতি

এই সপ্তাহ উদযাপনের যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করেন পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (বিএনআর) ও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড। তাদের অর্থানুকূল্য ছাড়া সাহিত্য সপ্তাহের আয়োজন সম্ভব হত না।[২]

এই সাহিত্য সপ্তাহের আয়োজনের জন্য ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলা বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে বৈঠকেই সপ্তাহ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ওসমান গনির কাছে গেলে তার কাছ থেকে উৎসাহোদ্দীপক 'পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা'র আশ্বাস পাওয়া যায়। সে আশ্বাসের প্রেক্ষিতে আবার ছাত্র-শিক্ষকরা বসে প্রস্তুতি সমিতি ও বিভিন্ন উপসংঘ গঠন করেন। 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের প্রস্তুতিতে বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে উৎসাহ ও কর্মতৎপরতার যে সাড়া জেগেছিল, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নজিরবিহীন।[৩]

www.nagorikpathagar.org

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের আয়োজনের শুরুতেই তৎকালে ঢাকায় সাড়া পড়ে যায়। ২১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ অবজারবার পত্রিকায় Our Heritase শীর্ষক এক রিপোর্টে বলা হয় :

> Citizens of Dacca will have an opportunity to go through twelve hundred years of Bangali literature begins from 8th century down to the forties of this century. When the programmes of the Bengali language and literature week scheduled to begin on sunday take them to the romantic world of 'Padmavati' of Alaul, give flashes of pungent writings of Dinabandhu Mitra and send them deep into the mystic thoughts of old Buddhist songs.

৩. বিভিন্ন সংঘ ও উপসংঘ

'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ'র সংঘ উপসংঘ গুলি ছিল নিম্নরূপ :[৪]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ

৫–১১ আশ্বিন ১৩৭০ ।। ২২–২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার)

প্রস্তুতি সমিতির সভাপতি : অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই;

প্রস্তুতি সমিতির আহ্বায়ক : আসাদুল ইসলাম চৌধুরী, মুহম্মদ মুজাদ্দেদ;

ব্যবস্থাপনা : অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ডক্টর আনিসুজ্জামান;

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মুহাম্মদ সিদ্দিক খান, গ্রন্থাগারিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ডক্টর বেন জ্যাকসন, মার্কিন তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র, কালাম মাহমুদ, চিত্রশিল্পী।

প্রদর্শনী উপসংঘের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ ও জনাব আহমদ শরীফ। আহ্বায়ক ছিলেন গোলাম সারওয়ার।

কবিতাপাঠ উপসংঘের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। আহ্বায়ক ঃ হুমায়ুন খান।

গদ্যপাঠ উপসংঘের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম ও জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। আহ্বায়ক ছিলেন, আবুল হাসান সালাহউদ্দীন।

নাটক উপসংঘের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন জনাব মুনীর চৌধুরী। এর আহ্বায়ক ছিলেন রশীদ হায়দার।

সঙ্গীত উপসংঘের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল। আহ্বায়ক ছিলেন জাহাঙ্গীর খান।

www.nagorikpathagar.org

প্রচার ও প্রকাশনা উপসংঘের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন ডক্টর আনিসুজ্জামান ও আহ্বায়ক ছিলেন আমিনুল ইসলাম (বেদু)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত এই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের অনুষ্ঠানসূচী ছিল নিম্নরূপ।[৫]

৪. প্রথম দিন : রবিবার ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

এই দিন সকাল ন'টা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান—পবিত্র কুরআন থেকে পাঠ : এ, বি, এম, আসিরউদ্দীন। ভাষণ—মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যক্ষ বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ। উদ্বোধনী ভাষণ—ডঃ মুহম্মদ ওসমান গনি, ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সকাল দশটা থেকে বারোটা—প্রদর্শনীঃ ভাষার বিবর্তন, লিপির পরিবর্তন, সাহিত্যের বিকাশ, মুদ্রণের ইতিহাস। এই প্রদর্শনী দুপুর দু'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত চলে। তারপর বসে কবিতা পাঠের আসর। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্ররা চর্যাপদ থেকে কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত বিশজন কবির কবিতা পাঠ করেন। কবিতা পাঠের এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

৫. দ্বিতীয় দিন : সোমবার ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

এই দিন দুপুর দু'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত চলে প্রদর্শনী। সন্ধ্যা সাতটায় ছিল আলোচনা সভা। বিষয়ঃ প্রাচীন বাংলা সাহিত্য। বক্তা ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডক্টর নীলিমা ইব্রাহীম ও জনাব সৈয়দ মুর্তজা আলী। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই।

৬. তৃতীয় দিন : মঙ্গলবার ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

প্রদর্শনী খোলা থাকে দুপুর দু'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত। সন্ধ্যা সাতটায় বসে গদ্যপাঠের আসর। তাতে বিশ্ববিদ্যলয়ের শিক্ষক-ছাত্রগণ উইলিয়াম কেরীর আমলের প্রাচীন বাংলা থেকে কাজী নজরুল ইসলামের ব্যথার দান পর্যন্ত গদ্যপাঠে অংশ নেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডক্টর নীলিমা ইব্রাহীম।

৭. চতুর্থ দিন : বুধবার ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

এই দিনে যথারীতি প্রদর্শনী চলে দুপুর দু'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত। সন্ধ্যা সাতটায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তৃতা করে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও অধ্যাপক আহমদ শরীফ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই।

www.nagorikpathagar.org

৮. পঞ্চম দিন : বৃহস্পতিবার ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

দুপুর দু'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত প্রদর্শনী শেষে সন্ধ্যা সাতটায় বসে নাটক থেকে পাঠের আসর। তাতে অংশগ্রহণকারীরা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মীর মশাররফ হোসেন, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, শাহাদৎ হোসেনের নাটক থেকে পড়েন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী।

৯. ষষ্ঠ দিন : শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

প্রদর্শনী শেষে সন্ধ্যা সাতটায় আলোচনা সভায় 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই।

১০. সপ্তম দিন : শনিবার ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

এ দিনে প্রদর্শনী শেষে সন্ধ্যা সাতটায় বসে গানের আসর। তাতে শিল্পীরা একক এবং সমবেত কণ্ঠে কাহ্নপাদ থেকে জসীমউদ্দীন পর্যন্ত বিভিন্ন কবি ও গীতিকারের সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আবু হেনা মোস্তাফা কামাল।

১১. অনুষ্ঠানের বিবরণ

২২ সেপ্টেম্বর ঠিক নয়টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর স্বাগত ভাষণে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এখন দেশকাল নিরপেক্ষ নয়। অর্জিত জ্ঞান যাতে দেশের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হয়, একালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেভাবে চিন্তা করছে।' বাংলা বিভাগের শিক্ষাদান সম্পর্কে তিনি বলেন, 'দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য, আত্মিক বিশ্বাস ও আশা-আকাংক্ষার রক্ষণাবেক্ষণে, তার বিকাশ ও রূপায়ণে সহায়তা করাও বাংলা বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য'। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গৌরবময় সাহিত্য-ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন :

> বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, সেন রাজাদের সময়ে গৌড়কে কেন্দ্র করে যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের বাহন সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন সংঘটিত হচ্ছিল, সে সময়ে নদী-নালা পরিবৃত পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের লালন ও চর্চা করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি

www.nagorikpathagar.org

> নিদর্শন বৌদ্ধগান ও দোহা পূর্ব বাংলারই সম্পদ।....
>
> পূর্ব বাংলা মাটিতে যে ভাষা ও সাহিত্যের গোড়া পত্তন হয়েছিল, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সবার আগে পূর্ব বাংলার প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকাতেই সে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৬]

উপসংহারে তিনি দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে, যেমন নিজেদের মধ্যে কিংবা সভা-সমিতিতে আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় এবং হল ইউনিয়নগুলোর নিমন্ত্রণপত্রে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে লেখা চিঠিপত্রে এবং ভাবের আদান-প্রদানে, বিবাহের আমন্ত্রণপত্রে, দোকানপাটের নামপত্রে, গাড়ীর নম্বর-ফলকে প্রভৃতিতে বাংলা ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়া কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের বক্তৃতায়ও তিনি বাংলা ব্যবহারের ওপর জোর দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ মুহম্মদ ওসমান গনি পড়াশোনার বাইরেও দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রীদের যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ওই অনুষ্ঠানকে তারই পরিচয়বাহী হিসাবে উল্লখ করেন। বাংলা ভাষায় জ্ঞান-চর্চার ওপর গুরুত্ব দিয়ে ভাইস-চ্যান্সেলর বলেন :

> বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। তাই আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতে যাতে শিক্ষার সর্বস্তরে ও সরকারী কাজকর্মে বাংলা ভাষার প্রচলন হয়, এখন থেকেই তার যথাবিহিত ব্যবস্থার সূচনা করা হবে।
>
> এই প্রত্যাশাকে সফল করে তুলতে হলে আমাদের সকলকেই কিছু সাধনা করতে হবে। চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের জ্ঞান সাধনার যা শ্রেষ্ঠ ফল, বাংলা ভাষায় তার পরিচয় দেবার দায়িত্ব আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রের সর্বাবিধ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলা ভাষাকে ক্রমেই বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে।[৭]

তিনি মাতৃভাষাকে ভালভাবে জানা, তার ইতিহাস ঐতিহ্য, গতি-প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া বাংলা ভাষাভাষীর পবিত্র কর্তব্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি বাংলা বিভাগ আয়োজিত এই ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ এবং প্রদর্শনীকে 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে অভিহিত করেন।

২৩ সেপ্টেম্বরের আলোচনা সভায় 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে প্রবন্ধ পড়েন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯২১ সালে তিনি নিজে বাংলা অনার্স শ্রেণীতে বৌদ্ধগান পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। তার অনেক কাল পর পর্যন্তও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধগান পাঠ্য হয়নি। ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন :

www.nagorikpathagar.org

> এ বৌদ্ধ গানগুলি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। এদের রচনাকাল সাত শত থেকে এগারো শত খৃষ্টাব্দের মধ্যে। আধুনিক কোন পাক-ভারতীয় আর্য ভাষায় এর সমতুল্য প্রাচীন নিদর্শন নেই। এটা বাংলা ভাষার একটা বিশেষ গৌরবের কথা। বাংলাদেশে ওই সময় বৌদ্ধ পাল বংশের রাজত্ব থাকায় দেশী ভাষায় এরূপ পদ রচনা সম্ভবপর হয়েছিল।[৮]

তিনি জানান, 'ওই বৌদ্ধ গানগুলি ফার্সীর গজল-কবিতারও প্রাচীন আদর্শ। তখন ভারতের সঙ্গে পারস্যের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। ভারতবর্ষ থেকে পঞ্চতন্ত্র পারস্যের মধ্যযুগীয় পহলভী ভাষায় অনুদিত হয়ে তার মাধ্যমে আরবীতে ভাষান্তরিত হয়। তখন তার নাম হয় 'কলিলহ্-দম্‌নহ্।' পঞ্চতন্ত্রের করকট দমনক এই দু' নামেরই পরবর্তী রূপ।'[৯]

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপধ্যায় তার Origin and Development of Bengali Language বইয়ে চর্যাপদের ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে স্বীকার করে নিয়ে বলেছিলেন, ওর ভাষা পশ্চিম বঙ্গীয়। কিন্তু ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যুক্তি প্রমাণ দিয়ে মীমাংসা করেন যে, ওই ভাষা ছিল পূর্ব বঙ্গীয়।

এ থেকে আরও একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী কালেও পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা'র বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র রূপ ছিল।

২৫ সেপ্টেম্বর (১৯৬৩) বুধবারের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য। এই বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ পড়েন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। খ্রিষ্টীয় ১২০০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত যে সাহিত্য ধারা তা-ই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। ডক্টর এনামুল হক তার প্রবন্ধে বলেন,

> এখনকার ইতিহাসগুলো যতই সমালোচনামূলক হোক না কেন, ওগুলো এক দিকে যেমন অতীতের প্রতি আধুনিক মনের প্রক্ষেপ, অন্য দিকে তেমনি মুসলিম বাংলা সাহিত্যের আলোচনাবর্জিত একতরফা রচনা। এ ইতিহাসের পূর্ণ সার্থকতা নেই। তথাকথিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য শুধু হিন্দুর সাহিত্য নয়, এমন কি শুধু মুসলমানের সাহিত্যও নয়; এ সাহিত্য হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সম্মিলিত বাংলা সাহিত্য।

তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করেনঃ তুর্কী যুগ (১২০০-১৩৫০), সুলতানী যুগ (১৩৫১-১৫৭৫) এবং মোগলাই যুগ (১৫৭৬-১৭৫৭)

তুর্কী যুগ সম্পর্কে আলোচনায় এনামুল হক বলেন, সেনদের কাছ থেকে মুসলিম তুর্কীরা বাংলাদেশ দখল করলেন কূটনীতি, শৌর্য-বীর্য ও জ্ঞান গরিমার শ্রেষ্ঠত্বে। তখনকার দিনের নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় মাপকাঠিতে তারা কোন অপরাধ করেননি। ফলে নির্যাতীত ও নিগৃহীত সকল মানুষ মানুষের প্রাপ্য ইসলামী মর্যাদা পেল; সংস্কৃতের দৈব আসন টলে গেল, ফারসী এসে তার স্থান দখল করল; আর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তার আপনভূমে

www.nagorikpathagar.org

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু তুর্কী যুগকে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলে চালিয়ে দেবার তিনি বিরোধিতা করেন যুক্তি–প্রমাণ দিয়ে।

তিনি বলেন, ওই সময়কার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন–পাঠনে এ–কথা মনে রাখতে হবে যে, বাংলা সাহিত্যের তুর্কী যুগ প্রধানত ভাষা গঠনের যুগ।

সুলতানী যুগ সম্পর্কে তিনি বলেন :

> তুর্কী যুগের শেষে দেশে যে রাষ্ট্র–বিপ্লব ঘটে, তার ফলে বাংলাদেশ মুসলিম সুলতানদের নেতৃত্বে স্বাধীন হয়। শিল্প–বাণিজ্য–স্থাপত্যে দেশ ভরে ওঠে। এ সময়ে হিন্দু–মুসলমান সকল লেখকই ধর্মগ্রন্থ সহ বিভিন্ন কাহিনী রচনা শুরু করেন। তার মধ্যে মুসলমান সাহিত্যকরাই নতুন এক দুঃসাহসিক সাহিত্যরীতির আমদানী করেন, তা হল রোমান্টিক কাহিনী কাব্য—ইউসুফ–জুলেখা, লাইলী–মজনু, হানিফা, কয়রাপরী প্রভৃতি তার উদাহরণ। এই সময়ের সাহিত্যকে দীনেশচন্দ্র সেন নাম দেন "গৌড়ীয় যুগ"। তিনি বলেন, "গৌড়ীয় সুলতানদের বাংলা–সাহিত্য–পৃষ্ঠপোষকতাই এ যুগে আমাদের সাহিত্যের সৌভাগ্যের কারণ।

মুহম্মদ এনামুল হক তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, ওই যুগে বাংলা সাহিত্যর দ্রুত উন্নতির জন্য শুধু সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতাই প্রধান উপাদান হিসাবে কাজ করেনি। ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি, ইসলামের সঙ্গে বাঙালীর ঘনিষ্ঠতর সংশ্রবে হিন্দু মানবের মুক্তি, হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন, বৈষ্ণব মতবাদের প্রবর্তন, বিশেষ করে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে উন্নত ফারসী সাহিত্যের গভীরতর যোগাযোগও এর পেছনে কাজ করেছে। এ ছাড়া ওই যুগের হিন্দুর বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ যেমন লক্ষণীয় তেমনি মুসলমানের বাংলা–সাহিত্যের সঙ্গেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হিন্দু প্রভাব লক্ষ্যণীয়। মুসলমানের সংস্কৃতি চর্চা এবং হিন্দুর ফারসী চর্চাও এর কারণ হতে পারে বলে ডক্টর এনামুল হক উল্লেখ করেন।

মোঘল যুগের সাহিত্যকে তিনি বাংলা–সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেন। এ সময়েই বাংলা প্রত্যন্ত অঞ্চলে মল্লভূমি, কোচবিহার, কামরূপ, আরাকান–যে ক'টি স্বাধীন রাজ্য ছিল, তার সব ক'টিতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্মানের আসন লাভ করে। তিনি বলেন :

> এ সময়কার বাংলা সাহিত্য চিৎপ্রকর্ষে যেমন বিশিষ্ট, পোষাক–পরিচ্ছদেও অনেকখানি অসাধারণ। ভাষায় ফারসী–জরির বুনোনি, দেহে জড়োয়া অলংকার, গতিতে গাম্ভীর্য, রুচিতে সৌন্দর্যবোধ, কল্পনায় বিশালতা ও স্বভাবে বিলাস–লিপ্সা নিয়ে এ যুগের সাহিত্য একান্তই মোগলাই। এর সব চাইতে বড় নজীর হল আলাওল ও ভারতচন্দ্রের সাহিত্য।[১১]

www.nagorikpathagar.org

অতীতের সাহিত্যর সঙ্গে বর্তমানের অব্যাহত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি চারটি প্রস্তাব পেশ করেন। সে গুলো হল :

(ক) Textual Criticism বা পাঠ-সমালোচনাশাস্ত্রে যাকে Composite Text বা সমন্বিত পাঠ বলে, অতীত হস্তলিপির বিভিন্ন পাঠ থেকে বেছে এক একটা পুস্তকের সমন্বিত পাঠ তৈরী করে সর্বসাধারণের জন্য ছাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এতে জনসাধারণের সাথে তাদের পূর্বপুরুষের মনের পরিচয় নিকটতর হবে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ লিপিগত বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে কেবল তৎসম শব্দের বানান শুদ্ধ করা ছাড়া অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের বানানে, অথবা দুর্বোধ্য শব্দাদিতে যেন হস্তক্ষেপ করা না হয়। এতে ভাষার প্রকৃতি বদলে যাবে।

(গ) তৃতীয়তঃ আধুনিক গদ্যে পুরোনো সাহিত্যের নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করতে হবে। এতে জনসাধারণের সাথে নতুন করে পুরোনো সাহিত্যের পরিচয় হবে।

(ঘ) চতুর্থতঃ সময় সময় সভাসমিতি ডেকে পুরোনো সাহিত্যের বিশেষজ্ঞদের মারফত আলাপ-আলোচনার আয়োজন করতে হবে। এ আলাপ-আলোচনা উচ্ছ্বাস-প্রবণ ও ভাবপ্রবণ না হয়ে বৈজ্ঞানিক কল্পনাভিত্তিক হওয়া আবশ্যক।[১২]

তার এই প্রবন্ধের ওপর আলোচনাকালে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেন, বাংলাদেশে মুসলমান বিজয়ের ফলে নতুন সংস্কৃতি ও জ্ঞানালোক প্রবেশ লাভ করেছিল এই সমাজে। এই নতুন সংস্কৃতির আবির্ভাবের ফলেই বাংলা সাহিত্যে যোগসাধনা ও সুফী মতবাদের এমন অপরূপ সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়।

আলোচনাকালে আহমদ শরীফ বলেন, বাংলা ভাষা চিরকালই জনসাধারণের ভাষা ছিল, আজও তাই আছে। তিনি বলেন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান বহুমুখী ও বিশিষ্ট এবং জনসাধারণই এই ভাষা ও সাহিত্যের লালন-পালন ও পুষ্টিসাধন করেছেন, আজও করছেন।

সভাপতির ভাষণে মুহম্মদ আবদুল হাই উল্লেখ করেণ যে, বাংলা সাহিত্য দু'টি বিদেশী সাহিত্যের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে। মধ্যযুগে ফারসী থেকে এবং আধুনিককালে ইংরেজী থেকে। তিনি বলেন, এই দুই বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যোগ না ঘটলে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান সমৃদ্ধি ঘটত না। মধ্যযুগে মুসলমান সুলতানেরা বাংলা সাহিত্যের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। সেটাও এ যুগের বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্যের কারণ।

www.nagorikpathagar.org

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ শুক্রবারের অনুষ্ঠানে আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। তিনি আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলেন :

> মধ্যযুগে চিত্ত বিকাশের প্রধান অবলম্বন ছিল ধর্ম। ধর্ম তার আচরণ নিষ্ঠা এবং বিশ্বাস নিয়ে মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করেছিলো। তখন ব্যক্তিগত বিশ্বাস ধর্মের ভিত্তি ছিলো না। সমষ্টির সত্তায় ধর্ম ছিল একটি আচরণীয় নিয়মগত কর্ম। তাই সে যুগে ধর্মের ক্রিয়াপদ্ধতি মূল্যবান ছিলো, ধর্মের অনুভূতির যে একটি নির্দিষ্ট পরিচর্যা আছে তা সেই সময়কার রচনায় ধরা পড়েনি।...আধুনিককালে ধর্ম অথবা শাস্ত্রবিধি সাহিত্যিকের জীবনে রহস্যের সন্ধান দিচ্ছে না। কেননা বর্তমান মানুষের বিচারে ধর্ম পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধির বস্তু অথবা পরিপূর্ণ নিশ্চেতনায় অস্বীকারের বস্তু। ধর্মের আচরণ নিয়ে আবেগের সঞ্চয় এখন আর ঘটে না। তাই বর্তমান সাহিত্য সাধনায় বিজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল এবং ধর্ম যেখানে প্রকাশিত, যেখানে তা প্রগাঢ় উপলব্ধির প্রসূণরূপে। দ্বন্দ্ব এবং সর্বনাশের মধ্য দিয়ে অচলায়তনের রুদ্ধ দ্বার উম্মোচন করে, ত্যাগ এবং নির্বাচনের মধ্যে এবং অনবরত আপনাকে অতিক্রম করার মধ্যে মানুষের যে উপলব্ধি, তাই হচ্ছে বর্তমান যুগের ধর্ম।[১৩]

এই প্রবন্ধের ওপর আলোচনাকালে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বলেন, 'বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ইতিহাসসমূহে আধুনিককালের মুসলমান লেখকদের পরিচয় খুবই অপূর্ণাঙ্গ। এ সম্পর্কে আমাদের দেশের জনসাধারণের মনে যে অস্বস্তি বিরাজ করছে আমরাও তার অংশীদার। একালের মুসলমান লেখকদের পরিচয় দান আমাদের একটা উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, তাই বলে হিন্দু সম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে আমরা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কবলে পড়তে চাই না। আমরা পাকিস্তানী অধিকাংশ মুসলমান, সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকও বটে। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই মুসলমান লেখকদের মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে সাহিত্য বিচারের মাপকাঠিতেই তাদের পরিচয় দিতে হবে।[১৪]

১২. প্রদর্শনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল ভাষা সাহিত্য বিষয়ক প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর চারটি শাখা ছিল : ভাষার বিবর্তন, সাহিত্যের বিকাশ, লিপির পরিবর্তন ও মুদ্রণের ইতিহাস।

ভাষার বিবর্তনে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা থেকে বিভিন্ন স্তরের ভেতর দিয়ে আধুনিক বাংলা ভাষার বিকাশ দেখানো হয়।

সাহিত্যের বিকাশ প্রসঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাস ব্যাখ্যা করা হয়। চর্যাপদ থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কবিতার বিচিত্র রূপ এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদানের ইতিহাসে। খ্যাতনামা মুসলিম কবিদের পরিচয় ছাড়াও মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ ছিল সেখানে।

বাংলা লিপির ক্রমবিবর্তনের ধারাও ছিল প্রদর্শনীর কৌতুহলোদ্দীপক অংশ। যুগে যুগে বাংলা অক্ষরের কী রূপ ছিল, তা তুলে ধরা হয়। এই অংশে দ্বাদশ শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা লিপির বিবর্তন স্পষ্ট হয়।

প্রদর্শনীতে কেবল তালিকার সহায়তায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বর্ণিত হয়নি। চিত্রের মাধ্যমেও এই ধারাবাহিকতা তুলে ধরা হয়। চিত্রগুলোর মধ্যে ছিল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের বাংলা সাহিত্য চর্চা, মুসলমানদের বাংলাদেশে আগমন, রোসাঙ্গ রাজদরবার, ইংরেজের বাংলাদেশ বিজয়। আলাওলের কাহিনীর একটি চিত্ররূপও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রদর্শনীর প্রবেশ পথে একটি পোস্টারে সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল হাকিমের বিখ্যাত চরণ কয়টি লেখা ছিল :

যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়
নিজদেশত্যাগী কেন বিদেশ ন জায়।।
মাতাপিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।

এ ছাড়া প্রদর্শনীতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল বাংলা মুদ্রণের ইতিহাস ও প্রাচীন পুঁথির প্রদর্শনী। বাংলা মুদ্রণের প্রথম যুগের বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি তাতে স্থান পেয়েছিল। বাংলা, নাগরী, আরবী বার্চ ও তালপাতায় লিখিত পাণ্ডুলিপিও ছিল তার অন্তর্ভুক্ত। বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রদর্শনী উপলব্ধি করতে দর্শকদের সাহায্য করেন। সাত দিনে প্রায় বিশ হাজার লোক এই প্রদর্শনী দেখতে আসেন।[১৫]

১৩. উপসংহার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ তৎকালীন ঢাকার একটি সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান ছিল। ঢাকার সকল সংবাদপত্র (আজাদ-৬ই আশ্বিন, ৭ই আশ্বিন ১৩৭০, সংবাদ-৪ আশ্বিন, ১৪ আশ্বিন ১৩৭০ বাং, ইত্তেফাক ও পূর্বদেশ-২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, জেহাদ-৫ আশ্বিন ১৩৭০, বাংলাদেশ অবজারবার ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, মর্নিং নিউজ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২ অক্টোবর ও ৩ অক্টোবর ১৯৬৩) এ সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করে সম্পাদকীয় ও পর্যালোচনামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করে।

www.nagorikpathagar.org

অংশগ্রহণকারী না হয়েও এই অনুষ্ঠানে আসেন ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দাস, কবি ফররুখ আহমদ, রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকরা। তারাও এই সম্মেলনের প্রশংসা করে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন দূতাবাস প্রতিনিধি ও অবাঙ্গালীরাও আসেন প্রদর্শনীতে।

এই সম্মেলন থেকেও পূর্ব বাংলাকে বাংলা সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করার প্রয়াস পান এর উদ্যোক্তা-আলোচক-বক্তারা। এই অনুসন্ধান ওই সম্মেলনের মাধ্যমে বহুলাংশে সফল হয়ে ওঠে।

তথ্যনির্দেশ

১. মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদক) *'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০'*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭০ বাং, ভূমিকা

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত পৃ ১

৪. পূর্বোক্ত, পৃ ১০৯-১১১

৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৯৯-১০৮

৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৩

৭. পূর্বোক্ত, পৃ ৫

৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৩০

৯. পূর্বোক্ত, পৃ ৩১

১০. পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩

১১. পূর্বোক্ত, পৃ ৪৭

১২. পূর্বোক্ত, পৃ ৫২-৫৩

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৬১-৬২

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৬৫-৬৬

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৬-৮

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

সাংস্কৃতিক আন্দোলন

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

এক. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৪৮-১৯৫২

১. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের ভাষা আন্দোলনের ওপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ওপর বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কোন কোনটির রচয়িতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা, আবার কোন কোনটি সম্পূর্ণ গবেষণাধর্মী। এ সবের মধ্যে অধ্যাপক আবুল কাসেমের 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস', হাসান হাফিজুর রহমানের 'একুশের ফেব্রুয়ারী' ও বদরুদ্দীন উমরের 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র ভাষার দাবীর বহিঃপ্রকাশ ছিল না, এর সঙ্গে জড়িত ছিল এদেশের মানুষের সর্বাত্মক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা। পাকিস্তানী শাসকদের পূর্ব বাংলাবিরোধী মনোভাব ও কর্মকাণ্ড এবং বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের সামগ্রিক প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কেবলমাত্র উর্দু হবে—এই ঘোষণায় শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন পূর্ব বাংলার মানুষ। কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল, রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হলে চাকরি-বাকরি ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতায় পূর্ব বাংলার মানুষ বঞ্চিতই থেকে যাবে। এটা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সাধারণ মানুষেরও সক্রিয় অংশগ্রহণের অন্যতম প্রধান কারণ।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যেহেতু বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত, সেহেতু এই আন্দোলনের ধারাবাহিক একটি পরিচিতি এই গবেষণার সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ গবেষকরাও এই অনুচ্ছেদ থেকে ভাষা আন্দোলন তারিখওয়ারী ঘটনাপঞ্জীর নাতিদীর্ঘ ইতিহাস জানতে পারবেন।

২. পূর্ব-ইতিহাস

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা, লেখালেখি শুরু করেন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা। ১৯৪০ সালে

www.nagorikpathagar.org

ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' (যা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত) গৃহীত হবার পর থেকে ঢাকা ও কলকাতায় বুদ্ধিজীবীরা আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু করেন। লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' কথাটি ছিল না বটে, কিন্তু তাতে উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে দু'টি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ছিল। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের দিল্লী কনভেনশনে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের বদলে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যে স্বতন্ত্র স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার ভাষা হবে বাংলা—এই চিন্তাই করা হয়েছে। এমন কি, পাকিস্তান রাষ্ট্র যদি উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে দু'টি প্রদেশ নিয়েও গঠিত হয়, তা হলেও যে বাংলা-ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে—এ বিষয়েও নিশ্চিত ছিলেন এখানকার চিন্তাবিদরা।

এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন 'দৈনিক আজাদ' সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজীবর রহমান খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ চিন্তাবিদ। ১৯৪৩ সালে আবুল মনসুর আহমদ লেখেন :

> বাঙলার চার কোটি বাঙলা-ভাষী মুসলিম জনসাধারণ হাজার বছরেও উর্দুভাষী হবে না, সে কথা আমি আগেই বলেছি। লাভের মধ্যে হবে এক শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এদের সঙ্গে জনসাধারণের কোনো যোগ থাকবে না, একথাও আগে বলেছি। কিন্তু এরা পশ্চিমাদের গলায় সুর মিলিয়ে উর্দুর মাহাত্ম্য গেয়ে যাবেন। কারণ এরাই হবেন পশ্চিমাদের এদেশীয় আত্মীয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের এ্যাংলোইণ্ডিয়ান শাসক শ্রেণী। শাসক শ্রেণীর ভাষা থেকে জনসাধারণের ভাষা পৃথক থাকার মধ্যে মস্ত বড় একটি সুবিধে আছে। তাতে অলিগার্কী ভেঙ্গে প্রকৃত গণতন্ত্র কোনদিন আসতে পারে না। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রোকাওট হিসাবে রাজনৈতিক মতলবেই এই অভিজাত শ্রেণী উর্দুকে বাঙলার ঘাড়ে চাপিয়ে রাখবেন। শুধু চাকরি বাকরিতে নয়; আইন সভার মেম্বরগিরিতেও যোগ্যতার মাপকাঠি হবে উর্দু বাগ্মিতা। সুতরাং সেদিক দিয়েও এই ভাষাগত আভিজাত্যের স্টীলফ্রেম ভেংগে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা করবার চেষ্টার বিপদ এইখানে।....অথচ উর্দু নিয়ে এই ধস্তাধস্তি না করে আমরা সোজাসুজি বাঙলাকেই যদি পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করি, তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মুসলিম বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়ণে হাত দিতে পারবো।[১]

সে সময়ে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ছিল সমাজের অভিজাত শ্রেণী।

www.nagorikpathagar.org

তবে পূর্ব বাংলার লেখক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলেই তখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত ব্যক্ত করে অবিরাম প্রবন্ধাদি লেখেন। সে সময়ে বাংলা ভাষার পক্ষে-বিপক্ষে যেসব অভিমত ব্যক্ত হয়েছিল, তা হল :

১. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের একমাত্র ভাষা হবে উর্দু। এই ছিল জিন্নাহ্ সাহেব এবং পাকিস্তানের নীতি। সেই সঙ্গে তিনি বলেছিলেন পূর্ব-বাংলার সরকারী ভাষা বাংলা হবে কিনা, তা ঠিক করবেন দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ। বাংলাদেশের মানুষ এই নীতি মেনে নেয়নি; ভাষা আন্দোলনের লক্ষ্যই ছিল এই নীতির বিরোধিতা।

২. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা। এর অর্থ ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে দৈনিক "আজাদ"-এ প্রকাশিত "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই দাবীই জানানো হয়েছিল। এ ছিল প্রায় চরম দাবী, দু'একজনের বেশী লেখক এ দাবী জানাননি, কিন্তু উর্দুর প্রতি বাঙালীর মোহ ভাঙতে, ভাষা হিসাবে বাংলার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং অন্তত অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার সমর্থনে এই অভিমতের একটা ভূমিকা ছিল।

৩. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা, উর্দু, ইংরেজী এবং আরবী। পূর্ব-বাংলার শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত বাংলা। ডঃ শহীদুল্লাহ্ এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।...

৪. পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী ভাষা (রাষ্ট্রভাষা) এবং 'আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের ভাষা হওয়া উচিত উর্দু'; উর্দুকে একটা সম্মান দেওয়া উচিত, কিন্তু পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত বাংলা। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং "সাওগাত" এই অভিমত ব্যক্ত করেছিল।...

৫. পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা।...

৬. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা এবং উর্দু। পূর্ব বাংলার শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বাঙালী উর্দু শিখবে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীর জন্য। একই প্রয়োজনে পশ্চিম পাকিস্তানীরা শিখবে বাংলা। এই ছিল (তমদ্দুন মজলিসসহ) অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর অভিমত।[২]

শেষোক্ত অভিমতই হয়ে উঠেছিল ভাষা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিক ঘটনাপঞ্জী

৩. ১৯৪৭ সালের ঘটনাবলী

১৯৪৭ সালের ৩ জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ ঘোষিত হলে মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস তা গ্রহণ করে। ফলে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে 'বাংলা' বা পূর্ব পাকিস্তানের স্বপ্ন ভেঙে যায়। পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসাবেই স্বীকৃতি পায়। ফলে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন আরও বড় হয়ে দেখা দেয়।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে কমরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে মুসলীম লীগের প্রগতিশীল অংশ নিয়ে ঢাকায় গঠিত হয় গণআজাদী লীগ। সেই লীগের ঘোষণায় বলা হয়, 'মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে হইবে।...বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্ব-পাকিস্তানীদের রাষ্ট্রভাষা'।[৩] ১৯৪৭ সালের মধ্যেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিতর্কে এর নানা দিক নিয়ে যারা প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন : ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কাসেম ও ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক।[৪] এছাড়া আজাদ, মিল্লাত, কৃষ্টি, সওগাত প্রভৃতি পত্রিকায়ও বাংলাভাষার পক্ষে সম্পাদকীয় নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।[৫]

৪. গণতান্ত্রিক যুব লীগ

১৯৪৭ সালের ৬-৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক যুবলীগের কর্মীসম্মেলন। সংগঠনও প্রতিষ্ঠা লাভ করে ওই কর্মীসম্মেলনের মাধ্যমেই। সম্মেলনে ভাষা সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় :

> ... বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে, তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।[৬]

৫. পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস

১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় আবুল কাসেমের নেতৃত্বে গঠিত হয় পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস। প্রতিষ্ঠার পর পরই মজলিস ভাষা সম্পর্কে কয়েকটি সাহিত্য বৈঠকের আয়োজন করে। ১৫ সেপ্টেম্বর মজলিসের উদ্যোগেই প্রকাশিত হয় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?' গ্রন্থ। এতে কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল কাসেমের তিনটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়। বইয়ের মুখবন্ধে সম্পাদক আবুল কাসেমের ভাষা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সন্নিবেশিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় :

www.nagorikpathagar.org

১। বাংলা ভাষাই হবে —
ক. পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন।
খ. পূর্ব-পাকিস্তানের আদালতের ভাষা।
গ. পূর্ব-পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হবে দু'টি— বাংলা ও উর্দু।

৩। ক. বাংলাই হবে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা একশ' জনই এ ভাষা শিক্ষা করবেন।

খ. পূর্ব-পাকিস্তানে উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা। যারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকরি ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত হবেন, শুধু তারাই ও-ভাষা শিক্ষা করবেন। পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা ৫ হতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

গ. ইংরেজী হবে পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে যাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকরি করবেন বা যাঁরা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন, তাঁরাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাদের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে হাজার করা ১ জনের চেয়ে কখনো বেশী হবে না।

ঠিক এই নীতি হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে (স্থানীয় ভাষার দাবী না উঠলে) উর্দু প্রথম ভাষা, বাংলা দ্বিতীয় ভাষা আর ইংরেজী তৃতীয় ভাষার স্থান অধিকার করবে।

৪। শাসনকাজ ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাতত কয়েক বছরের জন্য ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকাজ চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার করতে হবে।[৭]

আবুল কাসেম ও তাঁর সহকর্মীরা বাংলা ভাষার পক্ষে প্রচারণার বহুমুখী প্রয়াস চালান। বহু লোকের সঙ্গে আলাপ করেন। দ্বারে দ্বারে ঘোরেন। কিন্তু তাদের নিরাশ হতে হয়।... তাঁরা কক্ষে কক্ষে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দু'একজন ছাড়া অধিকাংশ ছাত্রই বিরূপ মনোভাব দেখিয়েছেন। পরপর কয়েকজন সাহিত্যিক ও সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আলোচনা করে তারা কিছুটা সাফল্য লাভ করেন। তারা বাংলার পক্ষে দেশের নাম করা ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে একটি স্মারকলিপি তৈরি করে তা সরকারের নিকট পেশ করেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে সরকারী কর্মকর্তারাও ছিলেন।[৮]

www.nagorikpathagar.org

সে সময় হাবীবুল্লাহ বাহার প্রমুখ মন্ত্রীরা তো বাংলা ভাষার সমর্থক ছিলেনই[৯], খোদ নূরুল আমীনও বাংলা ভাষার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ সালের ১২ নবেম্বর তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ঢাকার ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত সভায় জনাব নূরুল আমীন তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন :

> যদি রাষ্ট্রের জনসাধারণের মাতৃভাষার মধ্যস্থতায় রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা (না) হয়, তবে নাগরিকদের সহিত সে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অতি শীঘ্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের উপর বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা চাপান যুক্তিযুক্ত নহে। বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণা করার কোন প্রতিবন্ধক নাই বলিয়া আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।[১০]

এর আগে ৫ নবেম্বর ঢাকায় ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সভায়ও বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার দাবী জানানো হয়।[১১]

এদিকে ১৪ নবেম্বর ১৯৪৭ রাতে তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক এম এ কাসেম বাংলাকে পূর্ব বঙ্গের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে পূর্ব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে আলোচনা করেন। তার সঙ্গে ছিলেন এস আহসান। খাজা নাজিমুদ্দীন স্মারকলিপি বিবেচনার আশ্বাস দেন।[১২]

৬. ঘটনাবলী

<u>২৭-১১-১৯৪৭</u>

করাচীতে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন। এতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহার প্রাদেশিক ভাষা সমস্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এর জবাবে শিক্ষাসচিব ফজলুর রহমান বলেন, তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, প্রাদেশিক ভাষাই শিক্ষার বাহন হবে।[১৩]

<u>২৮-১১-১৯৪৭</u>

পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ প্রচার ও শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান বলেন, 'সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিসর্জ্জন না দিয়াও আমরা প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে কেবল শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেই নয়, সংস্কৃতি প্রচারের মাধ্যমে হিসাবেও সর্ব্বাধিক পরিমাণ সমৃদ্ধি লাভের সুযোগ দিব'।[১৪]

<u>০৫-১২-১৯৪৭</u>

এইদিন ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির শেষ দিনের বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটি প্রাদেশিক লীগ সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে একথা ঘোষণা করার ক্ষমতা দেন যে, উর্দু পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হবে না। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনে (বর্তমান বাংলা একাডেমী ভবন) 'লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

www.nagorikpathagar.org

যখন চলিতেছিল তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকসহ বহুসংখ্যক ছাত্র (ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুছলমান ছিলেন) শোভাযাত্রা করিয়া সেখানে যায় এবং দাবী করিতে থাকে যে, বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া অবিলম্বে ঘোষণা করিতে হইবে। প্রাদেশিক লীগ সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও অন্যান্য লীগ নেতৃবৃন্দ ছাত্রদিগকে আশ্বাস দেন যে, তাহাদের দাবী সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হইবে।[১৫]

ঐ দিনই আবুল কাসেম, আবু জাফর শামসুদ্দীনসহ মওলানা আকরম খানের সাথে ভাষার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন।... একটি প্রেস বিবৃতিতে আবুল কাসেম বলেন, আলোচনা প্রসঙ্গে মওলানা আকরম খান তাঁদের আশ্বাস দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষাকে চাপানোর চেষ্টা করলে পূর্ব পাকিস্তান বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং তিনি নিজে সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবেন।[১৬]

০৬-১২-১৯৪৭

৬ ডিসেম্বর ঢাকায় 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় শিক্ষা সম্মেলন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছাপা হয়। হাবীবুল্লাহ বাহার অবশ্য তার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তার আগেই শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৬ই ডিসেম্বর বেলা দুটোর সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের এক বিরাট সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই হলো সর্বপ্রথম সাধারণ ছাত্র সভা। এই সভায় যারা বক্তৃতা করেন, তাদের মধ্যে মুনীর চৌধুরী, আবদুর রহমান, কল্যাণ দাশগুপ্ত, এ কে এম আহসান, এস আহমদ অন্যতম। ...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ফরিদ আহমদ এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পেশ করেন এবং সেগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :

১. বাংলাকে পাকিস্তান ডোমিনিয়নের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার বাহন করা হোক।
২. রাষ্ট্রভাষা এবং লিংগুয়া ফ্রাংকা নিয়ে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য আসল সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়া এবং বাংলা ভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।
৩. পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহার উর্দু ভাষার দাবীকে সমর্থন করার জন্যে সভা তাঁদের আচরণের তীব্র নিন্দা করছে।
৪. সভা 'মর্নিং নিউজ'-এর বাঙালী বিরোধী প্রচারণার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্যে পত্রিকাটিকে সাবধান করে দিচ্ছে।[১৭]

www.nagorikpathagar.org

এই সভার পর ছাত্ররা একটি মিছিল বের করেন। প্রায় দুই হাজার ছাত্র পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সচিবালয়ের সামনে সমবেত হয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানান। তারা 'উর্দু জুলুম চলবে না' 'পাঞ্জাবী রাজ বরবাদ' প্রভৃতি শ্লোগান দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নীতি ঘোষণার দাবী জানান। কৃষিমন্ত্রী জনাব আফজাল বিক্ষোভকারীদের সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে কোন ভাষা গ্রহণ করিবেন, তাহা এখন স্থির হয় নাই।' মন্ত্রিসভা পরিষদের সদস্যগণের সহিত আলোচনার পর তাহাদের নীতি ঘোষণা করবেন। এতে সন্তুষ্ট না হয়ে ছাত্ররা নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী ও হাবীবুল্লাহ বাহারের বাড়ীতে যান। নূরুল আমীন বলেন, 'বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে আমরা আমাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছি।' হামিদুল হক বলেন, 'উর্দু পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।' তবে তিনি বলেন, 'সমস্ত বিষয়টি ধীর স্থিরভাবে বিবেচনা করিতে হইবে, বিক্ষোভ সৃষ্টি করিবা না।' তারা হাবীবুল্লাহ বাহারের বাসভবনেও যান। কিন্তু তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না। এরপর বিক্ষোভকারীরা খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনের সামনে গিয়ে উর্দু বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে। তিনি অসুস্থ থাকায় তার রাজনৈতিক সেক্রেটারী মিছিলকারীদের সামনে এসে জানান, প্রধানমন্ত্রী এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে তিনি ক্যাবিনেট ও পরিষদ সদস্যগণের সহিত শীঘ্র আলোচনা করিবেন। এরপর শোভাযাত্রাকারীরা মর্নিং নিউজ অফিসের সামনে গিয়ে মর্নিং নিউজ ও উর্দুর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে অফিসটি আক্রমণ করে।[১৮]

ওই দিনটি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এক বিবৃতিতে বাংলা ভাষার দাবী সমর্থন করে গোলযোগ সৃষ্টির বিরোধিতা করেন।[১৯]

৬ ডিসেম্বর 'মর্নিং নিউজ'-এ প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছিল, "শিক্ষা সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে উর্দুকে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। পাকিস্তান সংবিধান সভাই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের মীমাংসা করবে।" [বদরুদ্দীন উমর : পৃ ৩৪-৩৫]

<u>০৭-১২-১৯৪৭</u>

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঢাকার সলিমুল্লাহ হলে পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে "পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সমস্যা" সম্পর্কিত এক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। তাতে তিনি বলেন, "বাংলাদেশে উর্দু ও বাংলা লইয়া যে বিতণ্ডা চলিতেছে, তাহার কোন অর্থই হয় না। বস্তুত বাংলাদেশে শিক্ষার বাহন বা অপিস আদালতের ভাষা বাঙ্গলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা হইতেই পারে না।"[২০]

এই দিনই ঢাকার রেল কর্মচারীদের একটি সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন ফজলুল হক। সভায় বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি হলে ফজলুল হক সভা ত্যাগ করে চলে যান। প্রচার হয় যে, সভাটি ছিল হিন্দুদের নিয়ে ফজলুল হকের পাকিস্তান বিরোধী চক্রান্ত।. দিনই এইসব প্রচারণার বিরুদ্ধে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে

www.nagorikpathagar.org

সিরাজউদ্দৌলা পার্কে আর একটি সভার চেষ্টা করা হলে সেখানেও গণ্ডগোল হয়। ছাত্রদের উপর স্থানীয় লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।[২১]

১২-১২-১৯৪৭

এই দিন পলাশী ব্যারাক অঞ্চলে দু'দল লোকের মধ্যে ভাষার প্রশ্নে হাঙ্গামা বেধে যায়। সে সম্পর্কে পরের দিনের দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয় :

> বাঙ্গলা উর্দু লইয়া যে বিরোধ চলিতেছিল তাহা লইয়া দুই দল মুসলমানের মধ্যে আজ একটি সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। এই সংঘর্ষে কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। অদ্য রাতে বাসে করিয়া কতিপয় মুসলমান যুবক প্রচার করিতে থাকে যে, 'উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হউক'। 'এই প্রচারবাহিনী' পলাশী ব্যারাকের নিকট পৌছিলে এক সংঘর্ষ বাধিয়া যায় এবং লাঠি ও ইটপাটকেল ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও বাঙ্গলা ও উর্দুভাষার সমর্থকদের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষ হয়।
>
> বিকাল ৩টা পর্যন্ত ২০ জনেরও অধিক লোক আহত হয়। তাহাদের মধ্যে ১৭ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার পর বাঙ্গালী মুসলমানের বিরাট একদল জনতা রমনা ও সেক্রেটারীয়েট অঞ্চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং অবিলম্বে বাঙ্গালাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের দাবী জানায়।[২২]

একই দিন শহরে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি গুন্ডামির ঘটনা ঘটে। এতে আরও কয়েকজন আহত হন।[২৩]

১৩-১২-১৯৪৭

১২ ডিসেম্বরের গোলযোগ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে।

ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারির পর প্রকাশ্য আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লেও রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে বিশেষ করে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় লেখালেখি অব্যাহত থাকে।

৭. প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকেই[২৪] পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এ সম্পর্কে গাজীউল হক লিখেছেন :

> ১৯৪৭ সালে ডিসেম্বরের শেষ দিকে পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রশীদ বিল্ডিং নামে যে বিল্ডিং ছিল সেখানে একটি কক্ষে (তমদ্দুন মজলিসের অফিসে) একটি সভা হয়। প্রতিনিধি স্থানীয় ছাত্র, প্রফেসর ও বুদ্ধিজীবীরা এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মুসলিম ছাত্র লীগের কিছু নেতৃস্থানীয় ছাত্র,

www.nagorikpathagar.org

গণতান্ত্রিক যুব লীগের কর্মী এবং তমদ্দুন মজলিসের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। । ঐ সভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এটিই সর্বপ্রথম সংগ্রাম পরিষদ।...:পরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া। তিনি তমদ্দুন মজলিসের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এই কমিটিতে অধ্যাপক আবুল কাসেম, জনাব তোয়াহা, জনাব নঈমুদ্দীন আহমেদ, জনাব শওকত, জনাব ফরিদ আহমদ, এবং সম্ভবত জনাব আখলাকুর রহমান, জনাব আবদুল মতিন খান চৌধুরী, এ আজিজ আহমদ ছিলেন।[২৫]

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া আরও যেসব সদস্যের নাম বলেছেন, তারা হলেন : শামসুল আলম, আবুল খায়ের, আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী, অলি আহাদ। তিনি আরও বলেছেন, 'সরদার ফজলুল করিম সাহেব যদিও কমিটির সদস্য ছিলেন না, তবু তিনি সভায় উপস্থিত থাকতেন, মত বিনিময় করতেন। কিন্তু খাতাপত্রে স্বাক্ষর দিতেন না। পরে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের সহসভাপতি হিসাবে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে (স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট) এবং ফজলুল হক মুসলিম হলের সহসভাপতি হিসেবে তোয়াহা হাসেবকে সংগ্রাম পরিষদে নেয়া হয়। পরিষদের কাজকর্ম প্রায় সবই গোপনে করতে হতো। আমাদের কর্মকান্ডের কথা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। এ সংবাদে অনেক ছাত্রকর্মী বন্ধুবান্ধব অনেকেই সেদিন গালাগালি দিয়েছিল। সেদিন সরকারও আমাদের পঞ্চম বাহিনী বলত। এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যে বিভিন্ন হলে গিয়ে ছাত্রদের ব্যাপকভাবে বোঝাতে থাকি। অনেকেই বাংলাভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অনুধাবন করলো, সমর্থন জানালো, অনেকে উৎসাহ দিলো। কিন্তু সাহস করে কেউ সামনে এলো না।'[২৬]

৮. ১৯৪৮ সালের ঘটনাপঞ্জী

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষার দাবীতে পথবিক্ষোভ না হলেও আন্দোলন-ধারা অব্যাহত ছিল।

<u>১১-০১-১৯৪৮</u>

এই দিন পাকিস্তানের যোগাযোগমন্ত্রী আবদুর রব নিশতার সিলেট সফরে যান। তখন সিলেট মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি আবদুস সামাদের নেতৃত্বে একটি ছাত্র প্রতিনিধিদল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা মন্ত্রীর কাছে পূর্ব-বাংলার শিক্ষার মাধ্যম ও আদালতের ভাষারূপে বাংলা ব্যবহারের দাবী জানান। এ সময় সিলেটের আলেম সমাজও বাংলাভাষার পক্ষে-বিপক্ষে মত দেন।[২৭]

www.nagorikpathagar.org

০১-০২-১৯৪৮

এই দিন তমদ্দুন মজলিসের অধ্যাপক আবুল কাসেম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান খানের সঙ্গে তার ঢাকার বাসায় দেখা করেন। তাঁরা পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিষয় তালিকা থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়া, পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাকটিকিট ইত্যাদিতে বাংলা ভাষা স্থান না পাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা পরিশেষে তুমুল বিতর্কে পরিণত হয়।...অবশ্য ফজলুর রহমান বলেন যে, উপরোক্ত কয়েক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা বাদ দেওয়ার ব্যাপারটি একেবারেই ইচ্ছাকৃত নয়। নিতান্ত ভুলবশতই সেটা ঘটেছে। তিনি সে ভুল সংশোধনের আশ্বাসও দান করেন।[২৮]

০২-০২-১৯৪৮

ভিক্টোরিয়া পার্কে মওলানা আকরম খাঁ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান খান সভাপতির ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'ইহা গণপরিষদের বিবেচনার বিষয়। গণপরিষদ কি করিবেন তাহা তিনি অগ্রিম বলিতে অসমর্থ।'[২৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর মাহমুদ হাসান সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বলেন, "একমাত্র মাতৃভাষা ছাড়া আর কোন ভাষাই পাকিস্তানে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না।"[৩০]

মুদ্রা ও ডাকটিকিটে বাংলা ব্যবহার না করার প্রতিবাদে তখন কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেহাদ একটি কঠোর প্রতিবাদী সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। তাতে বলা হয় যে, পাকিস্তানে নৌবাহিনীতেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে উর্দু এবং ইংরেজীতে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।[৩১]

২০-০২-১৯৪৮

অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটি এবং পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল ও কয়েকজন সাংবাদিক হাবীবুল্লাহ বাহার, নূরুল আমিন ও গিয়াসুদ্দীন পাঠানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাকটিকিট, মনিঅর্ডার ফরমে এবং নৌ ও অন্যান্য বিভাগে নিয়োগের পরীক্ষা ইত্যাদিতে বাংলাকে বাদ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, তারা তার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রতিনিধিদল এ বিষয়ে ডঃ মাহমুদ হাসান ও খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। আবুল কাসেম জানান যে, গণপরিষদের পূর্ববঙ্গের সাফল্য বা প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁরা এ বিষয়ে যথাসাধ্য করবেন।[৩২]

২১-০২-১৯৪৮

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক নূরুল হক ভূঁইয়া, রেয়াত খান, কাজী শামসুল ইসলাম, আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী ও অলি আহাদ এক আবেদনপত্র প্রচার করেন। আবেদনপত্রে বলা হয় :

www.nagorikpathagar.org

বাংলা ভাষা আন্দোলন আজ এক বিশেষ পর্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এক দিকে যেমন উপর হইতে অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক উপায়ে আমাদের উপর অন্য ভাষা চাপাইবার সকল প্রকার চেষ্টা হইতেছে, অন্য দিকে তেমনি দেশের জনগণকে বাংলা বিরোধী করিয়া তুলিবার জন্য নানারূপ অপচেষ্টা হইতেছে। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের ভাষায় বলিতে গেলে ইহাতে পূর্ব পাকিস্তান বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে।

আমাদের কিন্তু বসিয়া থাকিলে চলিবে না। শিশু রাষ্ট্রের যাহাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বনপূর্বক আমাদের আন্দোলন করিয়া যাইতে হইবে। দরকার হইলে ন্যায়সঙ্গতভাবেই শেষ পন্থা অবলম্বন করিতেও আমরা দ্বিধাবোধ করিব না। এর জন্য চাই আমাদের প্রস্তুতি। পূর্ববাংলার প্রত্যেকটি জিলায়, প্রত্যেকটি গ্রামে বাংলা ভাষার দাবীকে আরও জোরালো করিতে হইবে। তাই আজ আমরা পূর্ব বাংলার প্রত্যেক নাগরিক, শিক্ষিত সমাজ, বিশেষ করিয়া ছাত্র ও সাহিত্যিকবৃন্দের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি। তারা যে যেখানে আছেন সভা-সমিতি করিয়া বাংলা ভাষার দাবীকে যেন জোরালো করিয়া তুলেন।[৩৩]

<u>২২-০২-১৯৪৮</u>

এই দিন করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনে পূর্ব-বাংলার কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সংশোধনটি ছিল খসড়া-নিয়ন্ত্রণ প্রণালীর ২৯ নং ধারা সম্পর্কে। এই ধারায় বলা হয়েছিল, পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে উর্দু বা ইংরেজীতে বক্তৃতা করতে হবে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তার সংশোধনী প্রস্তাবে উর্দু ও ইংরেজীর সঙ্গে বাংলাকেও পরিষদের সরকারী ভাষা করার প্রস্তাব করেন।

<u>২৫-০২-১৯৫৮</u>

২৫-০২-১৯৪৮ তারিখে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবের ওপর গণপরিষদে আলোচনা হয়। প্রস্তাব উত্থাপনকালে শ্রীদত্ত বলেন, প্রাদেশিকতার মনোভাব নিয়ে তিনি এ প্রস্তাব করেননি। পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা ৪ কোটি ৪০ লক্ষ। তাই তিনি এ প্রস্তাব এনেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের কথিত ভাষাই রাষ্ট্রের ভাষা হওয়া উচিত। তাই বাংলার পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।[৩৪]

সংশোধনীর বিরোধিতা করে পরিষদ নেতা লিয়াকত আলী খান বলেন, 'মনে হয় পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা, একটা সাধারণ ভাষা দ্বারা ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য'। পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, 'উর্দুই একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে

www.nagorikpathagar.org

পারে বলে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ লোকের অভিমত। বাংলাকে সরকারী ভাষা করার কোন যুক্তি নেই। তবে 'পূর্ববঙ্গে শিক্ষা ও শাসনকার্যের ক্ষেত্রে যথাসময়ে মাতৃভাষা ব্যবহৃত হবে।' পরিষদে কংগ্রেস দলের অস্থায়ী নেতা শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রাজকুমার চক্রবর্তী সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করেন। বিরোধিতা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজনফর আলী খান।[৩৫]

গণপরিষদের সহসভাপতি তমিজুদ্দীন খান পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের সমানাধিকারের কথা ঘোষণা করে প্রস্তাবটি ভোটে দেন। কিন্তু ভোটে তা নাকচ হয়ে যায়।[৩৬]

বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবী অগ্রাহ্য হওয়া এবং নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে ঢাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।[৩৭]

<u>২৬-০২-৪৮</u>

গণপরিষদের ভাষার দাবী নাকচ হওয়ার প্রতিবাদে এদিন ঢাকার ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করেন। মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও স্কুলের ছেলেরা ক্লাস বর্জন করে বাংলা ভাষার সমর্থনে শ্লোগান দিতে দিতে রমনা এলাকা প্রদক্ষিণ করে। মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষে হওয়ার পর সেখানে অপরাহ্ণে সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন তমদ্দুন মজলিসের আবুল কাসেম। পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দীন আহমদ, ফজলুল হক হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং গণপরিষদের বাঙালী মুসলিম লীগ সদস্যদের আচরণ ও উক্তিসমূহের তীব্র নিন্দা করে বক্তৃতা করেন। সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তাতে নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ, বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম সরকারী ভাষা করার উদ্দেশ্যে সংশোধন প্রস্তাব আনার জন্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে অভিনন্দন জানান এবং এ সম্পর্কে পূর্ব বাংলার মুসলমান সদস্যদের মনোভাব, ঢাকা বেতারের মিথ্যা, পক্ষপাতমূলক সংবাদ প্রচারের প্রতিবাদ জানানো হয়। এক পৃথক প্রস্তাবে 'পূর্ব পাকিস্তান প্রতিবাদ দিবস' পালন করতে ছাত্র সমাজকে অনুরোধ জানানো হয়।[৩৮]

এই পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঢেউ ঢাকার বাইরে গ্রাম-গ্রামান্তরেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

<u>২৭-০২-১৯৪৮</u>

রাজশাহীর স্কুল-কলেজের ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ধর্মঘট পালন করেন। ২৭-০২-৪৮ তারিখে নওগাঁ ও বরিশালে, ২৮ ফেব্রুয়ারী মুন্সীগঞ্জ, খুলনা ও দিনাজপুরেও ধর্মঘট পালিত হয় ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।[৩৯]

<u>২৮-০২-১৯৪৮</u>

এইদিন তমদ্দুন মজলিস এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের যুগ্ম রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পাকিস্তান গণপরিষদের সরকারী ভাষার তালিকা

www.nagorikpathagar.org

থেকে বাংলা ভাষা বাদ দেয়ায়, পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকিটে বাংলা ভাষা ব্যবহার না করার এবং নৌবাহিনীতে নিযুক্তির পরীক্ষা থেকে বাংলা ভাষা বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে আগামী ১১ই মার্চ সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট করা হবে। সভায় দাবী করা হয় যে, বাংলা ভাষাকে অবিলম্বে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা বলে ঘোষণা করা হোক। বাংলা ভাষার আন্দোলন যাতে সফল হয়, সেজন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষালয়সমূহের সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়।[৪০]

এ দিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্ররা ক্লাস ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে একটি সভা করেন। তাতে নাজিমুদ্দীনের নিন্দা করে বাংলা ভাষাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানানো হয়।[৪১]

০১-০৩-১৯৪৮

পয়লা মার্চ তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাসেম, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য শেখ মজিবুর রহমান বিএ, নঈমুদ্দিন আহমদ বিএ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের নেতা আবদুর রহমান চৌধুরী দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি ১১ মার্চের ধর্মঘট সফল করে তোলার আহ্বান জানান।[৪২]

একই দিন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচার দফতরের এক বিবৃতিতে বলা হয়, গণপরিষদের স্পীকার উর্দু বা ইংরেজী ছাড়াও অন্য কোন ভাষাতে কোন সদস্যকে বক্তৃতা দেবার সুযোগ দিতে পারেন। আর পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, তা প্রদেশের জনমত অনুসারে স্থির হবে। বিবৃতিতে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেয়া হয় যে, 'কোনরূপ গোলযোগ হলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।'[৪৩]

৯. নতুন 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'

পাকিস্তান গণপরিষদের বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রস্তাব প্রত্যাখান ও মুসলিম লীগ নেতাদের বাংলা ভাষা বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে কার্যকর সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যেই পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও তমদ্দুন মজলিসের যৌথ উদ্যোগে ২ মার্চ ১৯৪৮ ফজলুল হক মুসলিম হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের এক সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন আজিজ আহমদ, আবুল কাসেম, সরদার ফজলুল করিম, রণেশ দাসগুপ্ত, অজিত গুহ, শামসুদ্দীন আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব, নঈমুদ্দীন আহমদ, তফাজ্জল আলী, আলী আহমদ, মহীউদ্দীন, আনোয়ারা খাতুন, শামসুল আলম, শওকত আলী, আবদুল আউয়াল, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শামসুল হক, শহীদুল্লাহ কায়সার, লিলি খান, তাজউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য। সভাপতিত্ব করেন কামরুদ্দীন আহমদ। সভায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি সর্বদলীয় পরিষদ গঠিত হয়। এর সদস্য হিসাবে মনোনীত হন গণআজাদী

www.nagorikpathagar.org

লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, তমদ্দুন মজলিস, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল ইত্যাদি ছাত্রাবাস ও পূর্ব–পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের প্রত্যেকটি থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি। আহবায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যে সাব কমিটি হয়, তার দুটি বৈঠক ৪ ও ৫ মার্চ বিকাল পাঁচটায় ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১১ মার্চের ধর্মঘট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।[৪৪]

০৮–০৩–১৯৪৮

এই দিন সিলেটে তমদ্দুন মজলিস ও সিলেট জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে গোবিন্দ পার্কে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। তার উদ্দেশ্য ছিল অবিলম্বে পূর্ব–পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা। এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন আসাম মুসলিম লীগের প্রাক্তন সম্পাদক মাহমুদ আলী। সভা শুরু হবার পরপরই কিছু লোক উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হোক বলে ধ্বনি দিতে থাকে। এতে সভায় গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। গুন্ডারা মাহমুদ আলী, নওবেলালের প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ আজরফ, পাকিস্তান মুসলিম লীগের সদস্য ও সিলেট তমদ্দুন মজলিস সম্পাদক দেওয়ান অহিদুর রেজা ও সিলেট জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুস সামাদকে লক্ষ্য করে ইট–পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। এতে কয়েকজন আহত হয়। এছাড়া অন্য একটি সভায় যোগদানকারীরা সমাবেশে এসে তমদ্দুন মজলিস সদস্য মকসুদ আলীকে অমানুষিকভাবে প্রহার করে। মারামারির এক পর্যায়ে সমগ্র সিলেটে দু'মাসের জন্য সভা–সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।[৪৫]

১০. ১১ মার্চ ১৯৪৮ : ধর্মঘট ও অন্যান্য ঘটনা

বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবীতে ১১ মার্চ সারা দেশে ধর্মঘট পালিত হয়। আগের রাতে ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় ধর্মঘট সফল করে তোলার জন্য ব্যাপক পিকেটিং–এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অফিস যাত্রীরা যাতে বের হতে না পারেন, তার জন্য নীলক্ষেত, পলাশী ব্যারাক ইত্যাদি স্থানে পিকেটিং–এর আয়োজন করা হয়। ভোর পাঁচটা থেকে ছাত্ররা পিকেটিং শুরু করে। হাই কোর্টের সামনেও পিকেটিং হয়। ফজলুল হকসহ অন্যান্য আইনজীবীরা কোর্টে ঢুকতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যান। তখন পুলিশ লাঠিচার্জ করলে আইনজীবীরা কোর্ট বর্জন করেন। সেক্রেটারীয়েট অফিসগামী কর্মচারীদের বাধা দেয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হন শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, বরকত প্রমুখ। এর প্রতিবাদে বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে একটি বিরাট মিছিল খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনের সামনে সমবেত হলে পুলিশ বাধা দেয়। এক পর্যায়ে সমাবেশ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। একজন পুলিশ মোহাম্মদ তোয়াহাকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করলে তিনি

www.nagorikpathagar.org

রাইফেলটি ছিনিয়ে নেন। তখন তাকে সবাই ঘিরে ফেলে। এতে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে তাকে সেক্রেটারীয়েটের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সুস্থ হয়ে উঠতে তাকে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল।[৪৬]

১২-০৩-১৯৪৮

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে ১১ মার্চে সরকারী জুলুমের প্রতিবাদ জানান। তার হিসাব মতে ১১ মার্চের আন্দোলনে আহত হন ২০০, তার মধ্যে গুরুতর ১৮। ধৃত ৯০০। তার মধ্যে অনেককেই ছেড়ে দেওয়া হয়। জেলবন্দী ৬৯।[৪৭]

একই দিন সকালে জগন্নাথ কলেজে আয়োজিত সভায় গুন্ডাদের হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হন।[৪৮]

১৩-০৩-১৯৪৮

১১ মার্চের সরকারী জুলুমের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শহরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়।

১৪-০৪-১৯৪৮

এই দিন পূর্ব বাংলার সর্বত্র বিপুল উদ্দীপনায় ধর্মঘট পালন করা হয়। বলা সাড়ে তিনটায় খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের বৈঠক শুরু হয়। সেসময় ১১ মার্চে ধৃত ছাত্রদের মুক্তির ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে কিছু সংখ্যক ছাত্র সেখানে বিক্ষোভ করেন।[৪৯]

১১. ১৫ মার্চ ১৯৪৮ : খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে চুক্তি

এই দিনও ছিল ধর্মঘটের কর্মসূচী। সারা দিন বৃষ্টি ছিল। বৃষ্টি উপক্ষো করে পিকেটিং হচ্ছিল। সেক্রেটারীয়েটের বাঙালী কর্মচারীরা এবং দুপুরের দিকে রেল কর্মচারীরাও ধর্মঘটে যোগ দেন। পিকেটারদের বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।[৫০]

সকালেই খাজা নাজিমুদ্দীন প্রস্তাব পাঠান যে, তিনি বেলা সাড়ে ১১টায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চান। সকাল দশটায় ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বৈঠক করে আলোচনায় যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সাড়ে এগারোটায় অধ্যাপক আবুল কাসেম, কামরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আজিজ আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী তার সঙ্গে আলোচনায় বসেন বর্ধমান হাউসে।[৫১]

তুমুল বাক-বিতন্ডার পর খাজা নাজিমুদ্দীন চুক্তির সব কটি শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হন। আবুল কাসেম, কামরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ জেলে গিয়ে ভাষা-আন্দোলনের বন্দীদের চুক্তির

www.nagorikpathagar.org

শর্তগুলি দেখান। শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ এতে সম্মতি দেন। পরিষদ সদস্যরা বর্ধমান হাউজে ফিরে এসে সরকারপক্ষে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন এবং সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দীন আহমদ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সর্বসম্মত চুক্তিটি ছিল নিম্নরূপ :

১. ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাঁহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হইবে।

২. পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত কারিরা এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩. ১৯৪৮ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব-বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্য যে দিন নির্ধারিত হইয়াছে সেইদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তানের গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে, প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজী উঠিয়া যাওয়ার পরপরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষা রূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।

৫. আন্দোলনে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও বিরুদ্ধে কোন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬. সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা (কলকাতার কাগজের ঢাকায় প্রচার) প্রত্যাহার করা হইবে।

৭. ২৯ শে ফেব্রুয়ারী হইতে পূর্ব-বাঙলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে সেখানে হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮. সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।

৮নং শর্তটি খাজা নাজিমুদ্দীন নিজ হাতে লেখেন।[৫২]

বিকেল সাড়ে ৪টায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসমাবেশে অধ্যাপক আবুল কাসেম ও কামরুদ্দীন আহমদ চুক্তির কথা ঘোষণা করেন।

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ১৫ মার্চই (১৯৪৮) ভাষা আন্দোলনের বন্দী ছাত্র ও কর্মীদের মুক্তি দেওয়া হয়। তাদের জন্য জেলগেটে বহু লোক অপেক্ষা করছিল। মুক্তির পর তাদের একটা

www.nagorikpathagar.org

ট্রাকে চড়িয়ে শহরের মধ্যে ঘোরানোর পর ফজলুল হক মুসলিম হলে সেদিনই সন্ধ্যায় তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।[৫২]

১৫ মার্চই শুরু হয় পূর্ব-বঙ্গ বিধান পরিষদের অধিবেশন।

১৬-০৩-১৯৪৮

মুক্তি পাওয়ার পর শওকত আলী ও শেখ মুজিবুর রহমান ১৬ মার্চ ফজলুল হক হলে গিয়ে একটি প্রতিবাদ সভার জন্য ছাত্রদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। ৯টায় সেখানে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। তাতে ১৫ মার্চের চুক্তির কয়েক জায়গায় সংশোধন করা হয়। সংশোধনী ছিল নিম্নরূপ :

১. ঢাকা এবং অন্যান্য জেলায় পুলিশী বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তদন্তের জন্য সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত এবং সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হইবে।

২. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের সুপারিশ করিয়া প্রস্তাবগ্রহণের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য পূর্ব-বাংলা পরিষদের অধিবেশন চলাকালে একটি বিশেষ দিন নির্ধারণ করিতে হইবে।

৩. সংবিধান সভা কর্তৃক তাহারা উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করাইতে অসমর্থ হইলে সংবিধানসভা ও পূর্ব বাঙলার মন্ত্রিসভার সদস্যদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

অলি আহাদের মাধ্যমে প্রস্তাবগুলি খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৫৩]

এই দিনই সকালে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন তফাজ্জল আলীর মাধ্যমে জানতে চান, চুক্তির পর আন্দোলন প্রত্যাহারের যে কথা ছিল, সে অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না কেন। সংগ্রাম কমিটি তাকে জানান যে, আন্দোলনের উপর তাদের সম্পূর্ণ হাত নেই, আন্দোলন এখন এমন এক পর্যায়ে চলে গেছে যে, হঠাৎ করে তা প্রত্যাহার সম্ভব নয়।[৫৪]

১৬ তারিখেই সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করেন। তার বক্তৃতার পর একটি অনির্ধারিত মিছিল সরকারের বিরুদ্ধে ও বাংলা ভাষার সমর্থনে ধ্বনি দিতে দিতে পরিষদ ভবনের দিকে এগিয়ে যায়। কাছাকাছি পৌছলে পুলিশ বাধা দেয়। পরিষদের অধিবেশন তখন চলছিল। বাইরে হট্টগোল-বিক্ষোভও ছিল। পরিষদ ভবনের পূর্ব-গেট গিয়ে এই সময় ছাত্ররা কয়েকজন পরিষদ-সদস্যকে গালাগালি ও মারধোর করে। নাজেহালদের মধ্যে নাজিমুদ্দীন বিরোধীও কয়েকজন ছিলেন। ছাত্ররা অধিবেশন শেষ হওয়ার পর তিন ঘন্টা পর্যন্ত স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার ও মন্ত্রীদের ঘেরাও করে রাখে। শেষে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট শামসুল হককে ডেকে বলেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছাত্ররা এলাকা ত্যাগ না করলে লাঠিচার্জ করা হবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাঠি চার্জ শুরু হলে দৌড়াদৌড়ি পড়ে যায়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে এবং ফাঁকা গুলি করে। শেষ পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

অবস্থানকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। রাত সাড়ে ১১টায় সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। আড়াই ঘন্টা স্থায়ী বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পুলিশের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ১৭ মার্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও সভা হবে, কিন্তু কোন মিছিল হবে না।[৫৫]

১৬ মার্চই প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এক বিবৃতিতে বলেন, 'কিছু দিন যাবৎ ভাষা-সম্পর্কিত যে বিক্ষোভ চলছে, সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে আপোষচুক্তির বিশেষ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তার অবসান হওয়া উচিত ছিল। চুক্তির পর ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য প্রসিদ্ধ কতকগুলি লোক চুক্তি অস্বীকার করে পরিষদ ভবনের চারদিকে বিক্ষোভ করতে থাকে।' তিনি পরিষদ সদস্যদের অপমানিত হওয়া ও নিরুপায় হয়ে পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ও ফাঁকা গুলি করার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেন, 'উদারতার সঙ্গে এইসব প্রশ্ন বিবেচনা করেছি।...আমার এই মনোভাবকে সরকারের পক্ষে দুর্বলতা বলে ভুল করা হয়েছে।...যারা আগুন নিয়ে খেলা করছে তাদের আমি সাবধান করে দিতে চাই যে, সরকার কখনোই অরাজকতা বরদাশত করবে না।'[৫৬]

১৭-০৩-১৯৪৮

এই দিন ঢাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। বেলা আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নঈমুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জিন্নাহ'র ঢাকা আগমন উপলক্ষ্যে ১৯ মার্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘট না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই দিন পূর্ব-বাংলা বিধান পরিষদ অধিবেশনে স্পীকার আবদুল করিম বলেন, (পরিষদের কাজ চালানের জন্য) ভাষার প্রশ্ন পরিষদ দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে। তবে তার আগে সদস্যরা নিজেদের ইচ্ছামত যে কোনো ভাষায় বক্তৃতা করতে পাবেন।[৫৭]

১২. ১৯ মার্চ ১৯৪৮ : কায়েদ-ই আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র ঢাকা সফর

জিন্নাহ্ ১৯ মার্চ বিকালে তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেন। হাজার হাজার লোক তাঁকে স্বাগত জানাতে সেখানে সমবেত হন। সারা পথের দু'পাশে তাকে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন। পথে পথে তোরণ নির্মাণ করা হয়। পুরো শহরে আলোকসজ্জা করা হয়। পোড়ানো হয় আতশবাজি।

২১-০৩-১৯৪৮

২১ মার্চ বিকালে রেসকোর্স ময়দানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জিন্নাহ ভাষা ও ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বলেন :

> এ প্রদেশের সরকারী ভাষা বাংলা ভাষা হইবে কি না, তাহা এই প্রদেশের জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই স্থির করিবেন। আমি নিঃসন্দেহ যে, যথাসময়ে কেবল এই প্রদেশের অধিবাসীদের ইচ্ছানুযায়ীই এই প্রশ্ন সম্বন্ধে

www.nagorikpathagar.org

> সিদ্ধান্ত করা হইবে। আমি আপনাদিগকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতে চাই যে, বাংলা ভাষা সম্পর্কে আপনাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার হস্তক্ষেপ বা বিঘ্ন সৃষ্টি করা হইবে ইহার মধ্যে কোন সত্য নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রদেশের অধিবাসীরাই স্থির করিবেন, আপনাদের প্রদেশের ভাষা কি হইবে। কিন্তু আমি আপনাদিগকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতে চাই যে, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে, অন্য কোন ভাষা নহে। যে কেহ অন্য পথে চালিত হইবে, সেই পাকিস্তানের শত্রু। একটি রাষ্ট্রভাষা ব্যতীত কোন জাতির সংহতি থাকিতে পারে না।[৫৮]

জিন্নাহ'র এই ঘোষণার প্রতিবাদে ২২ মার্চ অধ্যাপক আবুল কাসেম ও শাহেদ আলী এবং ২৩ মার্চ এ কে ফজলুল এক বিবৃতি দেন।[৫৯]

<u>২৪-০৩-১৯৪৮</u>

২৪ মার্চ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র সম্মানে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানেও পাকিস্তানের সংহতির শত্রুদের সতর্ক করে দিয়ে জিন্নাহ বলেন :

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আমার মতামত পুনরায় ব্যক্ত করিব। এই প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহারের জন্য এই প্রদেশবাসী তাহাদের ইচ্ছামত যে-কোন ভাষা গ্রহণ করিতে পারেন এবং প্রশ্নটি প্রদেশবাসীর অভিরুচি অনুযায়ী তাঁহারাই স্থির করিবেন। জনসাধারণের আস্থাভাজন প্রতিনিধিগণ শান্ত ও সুস্থ মনে বিচার-বিবেচনা করিয়া যাহা স্থির করিবেন, তাহাই হইবে। তবে একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা থাকিতে পারে এবং উহা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আদান-প্রদানের ভাষা হইবে এবং সে ভাষা উর্দু ভিন্ন অপর কোন ভাষাই হওয়া উচিত নয়।
>
> সুতরাং উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হইবে। এই উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমান এই ভাষার পরিপোষণ করিয়াছে, পাকিস্তানের সর্বত্রই এই ভাষা বুঝিতে পারা যায়। সর্ব্বোপরি এই ভাষায় এছলামী সংস্কৃতি ও মোছলেম ঐতিহ্য যত বেশী চর্চা হইয়াছে, অপর কোন প্রাদেশিক ভাষায় তদ্রূপ হয় নাই। এই উর্দু ভাষা অপরাপর মোছলেম রাষ্ট্রকথিত ভাষার সমকক্ষ।[৬০]

জিন্নাহ'র এই বক্তৃতার সময় হলের মধ্যে বহু ছাত্র 'না না' বলে চীৎকার করতে থাকেন। এদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মতিন, এ কে এম আহসান প্রমুখ।[৬১]

১৩. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে জিন্নাহ'র সাক্ষাৎকার

www.nagorikpathagar.org

২৪ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় জিন্নাহ্ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধিদলকে সাক্ষাৎ দান করেন। চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের বাসভবনে এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকালে সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, তাজউদ্দীন আহমদ, লিলি খান, মোহাম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, অলি আহাদ, নঈমুদ্দীন আহমদ, শামসুল আলম ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম।[৬২]

আলোচনার শুরুতেই জিন্নাহ বলেন, তিনি নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি মানেন না, কারণ তাতে জোর করে স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আলোচনা ঘোরতর ঝগড়ায় পরিণত হয়। তাঁরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চান। জবাবে জিন্নাহ বলেন, তিনি তাদের কাছে রাজনীতি শিক্ষা করতে আসেননি। মোহাম্মদ তোয়াহা রাষ্ট্রের একাধিক রাষ্ট্রভাষার নজির তুলে ধরলে জিন্নাহ তার সত্যতা অস্বীকার করেন। জিন্নাহ কীভাবে এই ঐতিহাসিক সত্য অস্বীকার করছেন, মোহাম্মদ তোয়াহা তা জানতে চাইলে জিন্নাহ বলেন, তিনি ইতিহাস পাঠ করেছেন; তিনি এ সব কথা জানেন। তার এই জবাব শুনে অলি আহাদ বলেন, তিনিও ইতিহাস পড়েছেন এবং তিনি জানেন যে, কায়েদে আজম ইতিহাসকে বিকৃত করছেন মাত্র। এরপর অলি আহাদ জিন্নাহ'কে ব্যঙ্গ করে বলেন যে, তিনি শুধু ইতিহাসই জানেন, তাই নয়, তিনি বস্তুতপক্ষে একথাও জানেন যে, কায়েদে আজম পাকিস্তানের গবর্নর জেনারেল এবং ইংল্যান্ডের রানীর কাছে তাঁর অপসারণের জন্য তারা আবেদন করতে পারেন। অলি আহাদের এই বক্তব্যে জিন্নাহ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং পরিষদ সদস্যদের উচ্চকণ্ঠে বকাবকি শুরু করেন। ফলে ঘরে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়।[৬৩]

এরকম উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেও সোয়া সাতটা পর্যন্ত আলোচনা চলে। এ সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে জিন্নাহ'র কাছে নিম্নলিখিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপিটি তৈরি করেছিলেন কামরুদ্দীন আহমদ।

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একমাত্র মুসলমান যুবকদের লইয়া গঠিত এই কর্মপরিষদ মনে করে যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কারণ, প্রথমতঃ তাহারা মনে করেন যে, ইহা পাকিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভাষা এবং পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র হওয়ায় অধিকাংশ লোকের দাবী মানিয়া লওয়া উচিত।
>
> দ্বিতীয়তঃ আধুনিক যুগে কোন কোন রাষ্ট্রে একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত কয়েকটি দেশের নাম করা যায়, বেলজিয়াম (ফ্লেমিং ও ফরাসী ভাষা), কানাডা (ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা), সুইজারল্যান্ড (ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয় ভাষা), দক্ষিণ আফ্রিকা (ইংরেজী ও আফ্রিকানা ভাষা), মিসর (ফরাসী ও আরবী ভাষা), শ্যাম (থাই ও ইংরেজী

www.nagorikpathagar.org

ভাষা)। এতদ্ব্যতীত সোভিয়েট রাশিয়া ১৭টি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ এই ডোমিনিয়নের সকল প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষাই রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার করার পক্ষে উপযুক্ত। কারণ সম্পদের দিক বিবেচনায় এই ভাষাকে পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম স্থান দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থতঃ আলাওল, নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, ওয়াজেদ আলী, জসীম উদ্দীন ও আরও অনেক মুসলমান কবি ও সাহিত্যিক তাহাদের রচনা সম্ভার দ্বারা এই ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ বাংলার সুলতান হুসেন শাহ সংস্কৃত ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও এই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং এই ভাষার শব্দ সম্পদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ পারসিক ও আরবী ভাষা হইতে গৃহীত।

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই যে, যে কোন পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের কয়েকটি মৌলিক অধিকার আছে। কাজেই যে পর্যন্ত না আমাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সে পর্যন্ত বাংলা ভাষার জন্যে এই আন্দোলন চালাইয়া যাওয়া হইবে।[৬৪]

দশদিনব্যাপী পূর্ব-বাংলা সফর শেষে করাচী যাবার প্রাক্কালে জিন্নাহ পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশে বেতারে এক ভাষণ দেন। তাতেও পাকিস্তানী সংহতি বিরোধীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, 'এই প্রদেশের সরকারী ভাষা কী হওয়া উচিত, সেটা আপনাদের প্রতিনিধিরাই স্থির করবেন।'[৬৫]

<u>০৬-০৪-৪৮</u>

১৯৪৮ সালের ৬ এপ্রিল বিকাল তিনটায় পূর্ব-বঙ্গ বিধান পরিষদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বাংলাকে সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন।

১৪. ৮ এপ্রিল ১৯৪৮ : বিধান পরিষদে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ

৬ এপ্রিল থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত দীর্ঘ বিতর্ক ও সংশোধনী প্রস্তাব ও তার ওপর আলোচনার পর নাজিমুদ্দীনের প্রস্তাবটি নিম্নরূপে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :

(ক) পূর্ব বাংলা প্রদেশে ইংরেজীর স্থলে বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হইবে; এবং যত শীঘ্র সম্ভব অসুবিধাগুলি দূর করা যায়, তত শীঘ্র তাহা কার্যকর হইবে।

(খ) পূর্ব-বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যমে হইবে 'যথাসম্ভব'

www.nagorikpathagar.org

বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ স্কলারদের ভাষা।[৬৬]

৮ এপ্রিল বিধান পরিষদের সভায় খাজা নাজিমুদ্দীন জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই মুদ্রা ও ফরমে বাংলা ভাষা সন্নিবেশনের নির্দেশ দিয়েছেন।[৬৭]

এরপর ভাষাকে ঘিরে ছাত্রদের যে আন্দোলন, তা স্তিমিত হয়ে আসে। তবে ছাত্ররা ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ভাষা আন্দোলনের স্মারক হিসাবে ১১ মার্চ পালন করতে থাকেন।[৬৮]

১৫. নবপর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন : ১৯৫২

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চের ভাষা আন্দোলনের সূচনা যেমন হয়েছিল গণ-পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেবার অনুমোদন লাভের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত তেমনি ঘটেছিল চতুর্থ শ্রেণীর হাজার হাজার কর্মচারীর আন্দোলনের মাধ্যমে। এই কর্মচারীদের বিরুদ্ধে জানুয়ারীর প্রথম দিকে সরকার নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তা ছাড়া খুলনায় চলছিল দুর্ভিক্ষাবস্থা। পূর্ব-বাংলায় ছিল এমনিতেই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি।

ততদিনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন খাজা নাজিমুদ্দীন। ২৪ থেকে ২৬ জানুয়ারী ১৯৫২ ঢাকায় পাকিস্তান মুসলিম লীগের যে কাউন্সিল অধিবেশন চলছিল, তাতে যোগ দিতে ঢাকায় আসেন খাজা নাজিমুদ্দীন। ২৭ জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দানকালে রাষ্ট্র ভাষা প্রসঙ্গে কায়েদে আজমের কথা উল্লেখ করে খাজা নাজিমুদ্দীন বলেন, প্রদেশের ভাষা কি হবে, তা প্রদেশবাসীই স্থির করবেন, কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকলে কোন রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে পারে না।[৬৯]

খাজা নাজিমুদ্দীনের এই মন্তব্যই সারা পূর্ব বাংলায় পুনরায় ভাষা আন্দোলনের দাবানল সৃষ্টি করে। মোহাম্মদ তোয়াহা তার স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'নাজিমুদ্দীন সাহেব ভাষার প্রশ্নে ওই ধরনের বিবৃতি না দিলে ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা না-ও ঘটতে পারত।'[৭০]

এ প্রসঙ্গে অলি আহাদ লিখেছেন, 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে জিয়াইয়া রাখিবার কারণে ১৯৫১-১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কতিপয় উৎসাহী ও সংগ্রামী ছাত্র এক কর্মীসভা আহবান করে। এই সভায় যুবলীগের প্রাক্তন যুগ্ম-সম্পাদক জনাব আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বা 'Dacca University State Language Committee of Action গঠন করা হয়, সংগ্রামে যখন ভাটা পড়ে তখন এইভাবেই গুটিকয়েক সচেতন মন অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করে। জনাব মতিন একটি ইংরেজী স্মারকলিপি তৈয়ার করেন এবং উক্ত স্মারকলিপি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনসহ পাকিস্তান গণপরিষদের সকল

www.nagorikpathagar.org

সদস্যের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ স্মারকলিপির উত্তরেই, বোধহয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকার পল্টন ময়দানের সভায় উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের সংকল্প ঘোষণা করিয়াছিলেন।'৭১

<u>৩১-০১-১৯৫২ : সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ</u>

খাজা নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০ জানুয়ারী ছাত্র ধর্মঘট ও সভা আহ্বান করে। সভায় ৪ ফেব্রুয়ারীও ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্রসভা ও বিক্ষোভ মিছিলের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ওই দিনই সন্ধ্যা ছয়টায় ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরীতে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অপর এক সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় :

১। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী –সভাপতি, পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
২। আবুল হাশিম-খেলাফতে রব্বানী পার্টি
৩। শামসুল হক-সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
৪। আবদুল গফুর-সম্পাদক, সাপ্তাহিক সৈনিক
৫। আবুল কাসেম-তমদ্দুন মজলিস
৬। আতাউর রহমান খান-আওয়ামী মুসলিম লীগ
৭। কামরুদ্দিন আহমদ-
৮। খয়রাত হোসেন-সদস্য, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ
৯। আনোয়ারা খাতুন- " " " "
১০। আলমাস আলী-নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী মুসলীম লীগ
১১। আবদুল আওয়াল- " " " "
১২। সৈয়দ আবদুর রহিম-সভাপতি, রিকসা ইউনিয়ন
১৩। মোহাম্মদ তোয়াহা-সহ-সভাপতি, পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগ
১৪। অলি আহাদ-সাধারণ সম্পাদক, "
১৫ শামছুল হক চৌধুরী-ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
১৬। খালেক নেওয়াজ খান-সাধারণ সম্পাদক " "
১৭। কাজী গোলাম মাহবুব-আহবায়ক, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
১৮। মীর্জা গোলাম হাফিজ-সিভিল লিবার্টি কমিটি
১৯। মজিবুল হক-সহ-সভাপতি. সলিমুল্লাহ হল ছাত্রসংসদ
২০। হেদায়েত হোসেন চৌধুরী-সাধারণ সম্পাদক, " "
২১। শামসুল আলম-সহ-সভাপতি, ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ

www.nagorikpathagar.org

২২। আনোয়ারুল হক খান–সাধারণ সম্পাদক, " " "

২৩। গোলাম মাওলা–সহ–সভাপতি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ

২৪। সৈয়দ নুরুল আলম–পূর্ব–পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ

২৫। নুরুল হুদা–ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

২৬। শওকত আলী–পূর্ববঙ্গ কর্মীশিবির

২৭। আবদুল মতিন–আহবায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

২৮। আখতার উদ্দীন আহমদ–নিখিল পূর্ব–পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ

তবে দৈনিক আজাদের প্রতিবেদন থেকে মনে হয় কমিটি গঠিত হয়েছিল ৪০ জনের ওপর সদস্য নিয়ে।[৭৪]

বার লাইব্রেরীর ওই সভাতেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ২১ ফেব্রুয়ারী সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ হরতাল, সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৭৫]

০৪–০২–১৯৫২

পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী মোতাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরের সকল স্কুল কলেজের ছাত্র–ছাত্রী উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা ও আরবী হরফে বাংলা প্রচলনের চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে।[৭৬] ছাত্র–ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। সেখানে ২১ ফেব্রুয়ারীর সর্মসূচী পালনের সংকল্প শেষে একটি মিছিল শহরের কয়েকটি রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।[৭৭]

০৬–০২–১৯৫২

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে ১৫০ নং মোগলটুলীস্থ পূর্ববঙ্গ কর্মীশিবির অফিসে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে ১১, (১২?) ও ১৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে পতাকা দিবস পালনের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং জনসাধারণকে সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য দ্বারা আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় সহায়তা করতে আহবান জানায়। আন্দোলন দমানোর জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হলে তা ভঙ্গ করা হবে কিনা, তা নিয়েও আলোচনা হয়। অধিকাংশ সদস্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তবে অলি আহাদ ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মওলানা ভাসানী তাকে সমর্থন জানান। কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা মুলতবি হয়ে যায়।[৭৮]

৬ ফেব্রুয়ারীই করাচীর ডন পত্রিকা এক সম্পাদকীয়তে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর বিরোধিতার করে একে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে অভিহিত করে।[৭৯] এর প্রতিবাদ করেন মওলানা ভাসানী, অলি আহাদ, হামিদুল হক চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা।

www.nagorikpathagar.org

১৩-০২-১৯৫২

মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধিতা করায় পূর্ব বাংলা সরকার পাকিস্তান অবজারবার পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পত্রিকাটি ভাষা আন্দোলন সমর্থন করছিল।

১৬. একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রস্তুতি

এই সময়ে সভা-সমিতি, মিটিং-মিছিল ছিল। আর গঠিত হয়েছিল রাজবন্দী মুক্তি কমিটি। ১৯৫০ সাল থেকে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেকেই সরকারের নিরাপত্তা আইনে আটক ছিলেন।

একুশে ফেব্রুয়ারীর আগের সভা মিছিলের ফলে শুধু ছাত্র সমাজেই নয়, সাধারণ মানুষের মনেও সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছিল।

অলি আহাদ লিখেছেন, 'সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্বোক্ত আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন আয়োজন করেছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল ওই অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তরফ থেকে এব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা।'[৮০]

২০-০২-১৯৫২

এই অবস্থায় পূর্ব বঙ্গ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারী থেকে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকা শহরে সভা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করেন। সরকারী নির্দেশে বলা হয়, 'ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গতকল্য বুধবার ১৪৪ ধারার আদেশ জারী করিয়া এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আদেশ জারীর কারণস্বরূপ তিনি বলেন যে, একদল লোক শহরে সভা শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রয়াস পাওয়ায় এবং তদ্দারা জনজীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকায় এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কোতোয়ালী, সূত্রাপুর, লালবাগ, রমনা ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সমুদয় এলাকায় ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে।'[৮১]

সরকারের এই ঘোষণায় বিভিন্ন হলের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের) ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র এস এ বারী এ টি নিজের উদ্যোগে এক সভা ডেকে ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত করেন। অনুরূপভাবে ফজলুল হক মুসলিম হল ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররাও সভা করে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার রায় দেন।[৮২]

১৪৪ ধারা প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ২১শের কর্মসূচী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২০ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার পর ৯৪নং নবাবপুর রোডস্থ আওয়ামী মুসলিম লীগের সদর দফতরে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। এত সভাপতিত্ব করেন আবুল হাশিম। সভায় অলি আহাদ, আবদুল মতিন প্রমুখ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে জোরালো মত

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশ করেন। পরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার একটি প্রস্তাব আবুল হাশিম ভোটে দিলে তা ১১-৪ ভোটে পাস হয়। কিন্তু অলি আহাদ তা মানবেন না বলে জানিয়ে দেন।[৮৩]

রাত প্রায় দেড়টায় পরিষদ সদস্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক পরিষদের বিবেচনার জন্য ইংরেজী ভাষায় নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করেন :

> Resolved that in view of the promulgation of the section 144 cr.p.c. the programmes of the 21st February are withdrawn & if any member of the All Party Committee of Action for State Language defies the decision, the committee will ipso facto stand dissolved.
>
> অলি আহাদ তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে No. No বলে প্রতিবাদ জানান।[৮৪]
>
> শেষ পর্যন্ত সে মিটিং-এ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।[৮৫]

এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগ। তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্তে অটল থাকে।[৮৬]

২০-২১-শের গভীর রাতে ফজলুল হক হল আর ঢাকা হলের (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) মাঝখানে পুকুরের পাড়ে বৈঠক করে একদল ছাত্র নেতা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, যেকোন মূল্যেই হোক ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে। [অলি আহাদ, পৃ, ১৫০-১৫১]

১৭. ২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২

নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, বিভিন্ন স্থান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় যারা আসবেন, তারা মিছিল না করে দশ জন দশ জন গ্রুপে আসবেন। সেভাবেই সকাল থেকে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে শুরু করে।

বেলা ১১ টার দিকে আমতলার সভা শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গাজীউল হক। বক্তৃতার পর ঠিক হয়, ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন। তবে এক সঙ্গে বিরাট মিছিল বের না করে দশ জনের খন্ড খন্ড মিছিল হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। বেলা একটায় সদর দরজা সংলগ্ন পূর্বদিকের গেট দিয়ে প্রথম দলটি বেরোলেই দলনেতা আজমল হোসেন পুলিশের হাতে আটক হন। আটক হয় তার সঙ্গীরাও। এভাবে তিনটি দলকে পুলিশ আটক করে। তারপর একের পর এক সত্যাগ্রহী দল বেরিয়ে যেতে থাকে।[৮৭]

এসময় পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। শুরু হয় লাঠিচার্জ। চারদিকে ছুটাছুটি। তার মাঝে শ্লোগান, ইটপাটকেল। এই পর্যায়ে বেলা তিনটার দিকে মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলিশ গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলে আবদুল জব্বার ও রফিকউদ্দীন আহমেদ শহীদ হন।

www.nagorikpathagar.org

পরে হাসপাতালে শাহাদাৎ বরণ করে আবুল বরকত ও সালাম। আহত হয় ১৭ জন, গ্রেফতার হন ৬২ জন।[৮৮]

গুলি বর্ষণের খবর দ্রুত সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লে অফিস-আদালত, সেক্রেটারীয়েট, বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা অফিস ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। দোকান পাট ও গাড়িঘোড়া চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।[৮৯]

১৮. বিধান পরিষদে বিতর্ক

ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ নিয়ে বিধান সভায় তীব্র বাদানুবাদ হয়। পরে বিরোধী দলীয় সদস্যরা ওয়াকআউট করেন। বিকল ৫-১০ মিনিটে পরিষদ মুলতবী হয়ে যায়।[৯০]

১৯. বিধান পরিষদ সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দীনের পদত্যাগ

আবুল কালাম শামসুদ্দীন ওই দিন বিকালেই বিধান পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করে গবর্নর মালিক ফিরোজ খান নুনের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। পদত্যাগের কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন যে :

> নিরস্ত্র জনতার ওপর বেপরোয়া পুলিশী গুলিবর্ষণকে আমি জাতীয় সরকারের শাসন ব্যবস্থার এক চরম কলঙ্কময় ঘটনা বলে মনে করি। এই সরকারের আইন উপদেষ্টা দলের একজন সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট থাকতে আমি দারুণ মনঃপীড়া অনুভব করছি। কাজেই এর সংশ্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।[৯১]

এদিনই সরকারের প্রেসনোটে বলা হয়, 'ঘটনা সম্পর্কে জোর তদন্ত চলিতেছে।'[৯২]

২০. নতুন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি

একুশে ফেব্রুয়ারী রাত ৯টায় মেডিক্যাল কলেজে এক সভা আহবান করা হয়, তাতে গোলাম মওলা অন্তর্বর্তীকালীন অস্থায়ী আহবায়ক নিযুক্ত হন। তারা পরের দিন জঙ্গী মিছিলের ডাকেন।[৯৩]

<u>২২-০২-১৯৫২</u>

২১শে ফেব্রুয়ারীর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সারা দেশে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল। সাময়িক বাহিনী তলব, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে আরও ৪ জনের প্রাণহানি। শতাধিক আহত। ১৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সাত ঘন্টার কারফিউ জারি। ৫২ জন গ্রেফতার।[৯৪]

মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে সকাল ১০ টায় গায়েবানা জানাজা। হাজার হাজার লোকের সমাবেশ। সেখান থেকে কালো পতাকা ও শহীদদের রক্তাক্ত জামাকাপড় নিয়ে জঙ্গী মিছিল।

www.nagorikpathagar.org

সারা দেশে মসজিদে মসজিদে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা।

পুরনো ঢাকায় জঙ্গী মিছিল।

মুসলিম লীগ পরিষদ দল থেকে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের পদত্যাগ। তিনি অবশ্য তার সংসদ সদস্যপদে বহাল থাকেন।

বিকাল ৪টা ৫ মিনিটে বিধানসভার অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনেও হৈ চৈ হট্টগোল শেষে নূরুল আমিন প্রস্তাব করেন যে,

> This Assembly recommends to the Constituent Assembly of Pakistan that Bengali be one of the state languages of Pakistan.

এই প্রস্তাবে ভোটে দিলে তা গৃহীত হয়। [৯৫]

এরপর বৈঠক বসার কথা ছিল ২৫ ফেব্রুয়ারী। কিন্তু তার আগেই গবর্নর অধিবেশনের অবসান ঘোষণা করেন।

২৩-০২-১৯৫২

এদিনও পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয় ৪ ব্যক্তি। রেল কর্মচারীরা বেলা ১টা পর্যন্ত হরতাল পালন করেন। কারফিউ (সন্ধ্যা-সকাল ৮টা-৫টা) ও সেনামোতায়েন বহাল থাকে। কালো ব্যাজ পরে হাজার হাজার লোক রাস্তায় বেরোয়। দুপুর দুইটায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে সভা ও গায়েবানা জানাজা হয়। সারা দেশে সভা সমাবেশে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ও ২১শে ফেব্রুয়ারী ও ২২শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করা হয়।[৯৬]

২১. শহীদ মিনার

অলি আহাদের বক্তব্য অনুযায়ী ২২ ফেব্রুয়ারী দিবাগত সারা রাত ধরে ছাত্ররা যেখানে শহীদ হয়েছিলেন সেখানে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারী তা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। ২৩ ফেব্রুয়ারী রাতেই পুলিশ এই শহীদ মিনারটি ভেঙে চুরমার করে দেয়।[৯৭]

ডাঃ সাঈদ হায়দার বলেছেন, ২৩ তারিখ সারারাত কাজ করে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয় এবং ২৪ তারিখে তা উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমানের পিতা। 'পরবর্তীকালে আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব না কি উদ্বোধন করেছিলেন তবে তা হয়ত আরও আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখার জন্য হয়ে থাকবে।'[৯৮]

২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ আজাদের তথ্য অনুযায়ী আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের শহীদ মিনার উদ্বোধন করার কথা। কিন্তু ২৬ তারিখেই পুলিশ নতুন করে

www.nagorikpathagar.org

হামলা চালাতে শুরু করে হলে হলে এবং বশীল আল হেলালের যুক্তিমতে সেদিনই শহীদ মিনারটি ভেঙে ফেলা ছিল স্বাভাবিক। ফলে আবুল কালাম শামসুদ্দীন ঐদিন শহীদ মিনার উদ্বোধন করলেও পরের দিনের আজাদে সে সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। যেমন প্রকাশিত হয়নি শহীদ মিনারটি ভেঙে ফেলার খবর।

২৪-০২-১৯৫২

যানবাহন চলাচল দোকানপাট বন্ধ থাকে। কয়েক স্থানে পুলিশ মৃদু লাঠি-চার্জ করে। সান্ধ্য আইন দু'ঘন্টা কমিয়ে রাত ১০ টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত করা হয়। প্রচারপত্র বিলি করা হয় এবং দেয়ালে স্বৈরাচার বিরোধী পোস্টার লাগানো হয়। পুলিশ ও সামরিক প্রহরা অব্যাহত থাকে। বেতার কেন্দ্রে চারদিন ধরে ধর্মঘট চলে। ফলে সংবাদ বুলেটিন ছাড়া আর কোন কিছু প্রচার বন্ধ থাকে। শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনেকে রোজা রাখেন।[৯৯]

২৫-০২-১৯৫২

ঢাকা শহরের সর্বত্র পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ১১ বার পুলিশ বাহিনী সলিমুল্লাহ হলে ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রভোস্ট ডঃ ওসমান গণির হস্তক্ষেপ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। এই দিন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি সাধারণ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়। পুলিশ জননিরাপত্তা আইনে চারজন এমএলএ আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, মনোরঞ্জন ধর ও গোবিন্দলাল ব্যানার্জিকে আটক করে।[১০০]

২৬-০২-১৯৫২

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে পুলিশের খানাতল্লাশী। হাউজটিউটার ডঃ মফিজউদ্দীন আহমেদ ও ৩০ ছাত্র গ্রেফতার। এই দিন শহরের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসে। দোকানপাট সিনেমা-সার্কাস খেলাধূলা চলে। ব্যাংক পোস্ট অফিস খোলে।[১০১] সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে খানাতল্লাশির প্রতিবাদ জানিয়ে সর্বদলীয় কর্মপরিষদ এক বিবৃতি দেয়।[১০২] এরা ৫ মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট পালনের ডাক দেন।

২৭-০২-১৯৫২

এই দিন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকিসহ সভাপতি খাজা হাবিবুল্লাহ, পাকিস্তান মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য গিয়াসুদ্দীন পাঠান, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী ইউসুফ আলী চৌধুরী ও জয়েন্ট সেক্রেটারী শাহ আজিজুর রহমান চার পৃষ্ঠার একটি প্রচারপত্র ছাড়েন। তাতে তারা গুলি চালানোর ঘটনা দুঃখ ও শোক প্রকাশ করে একজন বিচারপতির নেতৃত্বে ঘটনার তদন্ত দাবী করেন। সেই সঙ্গে তারা ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন প্রত্যাহারের দাবী করেন। তারা পাকিস্তান বিরোধীদের চক্রান্ত সম্পর্কে জনসাধারণকে সজাগ থাকারও আহবান জানান।[১০৩]

www.nagorikpathagar.org

০৬-০৩-১৯৫২

প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের ছাড়া, ভাষা আন্দোলনে আটক বন্দীদের মুক্তির জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়।[১০৪]

০৭-০৩-১৯৫২

ঢাকা জেল থেকে তিনজন বন্দীকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু ওই দিনই রাতে শান্তিনগর এলাকা থেকে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের ১০ বা ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল মতিন, সাদেক খান, আবদুল লতিফ চৌধুরী, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী ও মুজিবুল হক।[১০৫]

এরপর গ্রেফতারী পরোয়ানার প্রেক্ষিতে পুলিশের কাছে গ্রেফতার বরণ করেন মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, সৈয়দ নূরুল আলম প্রমুখ।[১০৬]

১১-০৩-১৯৫২

ভাষা আন্দোলন কালে গ্রেফতারকৃত ৭৮ জনের মুক্তিলাভ।

১৫-০৩-১৯৫২

ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন পূর্ব বাংলা সরকারের অনুরোধ অনুযায়ী একুশে ফেব্রুয়ারী ঘটনা তদন্তে বিচারপতি এলিসকে নিয়োগ করেন।[১০৭] তার তদন্তের বিষয় ছিল ঃ (১) ঢাকার সাম্প্রতিক ঘটনায় পুলিশের গুলিবর্ষণ প্রয়োজন ছিল কিনা। (২) ওইরূপ পরিস্থিতিতে পুলিশের গুলিবর্ষণ যুক্তিসঙ্গত হয়েছিল না শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়েছিল।[১০৮]

২২. ৩১ মে ১৯৫২ : তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ

দীর্ঘ শুনানি শেষে বিচারপতি এলিস তার তদন্ত রিপোর্টে বলেন যে, (১) পুলিশের পক্ষে গুলিবর্ষণ প্রয়োজন হয়েছিল, (২) পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করলে 'পুলিশের বলপ্রয়োগ যুক্তিযুক্ত ছিল।'[১০৯]

এরপর প্রায় সারা বছর ধরেই বক্তৃতা-বিবৃতি সভা-সমিতি অব্যাহত থাকে। তাতে ভাষার দাবীর পাশাপাশি রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীও উচ্চারিত হতে থাকে।[১১০]

২৩. ১৯৫৩ থেকে পরবর্তী সময়

১৯৫৩ সাল থেকেই সারা দেশে একুশে ফেব্রুয়ারীকে 'শহীদ দিবস' হিসাবে পালন করা শুরু হয়।

www.nagorikpathagar.org

২৪. বাংলা ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি

১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদে পাকিস্তান ইসলামী রিপাবলিকের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত ২১৪ নং অনুচ্ছেদের ১নং ধারায় বলা হয় : "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা"।[১১১]

২৫. রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন থেকে মুক্তির প্রশ্ন : একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি বিরাট মাইল ফলক। এই একুশে ফেব্রুয়ারীকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন ধারার সূচনা হয়।

১৯৫২ সালের পর থেকে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারীর শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠান, সঙ্গীতানুষ্ঠান, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অব্যাহত থাকে। এসব আলোচনা অনুষ্ঠানে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয় যেমন উঠে এসেছে, তেমনি এদেশের মানুষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অধিকারের প্রশ্নও বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

তাছাড়া ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর পর সারা দেশের স্কুল-কলেজে, গ্রামে-গঞ্জেও গড়ে উঠেছে অসংখ্য শহীদ মিনার। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষ্যে এসব শহীদ মিনারকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার ফলে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে অধিকার সচেতনতা ও সংগ্রামী চেতনা, স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জোরদার হয়েছে।

একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষ্যে ১৯৫৩ সাল থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে একুশের সঙ্কলন। পাকিস্তানের ২৪ বছরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন শত শত 'একুশের সংকলন' প্রকাশ করেছে। যাতে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি নতুন নতুন লেখকেরও জন্ম হয়েছে। এসব লেখার মধ্য দিয়েও এদেশের মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হয়েছে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাই একুশে ফেব্রুয়ারীর অবদান অপরিসীম।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মূল্যায়নে আবুল কাসেম ফজলুল হক লিখেছেন :

> ১৯৫৩ সন (সাল) থেকে ধারাবাহিকভাবে যদি একুশে ফেব্রুআরি উদযাপনের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, এদেশের নিপীড়িত জনগণের কাছে এ-দিনটি প্রতি বছরই প্রতিবাদ প্রতিরোধ ও সংগ্রামের নতুন শপথ গ্রহণের দিন। কোন একটি মাত্র সুনির্ধারিত অন্যায়ের প্রতিবাদে, একটি মাত্র আক্রমণের প্রতিরোধে কিংবা কোন সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ মুক্তির লক্ষ্যে বছরের পর বছর ধরে

www.nagorikpathagar.org

> এদিনের কর্মতৎপরতা, স্লোগান, প্রতিজ্ঞা ও বক্তব্য গন্ডিবদ্ধ থাকেনি। এমন কি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রশ্নেও প্রতি বছর নতুন নতুন স্লোগান উঠেছে, নতুন নতুন সংগ্রামের শপথ গৃহীত হয়েছে।[১১২]

এভাবেই সমস্ত শোষণ-বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্যে এদেশে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

২৬. উপসংহার

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সব চেয়ে বড় ঘটনা ভাষা আন্দোলন। ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য লাহোর প্রস্তাবের পর থেকেই পূর্ব বাংলার মানুষ যে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন, ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর আত্মদানের মধ্য দিয়ে তা চূড়ান্ত রূপলাভ করে। এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে সাংবিধানিকভাবে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে।

কিন্তু বাংলা ভাষা ও পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে পাকিস্তানী শাসকদের মনোভাব কখনও পরিবর্তিত হয়নি। পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে তাই বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই অব্যাহত থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

তথ্যনির্দেশ

১. মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৫০
২. আবদুল হক, *ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব*, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ ৪৭-৪৯
৩. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খন্ড, ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ ১৭-১৯
৪. বশীর আলহেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ ১৭৩
৫. পূর্বোক্ত, পৃ ১৭৩-৭৪
৬. বদরুদ্দীন উমর, পৃ ২১-২৯
৭. উদ্ধৃত, রেজোয়ান হোসেন সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন*, পান্ডুলিপি, ১৯৭৬
৮. বশীর আলহেলাল, পৃ ১৮২
৯. পূর্বোক্ত
১০. দৈনিক আজাদ, ১৫-১১-১৯৪৭

www.nagorikpathagar.org

১১. দৈনিক আজাদ, ১৬-১১-১৯৪৭
১২. দৈনিক আজাদ, ১৯-১১-১৯৪৭
১৩. দৈনিক আজাদ, ২৯-১১-১৯৪৭
১৪. দৈনিক আজাদ, ৩০-১১-১৯৪৭
১৫. দৈনিক আজাদ, ০৭-১২-১৯৪৭
১৬. বদরুদ্দীন উমর, পৃ ৩৪
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫
১৮. দৈনিক আজাদ, ০৭-১২-১৯৪৭
১৯. দৈনিক আজাদ, ০৮-১২-১৯৪৭
২০. দৈনিক আজাদ, ১৫-১২-১৯৪৭
২১. বদরুদ্দীন উমর, পৃ ৩৮-৩৯
২২. দৈনিক আজাদ, ১৩-১২-১৯৪৭
২৩. বশীর আলহেলাল, পৃ ১৯৯-২০০
২৪. সুনির্দিষ্ট তারিখ জানা যায় না
২৫. *একুশের সঙ্কলন '৮০ ঃ স্মৃতিচারণ*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০, পৃ ১০২
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩-৩৪
২৭. সাপ্তাহিক নওবেলাল, ১৯-০২-১৯৪৮
২৮. বশীর আল্‌হেলাল, পৃ ২০৭
২৯. দৈনিক আজাদ, ০৪-০২-১৯৪৮
৩০. নওবেলাল, ০৫-০২-১৯৪৮
৩১. বদরুদ্দীন উমর, পৃ ৫৪-৫৫
৩২. দৈনিক আজাদ, ২৩-০২-১৯৪৮
৩৩. দৈনিক আজাদ, ২৩-০২-১৯৪৮
৩৪. দৈনিক আজাদ, ২৬-০২-১৯৪৮
৩৫. বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৩
৩৬. দৈনিক আজাদ, ২৬-০২-১৯৪৮
৩৭. দৈনিক আজাদ, ২৮-০২-১৯৪৮
৩৮. বশীর আলহেলাল, পৃ ২১১-২১২ [তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটি আসলে ছিল রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিরই নাম—বশীর আল হেলাল]
৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ ২১৭-২১৯
৪০. দৈনিক আজাদ, ০২-০৩-১৯৪৮

www.nagorikpathagar.org

৪১. পূর্বোক্ত

৪২. দৈনিক আজাদ, ০২-০৩-১৯৪৮

৪৩. দৈনিক আজাদ, ০৩-০৩-১৯৪৮

৪৪. বশীর আল্‌হেলাল, পৃ ২২০

৪৫. নওবেলাল, ১১-০৩-১৯৪৮

৪৬. বদরুদ্দীন উমর, পৃ ৭৬-১০৩

৪৭. পূর্বোক্ত

৪৮. পূর্বোক্ত

৪৯. পূর্বোক্ত

৫০. বাংলা একাডেমী, *একুশের সংকলন ১৯৮০, স্মৃতি চারণ* (গাজীউল হক) পৃ ১১২

৫১. পূর্বোক্ত

৫২. বশীর আল্‌হেলাল, পৃ ২৩৮

৫৩. বশীর আল্‌হেলাল, পৃ ২৪২

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ ২৪২-২৪৩

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ ২৪২

৫৫. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতিঃ ১৯৪৫ থেকে '৭৫,* ১ম প্রকাশ ১৯৮২, ঢাকা, পৃ ৫৪-৬১

৫৬. দৈনিক আজাদ, ১৮-০৩-১৯৪৮

৫৭. বশীর আল্‌হেলাল, পৃ ২৪৪

৫৮. দৈনিক আজাদ, ২৪-০৩-১৯৪৮

৫৯. দৈনিক আজাদ, ২৪ ও ২৫ মার্চ, ১৯৪৮

৬০. দৈনিক আজাদ, ২৬-০৩-১৯৪৮

৬১. বশীর আল্‌হেলাল, পৃ ২৫০

৬২. বদরুদ্দীন উমর, পৃ ১১৮-১১৯

৬৩. বদরুদ্দীন উমর, পৃ ১১৯-১২০

৬৪. যুগান্তর, ০২-০৪-১৯৪৮, উদ্ধৃত বদরুদ্দীন উমর, পৃ ১২১

৬৫. Quiaid-I-Azam Mohammad Ali Jinnah's speeches as Governor General, Pakistan Publication, Karachi. P-107, উদ্ধৃত, উমর, পৃ ১২৮

৬৬. East Bengal Legislative Assembly Proceedings. Vol 1. No.4. thursday, the 8th April, 1948. P.161, উদ্ধৃত, উমর পৃ ১৫৯-১৬০

৬৭. দৈনিক আজাদ, ০৯-০৪-১৯৪৮

www.nagorikpathagar.org

৬৮. বশীর আল্‌হেলাল, পৃ ২৫৮
৬৯. দৈনিক আজাদ, ২৮ জানুয়ারী, ১৯৫২
৭০. বাংলা একাডেমী সম্পাদিত *একুশের সংকলন '৮১ ঃ স্মৃতিচারণ*, পৃ ৯৪
৭১. অলি আহাদ, পৃ ১৪২
৭২. পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৩
৭৩. অলি আহাদ, পৃ ১৪৩–১৪৪
৭৪. দৈনিক আজাদ, ০১–০২–১৯৫২
৭৫. অলি আহাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৪
৭৬. দৈনিক আজাদ, ০৫–০২–১৯৫২
৭৭. অলি আহাদ পৃ ১৪৫
৭৮. অলি আহাদ, পৃ ১৪৫
৭৯. সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ, ১৭–০২–১৯৫২
৮০. অলি আহাদ, পৃ ১৪৬
৮১. দৈনিক আজাদ, ২১–০২–১৯৫২
৮২. অলি আহাদ, পৃ ১৪৬
৮৩. বশীর আল্‌হেলাল, পৃ ৩০২–২০৩
৮৪. বশীর আল্‌হেলাল, পৃ ৩০৪, ও অলি আহাদ, পৃ ১৪৯
৮৫. বাংলা একাডেমী, *একুশের সংকলন '৮১ ঃ স্মৃতিচারণ*, পৃ ৯৫–৯৬
৮৬. অলি আহাদ, পৃ ১৫০–১৫১
৮৭. বশীর আল্‌হেলাল, পৃ ৩১৬–৩১৯
৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৩১৯–৩২৩
৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ ৩২৪
৯০. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩০–৩৪৮
৯১. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ ৩৩১
৯২. দৈনিক আজাদ, ২২–০২–১৯৫২
৯৩. অলি আহাদ, পৃ ১৬০
৯৪. দৈনিক আজাদ, ২৩–০২–১৯৫২
৯৫. বশীর আল্‌হেলাল, পৃ ৪০৯
৯৬. বশীর আল্‌হেলাল, পৃ ৪১৬–৪২৮
৯৭. অলি আহাদ, পৃ ১৬৭–১৬৮
৯৮. *একুশের সংকলন '৮১ ঃ স্মৃতিচারণ*, পৃ ৪১–৪৪
৯৯. দৈনিক আজাদ, ২৫–০২–১৯৫২

www.nagorikpathagar.org

১০০. দৈনিক আজাদ, ২৬-০২-১৯৫২
১০১. দৈনিক আজাদ, ২৭-০২-১৯৫২
১০২. দৈনিক ইনসাফ, ২৭-০২-১৯৫২
১০৩. বশীর আল্‌হেলাল, পৃ ৪২৬-৪৬৩
১০৪. দৈনিক আজাদ, ০৭-০৩-১৯৫২
১০৫. *একুশের সংকলন '৮১ ঃ স্মৃতিচারণ*, পৃ ৯৭-৯৮
১০৬. অলি আহাদ, পূর্বোক্ত
১০৭. দৈনিক আজাদ, ১৬-০৩-১৯৫২
১০৮. দৈনিক আজাদ, ১৪-০৩-১৯৫২
১০৯. দৈনিক আজাদ, ০১-০৬-১৯৫২
১১০. বশীর আল্‌হেলাল, পৃ ৫০১-৫৩৬
১১১. বশীর আল্‌হেলাল, পৃ ৫৭০
১১২. আবুল-কাসেম ফজলুল হক, *একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন*, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ ২৯-৩০

www.nagorikpathagar.org

দুই. বাংলা ভাষার সংস্কার প্রচেষ্টা ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির উদ্যোগ ১৯৪৮-১৯৬৮

১. প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষা বিশেষ করে বাংলা বানান, বর্ণমালা ও লিপি সংস্কারের প্রয়াস দীর্ঘ দিনের। পাকিস্তান আমলে এই প্রয়াসের প্রধানত তিনটি দিক ছিল :" লিপি-সংস্কার, বানান-সংস্কার ও ভাষা-সংস্কার। 'ভাষা-সংস্কার' কথাটি স্বভাবতই কারো-কারো বিচিত্র মনে হয়েছে। কারণ ভাষার যে পূর্বাপর রূপ, দিন-ক্ষণ বেঁধে কমিটির মাধ্যমে প্রস্তাব করে তার পরিবর্তন করা যায় না। কেবল লিপি ও বানানে পরিবর্তন হয়ত আরোপ করা যায়। কিন্তু ব্যাকরণিক তো বটেই, বাংলা ভাষার আভিধানিক ও চরিত্রগত সংশোধনের প্রস্তাবও করা হয়েছিল। তবে সংস্কারের এই উদ্যোগকে "সমগ্রভাবে ভাষা-সংস্কর হয়ত বলা যায়। ব্যাপারটাকে সমগ্রভাবে ভাষা-সংস্কার বলা যায় আরও এই কারণে যে, বাংলা ভাষার আপন লিপি-বর্জনের প্রস্তাব ও প্রয়াসও এতে ছিল। কেবল লিপি ও বানান-সংস্কার নয়, অন্য লিপিতে বাংলা লেখার এই প্রস্তাব ও প্রয়াস দীর্ঘকালের।"[১] ভাষা সংস্কারের উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনটি ধারা ছিল লক্ষ্যণীয় : (১) আন্তরিক উদ্যোগ, (২) সরকারী উদ্যোগে ও (৩) সরকারী উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। এ ব্যাপারে পাকিস্তান আমলের উদ্যোগসমূহ বিশ্লেষণ করলে তখনকার প্রয়াসের স্বরূপ বোঝা যাবে।

২. রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব

অষ্টাদশ শতকেই ইংরেজ রাজকর্মচারীরা যখন শাসনকার্য উপলক্ষ্যে ভারতে দেশী ভাষাগুলির সংস্পর্শে আসেন, তখন থেকেই তাদের অনেকে ফারসি ও উর্দু সমেত সকল ভাষায় রোমান লিপি প্রবর্তনের কথা বলতে থাকেন। কোন কোন ইংরেজ অবশ্য এর বিরোধিতাও করেন। ১৭৮৮ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রথম ভারতীয় ভাষাসমূহ রোমান লিপিতে লিখতে প্রবৃত্ত হন। তারপর স্যার চার্লস, ট্রিবিল্যান, ডঃ ডর্ফ, পার্শ, টমাস প্রমুখ 'তৎকালীন প্রধান প্রধান ইংরেজ' কলকাতায় এ বিষয়ে প্রয়াস করেন, কিন্তু কেউ সফল হননি। শত-খানেক বছর পর জর সহকারী শিক্ষক ড্রু সাহেব রোমান হরফের পক্ষে

www.nagorikpathagar.org

সুপারিশ ও দীর্ঘ আলোচনা করেন। রাজ-কর্মচারীরা তাকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসেন। এই প্রস্তাবের রূপায়ণের জন্য এমন কি সভাসমিতিও স্থাপিত হয়। লাহোরের এইরূপ একটি সমিতির নাম 'রোমান-উর্দু'। ওই নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।[২]

রোমান হরফের পক্ষে সে কালে যে যুক্তিগুলি ছিল তা হল : রোমান বর্ণমালায় অক্ষর কম, তা আধুনিক জ্ঞানোন্নতির সহায়ক, মুদ্রণযন্ত্রের উপযোগী, রোমান অক্ষরের বাহ্যরূপ স্পষ্ট, পরিভাষা রচনায় সহায়ক, ভাষাতাত্ত্বিকভাবে রোমান লিপি প্রাচ্য লিপির সগোত্রও বটে, ইত্যাদি। লাহোর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ লাইটনর এবং আরও দু'একজন ইংরেজ এর বিরোধিতা করে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তা হল : দেশীয় লোকেরা তাঁদের আপন বর্ণমালাকে সম্মানের চোখে দেখেন এবং রোমান অক্ষরে দেশীয় উচ্চারণ কিছুতেই সম্ভব নয়।[৩]

পরবর্তীকালে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও না কি রোমান হরফে বাংলা লেখা সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি ওই মত পরিবর্তন করেন।[৪] তাছাড়া ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও রোমান হরফে বাংলা লেখার সুপারিশ করেছিলেন বলে জানা যায়।[৫] ১৯৪৭ সালের পর ডঃ মোহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা ও অধ্যক্ষ নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষাবিদও রোমান হরফে বাংলা লেখার পক্ষে মত দিয়েছিলেন।[৬]

বাংলা ভাষা রোমান হরফে লেখার সমর্থনে সে সময় যেসব যুক্তির অবতারণা করা হয়, সেগুলো হচ্ছে :

(১) বাঙলা হরফ আমাদের জাতীয় লিপি নয়।

(২) বর্তমান বাঙলা হরফের অনেক দোষত্রুটি রয়েছে; যেমন অতিরিক্ত অক্ষর সংখ্যা, দীর্ঘস্বর, তিন 'শ', দুই 'ব', দুই 'জ', দুই 'ন', যুক্তাক্ষর ইত্যাদি। এই হরফ-সমুদ্রের মধ্যে শিশুর উৎসাহ তলিয়ে যায়।

(৩) রোমান হরফে অক্ষর সংখ্যা কম হবে এবং নতুন শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ হবে। এতে অতি অল্প-সময়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব হবে। রোমান হরফ গ্রহণের ফলে তুরস্কে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল।

(৪) টাইপ-রাইটারে সুবিধে হবে।

(৫) রোমান হরফে লিখন-দ্রুতি ও পঠন-দ্রুতি বাঙলার চেয়ে বেশী।

(৬) আমাদের পক্ষে ইংরেজী লেখা সহজ হবে।

(৭) বিদেশীর পক্ষে বাঙলা শেখা সহজ হবে।[৭]

তবে এর কোন যুক্তিই শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি। বাংলা ভাষায় রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন অনেক পণ্ডিত জন। তার মধ্যে ১৯৪৮ সালে ফেরদাউস খানের একটি সমীক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[৮]

www.nagorikpathagar.org

১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলা সরকারের ভাষা কমিটি শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, উচ্চ সরকারী কর্মচারী ও বিধান পরিষদ সদস্যদের মধ্যে ভাষা সংস্কারের ব্যাপারে একটি সমীক্ষা চালান। সেই সমীক্ষায় বিস্তারিত প্রশ্নমালার জবাব দিয়েছিলেন ৩০১ জন। তার মধ্যে ৯৬ জন আরবী হরফে, ১৮ জন রোমান লিপিতে বাংলা লেখার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। বাকী ১৮৭ জন উত্তরদাতা বাংলা লিপি বজায় রাখার পক্ষে মত দেন।[৯]

এর মধ্যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন জোরদার হওয়ায় রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রয়াস আপাতত কিছুটা ঝিমিয়ে আসে। কিন্তু তাতে একেবারে যতি পড়ে না।

পরবর্তীকালে ১৯৫৭ সালেও পূর্ব-পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন বয়স্কদের শিক্ষায় সংশোধিত রোমান হরফ ব্যবহারের সুপারিশ করেন।[১০]

কোন কোন ব্যক্তি ও মহল থেকে বাংলা ও উর্দু এবং পাকিস্তানের অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও রোমান লিপি প্রবর্তনের দাবী করা হয়। বলা হয়, এর দ্বারা পাকিস্তানের ভাষা সমস্যার সমাধান হবে এবং দেশের সংহতি বৃদ্ধি পাবে।

১৯৫৭-৫৮ সালের দিকে রোমান হরফ প্রচলনের দাবী অব্যাহত ছিল। মোহাম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন, 'সম্প্রতি রোমান হরফে বাংলা লিখবার একটা ধুয়া উঠেছে। কয়েকজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ রোমান হরফে বাংলা লেখা প্রচলন করবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।'[১১]

বাংলার কথা বেশি বলা হচ্ছিল, কিন্তু অনেকে বলছিলেন পাকিস্তানের সমস্ত ভাষা রোমান লিপিতে লিখতে। সব ভাষায় রোমান হরফ প্রবর্তনের কথা যারা বলছিলেন, তাঁদের প্রধান যুক্তি ছিল দেশের ঐক্য ও সংহতি। তাছাড়া, রোমান যেহেতু অগ্রসর ইউরোপ ও আমেরিকার লিপি এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের কয়েকটি ভাষা এই লিপি গ্রহণ করেছে, এমনকি কয়েকটি মুসলিম দেশে আরবি লিপি বাদ দিয়ে তা করা হয়েছে, অতএব রোমান হরফ খুবই বৈজ্ঞানিক লিপি। মুহম্মদ আবদুল হাই প্রাগুক্ত প্রবন্ধে এই দাবি ও যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে লিখেছিলেন :

> এর আগে যদি বাংলা লিপিতে বাংলাভাষা লেখার কোন ব্যবস্থা না থাকতো কিংবা আজই যদি প্রথমবারের মত বাংলা লেখার উপায় উদ্ভাবন আমাদের শিক্ষাবিদদের করতে হ'ত, তা'হলে শুধু রোমান কেন, জীবজন্তুর ছবির সাহায্যে কিংবা আরবী অক্ষরে বাংলা শিখবার সোপারেশ তাঁরা করতে পারতেন।... কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলতে পারি না, গত হাজার বছর ধরে বাংলা লিপিতে বাংলা ভাষা লেখা হয়ে আসছে। ফলে বাংলা লিপি বাংলা ভাষার ধ্বনির বাহক হিসেবে ক্রমে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।...এখানে বাংলা লিপির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, তা অত্যন্ত ধ্বনিভিত্তিক।...বিজ্ঞানের এ অগ্রগতির কালে সবকিছুকে বৈজ্ঞানিক বলার

www.nagorikpathagar.org

একটা ধূয়া আমাদের পেয়ে বসেছে।...(রোমান হরফের) অসুবিধা এই যে এ লিপি ধ্বনিমূলক (Phonetic) নয়, বর্ণাত্মক অর্থাৎ একটি ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে একটি হরফ দাঁড়ায় না। ইংরেজীর কথাই ধরা যাক ... g হরফ কখনও 'গ' হয় কখনও তার কোন উচ্চারণই হয় না,...কখনও 'জ' হয়, ... কখনও স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়। ইংরেজীর এ অবিজ্ঞানোচিত বানান সংস্কার করে ধ্বনিমূলক পদ্ধতিতে ইংরেজী লেখার জন্যে বানার্ড শ' তাঁর সম্পত্তির একটা মোটা অংশ উইল করে যান। কিন্তু রক্ষণশীল ইংরেজ জাত তাঁর এ সাধু প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করতে পারল না। তারা বলল, তাঁর ইচ্ছানুসারে হরফ ও বানান সংস্কার করলে 'That will create confusion in the established law and order of the land'. রোমান হরফ রেখে শুধু বানান সংস্কার করতেই তাদের যখন এত আপত্তি সেখানে আমাদের মধ্যে বাংলা হরফ বর্জন করে একেবারে রোমান হরফ গ্রহণ করবার যাঁরা সুপারিশ করেছেন তাঁরা দেশজোড়া এ confusion-এর কথা ভেবে দেখেছেন কি? বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিচার করলে রোমান হরফের তুলনায় বাংলা হরফ যে অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক তা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। তার কারণ প্রত্যেকটি ধ্বনির জন্য বাংলায় একটি হরফ আছে। 'ক' লিখলে 'ক'-ধ্বনি ছাড়া আর অন্য কিছু উচ্চারণ আমরা করি না এবং কোন জায়গায় 'ক' অনুচ্চারিতও থাকে না।...বাংলা হরফ শুধু যে ধ্বনিমূলক (Phonetic) তা নয়, তারও চেয়ে এর বড় সুবিধে হল এই যে, এর স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ একটি করে অক্ষর বা syllable-কে ধারণ করে রয়েছে। বাংলা স্বরবর্ণগুলো যেমন অভ্রান্ত (Unambiguous) ধ্বনিমূলক, তেমনি বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণগুলো অভ্রান্ত ধ্বনিমূলক শুধু নয়, তার ওপরে তাদের অন্তর্নিহিত ধ্বনির অতিরিক্ত একটা 'অ' স্বরধ্বনিরও দ্যোতক। ফলে একটি হরফের সাহায্যে বাংলায় একটি পূর্ণ অক্ষর বা Syllable প্রকাশ করা সম্ভব হয়। শব্দের বা Syllable-এর গোড়াতে না থাকলে স্বরবর্ণগুলো আবার পূর্ণভাবে লেখা হয় না, অন্যত্র কখনও অপ্রকটভাবে কখনও বা সংক্ষিপ্তরূপে লিখিত হয় (যেমন আম্‌ই=আমি; রূউম্‌উ-রুমু ইত্যাদি)। এখানে রোমানে লিখতে গেলে প্রত্যেকটি ধ্বনিমূলক হরফ পৃথকভাবে লিখতে হবে। তবু বাংলায় diacritical mark না দিলে তার যথার্থ ধ্বনি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বাংলা ভাষার ধ্বনিবোধক বাংলা প্রতিলিপি ব্যবহারে এমন 'economy' রোমানে ত দূরের কথা, পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে অন্য কোন লিপিতে আছে কি না সন্দেহ। এছাড়া বাংলার যুক্তাক্ষরগুলো ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে লিপি ব্যবহারের economy-র দিক থেকে বিস্ময়কর শৃঙ্খলাজাত এবং আশ্চর্য রকমের বিজ্ঞান-ভিত্তিক।...

www.nagorikpathagar.org

যেহেতু ইংরেজী, বাংলা ও উর্দু প্রত্যেকটি ভাষারই ধ্বনি স্বতন্ত্র সে জন্যে এক রোমান লিপির সাহায্যে এ তিনটি ভাষা লিখতে গেলে যে কোন একটি হরফ এ তিন ভাষার একটি ধ্বনি প্রকাশ করবে না। প্রত্যেকটি ভাষার জন্যে পৃথকভাবে এ লিপির সংস্কার করে নিতে হবে।...যাঁরা বলেন উর্দু ও বাংলা দু ভাষাই রোমান হরফে লিখলে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ব্যবধান কমে আসবে এবং আত্মিক যোগ দৃঢ় হবে, তাঁদিগকে শুধু এ কথাই বলা যায় যে, ভাষার ঐক্য এক জাতি গঠনে যতটা সাহায্য করে লিপির ঐক্য তা করে না। আবার অনেক সময় দেখা যায় ভাষা ও লিপি এক হওয়া সত্ত্বেও একজাতীয়তা গঠনের পথ সুগম হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কথাই ধরা যাক।...পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভাষার পার্থক্য বিচার করে একজাতীয়তার পথ দৃঢ়তর করতে হলে লিপি এক করলেই যে তা সম্ভব হবে তা নয়, তার পথ রয়েছে অন্য। উভয় শাখার মানুষের মধ্যে মেলামেশার পথ সুগম করে, তাদের পরস্পরের চিত্ত জয় করে, উভয় শাখার মধ্যে আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা করে, চাকুরী-বাকুরীতে উভয় প্রদেশের মানুষকে সমান সুযোগ সুবিধা দান করে, শাসক ও শাসিতের মনোভাব দূর করে, ন্যায়বিচার ও সহযোগিতার ভিত্তিতেই একটি শক্তিশালী পাকিস্তানী জাতি গঠন করা সম্ভব।...

রোমান হরফে বাংলা লিখলে বিদেশীদের পক্ষে বাংলা শেখা কিছুটা হয়ত সহজ হবে।...কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদেশীর সুবিধার জন্যে আমাদের এতকালের সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক লিপি আমরা বর্জন করবো এ কোন্ দেশী কথা?...

বাংলা হরফ টাইপরাইটিং-এর জন্য সুবিধাজনক নয় এবং রোমান হরফে বাংলা ও উর্দু লিখলে বর্তমান টাইপ মেশিনেই তা সম্ভব হবে একথা ঠিক নয়। বাংলা টাইপরাইটারের ব্যাপক প্রচলন ছিল না বলেই তেমনভাবে তার উন্নতির চেষ্টা করা হয় নি। আজাদী-উত্তর যুগে আমাদের জাতীয় জীবনে বাংলার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশী হচ্ছে দেখে এ ক'বছরেই বাংলা টাইপরাইটারেরও অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে।...

বাংলা, রোমান লিপির প্রচলন যতটুকু না সুবিধা সৃষ্টি করবে তার চেয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করবে অনেক গুণে বেশী। সুতরাং রোমান লিপির প্রচলন করে সমগ্র জাতি যে অসুবিধায় পড়বে তার তুলনায় বর্তমান বাংলা লিপির সামান্য দোষত্রুটির কিছু সংস্কার করে নেওয়া বহুগুণে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।...

লক্ষ্যণীয়, বাংলায় যে যুক্তাক্ষরের বিরুদ্ধে এত কথা বলা হয়, তার সুবিধার দিক মুহম্মদ আবদুল হাই এখানে দেখিয়েছেন।

পাকিস্তান জাতীয় শিক্ষা কমিশন পাকিস্তানী ভাষায় রোমান হরফ গ্রহণ করা সম্পর্কে মত যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নমালা প্রচার করেছিলেন। প্রশ্নমালা সম্ভবত ১৯৫৮ সালের কোন

www.nagorikpathagar.org

এক সময় প্রেরিত হয়েছিল। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২) সে প্রশ্নমালার উত্তর দিয়েছিলেন তার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালের এপ্রিলের 'সমকাল' পত্রিকায়। এখানে তা তুলে দেওয়া হল :

প্রশ্ন : ১৮৬। পাকিস্তানে রোমান হরফ গ্রহণ আপনি অনুমোদন করেন কি?

উত্তর : না। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এ প্রস্তাব অযৌক্তিক এবং জাতি হিসেবে পাকিস্তানীদের জন্যে এ আত্মঘাতী। এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমরা লাভবান হবো যৎসামান্য কিন্তু জাতির উন্নতির সহায়ক এমন অনেক কিছুই আমরা হারাবো। সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করছি :

(ক) পাকিস্তানের মত রাষ্ট্র যেখানে বহুসংখ্যক ধর্ম, ভাষা এবং হরফ বিদ্যমান তার জাতীয় ঐক্যের কথা চিন্তা করা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু তা অবাস্তব। বর্তমান পৃথিবীর বহুধর্মাবলম্বী এবং বহুভাষাভাষী রাষ্ট্রগুলি আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের সমন্বয়ে এক রাষ্ট্র বা এক জাতি গড়ে তোলা সম্ভব। পক্ষান্তরে একধর্মাবলম্বী এবং একভাষাভাষী লোকেরাও পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের নাগরিক।

(খ) কোন বিশেষ হরফ বহুভাষাভাষী কোন রাষ্ট্রে ভাষাগত ঐক্য আনতে পারে না। ভাষা না জানলে শুধু শুনে অথবা কোন বিশেষ হরফে প'ড়ে তা' কারো বোধগম্য হবে না। একই হরফে দু'টী বা তারও বেশী ভাষা লেখা হলে, তা' পড়তে পারলেও, ভাষাজ্ঞান না থাকলে কারও ভাষাগত বুৎপত্তি কিছু মাত্র বাড়বে না।...

(গ) ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়ে রোমান হরফ পাকিস্তানী ভাষাগুলির সমস্ত ধ্বনি উৎপাদন করতে পারে না।....

(ঘ) পক্ষান্তরে রোমান হরফ গ্রহণ করলে পাকিস্তানী হরফে লেখা আমাদের যাবতীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্য ভবিষ্যৎকালের জন্যে একটি নিষিদ্ধ পুস্তকের মতই গণ্য হবে।...

(ঙ) মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলি রোমান হরফ গ্রহণ না করলে, ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান তা করতে পারে না, করা উচিতও নয়।...

প্রশ্ন : ১৮৭-ক। আপনি কি মনে করেন এই পন্থায় জনশিক্ষা ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে?

উত্তর : না। যে দেশে প্রচলিত হরফেই তার সবগুলো ভাষা মিলিয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ১৫ জনের বেশী নয়, বুঝতে হবে গলদ সেখানে হরফে নয়, আসল গলদ শিক্ষা-পদ্ধতিতে।...এছাড়া, পাকিস্তানী ভাষার ধ্বনি যথার্থভাবে

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশ করতে গেলে রোমান হরফের যে নতুন চেহারা দাঁড় করাতে হবে তাতে পাকিস্তানী হরফের ধ্বনিতাত্ত্বিক জটিলতা সবকিছুই থাকবে।...কাজেই জনশিক্ষার জন্যে প্রচলিত হরফে যে সময় লাগে তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হবে না।

প্রশ্ন : ১৮৭-খ। আপনি কি মনে করেন এই পন্থায় স্কুলের ছাত্রদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা শিখবার ভার লাঘব করবে?

উত্তর :... মাতৃভাষা ছাড়াও কোন ছাত্র যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা হিসেবে একটি পাকিস্তানী এবং একটি ইউরোপীয় ভাষা শিখতে চায় তাহলে তার হরফ শিখবার সময় হয়ত কিছুটা বাঁচবে। যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা ইংরেজী এবং আরবী অথবা ফারসী হয় তাহলে পাকিস্তানী ভাষার ধ্বনিভিত্তিক পাকিস্তানী রোমান হরফ তার বিশেষ কোন উপকারে আসবে না। কারণ, আরবী এবং ফারসীর ক্ষেত্রে ছাত্রটিকে আরবী হরফ আবার নতুন করে শিখতে হবে।

প্রশ্ন : ১৮৭-গ। আপনি কি মনে করেন, এই ব্যবস্থায় একটি জাতীয় ভাষা গড়ে উঠবে এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে?

উত্তর : ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে এই ধারণা নিতান্ত ভিত্তিহীন।...কোনো বিদেশী হরফ একটি ভাষার মৌলিক শব্দ উৎপাদনের উপযোগী করে যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে সে হরফ উক্ত ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক চরিত্র কিছুমাত্র বদলাতে পারে না। উদাহরণত, আরবী ভাষা আরবী হরফে লিখলে বা বাংলা, সাঁওতালী অথবা তুর্কী ভাষা রোমান হরফে লিখলে মূল ভাষা বদলে যায় না। কাজেই বাংলা, উর্দু, পশ্‌তু, সিন্ধী, বেলুচী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার জন্যে রোমান হরফ গ্রহণ করলে তাতে পাকিস্তানের একটি জাতীয় ভাষা গড়ে উঠবে না। কাজেই কোনো হরফ জাতীয় ঐক্য বিধানের সহায়ক হবে না। জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার উপকরণ আমাদের অন্যত্র খুঁজতে হবে—'হরফে' তা পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন : ১৮৭-ঘ। এই ব্যবস্থা মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশে অধিকতর সহায়ক হবে কি?

উত্তর : আমি মুদ্রণ বিশেষজ্ঞ নই। তবে আমার মনে হয়, মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশের সুবিধা-অসুবিধা মুদ্রাযন্ত্র এবং প্রকাশকদের ওপরই নির্ভর করে। এখানে হরফের প্রশ্ন নিতান্ত গৌণ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা উন্নততর মুদ্রাযন্ত্র তৈরি করতে পারি।...[১২]

৩. আরবী হরফে বাংলা প্রবর্তনের প্রয়াস

রোমান হরফে বাংলা প্রবর্তন প্রচেষ্টার পাশাপাশি আরবী হরফে বাংলা ভাষা লেখার প্রয়াসও ঐ একই সময়ে বিদ্যমান ছিল। এ ক্ষেত্রে আরবী ভাষার প্রতি বাঙালী মুসলমানের অনুরাগকে কাজে লাগানোই ছিল এর উদ্যোক্তাদের প্রধান হাতিয়ার।

www.nagorikpathagar.org

যদিও আরবী হরফে বাংলা লেখার এই প্রয়াসের ইতিহাস অনেক পুরানো। মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমান কবিদের বাংলা কাব্যের পুঁথি পরে আরবী হরফে অনুলিখিত হতে দেখা যায়। আরবী হরফে লেখা এ রকম বাংলা পুঁথি অনেক পাওয়া গেছে। যেমন মোজাম্মিলের ষোড়শ শতকের 'মক্তুল হোসেন' আলাওলের সপ্তদশ শতকের 'তোহফার' আরবী হরফে লেখা পুঁথি পাওয়া গেছে। ফকীর গরীবুল্লাহর অষ্টাদশ শতকের 'ইউসুফ–জুলেখার' আরবী হরফে একটি অনুলিপি করেছিলেন ফয়জুল্লাহ ১২২৩ মঘী অব্দে; আলী রাজার 'জ্ঞানসাগর'–এর একটি আরবী অনুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন শের জামাল খাঁ ১২২৫ মঘী অব্দে।[১৩]

তবে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকায় মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই মহাদেশগুলোর বিভিন্ন দেশ আরবী হরফ গ্রহণ করে। সেই সূত্র ধরেই বাংলা ভাষায় আরবী লিপি গ্রহণের পক্ষে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ ব্যাপারে আলোচনা হতেও দেখা যায়। এ সময় দূরদর্শী ছদ্মনামে কোন এক পন্ডিত ঢাকা থেকে 'হরফ সমস্যা' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এতে লেখক দেখান যে, 'আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী মরক্কো থেকে প্রশান্ত সাগরবর্তী ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাহানের মাত্র কয়েকটি ছাড়া সবগুলো ভাষায় আরবী বর্ণমালার প্রচলন হয়েছিল। দূরদর্শী জানান :

> শুধু যে এসিয়াটিক ও আফ্রিকান ভাষাসমূহের মধ্যেই এই হরফ পরিবর্তন ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বরং ইউরোপীয় ভাষাগুলোর ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থা ধরা হইয়াছিল। হালে আরবী হরফে লেখা কিছু Polish বই–পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে। পোল্যান্ডের একটি অংশের উপর মুসলমানদের আধিপত্যের সে পুরানো দিনের সাক্ষীস্বরূপ এই বইগুলি। ইন্দো–পাকিস্তান উপমহাদেশের মুসলমানগণ ঠিক যেমনিভাবে পস্তু সিন্ধি ও উর্দূ ভাষা আরবী হরফে লেখা শুরু করিয়াছিল, বাংলা ভাষা সম্পর্কেও তারা সে নীতিই অনুসরণ করিয়াছিল। কেবল কয়েকখানা নয়, বরং রাশি রাশি বই–পুস্তক, দলিল–দস্তাবেজ এর প্রমাণ স্বরূপে এখনও বিদ্যমান আছে। আরাকানের কিছু সংখ্যক লোক আজও বাংলা আরবী হরফে লেখে। বদ্–কিসমতির দরুণ বাংলায় মুসলিম শাসনের যবনিকা পতন এমনি সময় হয়, যখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পূর্ণ বিকাশ লাভ করে নাই।[১৪]

পাকিস্তানের ভাষার ক্ষেত্রে যারা আরবী হরফের প্রবক্তা ছিলেন, তাদের প্রায় সকলের যুক্তিই ছিল দূরদর্শীর অনুরূপ।

তবে আরবী হরফে বাংলা লেখার সচেতন প্রয়াস চালু ছিল তিরিশের দশক থেকেই। ১৯২৮ সাল থেকে চট্টগ্রামের মওলানা জুলফিকার আলী আরবী হরফে 'হুরুফুল কুরআন' (কোরানের বর্ণমালা) নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশনা প্রায় বিশ বছর অব্যাহত ছিল। এই প্রচেষ্টায় মওলানা জুলফিকার আলী তার সারা জীবনের সকল সম্পদ ব্যয় করেন এবং এই প্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য সব সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে যান।[১৫]

এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৪৪ সালে লিখেছেন, "এই সেদিনও চট্টগ্রাম হইতে মৌলবী জুলফক্কার আলী [মওলানা জুলফিকার আলী] সাহেব আবার বাংলা হরফের পরিবর্তে আরবী হরফে বাংলা লিখিবার চেষ্টা পান এবং স্বয়ং অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ে একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া আপন খেয়াল পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলেও কেহ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই। বিশেষ কোন যুক্তিতর্কের অবতারণা না করিয়াই বলিতে পারা যায়, এইরূপ ব্যাপার বাংলায় চলে না।"[১৬]

পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর বাংলা ভাষা আরবী হরফে লেখার প্রবক্তারা নানাভাবে এই প্রয়াসের ক্ষীণ ধারা অব্যাহত রাখেন। এক্ষেত্রে তারা মওলানা জুলফিকার আলীর আন্তরিক কিন্তু ব্যর্থ প্রয়াসকেও কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন।

পূর্ব-বাংলা সরকারের শিক্ষা-সচিব ফজলে আহমদ করিম ফজলী ছিলেন আরবী হরফে বাংলা প্রচলনের বিশেষ প্রবক্তা। তার সঙ্গে সায় দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নিজে। এদের দু'জনের পরামর্শে মওলানা জুলফিকার আলী গঠন করেন 'হুরুফুল কুরআন সমিতি।' ফজলে আহমদ করিম ফজলী আরবী হরফ প্রবর্তনের এই কাজে বইপত্র রচনার জন্য বার্ষিক ৩৫ হাজার টাকার মঞ্জুরী দেয়ার ব্যবস্থা করেন।[১৭]

১৯৪৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান বলেন, 'শিক্ষাক্ষেত্রে আরবী ভাষার প্রচলন হলে, তার দ্বারা আঞ্চলিক ভাষাগুলির সংরক্ষণকাজ সাধিত হবে। এ ছাড়া আরবী বর্ণমালা পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষাগত সামাঞ্জস্য বিধানেও সহায়তা করবে।'[১৮]

আবার ১৯৪৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের তৃতীয় বৈঠকেও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান উর্দুর উন্নতি সাধনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। কিন্তু ওই বৈঠক উদ্বোধন করতে গিয়ে পূর্ব-বাংলার গবর্নর জেনারেল স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন বলেন, পূর্ব বাংলার 'সকল স্তরে বাংলাভাষা শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত। তবে পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা হিসাবে উর্দূও প্রত্যেক সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী থেকে উর্ধ্বতন শ্রেণীতে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষণীয় হওয়া উচিত।[১৯]

তথাপি ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫১ সাল জুড়ে নানা কায়দায়, বয়স্ক শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতির নামে আরবী হরফে বাংলা প্রচলনের প্রয়াস অব্যাহতই থাকে। এবং এ জন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করা হয়। এর প্রতিবাদে ১৯৫০ সালেই ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, 'ইসলামী ভাবধারায় উর্দূ বিশেষ সমৃদ্ধ। কাজেই পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের মাতৃভাষা যাই হোক না কেন, উর্দূ শিক্ষার মাধ্যমে তারা বিশেষ লাভবান হবেন। কিন্তু উর্দূ

www.nagorikpathagar.org

হরফের সাহায্যে বাংলা শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করে অর্থ অপব্যয়ের কী মানে থাকতে পারে? আশ্চর্যের কথা, এর সঙ্গে পূর্ববঙ্গ সরকারের কোন সম্পর্ক নাই। এই অর্বাচীন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবেন। আমার আশঙ্কা হয়, এ বন্ধ না করা হলে সরকারী টাকার অপব্যয় করা হবে।'[২০]

৪. পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি

১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ পূর্ব বাংলা সরকার একটি ভাষা কমিটি (East Bengal Language Committee) গঠন করেন। ওই কমিটির পূর্ণাঙ্গ নাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি।'[২১] এই কমিটির বিচার্য বিষয় ছিল :

(১) পূর্ব বাংলার মানুষের ভাষার (ব্যাকরণ, বানান ইত্যাদি সমেত বাংলা ভাষার) সরলীকরণ, সংস্কার ও প্রমিতকরণের প্রশ্ন বিবেচনা করা এবং সে সম্পর্কে সুপারিশ করা।

(২) নতুন শব্দ ও বিশিষ্টার্থক শব্দসমূহের নির্মাণে এবং বিভিন্ন বিদেশী ভাষার যেসব পারিভাষিক শব্দ ও অন্যান্য শব্দের প্রতিশব্দ বাংলায় নেই, যত দূর সম্ভব, সে-সবের অনুবাদের পদ্ধতি প্রস্তাব করা।

(৩) বাংলা-ভাষাকে নির্দিষ্টভাবে পূর্ব-বাংলা এবং সাধারণভাবে পাকিস্তানের মানুষের প্রতিভা ও কৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচনা করতে পারেন এমন অন্যান্য সুপারিশ কমিটি করতে পারেন।[২২]

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৭০-১৯৬৮) কমিটির সভাপতি ও কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। সদস্য ছিলেন হবিবুল্লাহ (বাহার) চৌধুরী, প্রাদেশিক মন্ত্রী; ডাক্তার এম এ মালিক, (ঐ); ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মওলানা আব্দুল্লাহ-আল-বাকী, দিনাজপুরের সংসদ সদস্য; ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান; আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮), পরিষদ-সদস্য ও দৈনিক আজাদ-এর সম্পাদক; সৈয়দ আবুল হাসনাত মোহাম্মদ ইসমাইল, পূর্ব-বাংলা সরকারের পুলিশের ডেপুটি আইজি; মিজানুর রহমান, পূর্ব বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী; মজদুদ্দীন আহমদ, সিলেটের এমসি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ; শাইখ শরফুদ্দীন, ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক; জুলফিকার আলী, চট্টগ্রামের আলাভিয়া প্রেসের মালিক; গণেশচন্দ্র বসু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক; ও মোহিনী মোহন দাস, ঢাকা। এ ছাড়া কমিটির কাজে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য করার জন্য নিম্নলিখিত ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের সহযোজন করা হয় : ডঃ মুহাম্মদ এনামুল

www.nagorikpathagar.org

হক, রাজশাহী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও প্রধান; আবদুল মজিদ, পূর্ব-বাংলা সরকারের বাংলা অনুবাদক; অজিত কুমার গুহ, ঢাকার জগন্নাথ কলেজের প্রফেসর।[২৩]

পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে কমিটির লোকবলে কিছু পরিবর্তন করা হয়। গোলাম মোস্তফা সেক্রেটারীর কাজ চালাতে না পারায় তার স্থলে শাইখ শরফুদ্দীন এবং শাইখ শরফুদ্দীনের স্থলে চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর নাজমুল হুসেন চৌধুরী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। শেষে আবু সায়ীদ মাহমুদ এই পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষা বিভাগের আহমদ হোসেন খন্ডকালীন সহকারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ডাক্তার মালিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে চলে গেলে মন্ত্রী এস এম আফজল সদস্য নিযুক্ত হন। গণেশচন্দ্র বসু কমিটিতে থাকতে চান না বলে তার স্থলে নিযুক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লেকচারার হরনাথ পাল। হরনাথ পালও থাকতে না চাইলে তার জায়গায় আসেন অজিত কুমার গুহ। গোলাম মোস্তফা কমিটিতে ক্রমাগত অনুপস্থিত থাকায় তার স্থলে নিযুক্ত হন কলকাতার লেডী ব্রাবোর্ন কলেজের বাংলার সাবেক অধ্যাপক বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ। মোহিনীমোহন দাস মারা গেলে তার স্থলে অম্বিকাচরণ দাসকে নিয়োগ করা হয়।[২৪]

ভাষা কমিটির দু'দিনব্যাপী প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২২-২৩ জুন ১৯৪৯, পূর্ব-বাংলা বিধান পরিষদের কমিটি রুমে। পরে তিনটি উপকমিটি গঠন করা হয়। সেগুলো হল: প্রতিবর্ণীকরণ উপকমিটি, উর্দু লিপি উপ-কমিটি; ভাষা-সংস্কার উপকমিটি। এই উপকমিটি পরে ১৯৫০ সালের ৩ মে'র সভায় গঠিত হয়। সকল কমিটিরই মূল সভাপতি ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

ভাষা কমিটি ১৯৫০ সালের ২ মে এক বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রশ্নটি আর বিবেচনা করার দরকার নেই। এবং অতঃপর আরবী হরফকে উর্দূ হরফ বলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলার জন্য যে হরফের কথা বলা হচ্ছে, সেটি বর্ধিত আরবী হরফ—উর্দু।[২৫]

আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর 'অতীত দিনের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন : 'মওলানা মোঃ আকরম খাঁ সাহেবের বাড়ির বৈঠকখানার ঘরেই সাধারণত ভাষা সংস্কার-কমিটির বৈঠক বসত। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে কয়েকটি বৈঠকে ভাষা সংস্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পাকিস্তানী ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলা ভাষাকে নবরূপ দেওয়ার জন্য এর কোন কোন বিষয়ে সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, তা নিয়ে কমিটির সভায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হত। আমি ছিলাম এর বহুল সংস্কারের পক্ষপাতী। বর্ণমালা থেকে শুরু করে ব্যাকরণ পর্যন্ত এর আদ্যন্ত সংস্কার দরকার, কমিটির অধিকাংশ সদস্যেরও অভিমত ছিল এই ধরনের। আমাদের মতে বাংলা ব্যাকরণের নামে যা প্রচলিত রয়েছে, তা সংস্কৃত ব্যাকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। বাংলা ভাষাকে যেহেতু সংস্কৃতের দুহিতা কিংবা দৌহিত্রী বলে আমরা স্বীকার করি না, তাই সংস্কৃত ব্যাকরণকে আমরা বাংলা ব্যাকরণ বলে মানতে পারি না।'

www.nagorikpathagar.org

কমিটি বিভিন্ন পেশাজীবীর মধ্যে ১২০০ প্রশ্নমালা বিতরণ করে।

শেষ পর্যন্ত কমিটি ১৯৫০ সালের ৭ ডিসেম্বর সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট ও সুপারিশ পেশ করে। সুপারিশগুলি ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

কমিটি প্রস্তাবিত সংস্কারকৃত বাংলাকে বলা হবে 'শহজ বাংলা।' সহজ বাংলাকে বৈপ্লবিক নয়, বিবর্তনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বিকশিত হতে দিতে হবে; যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিকাশ ঘটালে তাতে এর অন্তর্স্বরূপ নষ্ট হবে। এই স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় পূর্ব-বাংলা ও পাকিস্তানের কৃষ্টির পরিপন্থী উপাদানসমূহ দূর করতে হবে এবং তদস্থলে তদনুকূল উপাদানসমূহ গ্রহণ করতে হবে। কোন বাতিক বা সংস্কারের প্রশ্রয় না দিয়ে পৃথিবীর সকল উন্নত ভাষা থেকে উপাদান গ্রহণ করতে হবে।

আধুনিক বাংলার প্রচলিত সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার দুই রীতিই গ্রহণ করতে হবে। সরকারি চিঠিপত্র, সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এই 'শহজ বাংলা'র উভয় রীতি ব্যবহার করতে গিয়ে যা করতে হবে : যতদূর সম্ভব, ভাষার সংস্কৃতায়ন বর্জন করে পূর্ব-বাংলার প্রচলিত সহজ গঠন-রীতি গ্রহণ করতে হবে; মুসলিম লেখকদের ভাব ও আবেগ হবে কঠোরভাবে ইসলামি আদর্শের অনুগ; আরো স্বাধীনভাবে পূর্ব-বাংলায় বিশেষত পুঁথি-সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ, শব্দসমষ্টি ও বিশিষ্টার্থক শব্দসমূহ ব্যবহার করতে হবে।

'শহজ বাংলা'র সাধারণ স্বীকৃতিলাভের জন্য সরকারকে অবিলম্বে যা করতে হবে : প্রাদেশিক সরকার 'শহজ বাংলা'কে সরকারি ভাষা-রূপে গ্রহণ করবেন। সকল সরকারি চিঠিপত্র, বিজ্ঞপ্তি, বইপত্র কঠোরভাবে 'শহজ বাংলা'য় হতে হবে। প্রাথমিক বাধ্যতামূলক শিক্ষায় তার প্রবর্তন করতে হবে; আগামী বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য-বই এই বাংলায় করতে হবে। পূর্ব-বাংলার সম্পাদক, লেখক, সংবাদপত্র ও পুস্তক-প্রকাশক এবং পুরাতন বইয়ের সম্পাদকদের 'শহজ বাংলা' গ্রহণ করার আহ্বান জানাতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করতে হবে তাঁরা যেন তাঁদের ছাত্রদের প্রচলিত ও 'শহজ বাংলা'র যে-কোনোটি গ্রহণ করতে দেন এবং বই-পত্র ক্রমে 'শহজ বাংলা'য় রূপান্তরিত করেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে বাংলা ব্যাকরণকে মুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করা হয় : বাংলা ব্যাকরণের পাঠ্যক্রম সহজ করতে হবে, ব্যাকরণের সূত্রাদি সহজ করতে হবে। ব্যাকরণের বিভিন্ন শব্দ ও নাম সহজ করতে হবে।

লিপি, বর্ণমালা ও বানান সম্পর্কে সুপারিশ করা হয় : 'শহজ বাংলা'য় কেবল

www.nagorikpathagar.org

বাংলা লিপি ব্যবহার করা হবে। স্বরবর্ণের সংখ্যা হবে ৭টি–অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও। স্বরচিহ্নের ক্ষেত্রে আ–কার, উ–কার এবং্যা–কারের কোন পরিবর্তন হবে না। ই–কারের চিহ্ন হবে,ী, এ–কারের প্রচলিত চিহ্নটিই অক্ষরের পরে বসবে। ঔ–কারের চিহ্ন হবে অক্ষরের পরে ব্যবহৃত ঔ–কারের দ্বিতীয় অংশ ী। ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে বাদ যাবে ঙ, ঞ, ণ, অন্তঃস্থ ব, ষ, স, ঢ, ক্ষ। যুক্তাক্ষর থাকবে না। তা ভেঙে লিখতে হবে। যেমন : রক্ত =রক্‌ত। ফলা–চিহ্ন থাকবে না। যেমন, র–ফলা, রেফ, মূর্ধণ্য ণ–ফলা, ন–ফলা থাকবে না। উচ্চারণ অনুসারে ভেঙে লিখতে হবে।[২৬]

সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত, পূর্ব–বাংলার আপন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও মুসলমানি ভাবাশ্রিত বাংলা ভাষা–প্রকরণের কিছু আদর্শ কমিটি উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শন করেন। সেগুলি এইরূপ :

(ক) অরণ্য বিহঙ্গম–কাকলীতে মুখরিত ও নির্ঝরিণীর কলনাদে নন্দিত = পাখীর গানের ও ঝর্ণার গানে বন গমগম করিতেছে।

(খ) তিনি যাবতীয় বিষয় আনুপূর্বিক অবগত হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন=তিনি সব কিছু আগাগোড়া শুনিয়া তাজ্জব হইলেন।

(গ) যত দিন পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিব, ততদিন তোমায় বিস্মৃত হইব না=তোমাকে সারাজীবন মনে রাখিব।

(ঘ) আমি তোমায় জন্ম–জন্মান্তরেও ভুলিব না=আমি তোমায় কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ভুলিব না। ইত্যাদি।[২৭]

কমিটি এই রিপোর্ট পেশ করার পর সরকার তা গ্রহণ করলেন, না বর্জন করলেন, তা জানা যায় না। বিভিন্ন মহল থেকে রিপোর্টটি প্রকাশের দাবী জানান হয়। ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদে শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদ জানান, রিপোর্টটি গৃহীতও হয়নি, বাতিলও হয়নি, সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।[২৮]

এর দীর্ঘ সময় পর ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনকালে সরকার ঐ রিপোর্টটি প্রকাশ করেন।

৫. বাংলা ভাষা সংস্কারে আইয়ুব খানের প্রয়াস

১৯৫৮ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের পর পুনরায় পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা প্রশ্নে নতুন করে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে শুরু। সেই সূত্র ধরেই শুরু হয় বাংলা ভাষা সংস্কারেরও প্রয়াস।

এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যে নিজেই আগ্রহী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তার ক্ষমতায় আরোহণের পর পরই। ১৯৫৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর এবং ১৯৬০

www.nagorikpathagar.org

সালের জানুয়ারীতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বাংলা ভাষার সংস্কারের প্রশ্ন উত্থাপন করেন।[২৯]

পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র জারির সময় ১৯৬২ সালের ১ মার্চ সংবাদপত্র সম্পাদকদের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি বলেন, 'কলকাতার সাংস্কৃতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে হলে পূর্ব পাকিস্তানীদের তাদের ভাষার হরফ বদলানো দরকার।'[৩০]

এর আগে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পুনর্গঠনমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর একটি উক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সরকারী প্রেস নোটে বলা হয়, 'দেশবাসীর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে সমগ্র দেশের লোক বুঝতে পারে, এমন একটি ভাষার স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বিকাশ সাধনই সরকারের লক্ষ্য।'[৩১]

এ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার আত্মজীবনীমূলক 'প্রভু নয় বন্ধু' (Friends not Masters) গ্রন্থে লিখেছেন :

> এটা আমার কাছে পরিষ্কার যে দুটি জাতীয় ভাষা নিয়ে আমরা এক জাতি-রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারব না। আমরা বহু-জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে থেকে যাব। আমি এর বিরুদ্ধে যুক্তি দিচ্ছি না, আমি একটি বাস্তব ঘটনামাত্র তুলে ধরছি যা স্বীকার করতেই হবে।...এটাও সমানভাবে সত্য যে, যদি জনগণ, তা পূর্ব পাকিস্তান বা পশ্চিম পাকিস্তান যেখানেই থাকুন না কেন, নিজেদের মধ্যে সংহতি গড়ে তুলতে চায়, তবে তাদের অবশ্যই পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়যোগ্য একটি মাধ্যম থাকতে হবে। এবং এটাকে একটি জাতীয় মাধ্যম হতে হবে। এ-ধরনের মাধ্যমে উদ্ভব করতে হলে আমাদিগকে বাংলা ও উর্দুর সাধারণ উপাদানগুলি চিহ্নিত করতে হবে এং সেগুলিকে একটি সাধারণ লিপির মাধ্যমে বিকশিত হবার ব্যবস্থা করতে হবে। নিশ্চিতভাবে এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া, তবে পারস্পরিক আদান প্রদান ও জানাশোনার ফলে এ-ধরনের একটি জাতীয় মাধ্যম গড়ে উঠতে ও নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করতে বাধ্য। (পৃ ১০২)

পাকিস্তানের সামরিক সরকার ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এই কমিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ১৯৫৯ সালের ৫ জানুয়ারী।[৩২] কমিশনকে মূলত শিক্ষার ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হলেও পরবর্তীতে এক নির্দেশে ও উর্দু ও বাংলার জন্য রোমান হরফ বাঞ্ছনীয় কিনা, সে সম্পর্কেও সুপারিশ করতে বলা হয়।[৩৩]

কমিশন শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে জনমত সংগ্রহের জন্য একটি ব্যাপক-ভিত্তিক প্রশ্নমালা তৈরি করে বিতরণ করে। এতে রাষ্ট্রভাষার লিপি সম্পর্কেও মতামত চাওয়া হয়। সেখানে লিপি-সংক্রান্ত প্রশ্ন ছিল নিম্নরূপ :[৩৪]

www.nagorikpathagar.org

১. আপনি কি পাকিস্তানে রোমান হরফ প্রবর্তন চান?
২. আপকি কি মনে করেন এর ফলে—
   ক. জনগণকে অল্প সময়ে সাক্ষর করে তোলা যাবে?
   খ. স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষা শিক্ষার বোঝা কমে যাবে?
   গ. একটি জাতীয় ভাষা সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হবে ও জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি পাবে?
   ঘ. পাঠ্য জিনিস মুদ্রণ কাজ সহজ হবে?
   ঙ. অন্য কোন সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে কি?

জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট সরকারের কাছে তার রিপোর্ট পেশ করে। কমিশন রাষ্ট্রভাষার লিপির প্রশ্নে উর্দু ও বাংলা ভাষাকে উন্নত করে রোমান হরফ গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করে। এ সম্পর্কে রিপোর্টে নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করা হয় :[৩৫]

১. সরকারের উচিত হবে, যে–সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নশ্‌ক্‌ বা রোমান হরফের উদ্ভাবন ও বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া।
২. অথবা, সরকারের কর্তব্য হবে ভাষাবিদদের সমন্বয়ে তিনটি উপসঙ্ঘ স্থাপন করা – প্রথম উপসঙ্ঘের কাজ হবে বর্ণমালা নির্ণয় করা দ্বিতীয় উপসঙ্ঘের কাজ হবে বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করা এবং তৃতীয় উপসঙ্ঘের দায়িত্ব হবে বাংলা ও উর্দুর উপযোগী রোমান হরফ উদ্ভাবন করা।

রিপোর্টে বলা হয়, এ সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে, তখনই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সময় হবে।[৩৬]

সরকার জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করেন এবং পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়নে অগ্রসর হন।

কিন্তু কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর পরই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা ও উর্দুর ক্ষেত্রে রোমান হরফ প্রবর্তনের তীব্র বিরোধিতা হয়।[৩৭] ফলে বিষয়টি নিয়ে সরকারও সে সময় তেমন বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকে।

৬. বাংলা একাডেমীর সংস্কার প্রয়াস

১৯৬২ সালের মার্চ মাসে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে Bengali and Urdu : A Literary Encounter শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের একত্র করে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির পথ সুগম করা। ভাষা ও সাহিত্যের

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য জোরদার করার জন্য একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান তিন দফা সুপারিশ রাখেন। তা ছিল :

১। ব্যাপক অনুবাদের ব্যবস্থা করা;

২। পূর্ব বাংলার স্কুলে উর্দু ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্কুলে বাংলা ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা; ও

৩। উর্দু ও বাংলা ভাষার সাধারণ শব্দগুলি খুঁজে বের করে জনপ্রিয় করা।[৩৮]

বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠন করে ১৯৬২ সালেই। এই কমিটির সভাপতি সৈয়দ আলী আহসান (জ. ১৯২২) ভাষা-সংস্কারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বলেন :

> প্রাচীন বাংলার শ্লথ-মন্থর জীবনের যে চাহিদা আমাদের মাতৃভাষা এতদিন পূরণ করে এসেছে, অপরিচিতভাবে বর্তমানের দাবি পূরণ যে আজ আর ঠিক তেমনিভাবে তার পক্ষে সম্ভব নয়, এটি আমাদের স্বীকার করতে হবে। শিল্পবিজ্ঞান আমাদের বাস্তব পরিবেশ দ্রুত পরিবর্তিত করে ফেলছে। এ নতুন পরিবেশের চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের ভাষাকেও আজ গ্রহণ এবং রূপান্তরের মাধ্যমে অধিকতর সহজ গতিসম্পন্ন এবং শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে। এই জন্য বাংলা ভাষা, লিপি ও বানান-সংস্কার অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অপরিহার্য এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের যেমন এক দিকে নতুন পরিবেশ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহজ প্রসারের দাবিকে স্মরণ রাখতে হবে, তেমনি স্মরণ রাখতে হবে বাংলা লিপি ও বানান পদ্ধতির অতুল ঐতিহ্য ও কালজয়ী শক্তির কথা। এ উভয় দিক লক্ষ্য রেখে আমাদের ভাষাবিদগণই একমাত্র সময়োপযোগী সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করতে পারেন।"[৩৯]

বাংলা একাডেমী গঠিত এই কমিটির সভাপতি ছাড়া অন্য সদস্যরা ছিলেন : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), আবুল হাসানাৎ, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহম্মদ ওসমান গণি, মুহম্মদ ফিরদাউস খান, মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১)।[৪০]

কমিটি বানান ও লিপি সংস্কারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রেখেছিলেন, যাতে :

ক. নতুন কোনও চিহ্ন উদ্ভাবন না করতে হয়।

খ. প্রচলিত অক্ষর কিংবা কারাদি চিহ্নগুলি যে যে ধ্বনির প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তার অতিরিক্ত কিংবা ধ্বনি বহির্ভূত অন্য কোন ধ্বনির প্রতীক হিসেবে যেন ব্যবহার করতে না হয়।

গ. বর্ণমালার চক্ষুগ্রাহ্য দৃশ্যমান রূপকে বিশেষভাবে যেন ব্যাহত না করতে হয় অর্থাৎ কারাদি স্বরচিহ্ন যুক্ত হলে কোন ব্যঞ্জনবর্ণের মৌলিক ও দৃশ্যরূপের যেন আর পরিবর্তন না হয়।

ঘ. বাংলার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব অনুসরণ করা নয়।[৪১]

www.nagorikpathagar.org

এই কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে বাংলা বানান ও লিপি সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে :

১. সংস্কৃত, অসংস্কৃত সর্বত্র ঙ স্থলে ং ব্যবহার করতে হবে। যথা সংগীত, গংগা, ডংকা, রং-এর, বাংগালী, ভাংগন ইত্যাদি। বর্ণমালা থেকে ঙ বাদ যাবে।

২. ইংরেজী J আরবী ج ও সংস্কৃত জ য বর্ণের বাংলা উচ্চারণ বিশিষ্ট ধ্বনির জন্য জ হবে। ইংরেজী Z ও আরবী ذ ز ظ ض বর্ণের বাংলা ভাষায় Z উচ্চারণবিশিষ্ট ধ্বনির জন্য সর্বত্র য হবে।

৩. ণ এবং ন স্থলে কেবল ন ব্যবহার করতে হবে। ণ বর্ণমালা থেকে বাদ যাবে।

৪. ইংরেজী Sh ও আরবী ش উচ্চারণবিশিষ্ট ধ্বনির জন্য সর্বত্র শ হবে। ইংরেজী S এবং আরবী س ص ث উচ্চারণবিশিষ্ট ধ্বনির জন্য সর্বত্র স হবে। য বর্ণমালা থেকে বাদ যাবে। তবে প্রচলিত বানানের যেখানে যেখানে স আছে সেখানে বিকল্পে স রাখা যেতে পারে।

৫. ই, ঈ এবং এদের প্রতীক ি ী স্থলে কেবল ই এবং ি ব্যবহৃত হবে। কেবল বিদেশী শব্দে প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে বিকল্পে ঈ এবং ী ব্যবহৃত হতে পারে। তবে প্রচলিত বানানে যেখানে ঈ বা ী আছে সেখানে বিকল্পে ঈ রাখা যেতে পারে।

৬. উ এবং ঊ এবং এদের চিহ্ন ু ূ এর মধ্যে শুধু উ এবং ু থাকবে। কেবল বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে বিকল্পে ঊ এবং ূ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে প্রচলিত বানানে যেখানে যেখানে ঊ এবং আছে সেখানে বিকল্পে ঊ এবং ূ রাখা যেতে পারে।

৭. বর্ণমালা থেকে ঋ, ঌ, বাদ যাবে। ঋ-এর পরিবর্তে রি হবে। তবে ৃ কার থাকতে পারে, যেমন মৃগয়া, কিন্তু পদ মধ্যের ফলা হ্রস্ব ই কার দিয়েও লিখা যেতে পারে, যেমন ম্রিগয়া।

৮. বর্ণমালা থেকে ঐ, ঔ এবং এদের চিহ্ন ৈ এবং ৌ বাদ যাবে না। তবে বিকল্পে অই এবং ওই লেখা যেতে পারে, যেমন শৈবাল—শইবাল।

৯. বর্ণমালা থেকে ৎ বাদ যাবে।

১০. বর্ণমালা থেকে ঞ বাদ যাবে। ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ স্থানে ন্‌চ, ন্‌ছ, ন্‌জ লিখতে হবে, যেমন বান্‌ছা ঝন্‌ঝা ইত্যাদি।

১১. জ্ঞ, ক্ষ থাকবে তবে তা গ্যঁ, ক্‌খ-এর প্রতীকরূপ এবং তা গ্যঁ ও ক্ষিয় রূপে পড়তে হবে।

www.nagorikpathagar.org

১২. গু, রু, শু, হৃ, হ্ন স্থানে গ্‌, র্‌, শ্‌, হ্‌, হ্‌ লিখতে হবে।

১৩. বিসর্গ বাদ যাবে। শব্দ মধ্যের 'ঃ'-এর স্থানে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে, যেমন দুখ্‌খ। শব্দান্তের 'ঃ'-এর পরিবর্তে হ্‌ হবে, যেমন আহ্‌ ইত্যাদি।

১৪. ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে র-ফলা '্র' এবং 'র্' রেফ থাকবে।

১৫. প্রচলিত বাঙলা বানানে যেখানে যেখানে য ফলা ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বোঝায় কেবল সে-সব স্থানেই দ্বিত্ব বোঝাতে হলে য ফলা রক্ষিত হবে। কিন্তু যে-সব স্থানে উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়, যথা ব্যাহ্য, উহ্য, সে-স্থলে ধ্বনি অনুযায়ী য ফলা থাকবে না, যেমন বাজ্‌ঝ, উজ্‌ঝ।

১৬. যুক্তাক্ষরে কোনও অক্ষরের চেহারা পরিবর্তিত হবে না, যেমন ক্‌ত।

১৭. দ্বিত্বের জন্য ব-ফলা থাকবে না।

১৮. দ্বিত্বের জন্য ম-ফলা থাকবে না।

১৯. ল-ফলা থাকবে।

২০. অন্য যুক্তবর্ণগুলি হস্‌ চিহ্ন দ্বারা অথবা গায়ে গায়ে লাগিয়ে প্রত্যেক অক্ষরকে পূর্ণরূপে লিখতে হবে।[৪২]

উপসঙ্ঘের সুপারিশসমূহ প্রকাশিত হলে একাডেমীর সংস্কৃতি বিভাগ ১৯৬৩ সালের ৩০ মে তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এগুলি ব্যাখ্যা করে।

একাডেমীর চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভায় ভাষণ দানকালে বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান অভিমত প্রকাশ করেন যে, উপসঙ্ঘের এই সুচিন্তিত প্রস্তাবসমূহ বাঙলা ভাষার ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতাকে কোনো প্রকারে ক্ষুণ্ন করেনি এবং বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, প্রকাশনা সংস্থা ও সংবাদপত্রগুলি তা অনুসরণ করলে বাঙলা ভাষা শিক্ষা ও প্রসারের ক্ষেত্রে অধিকতর সহজ ও গতিসম্পন্ন হয়ে উঠবে।[৪৩]

বাংলা একাডেমীর বাংলা বানান ও লিপির ক্ষেত্রে এই সংস্কার প্রস্তাবের সে সময় তেমন একটা বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়নি। তবে ওই কমিটির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না এমন দু'জন শিক্ষক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ও রফিকুল ইসলাম সংস্কার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।[৪৪]

৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ

বাংলা একাডেমী বাংলা বানান ও লিপি সংস্কারের জন্য যেসব সুপারিশ প্রণয়ন করেছিল, তা বাস্তবায়নের সাংগঠনিক ও অবকাঠামোগত সুবিধা একাডেমীর ছিল না। এ জন্যে দরকার ছিল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

সে কাঠামো ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদের সদস্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদের পরবর্তী বৈঠকে বিবেচনার জন্য

www.nagorikpathagar.org

রেজিষ্ট্রারের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠান। প্রস্তাবে বলা হয় :

> The University of Dacca is requested to form a committee for the reformation of the Bengali Language, script and spelling, and direct the Colleges affiliated to it to adopt the reformed Bengali.[৪৫]

এই চিঠির সূত্র ধরেই ১৯৬৭ সালের ২৮ মার্চ শিক্ষা-পরিষদের বৈঠকে ওই বিষয়ে একটি উপসঙ্ঘ (সাব কমিটি) গঠিত হয়। সেই উপসঙ্ঘে ছিলেন :

১। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সভাপতি), প্রফেসর এমিরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
২। ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ (সম্পাদক), পরিচালক, বাঙলা একাডেমী;
৩। মোঃ ফেরদাউস খান, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক;
৪। মোঃ আবদুল হাই, অধ্যক্ষ, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
৫। মোঃ ওসমান গণি, অধ্যক্ষ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঢাকা;
৬। ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, অধ্যক্ষ, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
৭। মোঃ আবুল কাসেম, অধ্যক্ষ, বাঙলা কলেজ;
৮। মোঃ ইব্রাহীম খাঁ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও প্রাক্তন এমএনএ;
৯। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পরিচালক, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড;
১০। মুনীর চৌধুরী, রিডার, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
১১। তফাজ্জল হোসেন, অধ্যক্ষ, চৌমুহনী কলেজ।[৪৬]

উপসঙ্ঘের প্রতি তিনটি বিষয়ে সুপারিশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেগুলো হল : বাঙলা বানানের সংস্কার ও সরলায়ন, বাঙলা ব্যাকরণের সংস্কার ও সরলায়ন এবং বাঙলা লিপির সংস্কার ও সরলায়ন।[৪৭] বাঙলা ভাষা সংস্কারের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান চেষ্টা চালাচ্ছে, বিশেষ করে বাঙলা একাডেমী, রিপোর্ট প্রণয়নকালে তাদের কাজ-কর্মের পর্যালোচনা করার জন্যেও উপসঙ্ঘকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

উপসঙ্ঘ সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে। এর সর্বশেষ বৈঠক বসে ১৯৬৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী। বৈঠকে সুপারিশসমূহ আলোচিত ও গৃহীত হবার পর তা শিক্ষা পরিষদে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিনজন সদস্য ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী এর বিরোধিতা করেন। তাদের ভিন্ন-মতপোষক টীকাও মূল প্রতিবেদনের সঙ্গে শিক্ষা পরিষদে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৪৯]

এরা প্রতিবেদন গৃহীত হবার ১০ দিন পর ২৪ ফেব্রুয়ারী '৬৮ লিখিতভাবে তাদের ভিন্নমতপোষক বক্তব্য পেশ করেন। এতে উপসঙ্ঘের সুপারিশগুলি দফাওয়ারী আলোচনা

www.nagorikpathagar.org

ও প্রত্যাখ্যান করে উপসংহারে তারা বলেন যে, 'বাঙলা লিপি ও বানান সরলায়ন ও সংস্কারের কোনো আশু প্রয়োজন নেই। এ-কাজে হাত দিলে নিশ্চিতরূপে ভ্রান্তি-বিভ্রান্তিতে পরিণত হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙলা ভাষার দ্রুত উন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হবে।'[৫০]

উপসঙ্ঘের সম্পাদক ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ ২২ মার্চ ১৯৬৮ মূল প্রতিবেদন ও ভিন্নমতপোষক টীকা রেজিস্ট্রারের কাছে পাঠিয়ে দেন। শিক্ষা পরিষদের ৪ মে'র ('৬৮) বৈঠকে উপসঙ্ঘের প্রতিবেদন ও ভিন্নমত পোষক টীকা সদস্যদের মধ্যে বিবেচনার জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সে-উদ্দেশ্যে এর কপি সাইক্লোস্টাইল করে প্রত্যেক সদস্যের কাছে একটি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৫১]

সংস্কার-উপসঙ্ঘের সদস্য ইব্রাহীম খাঁ ভিন্নমতপোষক টীকার প্রতিবাদ করে ২ আগস্ট ১৯৬৮ উপাচার্য ও শিক্ষা-পরিষদ সদস্যদের সমীপে একটি চিঠি লেখেন। সদস্যত্রয়ের উদ্দেশ্যের সততা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি বলেন :

> নোটের শেষভাগে এরা বলেছেন : "বাঙলা লিপি ও বানান সরলায়ন ও সংস্কারের আশু প্রয়োজন নাই।" এতে তাদের আসল কথা ও দৃষ্টিভঙ্গী সুপ্রকাশিত হয়েছে। একাডেমিক কাউন্সিল যেখানে এই সরলায়ন করা দরকার বলে কমিটি নিয়োগ করেছেন, সেখানে এঁরা তার একটুও দরকার নাই বলে পয়লা থেকেই একটা অনড় রক্ষণশীলতার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেছেন। পয়লা থেকে বলছি এই জন্য যে, কমিটির পয়লা ২/১ বৈঠকেই এঁরা তিনজন কমিটি মিটিং-এ কার্যধারাকে শুধু পদে পদে বাধা দিতে চেষ্টা করেছেন, এমন নয়, বরং সর্বপ্রকার নীতি বর্জন করে কোন যুক্তি না দিয়েই ঘোষণা করেছেন—কমিটি যাই করবে ও সিদ্ধান্ত নেবে তার সব ক'টিতে তাদের অমত থাকবে। আলোচনা-বিবেচনা ছাড়াই আগে থেকে এভাবে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় একাডেমিক কাউন্সিলের গঠিত কমিটিকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করা হয়েছে। পূর্ব ধারণার বশবর্তী হয়ে আলোচনা-বিষয়ের আলোচনার আগেই এই-ভাবের সিদ্ধান্ত প্রচারে তাদের পূর্ব পরিকল্পিত একটা কার্যক্রমই প্রকাশ পেয়েছে।[৫২]

শিক্ষা পরিষদের ৩ আগস্টের ('৬৮) বৈঠকে সম্পূর্ণ বিষয়টি আলোচিত হয়। দু'জন সদস্য-বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই ও ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম কবীর (কবীর চৌধুরী) সংস্কার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তারা বলেন, এর ফলে বাঙলা ভাষায় বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি দেখা দেবে।[৫৩] পরে সামান্য রদবদল করে প্রতিবেদনটি গৃহীত হয়।

এই সুপারিশগুলি ছিল বাঙলা একাডেমীর সুপারিশের অনুরূপ। তবে একাডেমী কর্তৃক গৃহীত ১৩ নং ও ১৫ নং সুপারিশ এ থেকে বাদ দেয়া হয় এবং বাঙলা একাডেমী যেখানে

www.nagorikpathagar.org

জ্ঞ ও ক্ষ কে গ্যঁ ও ক্খ্‌-এর প্রতীক রূপে রাখতে চেয়েছে, সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তে ওই দু'টি ধ্বনি বাদ দেওয়া হয় এবং তদস্থলে গ্যঁ ও খ্যঁ লেখার পরামর্শ দেওয়া হয়।[৫৪]

প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হবার পর শিক্ষা পরিষদের সেই বৈঠকেই এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদকে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠিত হয়। অন্যান্যের মধ্যে কমিটিতে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, বিজ্ঞান, আইন ও চিকিৎসা অনুষদের ডীনগণ, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক, ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ওসমান গণি, ইব্রাহীম খাঁ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক মোঃ নূরুল মোমেন।[৫৫]

এই সংস্কার কর্মসূচী সমর্থন করে সংবাদপত্রে ৫৮ জন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন : আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, ইব্রাহীম খাঁ, মুজিবুর রহমান খাঁ, আতাউর রহমান খান, গোবিন্দচন্দ্র দেব, আবুল কাশেম, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আবুল হাসানাত, ডক্টর ইন্নাস আলী, আবদুল হক ফরিদী, তালিম হোসেন, মোহাম্মদ আদমুদ্দিন, শাহ ফজলুর রহমান, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন, মোহাম্মদ নাসির আলী, মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, মীর আবুল হোসেন, আজিজুর রহমান, ডক্টর মোহর আলী, মোহাম্মদ আবদুর রহমান, জাহানারা আরজু, মফিজুদ্দীন আহমদ, মীর ফখরুজ্জামান, আখতারুল আলম, বাঙ্গাল আবু সাঈদ, মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, জনাব আবদুর রহমান, জোবেদা খানম, মোহসেনউদ্দীন আহমদ, মোস্তফা কামাল, মওলানা ফজলুল করিম, আবদুর রশিদ ওয়াসেকপুরী, ডক্টর আজিজুল হক, অধ্যাপক হেদায়েতুল ইসলাম খান, মহিউদ্দীন খান, এম এ এল শহীদুল্লাহ, আনিসুল হক চৌধুরী, ডক্টর শামসুল ইসলাম, রশিদ আহমদ, মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন, আনোয়ারুল হক খান মজলিস, মোহাম্মদ সিদ্দিক খান, বেদারউদ্দীন আহমদ, কানুতোষ মজুমদার, ইকবাল হোসেন, শেখ লুৎফুর রহমান, এস এন মোস্তফা, মোহাম্মদ নুরুন্নবী, লুৎফুন্নেছা খাতুন, কামরুন্নেসা, অধ্যাপক আবদুর রহমান, এম এ লতিফ, আইউব আলী, শামসুল আলম সিএসপি, মিয়া আবদুল গফুর, মোহাম্মদ আবদুর রহমান, আখতারুজ্জামান ও এম এ হাসান।[৫৬]

"ভাষাকে আমরা জনগণের শিক্ষার উপযোগী সহজ সুন্দর ভাষারূপে দেখতে চাই" এই শিরোনামে সংস্কার-প্রস্তাবের সমর্থনে আরও একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন : অধ্যাপক আবদুল গফুর, মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, এম এ লতিফ খানমজলিস, এস এ হাসান, মতিউর রহমান, এ এস মতিউল মান্নান, হেদায়েতউল্লাহ খান, কামরুন্নিসা, এডভোকেট হাসেম খান, এসএম আবদুল লতিফ, শামসুল হক সিদ্দিকী, কাজী আবদুল ওহাব, মোখতার হোসেন, শাহ মোঃ শরীফ, সৈয়দ আলী আশরাফ, শাহাদাত হোসেন, এইচ এম সাদত আলী, মওলানা মুহিউদ্দীন খান (সম্পাদক, মাসিক

www.nagorikpathagar.org

মদীনা), মোঃ আবদুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক তাহেরউদ্দীন, অধ্যাপক আইউব আলী, কায়েদে আজম কলেজ ও ডঃ আবুল হাসেম চৌধুরী।[৫৭]

সংস্কার প্রয়াসের বিরুদ্ধে "বাঙলা হরফের রদ্‌বদল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করবে" এই শিরনামে একটি বিবৃতি দেন ৪১ জন বুদ্ধিজীবী। এদের মধ্যে ছিলেন : কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাশিম, বেগম সুফিয়া কামাল, জহুর হোসেন চৌধুরী, অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন, সিকান্দার আবু জাফর, শহীদুল্লাহ্ কায়সার, আতাউস সামাদ, মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, সৈয়দ মর্তুজা আলী, কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, কে জি মোস্তফা, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, জহির রায়হান, শওকত আলী, শামসুর রাহমান, বেগম লায়লা সামাদ, ফজল শাহাবুদ্দীন, নুরজাহান বেগম, রোকনুজ্জামান খান, ওয়াহিদুল হক, আবদুল গণি হাজারী, ফয়েজ আহমদ, খালেদ চৌধুরী, সৈয়দ সাইয়িদ আতিকুল্লাহ্, শহীদ কাদরী, কালাম মাহমুদ, হাসান হাফিজুর রহমান, আলী আকসাদ, মোহাম্মদ সালেহউদ্দীন, আনোয়ার জাহিদ, আবদুল আউয়াল ও সানাউল্লাহ্ নূরী।[৫৮]

এই বাক্‌-বিতন্ডার মধ্যে ১৯৬৮ সালে আইউব-বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে বাংলা বানান ও লিপি-সংস্কার বিতর্ক চাপা পড়ে যায়। চাপা পড়ে যায় জাতীয় ভাষার প্রশ্নও।

৮. উপসংহার

বাংলা বানান ও লিপি-সংস্কারের এই প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল অনেক আগে থেকেই। পরবর্তীকালে দেখা যায়, বাংলা একাডেমী বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেসব সুপারিশ করে এখানকার লেখকরা তা অনেকাংশেই অনুসরণ করেছেন। এখনও তা অনুসৃত হচ্ছে।

তবে এক্ষেত্রে অধ্যাপক আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরীর বিরোধিতাকে তাদের স্ববিরোধিতা বলে চিহ্নিত করা যায়। কারণ ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমী যে ২০ দফা সংস্কার প্রস্তাব দেয়, তা ছিল সর্বসম্মত এবং সেই কমিটিতে আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী ছিলেন। তখন তারা এক্ষেত্রে কোন রকম ভিন্নমত পোষণ করেননি। অথচ ১৯৬৭ সালের কমিটিতে প্রায় একই প্রস্তাব গৃহীত হলেও তারা দু'জন প্রস্তাবের প্রতিটিরই বিরোধিতা করেন। এ সম্পর্কে ডঃ আহমদ শরীফের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন : 'তাদের সে ভিন্নমত প্রকাশের পেছনে হয়তো রাজনৈতিক হাওয়াও সাহস যুগিয়েছে, তখন জনগণের বাজারে 'ভাও' বদল হচ্ছিল।'[৫৯] এ সত্য অস্বীকার করা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

তথ্যনির্দেশ

১. বশীর আল হেলাল, *ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬, পৃ ৬০৭

২. পূর্বোক্ত, পৃ ৬০৮

৩. 'অজ্ঞাতনামা' লিখিত *'বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার'* বঙ্গ দর্শন, ১৮৭৯, উদ্ধৃত, হুমায়ূন আজাদ, বাঙলা ভাষা (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৪. আবুল ফজল মোহাম্মদ আখতারু-দ-দীন লিখিত *'বাঙলা বর্ণমালা পরিবর্তন'* শীর্ষক নিবন্ধ। দৈনিক আজাদ, ১৮-০৪-১৯৪৯

৫. ফেরদাউস খান, *হরফ সমস্যা*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৩৬৪

৬. মুনীর চৌধুরী, *বাঙলা গদ্যরীতি*, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, পৃ ১৬৩

৭. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৩-১৬৪

৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : ফেরদাউস খান, *The Language Problem of Today* (পুস্তিকা), ও *হরফ সমস্যা* (মুনীর চৌধুরীর বাংলা গদ্যরীতি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত)

৯. *Report of the East Bengal Language Committee*. 1949. পূর্ব পাকিস্তান গবর্ণমেন্ট প্রেস, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ ২২

১০. ফেরদাউস খান, *হরফ সমস্যা*, পৃ ১৬৩

১১. মুহাম্মদ আবদুল হাই, *রোমান বনাম বাংলা হরফ*, মাসিক সমকাল, ২ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৫৯

১২. মাসিক সমকাল, ২ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৫৯

১৩. বাংলা একাডেমী গবেষণা বিভাগের সংগ্রহ, উদ্ধৃত, বশীর আল্ হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, পৃ ৬১৬

১৪. দূরদর্শী, *হরফ সমস্যা*, ঢাকা, উদ্ধৃত, বশীর আলহেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, পৃ ৬১৬-৬১৭

[বশীর আল হেলালের মতে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চের পরে কোন এক সময়]

১৫. দূরদর্শী, *হরফ সমস্যা*, পৃ ২-৩

১৬. মুহাম্মদ এনামুল হক, *বাংলা ভাষার সংস্কার*, মালদহ, ১৯৪৪, পৃ ৮

১৭. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, (১ম খন্ড) দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ ২৪৮-২৪৯

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ ২৪৬

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ ২৫৫-২৫৬

২০. পূর্বোক্ত, পৃ ২৪৬

www.nagorikpathagar.org

২১. *Report of East Bengal Language Committee 1949,* East Pakistan Government Press, Dhaka p-2, উদ্ধৃত, বাশীর আল হেলাল, পৃ ৬৬৮
২২. পূর্বোক্ত
২৩ পূর্বোক্ত, পৃ ৬৬৮-৬৬৯
২৪. পূর্বোক্ত Report, পৃ ২-৪
২৫. পূর্বো পৃ ৭৬
২৬. পূর্বোক্ত Report, পৃ ৬-১১
২৭. মূল রিপোর্ট ইংরেজীতে ছিল। অনুবাদ : বশীর আল হেলাল
২৮. দৈনিক আজাদ, ২১-০২-১৯৬২
২৯. সাঈদ-উর রহমান, *আইউব খানের আমলে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর, ১৯৭৪, পৃ ১৮৫
৩০. G.W.Choudhury, Documents & Speeches on Constitution of Pakistan, Green Book House, Dhaka-1967, p.813
৩১. দৈনিক আজাদ, ০২-০৪-১৯৬০
৩২. Report of the Commission on National Education. পৃ ১ ও ৩৫৯
৩৩. দৈনিক আজাদ, ১৬-০২-১৯৫৯
৩৪. পূর্বোক্ত Report,. পৃ ৩৫৭
৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৬০
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৩০৯-৩১০
৩৭. সাইদ-উর রহমানের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, পৃ ৩৮৭-৮৯
৩৮. *Bengali And Urdu : A literary Encounter : A seminar,* বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪, পৃ ৯
৩৯. বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০, পৃ ১৩৬-১৩৭
৪০. বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭০, পৃ ১১৬
৪১. পূর্বোক্ত, পৃ ১১৪
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ ১২২
৪৩. বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০, পৃ ১৩৭
৪৪. সাঈদ-উর রহমানের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ঢা. বি. পত্রিকা, পৃ ১৯৪-১৯৫
৪৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় "ফাইল নং ২৬(২)-১২ (৬৬-৬৬) সংগ্রহ নং-২৬(১) রেজিষ্ট্রারের বিভাগ, সাধারণ শাখা, ক্রমিক নং।A.উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমানে পূর্বোক্ত প্রবন্ধ পৃ ১৯৬

www.nagorikpathagar.org

৪৬. Minutes of the Academic Council (D.U) Held on 28-3-67. উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত

৪৭. পূর্বোক্ত

৪৮. পূর্বোক্ত

৪৯. পূর্বোক্ত ফাইল, ক্রমিক নং-4B, উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান, পূর্বোক্ত

৫০. পূর্বোক্ত

৫১. Minutes of the Academic Council (D.U). held on 11.5.68. উদ্ধৃত সাঈদ-উর রহমানের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

৫২. পূর্বোক্ত ফাইল

৫৩. Minutes of the Academic Council (D. U.) held on 3.8.68. উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান, পূর্বোক্ত

৫৪. পূর্বোক্ত ফাইল, ক্রমিক-15 (A). উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান

৫৫. Minutes of the Academic Council (D.U.) held on 3.8.68.

৫৬. দৈনিক পাকিস্তান, ১৮-০৯-১৯৬৮

৫৭. দৈনিক পয়গাম, ২৭-০৮-১৯৬৮

৫৮. দৈনিক সংবাদ, ০৯-০৯-১৯৬৮

৫৯. আহমদ শরীফ, *পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষা-সংস্কার আন্দোলন*, উচ্চতর মানববিদ্যা সেমিনার প্রবন্ধমালা, প্রথম খন্ড, জুন ১৯৮৫, পৃ ১৫

www.nagorikpathagar.org

তিন. পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র-বিতর্ক

১. পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র বিতর্কের পটভূমি ও সূত্রপাত

এই উপমহাদেশে কিংবা বাংলাদেশেও হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নতুন নয়। এদেশে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বিরোধের রূপও পরিবর্তিত হয়। মধ্যযুগেও তা ছিল ক্ষীণ ধারায় এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ বিজয়ের পর তা আরও বিস্তৃতি লাভ করে। এই বিরোধ আবর্তিত হয়েছে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের উচ্চ শ্রেণীর বিভিন্ন স্বার্থকে কেন্দ্র করে।

মধ্যযুগে বাংলা ভাষার প্রতি অভিজাত মুসলমান শ্রেণীরও যে বিরূপ মনোভাব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়, সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল হাকিমের কবিতায়—'যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/সেসবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি' এবং মধ্যযুগের আরও অনেক মুসলিম কবির কবিতায়। এ থেকে বোঝা যায়, মুসলমান সমাজেও আশরাফ-আতরাফ ভেদে বাংলা ভাষা নিয়ে সমস্যা ছিল। বাংলা ভাষার প্রতি আশরাফ মুসলমানদের মনোভাব ছিল বিরূপ।

সাহিত্য ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের চিন্তাধারায়ও ভেদ ছিল। ব্রিটিশ আমলে সে ভেদরেখা আরও স্পষ্ট হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ১৯৩৮ সালে বঙ্কিম জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনকালেও হিন্দু-মুসলমান বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছিল—মুসলিম লীগ সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে 'আনন্দমঠ' গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব হয়েছিল। অবশ্য মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে বহ্ন্যুৎসবের প্রতিবাদও হয়েছিল। পরবর্তীকালে নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণে বাংলার মুসলমান সমাজে সেই মনোভাবের খুব বেশী পরিবর্তন সাধিত হয়নি। সে পরিবর্তনে আরও সময় লেগেছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পূর্ব বাংলার মানুষের ভাষা-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি কী হবে, সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের কতটুকু পূর্ব পাকিস্তানে গ্রহণ করা হবে, কতটুকু বর্জন করা হবে, তা নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেও বাঙালী মুসলমান সমাজে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না। কারণ বাঙালী মুসলমান সমাজে তখন শিক্ষিতের হারই ছিল অতি নগণ্য।

www.nagorikpathagar.org

সরকারী জরিপ থেকে দেখা যায়, দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে পূর্ব বাংলায় শিক্ষিতের হার ছিল মাত্র ১১.৭৭ শতাংশ।[১] তাই ওই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে যা কিছু আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে, তা কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনতিপরেই অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল হয়ে ওঠে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের আদর্শের ভিত্তিতে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতটুকু গ্রহণীয় বা বর্জনীয়, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদের সূত্রপাত ঘটে। তখনও স্কুলপাঠ্য বই-পুস্তকে ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রবীন্দ্র সাহিত্য স্বাভাবিকভাবেই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই বিতর্কে ১৯৫১ সালে প্রথম একটি নীতি নির্ধারণমূলক প্রবন্ধ লেখেন সৈয়দ আলী আহসান। 'পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা' শীর্ষক ওই প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

> মনে রাখতে হবে যে, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল স্বাতন্ত্র্যবোধের ওপর ভিত্তি করে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় মিলবে আমাদের সাহিত্যে ও কাব্যে। সুতরাংপ্রাক্তন বঙ্গের দুই অংশের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য আসতে পারে না—শুধুমাত্র সংস্কৃতিগত বোঝাপড়া হলেও হতে পারে।...প্রাক্তন বাংলা সাহিত্যের উপর উভয় বাংলার পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু এই অধিকার থাকার অর্থ এই নয় যে, সেই সাহিত্যের ট্রাডিশনও আমরা গ্রহণ করবো। নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন ও ভাবধারার প্রকাশ খুঁজবো। সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে, আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো বা জাতীয় সংহতির জন্যে যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশী।...পূর্ব বাংলার সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের উত্তরাধিকার হল, ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্য, অগণিত অমার্জিত পুঁথিসাহিত্য, অজস্র গ্রাম্যগাথা, বাউল ও অসংস্কৃত অঙ্গের পল্লীগান।[২]

সৈয়দ আলী আহসানের এই বক্তব্য ছিল পাকিস্তানবাদী সাংস্কৃতিক ধারণার অনুসারী। এই বক্তব্য নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলায় বাদ-প্রতিবাদের সূত্রপাত ঘটে। যদিও তৎকালে সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাসীন বুদ্ধিজীবীগণ এই মনোভাবের নীরব সমর্থক ছিলেন। সে সময়ে মুসলিম লীগের কঠোর শাসন ব্যবস্থায় ওই ধারার বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে কেউ সাহসও করেননি। অবশ্য তখনও রেডিও-তে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে নিয়মিত রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাজানো ও গাওয়া হত। তারও কেউ প্রতিবাদ করেননি।

সৈয়দ আলী আহসান সরাসরি রবীন্দ্র-সাহিত্য বর্জনের কথা বলেননি। কিন্তু তারও আগে প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের নেতা মুনীর চৌধুরী, আখলাকুর রহমান, আবদুল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

আলমুতী প্রগতিবিরোধী বলে রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের বক্তব্য দেন। ওই বক্তব্যের সঙ্গে একাত্ম না হওয়ায় তাঁরা অজিত গুহকে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সভাপতির পদ থেকে অপসারণ করেন।[৩] মার্কসীয় মতাদর্শের প্রভাবেই তাঁরা তখন রবীন্দ্র বর্জনের তাগিদ অনুভব করেছিলেন।

২. রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক

১৯৬১ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ঢাকায় বেশ তোড়জোর শুরু হয়ে যায়। ততদিনে অবশ্য রবীন্দ্র অনুরাগী ও রবীন্দ্রবিরাগী দুই ধারার বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীরই বিকাশ ঘটেছে। এর কারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর পূর্ব বাংলায় শিক্ষিতের হার বেড়েছে আগের চেয়ে দ্রুত। আর পশ্চিম বঙ্গ তথা কলকাতায় অবস্থানরত বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও দলে দলে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপর যে শূন্যতা ছিল, তত দিনে তা অনেকখানি পূরণ হয়ে যায়। আর পাকিস্তানবাদী শক্তির অখন্ড 'এক ধর্ম এক রাষ্ট্র' কেন্দ্রিক পাকিস্তানী সংস্কৃতির ধারণার সঙ্গে পূর্ব বাংলার বাঙালী সংস্কৃতির ধারণা ততদিনে জমাট বেঁধেছে।

এতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের প্রাক্কালে একদল বুদ্ধিজীবী যেমন রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক ও ভারত-পন্থী বলে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হন, অন্য দল তেমনি আবার রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব বাংলারই লোক এবং পূর্ব বাংলার বাঙালী সংস্কৃতির প্রতিনিধি বলে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নানা ধরনের যুক্তির আশ্রয় নেন। ওই সব যুক্তির অনেকগুলোই ছিল অবান্তর ও অমূলক।[৪]

সে সময় পাকিস্তানে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক আইন জারি ছিল। সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি রবীন্দ্রনাথ বিরোধী কোন বক্তব্য দেয়া না হলেও রবীন্দ্রানুরাগীরাই কার্যত আলোচনার সূত্রপাত করেন।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদযাপনের প্রাক্কালে দৈনিক আজাদ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক Pakistan Observer পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, তার ফলে সমাজে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

কার্যত রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সামনে রেখে মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত দৈনিক আজাদ পত্রিকাই বিরোধিতা করে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটায়। ১৩৬৮ সনের (১৯৬১ খৃ) ১ বৈশাখ দৈনিক আজাদে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও মওলানা আজাদ' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে উভয়ের সমালোচনা করে বলা হয় :

> রবীন্দ্রনাথের দোহাই পাড়িয়া অখণ্ড বাংলার আড়ালে আমাদের তামদ্দুনিক জীবনে বিভেদ ডাকিয়া আনার সুযোগ দেওয়া চলিবে না। একদল লোক পশ্চিম

www.nagorikpathagar.org

> বাংলার সাহিত্যের অন্ধ অনুসারী ও ভক্ত। তাদের রবীন্দ্র-ভক্তি বিপদের কারণ হতে পারে এবং বাইরের যারা পাকিস্তানকে দ্বিধাহীন মনে গ্রহণ করেন নাই, তারা এই সুযোগে তামদ্দুনিক অনুপ্রবেশের খেলায় নামিতে পারে।[৫]

একই দিন দৈনিক ইত্তেফাকে 'রবীন্দ্র জন্মতিথিতে রচনা প্রতিযোগিতা' শীর্ষক এক খবরে বলা হয়;

> মাদ্রাসা জামে-উল-উলুমের পক্ষ হইতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্কুলের বা মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে 'বিশ্বকবির ছেলেবেলা' এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে 'বিশ্বকবির চোখে মানব ও ধর্ম' বিষয়ে দুইটি রচনা আহ্বান করা হইয়াছে। রচনা বাংলায় লিখিতে হইবে।[৬]

বিবৃতিতে এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালা শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে ১০ বৈশাখ ১৩৬৮-তে। ঐ দিন ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় দুই কলাম হেডিং-এ দুই কলাম ছবিসহ অনুষ্ঠানের যে সংবাদটি ছাপা হয়, তার শিরোনাম ছিল, "আমি তোমাদেরই লোক, এই মোর পরিচয় হোক।। ঢাকায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ।। বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।" উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে কবি সুফিয়া কামাল বলেন :

> রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙ্গালীর কবি ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন বিশ্বকবি। রবীন্দ্র প্রতিভা লইয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি। তাঁর অবস্থান আমাদের আপনভোলা মনের সঙ্গোপনে। রবীন্দ্রনাথ ঋতুর কবি। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত বসন্ত প্রত্যেক ঋতুই কবির কবিতায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব ও উত্তর বাংলারই কবি। তাহার সোনার তরী পূর্ব বাংলার পদ্মা ও মেঘনাতেই বাহিত হইয়াছিল। আজও কবির স্মৃতি নিয়া বাঁচিয়া আছে শিলাইদহ শাহজাদপুর প্রভৃতি স্থান।[৭]

পরদিন ১২ বৈশাখ ১৩৬৮ সনে দৈনিক আজাদে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, 'রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যে মুসলমানদের জীবন-ভাবনা অনুপস্থিত এবং বিশেষত তাঁর ঐতিহাসিক গাথা কবিতায় তিনি বরং মুসলমানদের নিন্দাই করেছেন।'[৮]

ওই দিনই আজাদে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী' শীর্ষক এক উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় :

> বিপ্লবী সরকারের তৎপরতার সম্মুখে এই ছদ্মবেশী যুক্ত বাংলার ষড়যন্ত্র আবার কীভাবে মাথা তুলিয়া খাড়া হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা এদিকে

www.nagorikpathagar.org

> পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং এসব ছদ্মবেশী যুক্তবঙ্গীয় প্রচারণা দৃঢ় হস্তে অঙ্কুরেই উৎপাটন করিয়া দেওয়া উচিত।[৯]

১৪ বৈশাখ ১৩৬৮ দৈনিক আজাদ–এ প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও আমরা' শীর্ষক আর এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় : অবিভক্ত বাংলায়ও মুসলমান রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জাতীয় কবি বা আশা ও ভাষার কবি বলে গ্রহণ করেনি। রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যে ধারার অনুসারী, সে ধারার সঙ্গে মুসলমানদের নাড়ীর যোগ সেদিনও ছিল না।[১০]

একই দিন দৈনিক ইত্তেফাকের মিঠেকড়া কলামে ভীমরুল লেখেন :" পূর্ব পাকিস্তানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এক অপ্রত্যাশিত বিতর্কের উদ্ভব ঘটেছে। এক প্রবীণ সহযোগী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কতকগুলি অসঙ্গত ও অবাস্তব মন্তব্য করে এবং শতবার্ষিকী উদযাপনের উদ্যোক্তাদের দেশপ্রেমে সন্দেহ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর কটাক্ষ করে অবাঞ্ছিত বিতর্কের সূত্রপাত করেছে।"[১১] ভীমরুল দৈনিক আজাদের প্রতি এই মনোভাব পরিহারের আহ্বান জানান।

পুরো বৈশাখ মাস জুড়ে দৈনিক আজাদ–এ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের বিরোধিতা অব্যাহত থাকে। এর বিপরীতে দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নানা ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশ করে।

তবে আজাদ পত্রিকা রবীন্দ্রপন্থীদের বক্তব্যও নিয়মিত প্রকাশ করেছে।

> বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ। সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভাসমূহেরও তিনি অন্যতম। কাজেই তার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্যিক মহলেও যথাযথভাবে সাড়া জাগিবে, ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নাই।[১২]

পরের দিন আজাদ লেখে : 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এমন কোন শাখা নেই, যা রবীন্দ্রনাথের অবদানে পল্লবিত হয়নি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক অবদানের স্মরণ ও স্বীকৃতি হিসাবে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপনের তাৎপর্য বিশেষভাবেই অনুধাবনযোগ্য।'[১৩] তবে এসব মন্তব্য সম্পাদকীয় মত হিসেবে নয়, পাঠকের মতামত হিসাবে প্রকাশিত হয়।

পত্রিকার পাতায় এই বিতর্ক অব্যাহত থাকলেও পুরো ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ মাস ধরে সারা দেশে রবীন্দ্র–বিষয়ক সেমিনার, সাহিত্যানুষ্ঠান, আবৃত্তি অনুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠানের ধারা চলতে থাকে।[১৪]

এর বিরোধীরাও বসে ছিলেন না। তাদের উদ্যোগে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ফেনীতে কয়েকটি সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। ২৪ বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকীর আগের দিন, ঢাকা জেলা কাউন্সিল হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন ফজলুল হক সেলবর্ষী, মঈনুদ্দীন, দেওয়ান আবদুল হামিদ, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, অধ্যাপক গোলাম আযম, মওলানা মহিউদ্দীন, হাফেজ হাবিবুর রহমান, সঞ্জয়

www.nagorikpathagar.org

বড়ুয়া ও আবদুল মান্নান তালিব। সভায় বক্তারা রবীন্দ্রনাথকে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসাধক, প্রতিক্রিয়াশীল ও পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের বিরোধী বলে অভিহিত করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় :[১৫]

এক. পাকিস্তানের ইসলামভিত্তিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্রকে অখণ্ড ভারতীয় রামরাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসাবে চালু করার জন্য এক শ্রেণীর তথাকথিত সংস্কৃতিসেবী প্রদেশব্যাপী যে সাংস্কৃতিক অপচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে, এই সভা তাহাদের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করিতেছে।

দুই. পাকিস্তানের বদৌলতে অকল্পিত সুখ-সম্পদের অধিকারী হইয়াও যাহারা বিদেশী বিজাতীয় কৃষ্টি ও মতবাদের তল্পি বহিয়া বেড়াইতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট বিকাইয়া দেওয়ার স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য এই সভা প্রত্যেক দেশাত্মবোধসম্পন্ন পাকিস্তানী ও সরকারের প্রতি আহবান জানাইতেছে।

তিন. পূর্ব পাকিস্তানের বেতারকেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন একাডেমীকে বিজাতীয় সঙ্গীত-সাহিত্যের অভিশাপমুক্ত করিয়া জাতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শের অনুসারী করার জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিশু ও কিশোর মনকে জাতীয় কৃষ্টির অনুবর্তী করিয়া গড়িয়া তুলবার উদ্দেশ্যে যাবতীয় গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করণের জন্য এই সভা পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শে বিশ্বাসী সরকার, সুধীসমাজ ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে।

পরবর্তীকালের কার্যক্রমে মনে হয় না যে, এসব আহ্বানে কোথায়ও সাড়া মিলেছিল। এই বিতর্কে গোলাম মোস্তফাসহ অনেক পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিক নিজেকে জড়াননি।

ইতিমধ্যে ঢাকা শহরেই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য তিনটি কমিটি গঠিত হয়। ১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগ গঠিত কমিটি, ২. ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এস এম মুরশেদের নেতৃত্বে একটি কমিটি এবং ৩. ঢাকার প্রেসক্লাবে তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কমিটি'।[১৬] প্রাদেশিক সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোপন রিপোর্টে উল্লেখ ছিল যে, শেষোক্ত কমিটিকে ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাস অর্থ সাহায্য দিয়েছিল।[১৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে গঠিত কমিটি ১১ বৈশাখ কার্জন হলে প্রধান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাতে সভানেত্রীত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল। তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'সকল রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে অবস্থিত মহান কবি' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। গীতি-নক্সা, আবৃত্তি ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।[১৮]

www.nagorikpathagar.org

এর দ্বিতীয় দিনের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই। তাতে বিভিন্ন বক্তা রবীন্দ্র সাহিত্যের সর্বজনীনতা, মুসলমানদের সমস্যা পর্যালোচনায় তাঁর সহানুভূতি এবং তার সাহিত্যে পূর্ব বাংলার জনজীবন ও প্রকৃতির অবদানের কথা উল্লেখ করেন। এই অনুষ্ঠানে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন বলেন, রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর কোন হিন্দু সাহিত্যিক হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক সমঝোতার কথা এত গভীরভাবে আলোচনা করেননি।...রবীন্দ্রনাথই একমাত্র হিন্দু লেখক যিনি মুসলমানদের দাবী-দাওয়া স্বীকার করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে হিন্দুদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন।[১৯]

এদিকে বিচারপতি মুর্শেদের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় গোবিন্দচন্দ্র দেবের বাসা ও মুহম্মদ আবদুল হাই-এর অফিস কক্ষে, ঘরোয়াভাবে।[২০] তাতে কবির সাহিত্যকে বিশ্বমানবের সম্পদ বলে অভিহিত করা হয়।[২১] তাঁদের অনুষ্ঠানে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন চসার, শেক্সপীয়র, বালজাক, ভলতেয়ারের মত রবীন্দ্রনাথকে 'সমগ্র পৃথিবীরই বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধার পাত্র' বলে মত প্রকাশ করেন।[২২]

প্রেসক্লাবের কমিটির অনুষ্ঠানে সিম্পোজিয়াম, নাটক, চিত্র-প্রদর্শনীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়।[২৩]

এই তিনটি কমিটি ১৮ দিন ধরে ঢাকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করে।[২৪]

কমিটি তিনটি একত্রিত হয়ে ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ বৈশাখ চারদিনব্যাপী উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

২৪ বৈশাখের অনুষ্ঠানে শামসুর রাহমান ও আন্দালিব সাদানী যথাক্রমে তাঁদের বাংলা ও উর্দু কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেন। ঢাকার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিল্পীরা এরপর রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্য রচনা থেকে পাঠ করে শোনান। সবশেষে হয় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ফজলুল হক হলে।

এদিনে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বিচারপতি মুরশেদ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, রবীন্দ্রনাথ উদার মানবতার কবি এবং তাঁর মধ্যে রীতিমতো একটি যুগ বিধৃত।[২৫]

২৫ বৈশাখের অনুষ্ঠান দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে ছিল আলোচনা সভা। অনুষ্ঠিত হয় ফজলুল হক হলে। দ্বিতীয় পর্বে সন্ধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে অভিনীত হয় দুটি নৃত্যনাট্য—চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকা। আলোচনা সভার সভাপতি ছিলেন প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রফেসর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, জনাব মুনীর চৌধুরী ও শ্রী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন তাঁর আলোচনায় বলেন, রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বাংলা সাহিত্য অর্থহীন।[২৬]

২৬ বৈশাখ ফজলুল হক হলে আর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন মুনীর চৌধুরী, ডক্টর হাসান জামান, রশীদ করীম ও বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর।

www.nagorikpathagar.org

এদিন সন্ধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে 'রাজা ও রাণী' নাটকের অভিনয় হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এদিন সারা পূর্ব বাংলায়, বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে যে ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হয়, এবং তার ফলে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, তার জন্যে নাটকের অভিনয় হতে পারেনি।[২৭]

পরের দিন ২৭ বৈশাখ এ নাটকের অভিনয় চ্যারিটি শো হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়। সংগৃহীত অর্থ দান করা হয় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে গঠিত সাহায্য তহবিলে। তিনটি কমিটি আয়োজিত মূল উৎসব শেষ হয় বর্তমান নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে।[২৮]

এ সময়ে পূর্ব বাংলার সর্বত্র, বেতারেও রবীন্দ্র সঙ্গীত গীত হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় কী লেখা হয়েছে, কী বিতর্ক চলেছে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষ মাথা ঘামায়নি। এই বিতর্কের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সমস্যা কোনমতেই জড়িত ছিল না। ফলে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের পর এ বিতর্ক স্তিমিত হয়ে পড়ে।

৩. বেতার-টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার হ্রাসের বক্তব্য ও তার প্রতিক্রিয়া

১৯৬১ সালের রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সময় দেশে সামরিক শাসন জারি ছিল। পরে ১৯৬৩ সালে মৌলিক গণতন্ত্র ভিত্তিক শাসনতন্ত্র দিয়ে সামরিক শাসন তুলে নেওয়া হয়। দেশে আইয়ুব খানের শাসন চলে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। সামরিক শাসনের কালে দেশে এক ধরনের সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অঙ্গন আলোড়িত হয়ে ওঠে।

১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং ১৯৬৬ সালে ছ'দফার আন্দোলন আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন মেরুকরণ ঘটায়।

সে সময়েই ১৯৬৭ সালের জুন মাসে 'মৌলিক গণতন্ত্রে'র জাতীয় সংসদে পাকিস্তানের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন প্রদত্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করে পাকিস্তান অবজারভার এবং করাচীতে থেকে প্রকাশিত ডন পত্রিকায় ছাপা হয় যে, বেতার ও টেলিভিশন থেকে পাকিস্তানের মূল্যবোধ-বিরোধী রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করা হবে এবং ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের অন্য গানের প্রচারও হ্রাস করা হবে। পাকিস্তান অবজারভার-এ 'Broadcast ban on Tagore!' শিরোনামে প্রকাশিত ঐ খবরটি ছিল নিম্নরূপ :

> Rawalpindi, June 22 : Khawaza Shahabuddin, Minister for Information and Broadcasting, told the National Assembly today that the songs by Poet Rabindranath Tagore which he termed as "against Pakistan's cultural values" would not be broadcast in future, and the use of other songs would also be

www.nagorikpathagar.org

> reduced. He was answering to supplimentaries on a question from Mr. Mujibar Rahman Choudhury.[২৯]

খবরটি ডন পত্রিকার ভেতরের পাতায় সংসদের প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত সংবাদ হিসাবে প্রকাশিত হয়।

পরদিন ২৪ জুন, ১৯৬৭ দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় "রেডিও পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার করা হবে না" শিরোনামে এই খবরটি প্রকাশিত হয়। সেখানে খবরটি ছিল নিম্নরূপ :

> রাওয়ালপিন্ডি, ২৩ জুন (এপিপি)।- কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন গতকাল জাতীয় পরিষদে বলেন যে, ভবিষ্যতে রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান প্রচার করা হবে না এবং এ ধরনের অন্যান্য গানের প্রচারও কমিয়ে দেওয়া হবে। রাজশাহী থেকে নির্বাচিত বিরোধীদলীয় সদস্য জনাব মুজিবর রহমান চৌধুরীর এক অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে খাজা শাহাবুদ্দীন উপরোক্ত মন্তব্য করেন।[৩০]

উল্লেখ্য, পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটির কোন সূত্র উল্লেখ ছিল না। কিন্তু দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি পরিবেশন করেছিল এপিপি। খাজা শাহাবুদ্দীন যে অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে উক্তিটি করেছিলেন অবজারভারের খবরে তাও উল্লেখ করা হয়নি।

পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশের পরপরই পুনরায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ২৪ জুন (১৯৬৭) মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদীন, এম এ বারি, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, খান সারওয়ার মুরশিদ, সিকান্দার আবু জাফর, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আহমদ শরীফ, নীলিমা ইব্রাহীম, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, আনিসুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও শহীদুল্লাহ্ কায়সার ওই বক্তব্যের প্রতিবাদে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন :

> স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৩শে জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে সরকারী মাধ্যম হতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি।
>
> রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাঙলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে, তা রবীন্দ্রনাথকে বাঙলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদাদান করা অপরিহার্য।[৩০]

www.nagorikpathagar.org

এই বিবৃতির পরপরই সারা দেশেই বেতারে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ করার' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে। রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ করে কোনো সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষিত না-হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে আন্দোলন শুরু হয় 'রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ করা'র বিরুদ্ধে। 'সংস্কৃতি সংসদ', 'ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)', 'ক্রান্তি', 'স্পন্দন', 'অপূর্ব সংবাদ' প্রভৃতি ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এর প্রতিবাদে বিবৃতি দিতে শুরু করেন।

২৬ জুন পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় সংসদে স্বতন্ত্র সদস্য জনাব আসাদুজ্জামান খান রবীন্দ্র সঙ্গীত বিষয়ে সরকারের মনোভাবের সমালোচনা করেন। এ সম্পর্কে পরদিন অবজারভার পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয় :

> Mr. Asaduzzaman Khan also condemned the Government for trying to stun the Cultural growth of the people through Goverment action. Bitterly criticising the recent move of the Government to ban Tagore songs from the Radio, Mr. Asaduzzaman Khan said, the Government should know that such foolish act as banning celebrated poets could never stop the growth of any culture, rather it strengthened cultural movements.[৩১]

এ সময় ২৮ জুন ঢাকা থেকে প্রকাশিত মর্নিং নিউজ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'Clarification' শিরোনামে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় : A spokesman of the ministry of Information yesterday clarified Mr. Shahabuddin's statement on Tagore songs. He said the minister had stated that only those songs which were "against Pakistan's cultural values" would not be broadcast in future and the use of other songs would also be reduced.[৩২]

পূর্ব পাকিস্তানের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী যখন এই বিষয় নিয়ে আন্দোলন করছিলেন, তখনও পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলছিল। সেই অধিবেশনে নিয়মিত বক্তব্য রাখছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মালেক উকিল, শাহ্ আজিজুর রহমান, কামরুজ্জামান প্রমুখ। জাতীয় সংসদে এ নিয়ে তারা কোন কথাই বলেননি।[৩৩] বরং তথ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যার পর ২৯ জুন আওয়ামী লীগের শীর্ষ স্থানীয় নেতা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান জাতীয় সংসদে খাজা শাহাবুদ্দীনের উদ্দেশ্যে বলেন : 'If that is the view that only those songs which are prejudicial should be banned, I am at one with you. It must be banned. Pakistan is one and it is indivisible and sovereignty must be maintained, that is the first and the last. Therefore, regarding that we have no difference of opinion.[৩৪]

www.nagorikpathagar.org

তা সত্ত্বেও এ উপলক্ষ্যে ব্যাপকতর আন্দোলন করার এবং জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে জাতীয় প্রেসক্লাবে বারজন সদস্যের একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। ওয়াহিদুল হক ও কামাল লোহানী এ কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। অন্য যাঁরা এ কমিটির সদস্য ছিলেন তারা হলেন : আলী আশরাফ, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আতিকুল ইসলাম, কামাল হায়দার, সৈয়দ কামালউদ্দীন, আবদুল মতীন, আতাউর রহমান, ডক্টর সারওয়ার আলী। দোসরা জুলাই এ কমিটি গঠিত হওয়ার দিন কবি জসীমউদ্দীনের বাসভবনে অনুষ্ঠিত ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের এক সভায় সম্মিলিত আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে আরো একটি কমিটি গঠিত হয়। এতে সদস্য হন : এম এ বারি, ওয়াহিদুল হক, কামাল লোহানী, আলী আশরাফ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আতিকুল ইসলাম এবং ডক্টর সারওয়ার আলী।[৩৫]

এম এ বারির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তৃতা করেন কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জসীম উদ্দীন, আনিসুজ্জামান, মোস্তফা কামাল (আব্বাস উদ্দীনের পুত্র), ওয়াহিদুল হক এবং বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর পক্ষ থেকে আহমদ হুসেন, ছায়ানটের জাহেদুর রহীম, ঐকতানের ফারুকুল ইসলাম, শান্তি পরিষদের আলী আকসাদ, স্পন্দনের আতাউর রহমান, ক্রান্তির কামাল লোহানী, পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের আলী আশরাফ প্রমুখ।[৩৬]

কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে ব্যক্তিগতভাবে ঢাকার দু'জন খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী আলাদা বিবৃতি দিয়ে সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান। এঁরা হলেন 'ইসলামী একাডেমী'র পরিচালক আবুল হাশিম এবং কবি জসীমউদ্দীন। জসীমউদদীন তাঁর বিবৃতিতে বলেন, 'রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষীদের নাড়ীর বন্ধন। কোন সরকারী আইনের সহায়তায় সে বন্ধন ছিন্ন করা যাবে না। পূর্ব বাংলার বেতার থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার বন্ধ হলে জনগণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্যে আকাশবাণী শুনবে।'[৩৭]

ঢাকায় বসবাসকারী উর্দু কবি-সাহিত্যিকরাও এক বিবৃতিতে বলেন :

> We the Urdu poets and writers, are deeply aggrieved and shocked by the recent statement of Khawaja Shahabuddin to the effect that Tagore's songs are against Pakistan's cultural values and hence should not be broadcast in future.
>
> We are of the considered opinion that without Tagore the continuance of Bengali cultural and literary heritage is reduced to a hazy shadow.
>
> We, therefore, appeal to the Government to rescind the decision banning Tagore's songs from the broadcasting programme in the larger interest of the country.

www.nagorikpathagar.org

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন : নওশাদ নূরী, আদীব সোহিল, সরওয়ার হোসেন, শায়ের সিদ্দিক, নিয়ার নৌপরভী, জয়েনউদ্দীন আহমদ, আবু সায়ীদ, শাহদুল হক ও আহমেদ ইলিয়াস।[৩৮]

রাজনৈতিক দলগুলোও এসময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের স্বাভাবিক প্রচারের পক্ষে মত দেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম এবং মস্কো-পন্থী ন্যাপ সম্পাদক মোহাম্মদ সুলতান আলাদা আলাদা বিবৃতি দিয়ে সরকারের রবীন্দ্রবিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং জনগণকে এ ব্যাপারে সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। মওলানা ভাসানী তাঁর বিবৃতিতে বলেন :

> তথ্যমন্ত্রী জনাব শাহাবুদ্দীন ঘোষণা করেছেন যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত ইসলাম ও পাকিস্তানের ঐতিহ্যের পরিপন্থী বিধায় আর বেতার ও টেলিভিশন মাফরত পরিবেশিত হবে না। কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব সবুর খানও অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য পাকিস্তান সরকারের মনোভাবেরই প্রকাশ কিনা ইহাই সরকারের নিকট আমার জিজ্ঞাসা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য, সাহিত্য, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস ও সঙ্গীতের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে নতুন গৌরবে অভিষিক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অবদান সর্বজনীন।
>
> ইসলাম সত্য ও সুন্দরের জয় ঘোষণা করেছে। এই সত্য ও সুন্দরের পতাকাকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই, যাঁরা ইসলামের নামে, রবীন্দ্রনাথের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন, তাঁরা আসলে ইসলামের সত্য ও সুন্দরের নীতিতে বিশ্বাসী নন। তাই আমি এদেশের মানুষের প্রতি সরকারের এই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।[৩৯]

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমেনা বেগম তাঁর বিবৃতিতে বলেন : 'ক্ষমতাবলে হয়তো সাময়িকভাবে বেতার ও টেলিভিশন হইতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু গণচিত্ত হইতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুমধুর আবেদনকে কোনকালেই মুছিয়া ফেলা যাইবে না।'[৪০]

'সংস্কৃতির ওপর সরকারী হামলা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে' খুলনায় 'সংস্কৃতি সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। হাসান আজিজুল হক ও হেলালউদ্দীন এই পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং এ এফ এম আবদুল জলিল সভাপতি মনোনীত হন।[৪১]

আবুল ফজলের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম থেকেও কয়েকজন বুদ্ধিজীবী একটি বিবৃতি দান করেন। সে বিবৃতিতে বলা হয় : রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে আমাদের পাকিস্তানী ঐতিহ্য, মূল্যবোধ আর ধ্যানধারণার কোন বিরোধ নেই; বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিষয়বস্তু প্রধানত ভক্তি, আত্মনিবেদন, প্রেম আর প্রকৃতিচেতনা। এসবের কোনটাই ইসলামী আর

www.nagorikpathagar.org

পাকিস্তানী মতাদর্শের প্রতিকূল নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের জীবন-পরিধি থেকে বাদ দেওয়া হলে দেশের, বিশেষ করে তরুণ সমাজের, সৌন্দর্যচেতনা আর সঙ্গীতবোধ ব্যাহত হবে।[৪২] এ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন : আবুল ফজল, আল মাহমুদ, সাদেকুর রহমান চৌধুরী, সলিমুল হক খান মিল্কী বার-অ্যাট-ল, খান শফিকুল মান্নান, মেসবাহউল আলম, সুচরিত চৌধুরী, হরি পাল, শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব, আশীস চৌধুরী।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণও এই সরকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। শতাধিক শিক্ষকের স্বাক্ষর-সংবলিত একটি বিবৃতি যখন তাঁরা পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে পাঠান, তখন আর সেটি মুদ্রিত হয়নি।[৪৩]

খাজা শাহাবুদ্দীন ৪ জুলাই ঢাকায় এসে জাতীয় পরিষদে প্রদত্ত তাঁর বিবৃতির একটি ব্যাখ্যা দান করার পর পত্রিকাগুলি আর কোন বিবৃতি বা প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।[৪৪]

তবে কোন কোন বুদ্ধিজীবী ও প্রতিষ্ঠান তখন ভিন্নরূপ বিবৃতি দেন। প্রথম বিবৃতিটি প্রকাশিত হয় ২৯ জুন। তাতে স্বাক্ষর করেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, কে এম এ এ মুবিন, মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মোহর আলী, এ এফ এম আবদুর রহিম। বিবৃতিতে তারা বলেন :

> ...the recent statement in favour of Tagore's songs is liable to be misunderstood and is likely to be exploited in propaganda against Pakistan.[৪৫]

'তামদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্যে' বিশ্বাসী ৪০ জন বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পী তাঁদের বৃিতিতে বলেন :

> পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মহলের যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের তামদ্দুনিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই উক্তির প্রতিবাদ করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি এই কারণে যে, এই উক্তি স্বীকার করিয়া নিলে পাকিস্তানী ও ভারতীয় তমদ্দুন যে এক এবং অবিচ্ছেদ্য এই কথাই মানিয়া নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ যে তমদ্দুনের ধারক ও বাহক, তাহা হইতেছে ভারতীয়—যে তমদ্দুনের মূল কথা হইল, 'শতহনদল মোগল পাঠান এক দেহে হল লীন।' এবং যে তমদ্দুন এই উপমহাদেশের মুসলমানদের অভিহিত করে 'হিন্দু-মুসলমান' বলিয়া। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই এক প্রবন্ধে এই উপমহাদেশের মুসলমানদের "হিন্দু মুসলমান" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তমদ্দুন সম্পর্কে এই যে ধারণা, ইহার সহিত পাকিস্তানী তমদ্দুনের আকাশপাতাল ব্যবধান রহিয়াছে। বরং বলা যাইতে পারে, একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে তামদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, উপরোক্ত বিবৃতি মানিয়া

www.nagorikpathagar.org

> নিলে, সে ভিত্তিই অস্বীকৃত হয়। সে কারণে উপরোক্ত বিবৃতিকে আমরা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের মূলনীতির বিরোধী বলিয়াও মনে করি।

এ বিৃতিতে স্বাক্ষর করেন : মুহম্মদ বরকতুল্লাহ, আবদুল মওদুদ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ইব্রাহিম খাঁ, মুজীবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, ডক্টর হাসান জামান, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, বেনজীর আহমদ, মঈনুদ্দীন, শেখ শরফুদ্দীন, আ ক ম আদমউদ্দীন, তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, আ ন ম বজলুর রশীদ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সানাউল্লাহ নূরী, আবদুস সাত্তার, কাজী আবুল কাসেম, মুফাখখারুল ইসলাম, শামসুল হক, ওসমান গনি, মফিজউদ্দিন আহমদ, আনিসুল হক চৌধুরী, মোস্তফা কামাল, মতিউর রহমান, জহুরুল হক, ফারুক আহমদ, শরফুদ্দীন আহমদ, হোসনে আরা, মাফরুহা চৌধুরী (জ. ১৯৩৪), মোহাম্মদ নাসির আলী, এ কে এম নুরুল ইসলাম, জাহানারা আরজু (জ. ১৯৩২), আবদুল ওয়াদুদ।[৪৬]

মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে ৩০ জন মওলানার এক বিবৃতিতে বলা হয় : পাকিস্তান ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নিয়ে দুনিয়ার বুকে জন্ম লাভ করেছে। পাকিস্তানীরা তাই স্বকীয় তাহজীব তমদ্দুনের পরিপন্থী কোনো প্রচেষ্টাকেই বরদাস্ত করতে পারেন না। তারা বলেন, রবীন্দ্রনাথের বহু সঙ্গীত মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে হিন্দু সংস্কৃতি ও যৌন ভোগলালসার জয়গান গেয়েছে। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই এ সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হতে রেডিও ও টেলিভিশনকে পবিত্র রাখার প্রয়োজন ছিল। তাই বিলম্বে হলেও সরকার এই সঙ্গীত পরিবেশন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জনগণের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। তারা সরকারের এই 'মহৎ প্রচেষ্টা'কে অভিনন্দন জানান।[৪৭]

মুন্সী রইস উদ্দীন, আবদুল লতিফ, ধীর আলি মিয়া, আবদুল আলীম, নীনা হামিদ, আঞ্জুমান আরা বেগম, ইসমত আরা, ফউজিয়া খান, ফুলঝুরি খান, শাহনাজ বেগম, নাজমুল হুদা, খাদেম হোসেন খান, মীর কাশেম খান, আবিদ হোসেন খান প্রমুখ সঙ্গীত শিল্পী এক বিবৃতিতে বলেন :

> ভারতের জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের কোন কোন মহলে বাদানুবাদ শুরু হইয়াছে। সঙ্গীতের 'সার্বজনীনতা' অথবা 'রাবীন্দ্রিক সত্য সুন্দরের' মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়া বাজিমাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর লোকই পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যাপকভাবে চালু করিবার হাস্যকর প্রয়াস চালাইতেছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহাদের এই অপপ্রয়াস দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের

www.nagorikpathagar.org

জনগণের উপর রবীন্দ্রসঙ্গীত চাপাইয়া দেওয়ার সকল প্রচেষ্টাই নিঃশেষে ব্যর্থ হইবে।

ইহার কারণস্বরূপ বলা চলে যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাব, ভাষা ও সুরের কোনটার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের তৌহিদবাদী জনসাধারণের তিলমাত্র যোগ নাই। রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্য ও কৃষ্টি পূর্ব পাকিস্তানী তমদ্দুনের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ার দরুণ আমাদের আনন্দে উৎসবে সংগ্রামে শান্তিতে এবাদত বন্দেগীতে কোন অবস্থাতেই রবীন্দ্রসঙ্গীত কাজে লাগে না। উপরন্তু এই জমিদার কবির সঙ্গীতে বেদ, উপনিষদ ও প্রকৃতি-পূজার যে ভাবধারা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত পূর্ব পাকিস্তানের কোরআন, হাদীস ও তাসাউফে বিশ্বাসী জনগণের কোনদিনই চিন্তার সংযোগ সাধিত হয় নাই। পূর্ব পাকিস্তানের ঘরোয়া জীবনে, সমাজজীবনে, পুঁথিতে, গাথায়, গানে ও লোকসাহিত্যে আরবী-ফারসী মিশেল যে সহজ সরল বাংলাভাষা ব্যবহৃত হয়, রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত-ভারাক্রান্ত পশ্চিম বঙ্গের ভাষার সহিত তাহার ব্যবধান আসমান-জমীনের। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত অজস্র পৌরাণিক উপমাতেও আমাদের প্রবল আপত্তি রহিয়াছে। রবীন্দ্রসুরের বৈশিষ্ট্য বলিয়া যে একঘেয়েমিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী জনগণ এবং মেহনতি মানুষের নিকট তাহা নিতান্ত বিরক্তিকর এবং পীড়াদায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বৈপ্লবিক জীবনধারা ও পৌরুষের অভাবের দরুণ সংগ্রামী মানুষের নিকট রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোন আবেদন নাই বলিলেই চলে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পাকিস্তানের এই পূর্ব অঞ্চলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নাম-নিশানাও ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এক শ্রেণীর লোক অত্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রসঙ্গীত জনপ্রিয় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে।

সঙ্গীতক্ষেত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ সঙ্গীতের বাণী ও সুর চর্চার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে আমাদের নিজস্ব সঙ্গীত ভাণ্ডার অফুরন্ত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। ক্লাসিকাল ও লোকসঙ্গীতের বিরাট সম্ভাবনাময় যে সকল ধারা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি—সুরের বৈচিত্র্যে, বাণীর ঐশ্বর্যে এবং ভাবের গভীরতায় নিঃসন্দেহে তাহা অনবদ্য। বিজাতীয় কৃষ্টিকলা বিশেষত রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য কাঙ্গালপনাকে আমরা এজন্যে হীনমন্যতার পরিচায়ক ও নিতান্ত হাস্যকর জিনিস বলিয়া মনে করি।

কাজেই এক্ষেত্রে বেতার ও টেলিভিশনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের তমদ্দুন-বিরোধী রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে সরকার যে নয়া নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, আমাদের নিজস্ব সঙ্গীতের উৎকর্ষের জন্য তাহার প্রয়োজনীয়তা

www.nagorikpathagar.org

অনস্বীকার্য বলিয়াই আমরা তাহার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিতেছি।[৪৮]

এই ডামাডোলের মধ্যে ২ জুলাই, ১৯৬৭ দৈনিক সংবাদে "আমাদের সাংস্কৃতিক মর্যাদা ও রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক" এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে খাজা শাহাবুদ্দীনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়, "কোন্ কোন্ রবীন্দ্রসঙ্গীত পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মর্যাদার পরিপন্থী—ইহাইবা কে নির্ধারণ করিবে? এবং এই নিরিখে সকল রবীন্দ্রসঙ্গীতই যে বর্জিত হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি?...আমরা মনে করি রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্তমানে যে বিতর্ক সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অবাঞ্ছিত ও দুর্ভাগ্যজনক। সুতরাং অবিলম্বেই এই বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত।"[৪৯]

এসব বিবৃতি–যুদ্ধের মাঝখানেই ৪ জুলাই ১৯৬৭ তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে তাঁর বিবৃতির ব্যাখ্যা দিয়ে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, তাঁর বক্তব্য সংবাদপত্রে বিকৃত করে পরিবেশন করা হচ্ছে। তিনি কখনও বলেননি, সব রবীন্দ্রসঙ্গীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী। তিনি শুধু জনৈক উর্দু কবি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এটুকু বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গানও যদি পাকিস্তানী আদর্শের পরিপন্থী হয়, তবে তা রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত হবে না।[৫০]

এ সম্পর্কে ৫ জুলাই, ১৯৬৭ সংবাদ ও মর্নিং নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টটি ছিল নিম্নরূপ :

> রাওয়ালপিন্ডি, ৪ জুলাই (এপিপি)।– অদ্য জাতীয় পরিষদে তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন বলেন যে, তিনি কখনই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সকল সঙ্গীতকে পাকিস্তানের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যবিরোধী বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। তিনি বলেন যে, যদি রবি ঠাকুরের কোন গান পাকিস্তানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবোধের বিরোধী হয়, তবে সেগুলি পাকিস্তান বেতার হইতে প্রচার করা হইবে না। ...
>
> তিনি বলেন যে, ২৩ জুনের পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হইয়াছে। ঐ সংবাদের আদৌ কোন সত্যতা নাই। ...
>
> তিনি বলেন যে, বস্তুত জনাব শাহ আজিজুর রহমান এবং জনাব সোলায়মান ভারতের কোন উর্দু কবির রচনা সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে উহার উত্তরে তিনি বলেন, পাকিস্তানের আদর্শ, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির বিরোধী কোন কিছু চলিতে দেওয়া হইবে না।
>
> এই পর্যায়ে অপর একজন সদস্য জানিতে চাহেন যে, তাহার বক্তব্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় প্রযোজ্য কিনা তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়াছিলেন।[৫১]

তাঁর এই বক্তব্যের পর পত্র–পত্রিকায় এ সম্পর্কিত বাদানুবাদের অবসান ঘটে। সংবাদসহ অন্যান্য পত্র–পত্রিকায় অতঃপর এর পক্ষে বিপক্ষে আর কোন খবর ছাপা হয়নি।

এর মাস খানেক পরে ১৯৬৭ সালের ২২শে শ্রাবণ সারা দেশে বিপুল সমারোহে রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।[৫২]

www.nagorikpathagar.org

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, এসব বাদানুবাদ সত্ত্বেও পাকিস্তান বেতারকেন্দ্র থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার একদিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি।[৫৩]

৪. পূর্ব বঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা

আসলে ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রচর্চার যে ধারা বহমান ছিল, সে ধারা পরবর্তীকালে ক্রমে অধিক মাত্রায় বিকশিত হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দেশে শত শত খ্যাতিমান রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বেরিয়ে আসেন। গ্রামে-গঞ্জে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন পাঠ্য তালিকায় ছিলেন তেমনিই থাকেন। রবীন্দ্রচর্চা বাংলাদেশে বৃদ্ধিই পায়। পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আপন মহিমায় ভাস্বর। তবে উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক বিতর্কে বরং রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে-বিপক্ষে উত্তেজনা প্রকাশই প্রবল হয়ে উঠেছিল।

৫. উপসংহার

আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে এ ধরনের বিতর্ক নতুন নয়। কখনও কখনও সরকারী মদতে, কিংবা প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়েও এরকম অর্থহীন বিতর্ক চলে মূল সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে নেবার জন্য। পূর্ব বাংলায় তখনকার রবীন্দ্র-বিতর্কও তেমনি একটি ঘটনা ছিল কি-না ভেবে দেখা দরকার। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক একটি সঙ্গত প্রশ্নই উত্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্নে এই-যে দীর্ঘকালের বিতর্ক, এর দ্বারা কি আমাদের চিন্তাশক্তি ও অনুভূতি পরিপুষ্ট হয়েছে? বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে? সংস্কৃতি উন্নত হয়েছে? জাতীয় জীবনে সম্ভাবনার কোনো দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে?'[৫৪] অথচ, 'পাঠ্যপুস্তকে প্রথম শ্রেণী কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে হয়। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাঙলা অনার্সের ও এম, এ, শ্রেণীর সিলেবাসে রবীন্দ্র-রচনাবলী হয়তো পশ্চিম বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় বেশ একটু বেশি জায়গাই নিয়ে আছে।'[৫৫]

তিনি লিখেছেন, "১৯৮০ সনে বইয়ের খবর নামক একট সাময়িকপত্রে নিলুফার বেগম 'বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা (১৯৪৭-৭১)' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে পাকিস্তানকালে এদেশে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক ৬ জন লেখকের ৬টি গ্রন্থের এবং ১১০ জন লেখকের ১৪৯ টি প্রবন্ধের তালিকা প্রকাশ করেন। আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক রচনাবলীর তালিকা প্রণয়নের এটিই প্রথম প্রয়াস। এই ধারায় ১৯৮৬ সনে বাংলা একাডেমী থেকে মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বাংলাদেশে বরীন্দ্রচর্চা : গ্রন্থপঞ্জি' নামক একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে... ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সনের মধ্যে এদেশে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক ১৩টি গ্রন্থের এবং ৫৫২ টি প্রবন্ধের উল্লেখ রয়েছে। ১৯৪৭ থেকে

www.nagorikpathagar.org

১৯৮৬ সন পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূখণ্ডে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ১৩২৯টি প্রবন্ধের নাম উৎস-নির্দেশ সহ এ গ্রন্থে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আরও অনুসন্ধান চালালে এই সংখ্যা হয়তো ক্রমে বড় হবে।'[৫৬]

আবুল কাসেম ফজলুল হক এ প্রসঙ্গে তার 'বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা' প্রবন্ধে আরও লিখেছেন :

> আমাদের দেশে রবীন্দ্রচর্চার সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিকশিত প্রবণতাগুলো কোনো-না-কোনো প্রকার উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অন্তর্গত। স্থিতধী প্রয়াসের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মর্মগত পার্থক্য থাকে। স্থিতধী সৃজনপ্রয়াসী কর্মের বিচার যেমন সরলভাবে করা যায়, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিচার তেমন সরলভাবে করা যায় না।
>
> তা-ছাড়া আরও নানা রকম রহস্যজনক ব্যাপার আছে। একটু অনুসন্ধানে অগ্রসর হলেই আমাদের দেশে সমাজের উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর অনেক লোকের এমন সব আচরণের সাক্ষাত পাই—রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও এমন সব ক্রিয়াকলাপের মুখোমুখী আমরা হই, যেগুলোর কোনো বৌদ্ধিক বা যৌক্তিক কারণ আমরা খুঁজে পাই না। অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশরূপ ও মর্মবস্তুর মধ্যে সীমাতিরিক্ত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার বৈশিষ্ট্য-বিচার ও স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন অত্যন্ত কঠিন কাজ। পাকিস্তানকালে যাঁরা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে কিংবা বিবৃতি দিয়ে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের কিংবা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলে রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের দাবি তুলেছেন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সকলের আগে তাঁদেরই কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে মহিমান্বিত করে বই লিখেছেন।
>
> আসলে আমাদের বুদ্ধিবাদী ঐতিহ্য নিতান্তই দুর্বল। বুদ্ধিকে অন্ধবিশ্বাস থেকে আলাদা করে, আবেগ-উত্তাপ থেকে আলাদা করে, মান-অভিমান, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও কামনা-বাসনা থেকে আলাদা করে, ধূর্ততা-চতুরতা-ভাওতা-প্রতারণা থেকে আলাদা করে কখনও আমরা স্বরূপে বুঝতে চাই না। সাধারণত ধূর্ততা, চতুরতা, ভাওতা, প্রতারণা, সুবিধাবাদ ইত্যাদিকেই আমরা বুদ্ধির ব্যাপার বলে মনে করি, বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পর্যন্ত হই না। আমাদের উপলব্ধি করা দরকার যে, বুদ্ধির সাহায্যে যা সম্ভব, ধূর্ততা চতুরতা ভাওতা প্রতারণা ঘৃণা বিদ্বেষ ক্রোধ উত্তেজনা ও অস্থিরচিত্ততা দ্বারা কস্মিনকালেও তা সম্ভব নয়। দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য এসব ক্ষেত্রে মহান আবিষ্কার-উদ্ভাবন বুদ্ধির অনুশীলন ব্যতিরেকে কি সম্ভব?[৫৭]

আসলে তা সম্ভব নয় বলেই পূর্ব বাংলার রবীন্দ্র-বিতর্ক স্বাধীন বাংলাদেশে কোন সামাজিক-সাংস্কৃতিক জাগরণ সৃষ্টি করতে পারেনি।

www.nagorikpathagar.org

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের বিরোধিতা করে সে সময় প্রধানত আজাদ পত্রিকায় বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে এবং আজাদের ঐসব বক্তব্যের বিরোধিতা করে ইত্তেফাক ও সংবাদে মতামত প্রকাশিত হয়েছে। এই সময় আজাদ এবং ইত্তেফাক পত্রিকা অনুসন্ধানে দেখা যায়, আজাদে প্রকাশিত বক্তব্য ছিল নিতান্তই পূর্ব-ধারণাপ্রসূত এবং যুক্তিহীন। আজাদ-এর বক্তব্য কারও মনে আবেদন সৃষ্টি করার মতো বলেও মনে হয় না। অপরদিকে ইত্তেফাক ও সংবাদে প্রকাশিত মতামতের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যেন, অনেক ক্ষেত্রে গায়ে পড়ে বিবাদ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তখনকার পরিস্থিতিতে আজাদ পত্রিকা যে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ধারার প্রতিনিধিত্ব করত, ইত্তেফাক ও সংবাদ তার বিরোধী ধারার প্রতিনিধিত্ব করত। আজাদ চেষ্টা করত সংহত পাকিস্তানী সংস্কৃতি ও পাকিস্তানী জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করতে, আর ইত্তেফাক ও সংবাদ মনে করত, পাকিস্তান একাধিক জাতি নিয়ে গঠিত রাষ্ট্র। এখানে বাঙালীদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে শক্তিশালী করাই ছিল এই দুই পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য। আজাদ সেকালে ভারত ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে উৎসাহের সঙ্গে প্রচার চালাত। ইত্তেফাক ও সংবাদ ভারতের প্রতি উদার মনোভাব প্রদর্শন করত। সংবাদ ওই সময়ে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে সমর্থন করত। ইত্তেফাক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধিতা করত।

যাই হোক, সামগ্রিক বিচারে দেখা যায়, পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র-বিতর্ক ছিল নিতান্তই কৃত্রিম এবং প্রায় ভিত্তিহীন। ফলে খাজা শাহাবুদ্দীনের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে এই বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তথ্যনির্দেশ

১. Census of Pakistan, 1951, Vol. 3. p. 102.

২. সৈয়দ আলী আহসান, *পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা*, মাহেনও, আগস্ট ১৯৫১, পৃ ৫৩-৫৪

৩. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ ১৭৭

৪. পূর্বোক্ত, পৃ, ২১৩-২১৬

৫. দৈনিক আজাদ, ১ বৈশাখ, ১৩৬৮

৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ১ বৈশাখ, ১৩৬৮

৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ এপ্রিল, ১৯৬১

৮. দৈনিক আজাদ, ১২ বৈশাখ, ১৩৬৮

৯. আহবাব চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী*, দৈনিক আজাদ, ১২ বৈশাখ, ১৩৬৮

১০. দৈনিক আজাদ, ১৪ বৈশাখ, ১৩৬৮

www.nagorikpathagar.org

১১. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ বৈশাখ, ১৩৬৮
১২. দৈনিক আজাদ, ২৫-৪-১৯৬১
১৩. পূর্বোক্ত, ২৬-৪-১৯৬১
১৪. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ ৮১
১৫. দৈনিক আজাদ, ০৮-০৫-১৯৬১
১৬. দৈনিক আজাদ, মার্চ ২৯, এপ্রিল ২৩-২৪, মে ৮, ১৯৬১
১৭. সাঈদ-উর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ৮১
১৮. দৈনিক আজাদ, ২৩-০৪-১৯৬১
১৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪-০৪-১৯৬১
২০. শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশে রবীন্দ্র-বিতর্ক ও তার কিছু টীকা-ভাষ্য*, উত্তরাধিকার, শহীদ দিবস সংখ্যা, ১৯৭৪, পৃ ২৬৭
২১. দৈনিক আজাদ, ০৮-০৫-১৯৬১
২২. মাসিক সমকাল, বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ ৬৭৬
২৩ দৈনিক আজাদ, ১০-০৩-১৯৬১
২৪. দৈনিক সংবাদ, ৩ বৈশাখ, ১৩৬৮
২৫. The Pakistan Observer, May 9, 1961.
২৬. পূর্বোক্ত
২৭. গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ ২৩৩
২৮. পূর্বোক্ত
২৯. The Pakistan Observer / Dawn (Karachi), June 23, 1967.
৩০. দৈনিক পাকিস্তান, ২৪-০৬-১৯৬৭
৩১. The Pakistan Observer, June 28, 1967
৩২. The Morning News, June 28, 1967
৩৩. Dawn, June 23-July 3, 1967
৩৪. The Morning News, July 4, 1967
৩৫. The Pakistan Observer, July 27, 1967
৩৬. The Pakistan Observer, July 3, 1967
৩৭. The Pakistan Observer, July 2, 1967
৩৮. The Pakistan Observer, June 30, 1967
৩৯. পূর্বোক্ত
৪০. দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ জুন, ১৯৬৭
৪১. সংবাদ, ৩০ জুন, ১৯৬৭

www.nagorikpathagar.org

৪২. The Pakistan Observer, July 3, 1967

৪৩. সংবাদ, ১ জুলাই, ১৯৬৭

৪৪. গোলাম মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ ২৪৫

৪৫. পূর্বোক্ত

৪৬. দৈনিক পাকিস্তান, ২৯ জুন, ১৯৬৭

৪৭. The Pakistan Observer, June 25, 1967

৪৮. দৈনিক পাকিস্তান, ২৯ জুন, ১৯৬৭

৪৯. দৈনিক সংবাদ, ২ জুলাই, ১৯৬৭

৫০. পয়গাম, ৫ জুলাই, ১৯৬৭

৫১. The Morning News / সংবাদ, ৫ জুলাই, ১৯৬৭

৫২. সাঈদ-উর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৭

৫৩. দৈনিক পাকিস্তান, (বেতার অনুষ্ঠানসূচী) ২৩-২৬ জুন, ১৯৬৭

৫৪. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ ১৮০

৫৫. ঐ, পৃ ১৭৪

৫৬. ঐ, পৃ ১৮০

৫৭. ঐ, পৃ ১৭৫

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

উপসংহার

১. ইতিহাসচেতনা ও সংস্কৃতি

যে-কোন দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা দু'ভাবে বিকশিত হতে পারে : এক. স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং দুই. সুচিন্তিত প্রয়াসে। স্বতঃস্ফূর্ত কর্মকাণ্ডে যে তীব্র গতির সঞ্চার হয়, তাতে অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তি ভেসে যায় আবেগের তোড়ে। ফলে এসব আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত ফাঁক থেকে যায়, যা ধরা পড়তে সময় লাগে। কিন্তু সুচিন্তিত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সে ফাঁক পূর্ব পরিকল্পনামাফিক পূরণ করে নেয়া যায়।

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যারা দ্বিতীয় ধারার কর্মী, তাঁরা অতীত ইতিহাসের আলোকে বর্তমানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ নির্মাণে প্রয়াসী হন। এই ধারায় যে সুস্থ ও সুস্থ সমাজ নির্মাণ সম্ভব, অন্য কোনভাবে তা সম্ভব নয়। ইতিহাসচেতনা সংস্কৃতিচেতনারই অংশ।

সেজন্য জাতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন সুগভীর ইতিহাসচেতনা। পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক প্রয়াসের ক্ষেত্রে গোড়ার দিকে যে ইতিহাসচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়, শেষ দিকে ক্রমান্বয়ে তার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ফলে জনজোয়ারের অগ্রসরতার ধারায় সুচিন্তিত প্রয়াস হ্রাস পেয়েছে। সে ধারা বাংলাদেশ পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসচেতনা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিই মানুষকে নতুন সৃষ্টি প্রয়াসে ও বর্তমানের সঙ্কট দূরীকরণে প্রেরণা যোগায়। ইতিহাসচেতনার অভাব ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার অনুপস্থিতি সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা।

পাকিস্তানকালে প্রথম পর্যায়ে প্রবল ছিল পাকিস্তানবাদী চেতনা। কিন্তু চব্বিশ বছরের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এবং তীব্র আবেগের ধারায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে নতুন ইতিহাসচেতনা ও সংস্কৃতিচেতনা নিয়ে। এই নতুন চেতনার মধ্যে বহু নতুন উপাদানের সমাবেশ ঘটে; তবে তাতে স্বতঃস্ফূর্ততা প্রবল হয়ে ওঠে।

২. পাকিস্তান আন্দোলনের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি

১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ কনফারেন্সে ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাব (লাহোর প্রস্তাব) উত্থাপনের পর থেকেই উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র আবাসভূমির আকাঙ্ক্ষা জোরদার হয়ে ওঠে।

নানা ঐতিহাসিক কারণে এদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎবর্তী ছিল। ইংরেজ আমলের শেষ পর্যায়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীতে এই পশ্চাৎবর্তিতা সম্পর্কে তীব্র সচেতনতা জাগে। তখন তাদের উপলব্ধিতে আসে যে শিক্ষাদীক্ষা, কর্মক্ষেত্র, প্রশাসন,

www.nagorikpathagar.org

জমিদারী প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বাঙালী মুসলমানগণ পশ্চাৎবর্তী। তখন এই পশ্চাৎবর্তিতা কাটিয়ে ওঠার জন্য তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে।

বাঙলায় মুসলমান সমাজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ১৮৭১ সালের প্রথম লোকগণনায় পূর্ব বঙ্গের জেলাগুলিতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৪.৮ ভাগ।[১] ১৯০১ সালে এর শতকরা হার দাঁড়ায় ৬৬, ১৯১১ সালে ৬৭.১৯, ১৯২১ সালে ৬৮.১, ১৯৩১ সালে ৬৯.৪৯ এবং ১৯৪১ সালে ৭০.২৬।[২] ১৯৫১ সালে এ হার দাঁড়ায় ৭৬.৮৫ এবং ১৯৬১ সালে দাঁড়ায় ৮০.৪৩।[৩] কিন্তু সংখ্যায় গরিষ্ঠ হলেও শিক্ষা-দীক্ষা চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত নগণ্য। ফলে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের পর স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের আকাঙ্খায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২০-এর দশক থেকেই অবশ্য বাঙালী মুসলিম সমাজে আধুনিকতার ও নবচেতনার পরিচয় স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে।

এদেশে ইসলাম প্রচারের সূচনা অষ্টম শতকে। কিন্তু ব্যাপকভাবে এখানকার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দ্বাদশ শতক থেকে। ফলে প্রায় আট শ' বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করলেও, ধর্মীয় কারণেই তাদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য বজায় থাকে। মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য জোরদার করার সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয় পাকিস্তান প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্যচেতনা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিকশিত হতে থাকে অনেক আগে থেকে। তবে বাংলার মুসলমান সমাজে হিন্দু-মুসলিম মিলিত সাধনার সমন্বয়বাদী ধারাও শক্তিশালী ছিল। বাংলার মুসলিম রাজনীতিবিদদের মধ্যে এ কে ফজলুল হক, এইচ এস সোহরাওয়ার্দি, আবুল হাশিম, মওলানা ভাসানী প্রমুখের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমন্বয়বাদী চেতনা মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়েছে। লেখকদের মধ্যে এস ওয়াজেদ আলি, কবি নজরুল ইসলাম, কবি জসীম উদ্‌দীন, হুমায়ূন কবির, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ভাবুকদের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল সমন্বয়বাদী। পাকিস্তান আন্দোলনের কালে সমন্বয়বাদী ধারার উপর স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারা অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং ১৯৪০-এর দশকে তারাই জয়ী হয়। কিন্তু পাকিস্তানের ২৪ বছরে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি বদলে যায় এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় থেকে স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা আবার প্রবল হতে থাকে।

৩. পাকিস্তানকালে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Political Culture) নতুন রূপ লাভ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্বকারী একমাত্র রাজনৈতিক দল ছিল মুসলিম লীগ। ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু '৪৭ সালের পরবর্তীকালে এদেশে বিরোধী দলীয় রাজনীতির ধারা অনুপস্থিত

www.nagorikpathagar.org

ছিল কিছুকাল। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এদেশে রাজনীতি ক্ষেত্রে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়, তারাই বলতে গেলে প্রথম সুসংগঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দল। তখনও দৃশ্যত দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই চালু ছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে সরকারী দল এবং বিরোধী দল, কারও গণতান্ত্রিক নিয়ম-নীতি, আচার-আচরণ ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ফলে এদেশের রাজনৈতিক-সংস্কৃতিতে কোন নতুন গতি অর্জিত হয়নি। পাশাপাশি পূর্ব-বঙ্গভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোন দল জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে ততোটা সচেতনও ছিল না। তবে স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক কর্মধারা ছিল।

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করার পর গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চাই পুনরায় রুদ্ধ হয়ে যায়। তারপর কনভেনশন মুসলিম লীগের মাধ্যমে তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রের নামে আইয়ুব খান সরকারী ধারার রাজনীতি চালু করেন।

১৯৬২ সালে এসে পূর্ব বাংলায় প্রায় সব রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবিত হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক আচরণ বিধিতে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল ও সরকারী দলের আচার-আচরণে যে স্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার কথা, আইয়ুব আমলে তা অর্জিত হয়নি।

এরপর ঘটে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান। তারপর ১৯৭০-এর নির্বাচন। এই দুই পর্যায়ের কোথায়ও স্বতঃস্ফূর্ততা অতিক্রম করে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকশিত হবার পথ পায়নি। ফলে রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের শুরুতে পূর্ব বাংলা (এবং পশ্চিম পাকিস্তানও) যে অবস্থায় ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের সংযোজন ছাড়া তার কোন পরিবর্তন ঘটেনি পাকিস্তান শাসনের শেষে এসেও। তবে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই রাজনীতি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পরিবেশ সমাজের আশানুরূপ বিকাশের পথে অন্তরায় হয়েই থেকেছে। স্বতঃস্ফূর্ততা শক্তি ও দুর্বলতা এই কালে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ও সংস্কৃতিতে ঘনীভূত রূপ লাভ করেছে।

৪. পূর্ব বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

পাকিস্তানকালে (১৯৪৭-১৯৭১) আমাদের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই পরিবর্তন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে, তেমনি ঘটেছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও। মানুষের মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে অনেক। এখানে বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি এসব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মূল্যমানেও হেরফের হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

দেশের সংস্কৃতিসেবীদের কেউ কেউ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ছিলেন খুবই নিবেদিতপ্রাণ। কেউ কেউ আবার কাজ করেছেন দায়সারা গোছের। তারপরও পাকিস্তান-পর্বে পূর্ব বাংলায় বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড একটি প্রধান ধারায়ই অগ্রসর হয়েছে; আমরা যাকে বলতে পারি, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য জোরদারের প্রয়াস।

কোন জাতির স্বাধীনতার চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পেছনে সেই জাতির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সংগ্রামী তৎপরতা যেমন বিরাট ভূমিকা পালন করে, তেমনি তাতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জাতির মন-মননের বিকাশ এবং অভিন্ন জীবনচেতনাকেও সুসংবদ্ধ করে তার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।

একটি জাতি হিসাবে বাংলাদেশের মানুষের সহস্রাধিক বৎসরের ধারাবাহিক লিখিত ইতিহাস থাকলেও স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা দৃঢ়তর হয়েছে ও তার পরিপুষ্টি ঘটেছে পাকিস্তান আমলেই।

পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান শাসনামলের শুরু ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট, শেষ ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর। এই ২৪ বছরে পূর্ব বাংলার মানুষের মন-মানসিকতা, জীবনবোধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

১৯৪৬ সালে পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন। সেখানেও তারা আশা করেছিলেন যে, তাদের নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ও জাতিসত্তার বিকাশ পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে সহজ হবে। এদেশের সাধারণ মানুষ ভেবেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে পূর্ব বাংলার মানুষের সংস্কৃতিগত সাযুজ্য না থাকলেও, ধর্মীয় সাযুজ্য অভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। তাই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। তখন হিন্দু-বিরোধী, ভারত-বিরোধী মনোভাবও ছিল বেশ প্রবল। একইভাবে তা প্রযোজ্য ছিল ভারতের ক্ষেত্রেও। সেখানে ছিল মুসলিম-বিরোধী ও পাকিস্তান-বিরোধী মনোভাব। ওই সময় পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনাচরণে ধর্মচেতনার প্রাবল্য ছিল লক্ষ্যণীয়। এর পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষভাবে পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য চেতনার বিকাশধারাও ছিল, আর উদীয়মান রূপে প্রবাহিত ছিল মার্কসবাদী চেতনা। ওই ধর্মীয় কিংবা মুসলিম স্বাতন্ত্র্যচেতনাই ছিল পূর্ব-বাংলায় পাকিস্তানবাদিতার মূল।

তখনও পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজে পর্দা প্রথা প্রবল ছিল। ঘোড়ার গাড়িতে পর্দা টানিয়ে মুসলমান নারীরা রাস্তায় চলাফেরা করতেন, হেঁটে চললে বোরখা পরতেন। বেতারে যে দু'একজন গান গাইতেন, তাঁরাও বেতার-কেন্দ্রে যেতেন পর্দাঘেরা গাড়িতে, গান গাইতেন পর্দার আড়াল থেকে। মঞ্চে মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন পুরুষ-শিল্পীরাই। আর মেয়েদের নাটকে মেয়েরাই সাজতেন পুরুষ নট।

www.nagorikpathagar.org

পূর্ব বাংলার সমাজে তখনও সামন্ত শাসনের চিহ্ন মুছে যায়নি, জমিদারী প্রথা তখন বিলুপ্তির মুখে। পূর্ব বাংলার অর্থনীতি তখনও পুরোপুরি কৃষিনির্ভর, প্রশাসন ব্যবস্থাও ছিল ক্ষুদ্র। সে রকম একটি সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ছিল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও।

তখন ধর্মকে উপেক্ষা করে কিংবা মানুষের ধর্মীয় বোধ ও আচার-আচরণকে পাশ কাটিয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালানোও দুরূহ ব্যাপার ছিল। তখনও এদেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষতার ও মার্কসবাদের যে ক্ষীণ ধারা ছিল, তা সমাজে খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

তাছাড়া পাকিস্তান শাসনামলের শুরুর দিকে এদেশে শিক্ষিত জনসমষ্টি ছিল ক্ষুদ্র, দশ শতাংশের মত। শিক্ষাবঞ্চিত এই জনশ্রেণীর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ কিংবা মার্কসবাদী রাজনীতি-সংস্কৃতির শিকড় প্রোথিত করা সহজসাধ্য ছিল না। কারণ ওই সময়ে বিজ্ঞানমনস্কতার চেয়ে সংস্কার ছিল প্রবল। তবে তাতে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনও সূচিত হতে থাকে। ক্রমে মানুষের কৌতূহল দেখা দেয় বিচিত্র বিষয়ে।

পাকিস্তানী শাসনের ২৪ বছরে পূর্ব বাংলার সমাজে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মানুষের জীবনাচরণ, অভ্যাস, আচার-রুচি ও পোষাক-পরিচ্ছদে এসেছে পরিবর্তন। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটেছে, জমিদারী প্রথার অবসান ঘটেছে, দেশে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। তা শতকরা হারে নগণ্য হলেও, সংখ্যার বিচারে নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য নয়। কারণ জনসংখ্যা বেড়েছে দ্রুত। শিক্ষিতের হার বেড়েছে বৈ কমেনি। ফলে একটি নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়েছে। সমাজের ভেতরে পরিবর্তন হয়েছে ত্বরান্বিত ।

এ কারণেই পাকিস্তান শাসনামলের শেষ দিকে এসে দেখা গেল পর্দা প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদী ধারার পরিবর্তন হয়েছে, তার স্থলে পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র বাঙালী ধারা প্রবল হয়েছে। ধর্মীয় চেতনার ধারা ক্ষীণতর হয়ে এসেছে। একই সঙ্গে দেখা গেল, কুসংস্কার উঠে গেছে বহুলাংশে, নাটকে সঙ্গীতে চলচ্চিত্রে এসে গেছেন বিপুল সংখ্যক মহিলা শিল্পী, যা নিয়ে তেমন কোন সামাজিক সঙ্কটের সৃষ্টি হচ্ছে না। বদলে গেছে পুরানো মূল্যবোধ। যন্ত্র সভ্যতার বিকাশ এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন মানুষের মন-মননেও পরিবর্তন এনেছে।

মানুষের মূল্যবোধে এই পরিবর্তন যে শুধুমাত্র যোগাযোগ ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্যই ঘটেছে তা নয়, এর পেছনে কাজ করেছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়।

বাংলাদেশের সমাজে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পাশাপাশি মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনারও বিকাশ ঘটে। নতুন এই উদার ও সংস্কারমুক্ত আদর্শ বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত তরুণকে আকৃষ্ট করে। তারা সভা-সমিতি-মিছিল-সঙ্গীতের আয়োজন করে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তা প্রচার করে মূল্যবোধের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেন।

www.nagorikpathagar.org

তেমনিভাবে স্বাধীন পাকিস্তানে জমিদারী প্রথা অবসানের পর চাকরিনির্ভর পুঁজি-প্রধান নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হতে থাকে। তাদের মধ্যে মন-মননের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। ফলে শিক্ষিত পুঁজি-প্রধান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংস্কৃতিচর্চা ও জীবনাচরণে দেখা দেয় পরিবর্তন, আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল হয়ে ওঠে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনাও গড়ে উঠতে শুরু করে।

সমাজের ভেতরে এই মৌলিক পরিবর্তনের ধারা আমাদের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। সে প্রেক্ষাপটেই আমাদের সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতা লক্ষ্যগোচর হয়।

৫. পাকিস্তানকালে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল কালপর্বে পূর্ব বাংলায় সক্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন ও এখানকার সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও আন্দোলনে প্রধানত তিনটি ধারা লক্ষ্যণীয়।

এক. পাকিস্তানবাদী ইসলামী ধারা।

দুই. পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্যচেতনা ভিত্তিক মধ্যপন্থী ধারা।

তিন. সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসবাদী ধারা।

পাকিস্তানবাদী ইসলামী ধারায় যে সকল সাংস্কৃতিক কর্মী কাজ করেছেন, তাদের অনেকে একই সঙ্গে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং মুসলিম লীগেরও কর্মী ছিলেন। মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় তারা পাকিস্তানী জাতীয়তা, পাকিস্তানী ভাষা এবং অভিন্ন পাকিস্তানী সংস্কৃতি নির্মাণে আত্মনিবেদন করেন। এর জন্য তারা পূর্ব বাংলার মানুষের ইতিহাস ঐতিহ্যের দিকে অনেকটা মুখ ফিরিয়ে কেবল ধর্মকে অবলম্বন করার প্রয়াস পান। ফলে তারা ক্রমান্বয়ে এদেশের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

কার্যত এদেশের সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশী, তারা হলেন পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্যচেতনাভিত্তিক মধ্যপন্থী মানবতাবাদী ধারার অনুসারী। এরা প্রথম থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীর শোষণ ও বঞ্চনা নীতির দরুণ পাকিস্তানের অখণ্ডতার ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। সেই সঙ্গে তারা আমাদের রাজনীতি-সংস্কৃতি থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে চাননি। কেননা প্রায় সহস্র বছর ধরে বাংলার দুই অংশের ধর্মীয়, প্রাকৃতিক ও সামাজিক ব্যবধান দুই অংশের মানুষকে যে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, তা ঐতিহাসিক সত্য। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মধ্যপন্থীরা এই স্বাতন্ত্র্য মেনে নিয়েই অগ্রসর হয়েছেন। স্বাধীন বাংলাদেশেও সে ধর্মীয় চেতনা অবলুপ্ত হয়নি; যেভাবে ধর্মীয় চেতনার অবলুপ্তি ঘটানো সম্ভব হয়নি সোভিয়েট ইউনিয়নে সত্তর বছরের কম্যুনিষ্ট শাসনের পরও। অর্থাৎ জাতিসত্তা নির্মাণে ধর্ম আধুনিক বিশ্বেও একটি প্রধানতম উপাদান হিসাবে রয়ে গেছে। পূর্ব

www.nagorikpathagar.org

বাংলার স্বতন্ত্র ধারার অনুসারী মধ্যপন্থীরা সে কথা মনে রেখেই কাজ করে গেছেন। তারা বাঙালী মুসলমানের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিকাশে ইসলামকে বাদ দিয়ে চিন্তা করেননি। তাদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হয়নি।

তাছাড়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এখানে সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসবাদী রাজনীতি ও সংস্কৃতির ধারা জারি ছিল। কিন্তু রাজনীতিতে বা সংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব কখনও বড় হয়ে ওঠেনি। তার কারণ সম্ভবত এই যে, এদেশের বামপন্থী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মীরা কখনও এই জনপদের মানুষের শেকড় সন্ধান করতে চাননি। ফলে নিজস্ব ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী পূর্ব বাংলার মানুষ কখনও বামপন্থীদের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারেননি। বামপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মার্কসবাদের প্রতি অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামি ছিল আর ছিল মস্কো কিংবা পিকিং-এর অন্ধ অনুকরণের প্রবণতা—যা এদেশের মানুষ পছন্দ করেনি। কিন্তু বামপন্থীদের এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, নানা রকম কুসংস্কার দূরীকরণে, শিল্প-সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে নতুন ধারার সূচনায় তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

৬. পাকিস্তানবাদী ইসলামী ধারা

পাকিস্তানবাদী সাংস্কৃতিক ধারা বলতে বোঝানো হয়েছে সেই ধরনের সাংস্কৃতিক প্রবণতাকে যা গোটা পাকিস্তানের সকল জাতিসত্তাকে একটি পাকিস্তানী জাতিসত্তায় পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছে। এর প্রবক্তারা পাকিস্তানের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি-গোষ্ঠীর সকল ভাষা-সাহিত্য-ঐতিহ্যে নিরপেক্ষ ইসলাম ধর্ম এবং উর্দু ভাষার ভিত্তিতে একটি কৃত্রিম 'পাকিস্তানী জাতি' সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ 'পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ' সৃষ্টির লক্ষ্যে পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড শুরু করেন। সে উদ্যোগে তারা যেমন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তেমনি পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখে, বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে তাদের লক্ষ্য হাসিলের প্রয়াস পান। সে প্রয়াসে সাংগঠনিক তৎপরতার চেয়ে তারা প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতায় লিপ্ত ছিলেন বেশী। অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এরা সবাই গুরুত্বপূর্ণ সরকারী-বেসরকারী চাকরি-বাকরির সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন।

পরবর্তীকালে পাকিস্তান লেখক সংঘ (১৯৫৯) ও পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা (১৯৬২) সুকৌশলে পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতির ধারা এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তবে এই ধারায় ভিন্ন চেতনার লোকেরাও জড়িত ছিলেন। সরকারী উদ্যোগে ও সাহায্যে সংস্থা দুটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সফল হননি। কেননা, ততদিনে পূর্ব বাংলার মানুষের মন-মানসিকতার পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে ব্যাপকভাবে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানী জাতীয়তায় বিশ্বাসী সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতিকর্মীরা তাদের আদর্শ ও লক্ষ্য বিস্তারের জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ঃ

এক. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন ১৯৪৮,

দুই. পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন চট্টগ্রাম ১৯৫৮।

এই দুটি সম্মেলনেই তারা পাকিস্তানী সংস্কৃতি, পাকিস্তানী সাহিত্যের ভাষা, মুসলিম স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি বিষয়ের ওপর তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

তমদ্দুন মজলিস ও নজরুল একাডেমী এই ধারার সংগঠন। তবে তমদ্দুন মজলিস পাকিস্তান কাঠামোর ভেতরে ইসলামী ধারায় পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেয়েছিল। এরাই ১৯৫২ সালে ঢাকায় ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং ১৯৫৭ সালে ঢাকায় সিপাহী বিপ্লবী শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৯৪৮-৫২ পর্বে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

তবে নিজস্ব মতাদর্শ-ভিত্তিক সাহিত্য-সংস্কৃতি সৃজনপ্রয়াসে পাকিস্তানবাদী ইসলামী ধারার কারও কারও প্রধান কাজ ছিল বাংলা ভাষা সংস্কার প্রচেষ্টা ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির উদ্যোগ। তাদের ধারণা ছিল, লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা ধরনের একটি ভাষা ও অভিন্ন লিপি তৈরি করতে পারলে পাকিস্তানের সংহতি দৃঢ়তর হবে এবং রাষ্ট্র পর্যায়ে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সময়ে তারা রোমান কিংবা আরবী হরফে বাংলা ভাষা লেখার ব্যাপারে তৎপরতা চালান। পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির স্বার্থে তাঁরা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কে সরকারী উৎসাহ প্রদানেরও দাবী করেছিলেন। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তারা এই উদ্যোগ জারী রাখেন। এ ছাড়া তারা নিয়মিত পত্রপত্রিকায় লিখেও তাদের মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে উদ্যোগ সফল হয়নি। সফল হতে পারেনি এই কারণে যে, তারা মানুষের প্রবণতা বিবেচনা না করে এসকল বিষয় পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর যান্ত্রিকভাবে চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। পূর্ব বাংলার মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

৭. পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্যচেতনা ভিত্তিক মধ্যপন্থী মানবতাবাদী ধারা

এই ধারার প্রথম সংগঠন পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। এই ধারার কর্মীরা ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে ১৯৫২ সালে কুমিল্লায় এবং ১৯৫৭ সালে কাগমারী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন করে। এদের মধ্যে সমন্বয়বাদী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী উভয় ধারার ব্যক্তিবর্গ সহাবস্থান করেছেন। তবে সমন্বয়বাদীরা ছিলেন সংখ্যায় অনেক বড়।

এই ধারার সংস্কৃতি কর্মীরা পত্র-পত্রিকায় লিখে এবং বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

www.nagorikpathagar.org

৮. বামপন্থী ধারা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এদেশে কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ও মার্কস্‌বাদী রাজনীতির ধারা কখনও একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়নি। এই ধারার সংগঠন সংস্কৃতি সংসদ ও ছায়ানট। এই ধারার কর্মীদের উদ্যোগে সম্মেলন হয়েছিল ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে এবং ১৯৫২ সালে কুমিল্লায়। সমাজতান্ত্রিক ধারার সাংস্কৃতিক কর্মীদের অনেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলে, বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে যোগ দিয়ে তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখেন। এদের ছোট ছোট সংগঠন ছিল ক্রান্তি, উন্মেষ ও সৃজনী। আবার একই ব্যক্তি কখনও কখনও এক সংগঠন বদলে ভিন্ন সংগঠনে যোগ দিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখেন। সেখানে কখনও তারা যোগ দেন মধ্যপন্থীদের সঙ্গে, কখনও বা নিজেরাই আয়োজন করেন সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনের।

বাম ধারার প্রথম সাংস্কৃতিক সংগঠন সংস্কৃতি সংসদ (১৯৫১)। সংস্কৃতি সংসদ প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- কেন্দ্রিক থাকলেও তারা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির পাশাপাশি কুসংস্কার দূর করে আধুনিক ও সুরুচিসম্পন্ন সংস্কৃতির ধারা সৃষ্টি করেন। এই সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট হয় বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী। ১৯৫২ সালে এরাই গড়ে তোলেন পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। এদেরই কেউ কেউ আবার ১৯৬১ সালে গঠন করেন ছায়ানট। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডেও পূর্ব-বাংলার স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় বিকশিত করে তোলার প্রয়াস লাভ করা যায়।

বামপন্থীদের উদ্যোগে যেসব সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন চট্টগ্রাম ১৯৫১, পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন কুমিল্লা ১৯৫২, কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন টাঙ্গাইল ১৯৫৭। প্রধানত এদের নেতৃত্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ১৯৬৩ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের আয়োজন করে।

বামপন্থী ধারার সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে আবার অনেকে কাজ করেন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান লেখক সংঘে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। ধারণা করা যায়, রাজনৈতিক আদর্শ বিস্তারে ব্যর্থ হয়ে এদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ব্যক্তিগত লাভালাভের ব্যাপারে অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েন।

এছাড়া বামপন্থী ধারার লেখকদের মধ্যে অনেকেই অখণ্ড বাংলার ভাবধারায় 'বাঙালী' চেতনার অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার সমাজে তারা সুদূরপ্রসারী গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।

www.nagorikpathagar.org

৯. ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মান

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যে-সকল সাংস্কৃতিক সংগঠন পূর্ব বাংলায় কাজ করেছে, তাদের সাংগঠনিক দিকটিও বিশেষভাবে বিবেচ্য। পূর্ব বাংলার প্রথম সাংস্কৃতিক সংগঠন তমদ্দুন মজলিস (১৯৪৭)। তমদ্দুন মজলিসের নেতৃত্বে যারা ছিলেন, তারা সংগঠনের ব্যাপারে ছিলেন যথেষ্ট নিষ্ঠাবান ও সচেতন। তারা তাদের কর্মতৎপরতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। সংগঠনের বিভিন্ন তৎপরতা, এর সাংগঠনিক কাঠামো, সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তমদ্দুন মজলিস যে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে, পরবর্তীকালে অন্য কোন সংগঠন সে ধরনের দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি।

সর্বশেষ এ ধরনের সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে নজরুল একাডেমী (১৯৬৪)। এই প্রতিষ্ঠানটিও সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র, প্রকাশনা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের কর্মতৎপরতা পরিচালনা করেছে।

এই দুটি সংগঠনেরই কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংরক্ষিত হয়েছে।

তমদ্দুন মজলিসের (১৯৪৭) পরে এই অভিসন্দর্ভে আরও আটটি সাংস্কৃতিক সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের সাংগঠনিক ও অন্যান্য কর্মতৎপরতার বিবরণ উদ্ধার করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ, তাদের লিখিত কোন দলিল নেই বললেই চলে।

সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদ অনুসারী সংগঠনগুলোর অবস্থা আরও করুণ। পাকিস্তানের ২৪ বছরে তারা নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার সুনির্দিষ্ট দৃঢ় লক্ষ্য কখনও ছিল বলে মনে হয় না। এরা পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সংস্কৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, ছায়ানট প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় চেতনার কথা মনে রেখে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেননি। বেশীর-ভাগ সময় একটি বিশেষ সংস্কৃতিসেবী দল একাধিক সংগঠন গড়ে তুলেছেন। কিন্তু তাদের কার্যক্রম বেশী দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। এই ধারার সংস্কৃতিসেবীদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে মনে হয়, তারা চলতি হাওয়ায় ভেসেছেন বেশী করে; প্রতিবাদ যত করেছেন, বিনির্মাণে ততটা মনোযোগী হতে পারেননি। পারেননি বলেই এদের বেশীর ভাগ শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খানের মত স্বৈরশাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত পাকিস্তান লেখক সংঘে লীন হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ-গোষ্ঠীস্বার্থ হাসিলের জন্য কাজ করে গেছেন। লেখক সংঘে কবি গোলাম মোস্তফা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন সুফিয়া কামাল, হাসান হাফিজুর রহমান, মুনীর চৌধুরী, খান সরোয়ার মুরশিদ, শওকত ওসমান এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ। এর কারণ হতে পারে, হতাশাজনিত অথবা সুবিধাবাদজনিত; হতে পারে, তারা জানতেন না তারা কি চান। কিন্তু এই শ্রেণীর সংস্কৃতিসেবীদের প্রধান অবদান ছিল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষের প্রগতিচেতনার উন্মেষ ঘটানো।

www.nagorikpathagar.org

এই প্রগতিচেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে এরা হয়ত সরে গেছেন, কিন্তু তাদের প্রচারিত বক্তব্য অনেক দিন ধরে প্রভাবিত করেছে তরুণ সমাজকে।

এখানে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। সংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজে এই প্রতিষ্ঠান নৃত্যশিল্পকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে। যদিও গোটা পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানী সংস্কৃতি বিদেশে তুলে ধরার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি ব্যবহৃত হয়েছে।

একইভাবে দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবী বলে যাদের পরিচয়, তারা বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন করে যে দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, বামপন্থীরা তা করতে পারেননি। দক্ষিণপন্থীরা তাদের সকল কার্যক্রমের বিবরণ নানাভাবে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছেন, সে প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়নি বামপন্থীদের মধ্যে। এক্ষেত্রে তারা দায়সারা গোছের কাজই করেছেন বেশী। ফলে তাদের কার্যক্রমের বিবরণ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলা কিংবা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজনের ক্ষেত্রেও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে যে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে সরকারী সমর্থন ছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম লীগ বিরোধীরা ১৯৫২ সালে ডাকে ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন। এরপর ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রত্যক্ষ উৎসাহে সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয় ঢাকায়, পরে ১৯৫৭ সালে কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে তার প্রতিক্রিয়ায় ইসলামপন্থীরা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে চট্টগ্রামে ১৯৫৭ সালেই। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়েই অগ্রসর হয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।

এখানে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। তা হল পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য চেতনার মধ্যপন্থী ধারায় যারা কাজ করেছেন, তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে যে অনুশীলন, ইতিহাস-চেতনা, দূরদর্শিতা ও সত্যান্বেষী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে, তা পাওয়া যায়নি 'বামপন্থী' ধারার সংস্কৃতি-কর্মীদের কাছ থেকে। তারা মত বদলেছেন দ্রুত। তারা আবেগে যত তাড়িত হয়েছেন, অস্থিরচিত্ততার যত পরিচয় দিয়েছেন, যুক্তি দিয়ে বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় ততটা উদ্যোগী হতে পারেননি।

এর ফলে পূর্ব বাংলায় তমদ্দুন মজলিসের পরবর্তীকালে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনের মান মজলিসের তুলনায় আরও সুসংবদ্ধ তো হয়নি, বরং তার মধ্যে দায়সারা ভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। অথচ প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মীরাই পারতেন পূর্ব-বাংলায় সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নির্মাণের কাজ আরও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে।

তবু এইসব বিচ্ছিন্ন ঐকান্তিক কিংবা সাময়িক ধারার সকল কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়েই জনগণ তার আপন ধারা অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সহস্র বছরের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যচেতনাকেই অবলম্বন করেছেন। সেই ধারাতেই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা।

www.nagorikpathagar.org

১০. বাংলাদেশের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও স্বকীয়তা

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পাকিস্তান আমলে বিশেষ করে ষাটের দশকে যে দুর্বলতার সূচনা হয়, তার ধারাবাহিকতা বাংলাদেশেও বিস্তৃত হয়েছে। ফলে বর্তমান সময়ে এখানে এক ধরনের সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় লক্ষ্যণীয়।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, ১৯৪৭–'৭১ পর্বে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা নতুন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। মানুষের আত্মানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধি পায়। ডান–বাম নির্বিশেষে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তাকে পরিপুষ্ট করতে চেয়েছেন।

উপরে উল্লিখিত বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়েই পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ধারা ক্রমান্বয়ে পরিপুষ্ট হতে থাকে। এই বিভিন্ন ধারার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সচেতনতাই শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলের জনসাধারণকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে। বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বতন্ত্র জাতিসত্তার রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

নানা দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশের সংস্কৃতি এখনও বহুলাংশে পাকিস্তানকালের ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার ধারা ধরেই বিকশিত হচ্ছে। বিরোধের ও ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার এই ধারার অবসান ও উন্নততর নতুন ধারার প্রবর্তন সম্ভবপর হতে পারে। মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী, ন্যায়কামী, বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন ভাবধারার ও কর্মধারার বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশে সে ধারার বিকাশের অন্তহীন সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol. II, IV, VII, VIII & IX. 1872

২. Census of Pakistan, 1951, Vol 2. Karachi, 1954, p. 34

৩. Census of Pakistan, 1961, Vol 2. Karachi, 1964, p. 11-14

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জি

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পত্র-পত্রিকা

ক. দৈনিক পত্রিকা

দৈনিক আজাদ	১৯৪৭ :	নভেম্বর ১৫, ১৬, ১৯, ২৯, ৩০। ডিসেম্বর ৭, ৮, ১৩, ১৫
	১৯৪৮ :	ফেব্রুয়ারী ৪, ৫, ২৩, ২৬, ২৮। মার্চ ২, ৩, ১১, ১৮, ২৪, ২৫, ২৬। এপ্রিল ৯, ৪, ৭, ৮
	১৯৪৯ :	জানুয়ারী ১
	১৯৫১ :	মার্চ ১৯, ২২, ২৬
	১৯৫২ :	জানুয়ারী ২৮। ফেব্রুয়ারী ১, ৫, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭। মার্চ ৭, ১৪, ১৬। জুন ১
	১৯৫৪ :	এপ্রিল ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯। মে ৪, ৫, ১০
	১৯৫৭ :	ফেব্রুয়ারী ১৪, মার্চ ২৯, ৩১
	১৯৫৮ :	এপ্রিল ২৪, ২৭। মে ৪, ৫, ৭, ১৩। জুলাই ২২। আগস্ট ১৯
	১৯৫৯ :	ফেব্রুয়ারী ১৬। আগস্ট ১১। ডিসেম্বর ১৫
	১৯৬০ :	এপ্রিল ২
	১৯৬১ :	মার্চ ৩, ১০, ২৯। এপ্রিল ১৪, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮। মে ৮, ২৪।
	১৯৬২ :	ফেব্রুয়ারী ২১
	১৯৬৭ :	জুন ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০। জুলাই ১, ২, ৩, ৪, ৫
দৈনিক ইনকিলাব	১৯৯২ :	সেপ্টেম্বর ৪
দৈনিক ইত্তেফাক	১৯৫৭ :	জুন ১২। ১৯৬৩, সেপ্টেম্বর ২৯
	১৯৬১ :	এপ্রিল ১৪, ১৭, ২৪, ২৮।
দৈনিক ইত্তেহাদ	১৯৫২ :	ফেব্রুয়ারী ৫, ১৭
	১৯৫৭ :	ফেব্রুয়ারী ৪, ৫, ১৬
দৈনিক ইনসাফ	১৩৫৯ :	আশ্বিন ১২। ১৩৬১ জৈষ্ঠ্য ১৯
দৈনিক জেহাদ	১৩৭০ :	আশ্বিন ৫

www.nagorikpathagar.org

দৈনিক পয়গাম	১৯৬৮ :	জুলাই ৫, ১২। আগস্ট ২৭
দৈনিক পাকিস্তান	১৯৬৭ :	জুন ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯। জুলাই ৫
	১৯৬৮ :	জুন ১। জুলাই ২, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১। সেপ্টেম্বর ৯, ১৮
	১৯৭১ :	মার্চ ২৫
দৈনিক সংগ্রাম	১৯৮৫ :	মার্চ
দৈনিক সংবাদ	১৯৫২ :	আগস্ট ১০ (ভাদ্র ১৩৫৮)
	১৯৫৭ :	ফেব্রুয়ারী ৯
	১৯৬১ :	এপ্রিল ১৬
	১৯৬৭ :	জুন ৩০। জুলাই ১, ২, ৫, ৭
	১৯৬৮ :	মে ২৫। জুলাই ৬, ৭, ৮, ৯, ১০। সেপ্টেম্বর ৯
	১৯৮২ :	ফেব্রুয়ারী ৭
	১৯৮৫ :	আগস্ট ১
Dawn	*1959* :	January 30
	1967 :	June 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. July 1, 2, 3
	1968 :	May 25
The Pakistan Observer	*1951* :	September 9
	1957 :	March 30, 31
	1959 :	January 30. February 1
	1962 :	May 12
	1963 :	September 30.
	1967 :	June 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. July 2, 3, 4, 5, 27
	1968 :	May 25. September 26
	1947 :	December, 5, 6.
The Morning News	1963 :	26 September. October 2, 3.
	1967 :	June 28, July 4, 5

খ. সাময়িকী

সাপ্তাহিক নওবেলাল	১৯৪৮ :	ফেব্রুয়ারী ৫। ১৯৫২ ফেব্রুয়ারী ৬,
সাপ্তাহিক পূর্বদেশ	১৯৬৩ :	সেপ্টেম্বর ২৯
সাপ্তাহিক প্রাচ্যবার্তা	১৯৭৭ :	মওলানা ভাসানী স্মরণীকা সংখ্যা
সাপ্তাহিক বিচিত্রা	১৯৮২ :	সেপ্টেম্বর ১৮

www.nagorikpathagar.org

সাপ্তাহিক সৈনিক	১৯৪৯ :	১ বর্ষ, ১০, ৩২ সংখ্যা ১৯৪৯ জানুয়ারী ৯, জুলাই ২২, নভেম্বর ৭, ২১।
	১৯৫৭ :	এপ্রিল ৫
মাসিক অনুসরণ	১৯৯৩ :	এপ্রিল
মাসিক উত্তরাধিকার	১৯৭৪ :	শহীদ দিবস সংখ্যা। ১৯৮৩ শহীদ দিবস সংখ্যা
মাসিক দ্যুতি	১৩৫৯ :	কার্তিক, অগ্রহায়ণ। ১৩৬০ ১০ সংখ্যা,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা	১৯৭৬ :	ডিসেম্বর
মাসিক মাহেনও	১৯৫৭ :	মে, ১৯৬৮ অক্টোবর,
মাসিক মোহাম্মদী	১৩৫০ :	কার্তিক। ১৩৬৫ আষাঢ়, শ্রাবণ, ফাল্গুন।
	১৩৬৬ :	বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য। ১৩৬৭ পৌষ
মাসিক সওগাত	১৩৫৯	অগ্রহায়ণ,
মাসিক সমকাল	১৯৫৯ :	২ বর্ষ ৮ সংখ্যা
মাসিক পূবালী		২ বর্ষ ৯ সংখ্যা
পরিক্রম	১৯৬২ :	সেপ্টেম্বর। ১৯৭০ ফেব্রুয়ারী–মে,
পূরবী	১৩৬৭ :	১ বর্ষ ১ সংখ্যা
পাণ্ডুলিপি	১৩৮২ :	৫, ৬ খণ্ড। ১৩৮৩, ৬ খণ্ড।
	১৯৭৬ :	জুন,
নজরুল একাডেমী পত্রিকা	১৩৭৬ :	১ বর্ষ ১ সংখ্যা। ১৩৮৮ ৭ বর্ষ ১ সংখ্যা, গ্রীষ্ম,
বাংলা একাডেমী পত্রিকা	১৩৬৪ :	১ বর্ষ ৩ সংখ্যা। ১৩৭০ বৈশাখ–আষাঢ়, শ্রাবণ–আশ্বিন,
লেখক সংঘ পত্রিকা	১৩৬৮ :	১ বর্ষ ১ সংখ্যা, আজাদী সংখ্যা। ৪, ৫, ৬, ৭, ৮–৯, সংখ্যা,
সুন্দরম	১৩৯৮ :	অগ্রহায়ণ–মাঘ,
সীমান্ত	১৩৫৭ :	৩ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ফাল্গুন

গ. মূল গ্রন্থ, বাংলা

অনিল মুখার্জী : *স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমি* (ঢাকা, ১৩৭৯)

অমিতাভ গুপ্ত : *বাংলাদেশ* (আনন্দধারা প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৭৮)

www.nagorikpathagar.org

অলি আহাদ	:	*জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে '৭৫* (ঢাকা, ১৯৮২)
আতাউর রহমান খান	:	*স্বৈরাচারের দশ বছর* (ঢাকা, ১৯৭০)
আনোয়ার পাশা	:	*সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল* (বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭)
আবদুল মওদুদ	:	*মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর* (নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯)
আবদুর রহমান	:	*যতটুকু মনে পড়ে* (চট্টগ্রাম, ১৯৫২)
আবদুল হক	:	*ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব* (মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬)
		বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (বইঘর, চট্টগ্রাম ১৩৮০)
		সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ (ঢাকা, ১৯৭৬)
		সাহিত্য ও স্বাধীনতা (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৪)
আবুল কালাম শামসুদ্দীন	:	*অতীত দিনের স্মৃতি* (ঢাকা, ১৯৮৫)
আবুল কাসেম	:	*পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু* (তমদ্দুন মজলিস, ঢাকা, ১৯৪৭)
আবুল কাসেম ফজলুল হক	:	*কালের যাত্রার ধ্বনি* (খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭৩)
		আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)
		একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ১৯৭৬)
		মুক্তিসংগ্রাম (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫)
আবু জাফর শামসুদ্দীন	:	*চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য* (ঢাকা, ১৯৬৪)
আবুল ফজল	:	*সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা, ১৯৭৪)
		সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (ঢাকা, ১৯৬০)
		রেখাচিত্র (বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮)
আবুল মনসুর আহমদ	:	*বাংলাদেশের কালচার* (আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৭৬)
		আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (ঢাকা, ১৯৭০)
আনিসুজ্জামান	:	*স্বরূপের সন্ধানে* (ঢাকা, ১৯৭৬)
		পুরোনো বাংলা গদ্য (বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪)

www.nagorikpathagar.org

আহমদ শরীফ : *স্বদেশ অন্বেষা* (খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, ১৩৭৭ বাং)

এম এ রহিম : *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড* (বাংলা একাডেমী, ১৯৮২)

কাজী আবদুল ওদুদ : *শাশ্বত বঙ্গ* (কলকাতা, ১৩৫৮)
বাংলার জাগরণ (কলকাতা ১৯৫৬)

কামাল লোহানী : *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম* (ঢাকা, ১৯৯৪)

খোন্দকার সিরাজুল হক : *মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪)

গোপাল হালদার : *সংস্কৃতির রূপান্তর* (মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৭৪)

গোলাম মুরশিদ : *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা* (ঢাকা, ১৯৮১)

তমদ্দুন মজলিস
(সম্পাদক) : *(পুস্তিকা) ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন*

দীনেশচন্দ্র সেন : *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (কলকাতা, ১৩৬৫)

দূরদর্শী : *হরফ সমস্যা* (ঢাকা, ১৯৪৯?)

ধনঞ্জয় দাশ : *আমার জন্মভূমি : স্মৃতিময় বাংলাদেশ* (কলকাতা, ১৯৭১)

নীহাররঞ্জন রায় : *কৃষ্টি কালচার-সংস্কৃতি* (কলকাতা, ১৯৭৯)
বাঙ্গালীর ইতিহাস (কলকাতা, ১৯৬০)

পঞ্চানন মন্ডল : *চিঠিপত্রে সমাজচিত্র* (কলকাতা, ১৯৫৩)

ফয়েজ আহমদ : *মধ্যরাতের অশ্বারোহী* (ঢাকা, ১৯৮৪)
সত্যবাবু মারা গেছেন (ঢাকা, ১৯৮৪)

ফারুক আলমগীর : *সংস্কৃতি সংসদ* (হেমন্ত, ১৩৭২)

বঙ্কিম রচনাবলী : ২য় খন্ড (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৮০)

বদরুদ্দীন উমর : *সংস্কৃতির সংকট* (ঢাকা, ১৯৭৪)
সাম্প্রদায়িকতা (ঢাকা, ১৯৮০)
সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (ঢাকা, ১৯৮০)
পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭০)

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক (ঢাকা, ১৯৮৫)
ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে কতিপয় দলিল (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪)

বশীর আল হেলাল : *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬)

বিনয় ঘোষ : *বাংলার বিদ্বৎসমাজ* (কলকাতা, ১৯৮৭)

বুলবন ওসমান : *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব* (ঢাকা, ১৯৮৬)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : *সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খন্ড* (কলকাতা, ১৩৪০)

মুনতাসীর মামুন : *উনিশ শতকের পূর্ববাংলার সভা সমিতি* (ঢাকা, ১৯৮৪)

মুনীর চৌধুরী : *বাংলা গদ্যরীতি* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬)

মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদক) : *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৩০)

মুহম্মদ আবু তালিব : *আযাদী আন্দোলনে বাঙালী মুসলমান* (ঢাকা)

মুহম্মদ এনামুল হক : *বাংলাভাষার সংস্কার* (মালদহ, ১৯৪৪)
বাংলা সাহিত্যের কথা (ঢাকা, ১৯৬৬)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : *আমাদের সমস্যা ঃ ভাষা সাহিত্য শিক্ষা, লিপি* (ঢাকা, ১৯৪৯)

মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ (সম্পাদক) : *শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ* (ঢাকা, ১৯৬৭)

মোতাহের হোসেন চৌধুরী : *সংস্কৃতি-কথা* (বাংলা একাডেমী, ১৯৭০)

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন : *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* (সওগাত প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৫)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক* (বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪)

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ : *সাহিত্যের রূপকার* (ইসলামী সংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৮১)
বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য (ঢাকা, ১৯৭২)

মোহাম্মদ হাননান : *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ পর্ব* (ঢাকা, গ্রন্থলোক, ১৯৯১)

রায়হানা হোসেন/গোলাম : *শহীদুর রহমান স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা, ১৯৯৩)

www.nagorikpathagar.org

মঈনউদ্দিন/রশীদ হায়দার
(সম্পাদক)

রাহিজা খানম : *নৃত্যশিল্প* (ঢাকা, ১৯৭৯)
শাহ আহমদ রেজা : *মওলানা ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম* (গণপ্রকাশনী, ১৯৮৬)
শাহিদা আখতার : *বুলবুল চৌধুরী* (বাংলা একাডেমী, ১৯৯০)
শিবনাথ শাস্ত্রী : *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ* (কলকাতা, ১৯৫৭)
সরলানন্দ সেন : *ঢাকার চিঠি* (মুক্তধারা, কলকাতা, ১৯৭১)
সাঈদ-উর-রহমান : *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩)
সুকান্ত একাডেমী : *ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি* (ঢাকা, ১৯৭৮)
সুকুমার বিশ্বাস : *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা* (বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮)
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : *ভারত সংস্কৃতি* (মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৭০)
সৈয়দ আবুল মকসুদ : *ভাসানী, ১ম খন্ড* (ঢাকা, ১৯৮৬)
হাসান জামান : *সমাজ-সংস্কৃতি সাহিত্য* (ঢাকা ১৯৭৬)
সম্পাদক *শতাব্দী পরিক্রমা* (ঢাকা, ১৯৫৮)
হাসান হাফিজুর রহমান : *একুশে ফেব্রুয়ারী* (ঢাকা, মার্চ ১৯৫৩)
(সম্পাদক) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র* (তথ্য ও মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৬)

ঘ. মূল গ্রন্থ, ইংরেজী

A. R. Mallik : *British Policy and the Muslims in Bengal* (Dacca, 1961)
A. Sadeque : *The Economic Emergence of Pakistan* (Dacca, 1954)
Abu Jafar Shamsuddin : *Sociology of Bengal Politics* (Dacca, 1973)
Abul Hashim : *In Retrospection* (Dacca, 1974)
Christopher Caudwell : *Illusion and Reality* (London, 1958)

www.nagorikpathagar.org

Carlo Coppola (editor) : *Marxist Influences and South Asian Literature Vol. 1* (Dacca, 1974)

Ferdaus Khan : *The Language Problem of To-day*

G.W. Choudhury : *Documents & Speeches on Constitution of Pakistan* (Green Book House, Dhaka 1967)

M. A Rahim : *Muslim Society and Politics in Bengal : 1757-1947* (Dacca ,1979)

Mao Tsetung : *On Literature and Art, 3rd ed.* (Peking, 1976)

Muhammad Ayub Khan : *Friends not Masters* (Karachi, 1967)

Muzaffar Ahmed Chaudhury : *Government and Politics in Pakistan* (Dacca, 1968)

Rounaq Jahan : *Pakistan : Failure in National Integration* (Dacca, 1977)

Syed Ali Ahsan (editor) : *Bengali and Urdu : A Literary Encounter, A Seminar* (Dacca, 1964)

Talukder Maniruzzaman : *The Politics of Development : The Case of Pakistan 1947-58* (Dacca, 1975)

W. W. Hunter : *The Indian Musalmans* (Calcutta, 1945)

A Statistical Account of Bengal, Vol II, IV, VII, VIII & IX, 1872

www.nagorikpathagar.org

ঙ. সহায়ক গ্রন্থ, বাংলা

অজয় রায় : *বাংলাদেশের অর্থনীতি অতীত ও বর্তমান* (ঢাকা, ১৯৮৯)

অতুল সুর : *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস* (কলকাতা, ১৯৭৬)

অনিল মুখার্জী : *স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি* (ঢাকা, ১৩৭৯)

অমলেন্দু দে : *বাংলাদেশ* (কলকাতা, ১৩৭৮)

অসিতকুমার ভট্টাচার্য : *সংস্কৃতি ও সাহিত্য* (কলকাতা, ১৩৭৭)

আতাউর রহমান খান : *স্বৈরাচারের দশ বছর* (ঢাকা, ১৯৭০)

আনিসুজ্জামান : *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৬৪)

আবু জাফর শামসুদ্দীন : *চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য* (ঢাকা, ১৯৬৪)

আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ : *আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব* (ঢাকা, ১৯৮২)

আবুল কালাম শামসুদ্দীন : *দৃষ্টিকোণ* (ঢাকা, ১৩৬৬)

কাজী আবদুল মান্নান : *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (ঢাকা, ১৯৬৯)

আহমদ শরীফ : *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (ঢাকা, ১৯৭৮)

কামরুদ্দীন আহমদ : *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা, ১৩৭৬)
বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, ২য় খন্ড (ঢাকা, ১৩৮২)

কার্ল মার্কস : *ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী* (মস্কো, ১৯৭১)

গোপাল হালদার : *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, ২ খন্ড* (কলকাতা, ১৩৭০)

ছদরুদ্দীন : *দেশ-কাল-পাত্র* (ঢাকা, ১৯৬৬)

জীবেন্দ্র সিংহ রায় : *কল্লোলের কাল* (কলকাতা, ১৯৭৩)

দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : *ভারতীয় দর্শন, আদিপর্ব* (কলকাতা, ১৯৬০)

ধনঞ্জয় দাশ : *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, ১ম খন্ড* (কলকাতা, ১৯৭৫)

নরহরি কবিরাজ : *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা* (কলকাতা, ১৯৫৭)

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ : *বাংলার অর্থনৈতিক জীবন (১৭৫৭-১৭৯৩)* (কলকাতা, ১৯৬৭)

www.nagorikpathagar.org

নারায়ণ ভট্টাচার্য : *অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি* (কলকাতা, ১৩৭০)

প্রমথ চৌধুরী : *প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান* (কলকাতা, ১৩৬০)

বিনয় ঘোষ : *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খন্ড* (কলকাতা, ১৯৭৬)
(সম্পাদিত) সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ১ম খন্ড (কলকাতা, ১৯৬২)

বিমল চন্দ্র সিংহ : *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (কলকাতা, ১৩৬৪)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা সাময়িক পত্র, ২য় খন্ড* (কলকাতা, ১৩৫১)

মনসুর মুসা (সম্পাদক) : *বাংলাদেশ* (ঢাকা, ১৯৭৪)

মুহম্মদ আবদুল হাই/ সৈয়দ আলী আহসান : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা, ১৯৬৪)

মুহম্মদ এনামুল হক : *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা, ১৯৬৮)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : *ভাষা ও সাহিত্য* (ঢাকা, ১৯৫০)
আমাদের সংস্কার (ঢাকা, ১৯৪৯)

মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম : *পাকিস্তান ঃ দেশ ও কৃষ্টি, ২য় খন্ড* (ঢাকা, ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ১৯৭০)

মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ : *আমাদের মুক্তিসংগ্রাম* (ঢাকা, ১৯৬৭)
যুগবিচিত্রা (ঢাকা, ১৯৬৭)

মোহাম্মদ গোলাম হোসেন : *বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান* (কলকাতা, ১৯১০)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : *আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২)
আধুনিক বাংলা সাহিত্য (ঢাকা, ১৯৬২)

মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ : *সমকালীন সাহিত্যের ধারা* (ঢাকা, ১৯৬৫)

সিরাজুল ইসলাম : *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা* (ঢাকা, ১৯৮১)

সুপ্রকাশ রায় : *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* (কলকাতা, ১৯৬৬)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা* (কলকাতা, ১৩২৩)

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য : *হিন্দুদের দেব দেবী, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব* (কলকাতা, ১৯৮০)

হাসান জামান : *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য* (ঢাকা, ১৯৬৭)

www.nagorikpathagar.org

চ. সহায়ক গ্রন্থ, ইংরেজী

Anonymus : *Mutiny of the Bengal Army* (London, 1957)

A. R. Desai : *Social Background of Indian Nationalism* (London, 1948)

Brijen K. Gupta : *Sirajuddaullah and The East India Company : 1756-1757* (Leiden, 1966)

Dinesh Chandra Sen : *History of Bengali Language and Literature* (Calcutta, 1954)

Herbert Feldman : *Revolution in Pakistan* (London, 1967)
From Crisis to Crisis Pakistan 1962-69 (London, 1972)

Jadunath Sarkar : *Fall of Mughal Empire. Vol. II* (Calcutta, 1934)
History of Bengal. Vol. II (Dacca, 1948)

Jamaluddin Ahmed (ed.) : *Speeches and Writings of Jinnah. Vol I.* (Karachi, 1946

J. M. Ghose : *Sannyasi and Fakirs Raiders in Bengal* (Calcutta, 1930)

J. N. Farquhar : *Modern Religious Movements in India* (London, 1924)

Karl Von Vorys : *Political Development in Pakistan* (Princeton, U.S.A. 1965)

Keith Callard : *Pakistan, A Political Study* (London, 1957)

Maulana Abul Kalam Azad : *India Wins Freedom* (Calcutta, 1959)

Mirza Shahjahan : *Agricultural Finance in East Pakistan* (Dacca, 1968)

www.nagorikpathagar.org

Mustaq Ahmed : *Government and Politics in Pakistan* (Karachi, 1963)

Ram Gopal : *British Rule in India* (London, 1963)

R. C. Majumder : *History of Freedom Movement in India. Vol. I* (Calcutta, 1963)

S. Sajjad Hussain (Editor) : *Report : Dacca University Seminars on Contemporary writings in East Pakistan* (Dacca, 1957)

Syed Qamrul Ahsan : *Politics and Personalities in Pakistan* (Dacca, 1969)

Tariq Ali : *Pakistan : Military Rule or People's Power* (New York, 1970)

ছ. প্রবন্ধ

আনিসুজ্জামান : সংস্কৃতি সংসদের কথা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ সম্মেলন '৮৯, *স্মরণিকা*, হামিদ কায়সার অপু সম্পাদিত)

আবদুল গণি হাজারী : সাহিত্যে বিপন্নবাদ (*মাসিক সওগাত*, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯)

আসাদ চৌধুরী : সংস্কৃতির বিকাশ ধারা (*রক্তাক্ত বাংলা*, কলকাতা, ১৯৭১)

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ : স্মৃতিময় সেই দিনগুলি (সংস্কৃতি সংসদ স্মরণিকা)

আবুল ফজল মোহাম্মদ আখতারুদ্দীন : বাংলা বর্ণমালা পরিবর্তন (*দৈনিক আজাদ*, ১৮ এপ্রিল, ১৯৪৮)

আবু জাফর শামসুদ্দীন : কাগমারী সম্মেলন (*দৈনিক সংবাদ*, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২)

www.nagorikpathagar.org

আহমদ শরীফ	:	পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষা সংস্কার আন্দোলন (*উচ্চতর মানববিদ্যা সেমিনার প্রবন্ধমালা*, ১ম খণ্ড, জুন ১৯৮৫)
		এবারের সংস্কৃতি সম্মেলন *দৈনিক ইনসাফ*, ১২ আশ্বিন ১৯৫৯)
আহবাব চৌধুরী	:	রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক *দৈনিক আজাদ*, ১২ বৈশাখ, ১৩৬৮)
ওবায়দুল হক সরকার	:	নাট্য আন্দোলনের স্মরণীয় দিন (*দৈনিক ইনকিলাব*, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯২)
কুদরত উল্লাহ্ শাহাব	:	লেখন ও লেখকের স্বাধীনতা (*মাসিক মোহাম্মদী*, ফাল্গুন ১৩৬৫)
জসীমউদ্‌দীন	:	আমাদের সাহিত্যের সমস্যা (*মাসিক মোহাম্মদী*, ফাল্গুন ১৩৬৫)
নূরুল হক চৌধুরী	:	শতাব্দীর উজ্জ্বল সূর্যের আকর্ষণে (*সাপ্তাহিক প্রাচ্যবার্তা*, মওলানা ভাসানী স্মরণ, সংখ্যা, ১৯৭৭, ঢাকা)
ফয়েজ আহমদ	:	মধ্যরাতের অশ্বারোহী (*সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৮২)
		রাজনৈতিক ব্যক্তি (*হাসান হাফিজুর রহমান স্মারক গ্রন্থ*, জুন, ১৯৮৩)
বুলবুল খান মাহবুব	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুময় সেই দিনগুলি (*মাসিক অনুসরণ* : সম্পাদক শাহ আহমদ রেজা, মে, ১৯৯৩)
মঈনুদ্দীন	:	দেখে এলাম করাচী (*মাসিক মোহাম্মদী*, জৈষ্ঠ্য, ১৩৬৬)
মাহবুবুল আলম	:	*সংকট কেটে যাচ্ছে* (মাহুতটুলী, ঢাকা, ১৯৫২)
মুসাফির	:	রাজনৈতিক মঞ্চ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২-৬-১৯৫৭)
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	:	স্বজন-কথা (*হাসান হাফিজুর রহমান স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা, ১৯৮৩)

www.nagorikpathagar.org

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	:	উদ্বোধনী ভাষণ (পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন ১৯৫৪, প্রকাশিত *পুস্তিকা)*
মোহাম্মদ আইয়ুব খান	:	পাকিস্তানের সংহতি ও লেখকদের ভূমিকা (*মাসিক মোহাম্মদী,* ফাল্গুন, ১৩৬৫)
মোহাম্মদ নাসির আলী	:	করাচী লেখক সম্মেলন (*মাসিক মোহাম্মদী,* ফাল্গুন ১৩৬৫)
মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ	:	পূবালীর দিনগুলি *দৈনিক সংগ্রাম,* ১৯৮৫) প্রাতিষ্ঠানিক নজরুল চর্চার ইতিবৃত্ত (*সুন্দরম,* সম্পাদক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, অগ্রাহায়ণ–মাঘ ১৩৯৮)
রফিকুল ইসলাম	:	বাংলাদেশ আন্দোলনের সাংস্কৃতির পর্যায় (*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,* ১৯৭৬) বাংলাদেশে নজরুল সঙ্গীত চর্চা (*নজরুল একাডেমী পত্রিকা,* ১৩৬৫)
লায়লা সামাদ	:	হাসান হাফিজুর রহমান (*হাসান হাফিজুর রহমান স্মারক গ্রন্থ)*
শামসুজ্জামান খান	:	বাংলাদেশে রবীন্দ্র–বিতর্ক ও তার কিছু টিকা–ভাষ্য (*উত্তরাধিকার,* শহীদ দিবস সংখ্যা, ১৯৭৪)
শাহাবুদ্দীন আহমদ	:	নজরুল একাডেমী পরিচিতি (*নজরুল একাডেমী পত্রিকা,* ৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৩৮৮) নজরুল চর্চা দেশে বিদেশে (*উত্তরাধিকার,* শহীদ দিবস সংখ্যা, ১৯৭৪)
সনজীদা খাতুন	:	ছায়ানট (*সবারে করি আহবান,* স্মরণিকা, ৮ জানুয়ারী, ১৯৮৭)
সরদার জয়েনউদ্দীন	:	মনে পড়ে মওলানা ভাসানী *দৈনিক সংবাদ,* ১ আগস্ট, ১৯৮৫)
সাঈদ-উর-রহমান	:	আইয়ুব খানের আমলে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক (*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,* ডিসেম্বর, ১৯৭৪) সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম (*পাণ্ডুলিপি,* সম্পাদক আনিসুজ্জামান, ১৯৭৮)

www.nagorikpathagar.org

জ. রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফাইল নং-২৬ (২)-১২ (৬৬-৬৬) সংগ্রহ নং -২৬(১) রেজিস্টারের বিভাগ, সাধারণ শাখা, ক্রমিক নং IA

Minutes at the Academic Council (D.U) Held on 28.3.67, 11.5.68, 3.8.68

Report of the East Bengal Language Committee, 1949 (পূর্ব পাকিস্তান গবর্ণমেন্ট প্রেস, ঢাকা, ১৯৫৮)

Census of Pakistan 1951 Vol. 2 (Karachi, 1954)

Census of Pakistan, 1961 Vol. 2 (Karachi, 1964)

East Bengal Legislative Assembly Proceedings. Vol-1 No.4 Thursday, 8th April, 1948.

Quiad-1-Azam Mohammad Ali Jinnah's Speeches as Governor General, (Pakistan Publication, Karachi.1948)

ঝ. কোষ-গ্রন্থ

আমাদের লেখক প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী : প্রধান সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাংলা একাডেমী (ঢাকা, ১৯৭৪)

চরিতাভিধান : সম্পাদক ঃ শামসুজ্জামান খান/ সেলিনা হোসেন, বাংলা একাডেমী (ঢাকা, ১৯৮৫)

বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি : বাংলা একাডেমী সংকলিত (ঢাকা, ১৯৮৪)

বাংলাদেশের সাহিত্যিক পরিচিতি : সংকলক ও সম্পাদক ঃ ডঃ মুহম্মদ আবদুল জলিল/ডঃ সেলিম জাহাঙ্গীর (ঢাকা, ১৯৯১)

বাংলা বিশ্বকোষ, চতুর্থ খন্ড : ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রমোশন/নওরোজ কিতাবিস্তান (ঢাকা, ১৯৭৬)

www.nagorikpathagar.org

Encyclopaedia Britanica : London, 1989
Encyclopaedia of Social Sciences : London, 1989
Third World Guide : London, 1989

www.nagorikpathagar.org

নির্ঘন্ট

অ.

অজিত কুমার গুহ ৮৫, ৮৭, ১০৮, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৬, ২১৩, ২৭৫, ২৯৮, ৩৩২

অজিত নাথ নন্দী ১৯১, ১৯৪

অলি আহাদ ৩৯, ৫৭, ২৯৪, ২৯৮, ৩০০–৩০৫, ৩০৭–৩১১, ৩১৫,

অজিত স্যানাল ১০০

অতীন্দ্র মোহন রায় ১৯১, ১৯৭

অন্নদাশঙ্কর রায় ১৮৯, ২১৩

অবনীমোহন চক্রবর্তী ১৯৬

আ.

আকবর উদ্দীন ১০৪, ১৫৩, ২৩৮, ২৪০

আখতার হামিদ খান ১৯২, ১৯৪

আখলাকুর রহমান ৭৯, ৮৯, ১৭১, ১৭২, ২৩০, ২৯৪

আজহারুল ইসলাম ১০৫, ১১২, ২৫৬

আজিজ আহমদ ৩৯, ৫২, ৫৮, ২৫৮

আজিজুর রহমান বিএল ১৯১

আজিজুর রহমান, কবি ৬৫, ১০৪, ১০৬, ১০৮, ২৪৫

আজিজুল হাকিম ৯০

আতাউর রহমান ৭৯

আতাউর রহমান খান ২২৬, ২২৯, ২৩৮, ৩৪২

আতাউস সামাদ ৩৪৩

আতিকুল ইসলাম ১৩৯, ২২৭

আতোয়ার রহমান ৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯০, ১০৮, ২১৭

আনওয়ারুল আজিম ৭১

আনওয়ারুল হক, শিল্পী ১৮৮

আঞ্জুমান আরা বেগম ৩৬০,

আনিসুজ্জামান, ডক্টর ৭১, ৭৮, ৮১, ৮৫, ৮৭, ৯০, ১০০, ১০৮, ১১৮, ১২২, ১২৩, ১৩৯, ২৭৩

আ ন ম গোলাম মোস্তফা ৭৮

আ ন ম বজলুর রশীদ ৯০, ১৯৭, ৩৬০

আনসার আলী ১৫৩

আনিস চৌধুরী ৮৫, ৮৭, ৯৪

আনোয়ার জাহিদ ৩৪৩

www.nagorikpathagar.org

আনোয়ার পাশা ১৪৭, ১৬৪
আনোয়ারা খাতুন ৩০৮
আনোয়ারা বাহার চৌধুরী ১০০
আবদুর রউফ ১৯৭,
আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী ১০৬, ১০৭
আবদুর রশীদ খান ১৩৭, ২০৩, ২১১, ২৪৫
আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ৩১৩
আবদুর রহমান ৫৩, ১৫৩, ২৪৮, ২৯১
আবদুর রহমান খাঁ ৯০, ৯১, ২১৮
আবদুর রহমান খাঁ, খান বাহাদুর ১১২, ১১৯, ১৩৭, ১৯১
আবদুর রহমান চৌধুরী ২৯৮, ৩০০
আবদুর রহিম, মওলানা ১৭২
আবদুর রহিম, স্যার ৩১
আবদুর রাজ্জাক ১২১
আবদুর আজিজ, ডক্টর ২৪১
আবদুল আলীম ৩৬০
আবদুল আহাদ ১৩২, ১৭০, ১৭২
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ১৮৩, ১৮৪, ১৯৫
আবদুল কাইউম ১৭০
আবদুল কাদির ৮৯, ১০৮, ১১২, ১১৫, ১১৯, ১২৩, ১৩৭, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ২১০, ২৪৫
আবদুল কুদ্দস ১৯৭
আবদুল গফুর, অধ্যাপক ৬৫, ৬৭, ২০২, ২৪৫, ৩০৮
আবদুল গফুর সিদ্দিকী ২১০, ২১২, ২১৪, ২১৮
আবদুল গণি হাজারী ৮৫, ৮৭, ৯০, ৯৪, ২১০, ৩৪৩
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ১১, ৮২, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ১০৮, ১৪৭, ৩৪৩, ৩৫৭
আবদুল জব্বার খান, স্পীকার ১৫৪
আবদুল মওদুদ, বিচারপতি ১০৮, ১৫৩, ১৬১, ১৬৪, ২৩৮, ৩৬০
আবদুল মতিন ৫৮, ২৯৪, ৩০৯, ৩১৫
আবদুল মালেক উকিল ৩৫৬
আবদুল লতিফ ১১
আবদুল হক ৮৯, ৯০, ১১৬, ১৬৪, ২১১, ২৩৮, ২৪১
আবদুল হাই মাশরেকী ১০৮, ২২১, ২৪৩
আবদুল হামিদ, মন্ত্রী ৫৩
আবদুল হামিদ চৌধুরী, স্পীকার ১৪২, ১৫৪
আবদুল হালিম চৌধুরী, গায়ক ২২০

www.nagorikpathagar.org

আবদুল্লাহ আল মামুন ৭৯
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ১৪৭
আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন ১১২, ১২০, ১৪৮, ১৭০, ১৭১, ২১৭
আবদুল্লাহ ইউসুফ ১৪৪
আবদুল্লাহেল কাফি ২৩৮, ২৪৫
আবদুস সাত্তার ৭৯, ১০৮, ১২১, ৩৬০
আবদুস সোবহান চৌধুরী ২৬১
আব্বাসউদ্দীন আহমদ ১৭০, ২০৫, ২২০
আবিদ হোসেন খান ৩৬০
আবু জাফর শামসুদ্দীন ৩৯, ৫৩, ৯০, ২১০, ২১৭, ২২৭, ২২৩, ২৯১
আবু বকর সিদ্দিক ১১
আবু রুশদ ৬৪, ১১৬
আবু সাঈদ চৌধুরী, বিচারপতি ১৫৩
আবু হেনা মোস্তফা কামাল ৬৫, ৬৬, ৮২, ২৭৩
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ৭৬
আবুল কালাম শামসুদ্দীন ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ১৩৭, ১৫১, ১৫৩, ১৬৪, ২১০, ২১৫, ২২০, ২২২, ২৫৯, ২৮৬, ৩১২–১৪, ৩৩১, ৩৪২, ৩৬০
আবুল কাশেম, প্রিন্সিপাল ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৬, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪ ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ১৭৭, ১৯৭, ২৮৫, ২৯১, ২৯৪, ২৯৮–৩০৪, ৩০৮, ৩৪০
আবুল কাসেম ফজলুল হক ৩১৬, ৩৬৩–৬৪
আবুল খায়ের আহমদ ১৯১
আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন ১৯৭,
আবুল ফজল ২০, ৩০, ৩১, ৯৮, ১০৮, ১২২, ১২৩, ১৮১, ১৮২, ১৮৫, ১৯৪
আবুল মনসুর আহমদ ১৭, ৫০, ৫২, ২১০, ২১৮, ২৫৭, ২৮৬, ২৮৮, ৩৪২, ৩৬০
আবুল হাসান, ডক্টর ২৪১
আবুল হাশিম ৬৬, ৬৭, ১৩৮, ১৩৯, ২৪১, ৩০৮, ৩১১, ৩৪২, ৩৫৭, ৩৭২
আবুল হাসনাৎ ১৬৯
আবুল হোসেন, কবি ১১৫
আমানুল হক ১৬২
আমিনুল ইসলাম, শিল্পী ৯১
আমিনুল ইসলাম (বেদু) ২৭৪
আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক ২৪১
আমিনুল হক, খানবাহাদুর ২১৭
আমীর হোসেন চৌধুরী ১৫২
আমীরুজ্জামান ১৭০
আলতাফ মাহমুদ ১৩২, ১৩৫

www.nagorikpathagar.org

আলমগীর জলিল ১২৩
আলমাস আলী ৩০৮
আল মাহমুদ ৮৯, ৯০, ৩৫৯
আলাউদ্দীন আল আজাদ ৭৯, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৪, ১৭০, ২১৫
আলী আকসাদ ৩৪৩
আলী ইমাম ১৪৪
আলীম আল রাজী, ডক্টর ২৩৮
আলী আশরাফ, সাংবাদিক ৯৪
আশকার ইবনে শাইখ ৬৬, ১৩৭, ২২১, ২৩৮, ২৪০
আশরাফ সিদ্দিকী, ডক্টর ১১৮, ১২৩, ২৪৫, ৩৬০
আশীষ কুমার লোহ ১৪৪
আশুতোষ চক্রবর্তী ১৯১
আশুতোষ সিংহ, বিএল ১৯১
আসাদ চৌধুরী ৭৯
আসাদুজ্জামান খান ৩৫৬
আসাদুল ইসলাম চৌধুরী ২৭৩
আহমদ কবির ১৪৭
আহমদ ছফা ১১, ১৪৭
আহমদ শফিক ১২০
আহমদ শরীফ, ডক্টর ১১, ১৯, ২১, ২৫, ৯০, ১০৮, ১৪৮, ১৯৬, ১৯৭-৮, ২১৫, ২৭৩, ২৭৮
আহমদ হাসান দানী, ডক্টর ২৪১, ২৯৭
আহমেদ হোসেন ১২০, ১৪৮
আহমেদুর রহমান ১৩০
আহসান আহমদ আশক ১১৯, ১৪১
আহসানউদ্দীন আহমদ ১৯১
আহসানুজ্জামান খাঁ ১৭০
আহসান হাবীব ১০৮, ২৪৩, ৩৬০

ই.

ইয়ার মোহাম্মদ খান ২২৮
ইন্নাস আলী, ডক্টর ৩৪২
ইবনে জশমতুল্লাহ ২৯৭
ইব্রাহীম খাঁ, প্রিন্সিপাল ১০৪, ১১৩, ১১৯, ১২৩, ১৫৩, ১৬০, ১৭০, ২০২, ২৪৮, ২৫২, ৩৪০, ৩৪২, ৩৬০
ইসমত আরা ৩৬০

www.nagorikpathagar.org

ঈ.
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৯

এ.
এ কে এম আহসান ৩৯, ৫৩, ৬৫, ২৯১
এ কে এম নূরুল ইসলাম, বিচারপতি ১৫২, ১৫৩, ১৬০, ৩৬০
এ কে ফজলুল হক ৫৪, ৯৯, ২০৯, ২২৩, ৩৭২
এনাম আহমদ চৌধুরী ৭৯
এনামুল হক, ডক্টর ৬৫, ৬৬, ৮০, ১০১, ১৪৭
এনায়েতউল্লাহ খান, হলিডে ৭৯
এ বি এম হাবীবুল্লাহ, ডক্টর ১২, ১৯৭
এম মোহাইমেন ১০০
এম এন হুদা, ডক্টর ২৩০
এস আহমদ ৪৮, ২৯১

ও.
ওয়াহিদুল হক ১৩০, ৩৪৩, ৩৫৭
ওবায়দুল হক সরকার ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৮১
ওবায়দুল্লাহ খান, এ জেড এম ৭১, ৭৯, ৮৫, ৯৪, ১৯৮

ক.
কবীর চৌধুরী ১৪৭, ১৯১, ১৯২, ২১৬, ৩৪১
কমরুদ্দীন আহমদ ৫৭, ৫৮, ২৮৮, ২৯৮–৩০৫, ৩০৮
কল্যাণ দাসগুপ্ত ৫৩
কলিম শরাফী ১৮৯, ২১৪, ২১৯
কাজী আনওয়ারুল হক ১৫৪, ১৫৬, ১৫৯
কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৪, ২১২, ২১৯
কাজী আবুল কাসেম ১৫২, ৩৬০
কাজী আবুল হোসেন ১১৯
কাজী এ কামরুজ্জামান ৬০
কাজী গোলাম মাহবুব ৫৭, ২৯৮, ৩০৮
কাজী জাফর আহমদ ৭৯, ৮০
কাজী দীন মোহাম্মদ, ডক্টর ১৫৪, ২১৭, ২৪১, ২৪৩, ২৭৩, ৩৪০, ৩৬০
কাজী মোতাহার হোসেন, ডক্টর ৫০, ৫১, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯০, ১০০, ১০৮, ১১২, ১১৮, ১২১, ১২৩, ১৪৭, ১৭০, ২০২, ২১০, ২১৭–১৮, ২২৯, ২৮৬, ৩৩৭, ৩৪২, ৩৫৩–৫৭
কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস ২২৮, ৩৪৩

www.nagorikpathagar.org

কাদের নেওয়াজ, কবি ১১২
কামরুন্নাহার লাইলী ৭৯
কামরুল হাসান ৮৫, ৮৭, ১০০, ১৮৮, ১৯৭, ২১৭
কামাল লোহানী ১০, ১৩১, ১৩২, ৩৫৭
কামিনী কুমার দত্ত ১৯১
কেরামত মওলা ১৪৪
কে জি মোস্তফা ৩৪৩
কালাম মাহমুদ ২৭৩, ৩৪৩
কল্যাণ দাশগুপ্ত ২৯১

খ.
খন্দকার আসাদুজ্জামান ৭৯
খাজা নাজিমুদ্দীন ৪১, ৫৩, ৫৫-৫৮, ২৯০, ২৯৭, ৩০১, ৩০৭
খাজা শাহাবুদ্দীন ৩৬০
খয়রাত হোসেন ৩০৮
খাদেম হোসেন খান ২২০
খান সারওয়ার মুরশেদ ৭১, ৭৮, ৭৯, ৮৭
খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন ১০৪, ১০৭, ১৫৩, ৩৪২
খান এ সবুর ১৫৪, ১৫৫, ১৫৯
খাদেম হোসেন খান, ওস্তাদ ১০০, ৩৬০
খালেদ চৌধুরী ৮৫, ১৯৭
খোন্দকার সিরাজুল হক, ডক্টর ৩
খায়রুল কবীর ১৭০, ২২৮

গ.
গাজীউল হক ২৯২
গিয়াসউদ্দীন আহমদ, শহীদ ৭৮
গিয়াসউদ্দীন পাঠান ৫৫
গোপাল বিশ্বাস ১৯৭
গোপাল হালদার ১৮, ১৭১
গোবিন্দ চন্দ্র দেব ২৩০, ২৪২, ৩৫৩
গোলাম আহমদ চৌধুরী, ডক্টর ২৪১
গোলাম আযম, অধ্যাপক ৩৫১
গোলাম মোস্তফা ৯০, ১০৪, ১০৫, ১০৯, ১১২, ১১৩, ১২০, ১২২, ১২৩, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৭, ১৭২, ২৫৪, ৩৩১, ৩৫৩
গোলাম সাকলায়েন ১২৩

www.nagorikpathagar.org

চ.
চৌধুরী লুৎফর রহমান ৬৬

জ.
জয়নুল আবেদীন ৮৫, ৮৭, ১৮৮, ২১০, ২১৬, ২৪৮, ২৬৭
জসীম উদ্‌দীন ৫২, ১০১, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১২০, ১২৩, ১৬৯, ১৯৬, ২১৩, ২২১, ৩৫৭
জহরত আরা খানম ৭৯
জহুর হোসেন চৌধুরী ৩৪৩
জহির রায়হান ৭৯, ৮০, ৩৪৩
জাকির হোসেন ৪১
জাহানারা ইমাম ১২০, ১৪৮
জাহানারা ইসলাম ১৩৯
জাহানারা আরজু ১৫৩, ১৬৪, ২৪৫, ৩৬০
জাহেদুর রহিম ১৩১, ১৩৯
জিনাত গণি ১৯৭
জিয়া হায়দার ৭৯
জোবেদা খানম ১১৮, ১২৩
জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ৬১, ১১৮, ১২৩, ৩৫৩
জ্যোৎস্নাময় বসু ১৯১

ত.
তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ২৪৩
তাজউদ্দীন আহমদ ৫৮, ২৯৮
তাফাজ্জুল হোসেন, অধ্যাপক ২৩৮, ২৪০, ৩৪০
তালিম হোসেন, কবি ১০৪, ১১৯, ১২০, ১২৩, ১৫২, ১৫৩, ২২১, ৩৬০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৯
তালুকদার মনিরুজ্জামান ৬৫
তীতুমীর ২৯
তুলসী লাহিড়ী ৭৬
ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী ১৬৯

দ.
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১২
দুদু মিয়া ২৯
দেওয়ান আবদুল হামিদ ২৩৮
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ৬৫, ১১৫, ২৪৫, ২৬৩, ২৯৯

www.nagorikpathagar.org

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯৪
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৯

ধ.
ধীর আলী মিয়া ৩৬০
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৯৬
ধীরেন্দ্রনাথ রায় ২১২

ন.
নঈমুদ্দীন আহমদ ৫৩, ৫৮, ২৯৪, ২৯৮, ৩০০-৩০৪
নজির আহমদ ১৭৮, ১৭২
নরেন বিশ্বাস ৭৯
নরেন্দ্র দেব ২১২, ২২৯
নাজমুল করীম ১১৮, ২১৬
নাজির আহমদ ২১৭
নাজিরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ ১০৭, ১১২, ৩২৩
নীলিমা ইব্রাহিম, ডক্টর ১২৩, ২৭৩
নীহাররঞ্জন রায় ২৫, ২৮
নূরুদ্দীন আহমদ ১৯৭
নূরুর রহমান ১৯৩
নূরুল আমিন ৫৪, ৫৫, ৭৪, ৭৫, ২৯০, ২৯২
নূরুল ইসলাম, ডক্টর ২৩০
নূরুন্নেহার ৭৪, ৭৫
নূরুল ইসলাম চৌধুরী ১৭০, ২৫১
নূরুল হক ভূইয়া, অধ্যাপক ৩৯, ৫৪, ৬৫, ২৯৪
নূরুল হোসেন ৮৯, ১১২, ১১৯, ১২৩
নেয়ামুল বশীর ৯১, ১৪৮, ১৯৮

প.
প্রবোধ কুমার স্যানাল ২১৩, ২২৯
প্রমথনাথ বিশী ২১৩

ফ.
ফউজিয়া খান ৩৬০
ফকির শাহাবুদ্দীন আহমদ ২২৮
ফজল শাহাবুদ্দীন ৯০, ১৪৭, ৩৪৩

www.nagorikpathagar.org

ফজলুর রহমান, মন্ত্রী ৫৪, ২৯০
ফজলুর রহমান ২১৭, ২৯০
ফজলে আহমদ করিম ফজলী ১৭৬, ৩৩০
ফজলে লোহানী ৮৫, ৮৭, ৯৪
ফতেহ লোহানী ১৭০, ১৯৭
ফররুখ আহমদ ১১৯, ১২২, ১২৩, ১৭০, ২২১, ৩৬০
ফরিদা ইয়াসমিন ১০৭
ফরিদা বারী মালিক (খান) ৭৯
ফরিদা হাসান ১৩০, ১৩১, ১৮৮
ফজলুল হক সেলবর্ষী ৯০, ৩৯১
ফয়েজ আহমদ ৮৫, ৮৬, ১৯৭, ২১৭, ৩৪৩
ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ৩৩২
ফরহাদ মজহার ১১
ফারুক আলমগীর ৭১, ৭৩, ৭৬, ৭৯, ৮০
ফাহমিদা খাতুন ৭৯, ১৩৯
ফিরোজা বেগম ১৪১, ১৪২, ১৪৫
ফুলঝুরি খান ৩৬০
ফেরদাউস খান ৬০, ১৮৭, ৩৪০
ফেরদৌসী বেগম, গায়িকা ৬৫, ১০৭, ১৩২, ১৫৪
ফেরদৌসী মজুমদার ৭৯

ব.
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৬, ২০, ২৯
বজলুল করিম ৭৯
বদরুদ্দীন উমর ১, ৮, ৯, ১১, ১৯, ৪৩, ৫৯, ৬৫, ২৮৫
বদরুন্নেসা আহমদ ১০০
বনফুল ৭৬
বন্দে আলী মিয়া ২১০, ২১৫
বশীর আল হেলাল ১১, ৩১৪
বশীর আহমদ, গায়ক ১৪১, ১৪২
বাসন্তী গুহঠাকুরতা ১০০
বাহাউদ্দীন আহমদ ২১৮
বি এম আব্বাস এটি ২৩০
বিজন চৌধুরী ১৯৭
বিজন ভট্টাচার্য ৭১, ৭৩, ৭৫, ১৯৮
বিবেকানন্দ ২৯

www.nagorikpathagar.org

বিমল চন্দ্র রায় ১৭২
বিলকিস নাসিরউদ্দীন ১৩৯, ২১৮
বিষ্ণু দে ১৯৪
বুলবুল খান মাহবুব ৭৬
বুলবুল চৌধুরী ৯৮, ৯৯, ১০০
বেদারউদ্দীন আহমদ ৯১, ১০০, ১৬১, ১৭০, ১৭২, ২২০
বেদুইন সামাদ ১২৩
বেনজির আহমদ, কবি ১০৪, ১১২, ১৫৩, ১৬৪, ২৪৫, ৩৬০
বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ১১, ৮৫, ৮৭, ৯০, ৯৪, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ৩৫৩

ভ.
ভবানী সেন ১৭১

ম.
মঈনউদ্দীন ৮৯, ১১২, ১১৩, ১৩৬, ২৫৬, ৩৫১, ৩৬০
মঈনুদ্দীন আহমেদ ২৯৪
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১১২, ২২৬, ২৩১, ৩০৮–৯, ৩৫৮, ৩৭২
মওলানা জুলফিকার আলী ৩৩০
মওলানা মহিউদ্দীন খান ২৩৮
মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান ১০৪, ১২২
মতিউল ইসলাম, কবি ১১২, ১৮২
মতীনউদ্দীন আহমদ ১০৪, ১১২, ১৩৬
মনসুরউদ্দীন ১০৬, ১২০, ২০২, ২১৫, ২৭৪, ৩৪৩
মনসুর মুসা ১৪৭
মযহারুল ইসলাম, ডক্টর ২৬৬
মনিরউদ্দীন ইউসুফ ১৪০
মনোজ বসু ৭৬, ২১২, ২১৮
মফিজুল্লাহ কবির ২৩৮
মমতাজউদ্দীন আহমদ ৭৯, ১১২
মমতাজুর রহমান তরফদার ১১
মহাদেব সাহা ১৪৭
মাফরুহা চৌধুরী ১৫৩, ৩৬০
মালেকা বেগম ৭৯
মালেকা আজিম ১৩৯
মাহফুজুল হক ২৪৫, ২৬৩
মাহমুদ হোসেন, ডক্টর ২২৯

www.nagorikpathagar.org

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ১২৩, ২৪৫
মাহবুব উল্লাহ ৮০
মাহবুব-উল আলম ১১২, ১৯৫
মাহবুবুল আলম চৌধুরী ১৯৭
মাহমুদ আলী ২৯৯
মাহমুদ নূরুল হুদা ৯৯
মাহমুদ শাহ কোরেশী ৮৯
মাহমুদ হাসান ২৯৫
মিরজা আবদুল হাই ৯০
মীজানুর রহমান ১১৯
মীর্জা গোলাম হাফিজ ৩০৮
মীর আবুল হোসেন ১০৮
মীর কাশিম খান ৩৬০
মীর মশাররফ হোসেন ১১৮
মুজিবর রহমান খাঁ ৭৯, ১০৪,, ১০৮, ১২৩, ১৫৩, ১৭০, ২৮৬, ৩৪২, ৩৬০
মুনীর চৌধুরী ৫৩, ৭১, ৭৪, ৮৫, ১১৮, ১২১, ১২৩, ১৩৭, ১৪২, ১৭০, ১৭১, ২১৩, ২১৫, ২৭৫, ২৮০, ২৯১, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৫৩
মুন্নী বেগম ১৪২
মুন্সী রইসউদ্দীন ৩৬০
মুর্তাজা বশীর, শিল্পী ৮৭, ৯১
মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম ৭৮, ৭৯, ৮৫, ১৯৭
মুস্তাফিজুর রহমান ২৩৮
মুহম্মদ আফজাল, মন্ত্রী ৫৪
মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ১১৩, ১৬৯, ৩০৪, ৩০৫
মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক ৬৩, ১০৮, ১১২, ১১৫, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৩, ২১০, ২১৬, ২২২, ২৭৩, ২৭৮, ৩২৪, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৫৩
মুহম্মদ ইসহাক, ডক্টর ২৩৮
মুহম্মদ এনামুল হক, ডক্টর ১১২, ১১৯, ১২১, ১২৩, ১৪০, ১৪৮, ২২৯, ২৭৭, ৩২৭, ৩৪০
মুহম্মদ ওসমান গণি, ভিসি, ঢা.বি. ১৫৫, ২৩০, ২৭৪, ৩১৫, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪২
মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, ডক্টর ৯১, ১৪৭, ২১০, ২১৬, ২২৯, ৩২৩, ৩৫৫
মুহম্মদ মুজাদ্দেদ ২৭৩
মুহম্মদ মুহাদ্দিস ৭৯, ৮০
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর ৬১, ৯০, ১২০, ১২১, ১২৩, ১৩৭, ১৪৭, ১৫৫, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ২১২, ২১৩, ২২৯, ২৮৮, ৩৩০, ৩৩৯–৪১
মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ৩৯, ৫৮
মোজাফফর আহমদ কমরেড ৪৭

www.nagorikpathagar.org

মোতাহের হোসেন চৌধুরী ১৫, ২০, ২২, ১০৮, ১৮৫, ১৮৯
মোনায়েম খাঁ, গবর্নর ১৩৪, ১৬০
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ৮৭, ১২০, ১২৩, ১৪৭, ১৪৮, ২১৬, ২৭৩
মোফাখখারুল ইসলাম, কবি ১১২, ৩৬০
মোমিনুল হক ৭৯
মোস্তফা কামাল ৬৫
মোস্তফা মনোয়ার ১৪৪
মোস্তফা জামান আব্বাসী ৮২, ১৪৮
মোহাম্মদ আইয়ুব খান ১০, ১১৬, ১১৭, ১২২, ১২৬, ১৫৪, ১৬০, ১৬২, ১৬৩, ৩৩৪, ৩৩৫
মোহাম্মদ আকরম খাঁ ৫৩, ২৩৫, ২৪৮, ২৫১, ২৬৮, ২৮৫, ৩৩১, ৩৪৮, ৩৬০
মোহাম্মদ আবু তালিব ২২২, ২৩৮, ২৪৫
মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী ১২০, ১৪৮
মোহাম্মদ ইব্রাহিম, ভিসি, ঢা. বি. ২৩৮
মোহাম্মদ ইব্রাহিম, বিচারপতি ৯৯
মোহাম্মদ ইব্রাহিম, চিকিৎসক ১০০
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ৮৯, ১০৮
মোহাম্মদ তোয়াহা ৩৯, ২৯৪, ২৯৮–৯৯, ৩০৫, ৩০৮, ৩১৫
মোহাম্মদ নাসির আলী ১০৪, ১০৭, ৩৬০
মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৩৪৩
মোহাম্মদ মোহর আলী ৩৫৯
মোহাম্মদ সোলায়মান ১৭০
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ১০৮
মোহাম্মদ জাকারিয়া ১৪৪
মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, অধ্যক্ষ ৯১, ১০২, ১০৩, ১১২, ১৩৭, ১৫৩, ২০২, ২৫৯, ৩৬০
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডক্টর ৭৯, ৮১,, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৮, ২৭৩
মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ৬৫, ৬৬, ১০৪, ১০৮, ১০৯, ১৪০, ১৪৭, ১৫৩, ১৬৪, ২৪৫, ৩৬০
মোহাম্মদ মোদাব্বের ১০০, ১৫৩, ১৬০, ৩৪২, ৩৬০
মোহাম্মদ মোরশেদ, বিচারপতি ১৪১, ৩৫৩
মোহাম্মদ সুলতান, প্রকাশক ৯১
মোহাম্মদ হোসেন ৭৯

য.

যোগেশচন্দ্র রায় ২০

র.

রওশন আরা মাসুদ ১৪৫
রওশন ইয়াজদানী ১২১, ১৯৭

www.nagorikpathagar.org

রফিউদ্দীন ১৫
রফিকুল ইসলাম, ডক্টর ৭৯, ১০১, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫২, ২৭৩
রফিকুল হক ৭৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯, ২৯, ৭৬, ১০১, ২২৩
রণেশ দাশগুপ্ত ২৯৮
রমেশ শীল ২১৫
রশীদ করিম ১২১, ৩৫৩
রশীদ হায়দার ৭৯
রায়হান শরীফ ১৫
রাজিয়া খান ১২০, ১৪৭, ১৪৮
রাধারাণী দেবী ২১২, ২১৯, ২২৯
রানা লিয়াকত আলী (বেগম) ৯৯
রামমোহন রায় ২৯
রামকৃষ্ণ পরমহংস ২৯
রামেন্দু মজুমদার ৭৯
রামমোহন চক্রবর্তী ১৯৭
রাহিজা খানম ৯৮
রুহুল আমিন নিজামী ১৯৭
রোকনুজ্জামান খান ৮৭, ৩৪৩
রোকেয়া কবির ৭৪, ৭৫

ল.
লতিফা রশীদ ৯০, ৯১
লায়লা আরজুমান্দ বানু ১৪১, ১৪২, ১৪৫, ১৬২, ১৭০, ২২০
লায়লা সামাদ ৭৪, ৭৫, ৮৫, ৮৮, ১৯৭, ২১৭, ৩৪৩
লিলি চৌধুরী ৭৪
লুৎফুল হায়দার চৌধুরী ৮৭, ৯০

শ.
শওকত আলী ৫৭, ১৯৮, ২৯৯-৩০২, ৩৪৩
শওকত ওসমান ৭৫, ১১২, ১৪২, ১৯২, ১৯৭, ২১৩, ২১৮, ২৩৫
শফিউদ্দীন আহমদ ১৮৮
শফিকুল হোসেন ২১৭
শরদিন্দু ব্যানার্জী ১৯৩, ১৯৭
শহীদ কাদরী ৯১, ৩৪৩
শহীদ সাবের ৮৭

www.nagorikpathagar.org

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ২১২, ২১৯
শামসুদ্দীন আবুল কালাম ৮৯, ৯১, ১১৩
শামসুদ্দীন আহমদ, ডাক্তার ২৩০
শামসুন্নাহার মাহমুদ ৮৯, ৯৯, ১১২, ১১৫, ১১৮, ১২৩, ১৩৭, ১৭৭, ২১৭, ২৪১, ৩৩৩
শামসুর রাহমান ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯৪, ১৪৭, ২১৭, ৩৪৩, ৩৫৩
শামসুল আলম ৫৮
শামসুল হুদা ১৭০
শামসুল হুদা চৌধুরী ১০৪
শামসুল হক ৩৯, ৫২, ৫৭, ৫৮, ১৪৮, ২৯৮–৩০২, ৩০৮, ৩১১
শাহ আজিজুর রহমান ৫২, ৩৫৬
শাহনাজ বেগম ৩৬০
শাহনূর খান ১১
শাহাদৎ হোসেন ২০২
শহীদুল্লাহ কায়সার ২৯৮, ৩৪৩
শাহেদ আলী ৪৬, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ২২১, ২৪৫, ৩০৪, ৩৬০
শাহেদ সোহরাওয়ার্দী ৩১
শেখ লুৎফর রহমান ১১, ১৪৫, ১৬২, ১৭২, ২১৩, ২১৫, ২১৭
শাহাবুদ্দীন ১৯৭
শাহাবুদ্দীন আহমদ ১৬৪
শেখ মুজিবুর রহমান ৫২, ৫৭, ২৯৮–৩০২
শেখ লুৎফর রহমান ১৪৫, ১৬২

স.
সচীন্দ্রপ্রসাদ মজুমদার ১৯৩, ১৯৭
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৮৫
সন্‌জীদা খাতুন ৭৯, ১৩১, ১৩২, ২১৯
সরদার জয়েনউদ্দীন ৮৭,
সরদার ফজলুল করিম ১৪৭, ১৪৮, ২৯৪
সরলানন্দ সেন ১৮২
সলিল চৌধুরী ১৮৮, ২০৫
সাইদুল হাসান ১৩৪
সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ৮৫, ৮৭, ৯০, ৩৪৩
সাইফুদ্দীন ১৪৪
সাইফুদ্দীন আহমদ মানিক ৭৯, ১৩১
সায়িদুল হক ১১৮
সাঈদ-উর রহমান, ডক্টর ৮৬, ১৩৪

www.nagorikpathagar.org

সাদেক খান ৩১৫
সাধন সরকার ১১
সাখাওয়াৎ হোসেন ৭৯
সানাউল্লাহ নূরী ৪১, ৪৯, ৬০, ৬৫, ৩৪৩, ৩৬০
সাজেদুর রহমান ১৪৭
সাবির আহমদ চৌধুরী ১৬০
সিকান্দার আবু জাফর ১১, ১২, ১০৮, ১৩৯, ১৪১, ১৪৪, ৩৪৩
সিরাজুল ইসলাম ১৯৭
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডক্টর ১১, ৬৫, ৬৬, ১০৮,, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৭, ২৪১, ২৪৩, ২৬৫
সিরাজউদ্দীন হোসেন ১৫৩
সিরাজুল হক ২৪১
সুকান্ত ভট্টাচার্য ৭৭
সুচরিত চৌধুরী ১৯৭, ৩৫৯
সুচিত্রা মিত্র ২১৩
সত্যেন্দ্রনাথ বসু ২৩২
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর ১৫, ১৭, ২০, ২৪, ১৭৮, ৩২৩
সুফিয়া কামাল ৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯১, ১১২, ১১৩, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৪১, ১৫৩, ১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ২১৭, ৩৪৩, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৭
সুফী জুলফিকার হায়দার ১৬৪
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২১২, ২১৮
সুলতানা রেবু ৭৯
সুশোভন সরকার ১৭১
সেকান্দর আলী ভূঁয়া ১৯১
সেলিনা বাহার চৌধুরী ১০০
সৈয়দ আকরম হোসেন ১৪৭
সৈয়দ আজিজুল হক ১০০
সৈয়দ আবদুল ওয়াদুদ, বিএল ১৯১
সৈয়দ আলী আশরাফ ১০৮, ১৬৯, ১৭৭, ৩৪২
সৈয়দ আলী আহসান ১১৮, ১২৩, ১৭০, ১৭৬, ২০২, ২১৬, ২২২, ২৮০, ৩৩৭, ৩৪৮
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১১৫
সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৪১, ৫৮, ৩০৫
সৈয়দ মুজতবা আলী ২১৩
সৈয়দ মুর্তজা আলী ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৩, ১৪৮, ৩৪৩
সৈয়দ মুস্তফা আলী ৯০
সৈয়দ মুহম্মদ হোসেন, বিচারপতি ১০০
সৈয়দ শামসুল হক ৮৭, ৮৯, ৯০

www.nagorikpathagar.org

সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন ১০৪, ১০৫
সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ১১৫, ১২৩, ৩৪০, ৩৫৩, ৩৫৯
সোহরাবউদ্দীন, গায়ক ৯১
সোহরাব হোসেন, গায়ক ১৪৫, ১৬১

হ.
হায়াত হোসেন ৮০
হাজী শরিয়ত উল্লাহ ২৯
হানিফ দউফ ২১৭
হাবীবুর রহমান ২১৫
হাবীবুল্লাহ বাহার, মন্ত্রী ৫২, ৫৩, ৫৫, ১৬৯, ১৭০, ১৭২, ১৭৬, ১৭৭, ২৯০
হামিদুল হক চৌধুরী ৫৪, ২৯২, ৩০৯
হাশমত রশীদ ১৯৭
হাসনাত আবদুল হাই ৮২
হাসান আজিজুল হক ৩৫৮
হাসান ইকবাল ৬৫
হাসান জামান, ডক্টর ১১৮, ১২৩, ১৫৪, ২০২, ২৩৮, ২৪১, ৩৫৩, ৩৬০
হাসান হাফিজুর রহমান ১১, ৭১, ৭৯, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯১, ১০৮, ১২০, ১৪৭, ১৪৮, ১৯৮, ২৮৫, ৩৫৭
হীরেন্দ্রনাথ সেন ২১৩
হুমায়ূন কবির (ভারত) ২৫, ২৬, ২২৯
হুমায়ূন কবির, কবি ১১
হেদায়েত হোসেন চৌধুরী ৩১৫
হেদায়েত উল্লাহ ২৩০
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৯৯, ৩৭২

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ISBN 984-8298-03-7

9 789848 298039